ছায়াপথ।

উপন্যাসে—সনাতন ধর্ম্ম প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় প্রকাশ।

(তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।)

ছায়া প্রণেতা—

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

অজ্ঞেতে বুঝিতে নারে, বিজ্ঞে লাগে ধন্ধ।
গুরু কৃপা বিনা নাহি—ইহার সম্বন্ধ॥

কলিকাতা, ১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে—

শ্রীরাধানাথ মিত্র দ্বারা প্রকাশিত।

ভাদ্র, ১৩০৮।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

তৃতীয় খণ্ড।

সম্বন্ধ।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবসুন্দর যেন আর সে জীবসুন্দর নাই। সংসারের সামান্য আপদ বিপদে যে জীবসুন্দর অস্থির হইতেন—আজ সেই জীবসুন্দর প্রাণ তুল্য ভাই—শিবসুন্দর বিরহেও স্থির—অবিকম্পিত। মনে মনে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ। কিন্তু সে কল্পনার আত্মসমর্পণে সুখ নাই—শান্তি নাই—আত্মবিস্মরণ নাই। তাই মধ্যে মধ্যে হৃদয় যেন সে তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উঠিয়াই কিন্তু নিরস্ত হয়—কারণ সম্মুখেই হরসুন্দরের দিব্য মূর্ত্তিতে সে বেগ আপনিই শমিত হইয়া যায়।

জীবন্দসুর ভাবিতেছেন—সংসারে ধর্ম্ম ভ্রষ্টের দোষ নাই। যাঁহারা ভুক্তভোগী নহেন—এ ব্যথা ভোগ করেন নাই—ধর্ম্মে যাঁহারা অগ্রসর হয়েন নাই—তাঁহারাই দূর হইতে দোষ দেখেন। নচেৎ ভুক্তভোগীত বুঝিবেনই—যাঁহারা মুক্ত, তাহারাও বুঝেন যে, সংসারের এ কুহক পিছে রাখিতে—কত কষ্ট। মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি ভুলিতে—কত বেদনা হৃদয়ে লাগে। কারণ তাঁহারা এককালে ভুক্ত ভোগী ছিলেন। যাহার যাহা ক্ষমতাধীন, তাহাতে তাহার আলস্য দোষের বটে—কিন্তু যাহার ইচ্ছা আছে—বলে কুলাইতেছে না—তাহাতে তাহার দোষ কি?

আবার ভাবিতেছেন—লোকের হিত চিন্তা—লোকের কষ্টে কষ্ট বোধ—সে কষ্ট নিবারণের চেষ্টা, এ সকল কি ধর্ম্ম নহে? যদি হয়—তবে আমার হৃদয়ের এ বিক্ষেপ—দোষের কেন? ইহাও ত ধর্ম্ম? যাহা ধর্ম্ম—তাহা হৃদয় হইতে দূর করাও ত দোষ?

ভাবিতে ভাবিতে জীবসুন্দরের চক্ষে জল আসিল। কারণ জীবসুন্দর মনে মনে বিচারে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। অথচ

হইবে। তখন বুঝিবে—নিত্য ধর্ম্মে আর নৈমিত্তিক ধর্ম্মে প্রভেদ কি?"

এমন সময়ে নটনারায়ণ ম্লান মুখে আসিয়া বসিলেন। নটনারায়ণের ম্লান ছায়া হরসুন্দরের হৃদয়ে পড়িতেই হরসুন্দর বলিলেন, "আজ এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?"

নটনারায়ণ নরনারায়ণের গৃহ ত্যাগের কথা যথাযথ বিবৃত করিলেন। হরসুন্দর বলিলেন, "তবে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া তোমার এখানে আসা ভাল হয় নাই, কারণ এখানে অনুসন্ধান কে করিবে?"

নট। অনুসন্ধান যাহা করিবার তাহাত করা হইবে এবং তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছি। আর যদি এই দিকেই আসিয়া থাকে—তবে সে খোঁজও লওয়া হইবে এবং আপনার সংবাদও পাইব—এই বলিয়া আমিই এ দিকে আসিলাম। কিন্তু বৃথা অনুসন্ধান, আপনার কি বোধ হয়?

হরসুন্দর সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না। যোগমায়া কিরূপ করিতেছেন—তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু জীবসুন্দরের চক্ষু হইতে জল ঝরিতে লাগিল। এবং হৃদয়ে এরূপ একটা ভাবের উদয় হইল—যাহাতে জীবসুন্দর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

জীসুন্দরের এ ভাবে, হরসুন্দরের চক্ষেও জল দেখা দিল। নটনারায়ণের চক্ষে এ পর্য্যন্ত জল দেখা দেয় নাই—কিন্তু হরসুন্দরের চক্ষে জল দেখিয়া তিনি আর হৃদয়বেগ শমিত করিতে পারিলেন না।

হরসুন্দর বলিলেন, "তাহার কি মহিমা, কাহাকে কোন রূপে আকর্ষণ করিতেছেন, দাস জীব তাহা না বুঝিতে পারিয়া অহং ধর্ম্মে তাহাকে হারায়—দুঃখ লাভ করে, তাই কাঁদিতে হয়। আজ সংসারে একটী ধর্ম্ম পথের পথিক হইল, এমন সুখের দিনেও মায়া ঘোরে কাঁদিতে হয়,—জীবের ইহাপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি আছে।"

তখন জীবসুন্দরকে বলিলেন, 'জীব! আজ উত্তমরূপ সেবার আয়োজন কর, জীবের প্রতি যাহার এত দয়া, দেখিও জীব যেন তাহার সেবা না ভুলে।"

নটনারায়ণ বলিলেন, "যদি বলেন—তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

হর। তাহার কথা—যে শুনায় বা তাহার কথা যে শুনে—সে

আমার মাথার ঠাকুর। শুনিব বলিয়াইত কথা তুলিছে হর—যদি তৃষ্ণায় জল কোথাও পাই। তবে ইহাতে জিজ্ঞাসার কথা কি আছে ভাই!

নট। শুনাই আমাদের অবস্থা, তবে না বুঝিলে—বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা। নরনারায়ণ, সংসারে মুক্তি প্রার্থী হইয়া সংসার ত্যাগ করিল বলিয়াই আমাদের জ্ঞান—কিন্তু বৈষ্ণব কি এ বৈরাগ্যকে ধর্ম্ম পথের পথিক মনে করেন?

হরসুন্দর অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তুমি কি নরনারায়ণকে চিন? মানুষ বহু বহু জন্মে যে কার্য্য সাধন করে—আবার এক জন্মেও কৃষ্ণ কৃপায়—তাহা সাধন করিতে পারে। নিত্য ধর্ম্ম সনাতন—তাহা দুর্লভ। সে দৃষ্টি—প্রথমেই কেহ লক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু যাহার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা থাকে, সে আর অনিত্য ধর্ম্মে—অধিক দিন স্থির থাকিতে পারে না। অনিত্য ধর্ম্মের অনিত্যতা দেখিয়া নিত্য ধর্ম্ম অভাবে, যখন—সে ধর্ম্ম প্রতিও তাহার বৈরাগ্য জন্মিবে—তখন নিত্য ধর্ম্ম—আবরণ অভাবে আপনিই প্রকাশ হইবে। কারণ জীবের তাহা নিত্য সহচর—অবিদ্যার আবরণে এখন আবরিত মাত্র। সে প্রকাশে কাহার মুক্তিতে আদর জন্মে? মুক্তি আপনি আসিয়া তাহার সহচরী হয় মাত্র—সে কৃষ্ণ ভিন্ন কাহার মুখ অপেক্ষা করে না। নরনারায়ণের ভাবে বোধ হয়, এক দিন নরনারায়ণের গুরু কৃপায়—সে নিত্য ধর্ম্মের উদয় হইয়াছিল। যে—সে স্বরূপ বারেক ভোগ করিয়াছে—তাহাকে আর মায়া, ছলনায় অধিক দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। তবে ভোগাবসানের জন্য তাহাকে সময় অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং মায়াও নানারূপে ভুলাইতে চেষ্টা করিবে।"

নট। যদি মায়া ভুলাইতে চেষ্টা করে—তবে ভোগ বাসনারত বুদ্ধিই হইবে?

হর। না—নিত্য ধর্ম্ম সর্ব্বাতীত, যে তাহা বারেক ভোগ করে—মায়ার কোন ভোগে সে অধিক দিন আর ভুলিয়া থাকিতে পারে না। তাহার এই নিত্য ধর্ম্মের অনুরাগে, মায়া সন্তুষ্টা হইয়া তখন তাহাকে স্ব বাগুরা হইতে আপনি মুক্তি দেন। এতদিন নরনারায়ণের ধর্ম্মের

জন্য প্রাণ কাঁদে নাই, আজ কাঁদিয়াছে—তাই সে গৃহে তিষ্ঠিতে পারে নাই। যাহার জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাহার কাছে যাইবার জন্যই গৃহ ছাড়িয়াছে। কোথায় সে জানে না বলিয়াই—সে বনে গিয়াছে। যদি বনে না পায়, আবার তাহাকে ফিরিতে হইবে। মায়া তাহাকে ভুলাইয়া ভণ্ড করিতে পারিবে না।

এই প্রাণ কাঁদাই ধর্ম্মপথের পথিক হওয়া—নচেৎ যে আহারে বিহারে সন্তুষ্ট আছে—তাহার ধর্ম্মভাব মায়ার খেলা মাত্র। বনে গমন প্রাণ কাঁদার লক্ষণ না হইলেও—সংসারে অনাশক্তি একটা লক্ষণ বটে। কারণ একে আশক্তি—অন্যে অনাশক্তি—ইহা সাধারণ নিয়ম।

তখন অন্দর হইতে কমলাকান্ত বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, "জিনিসপত্র গুলি সব গুছাইয়া লওয়া হইয়াছে ত? তোমাদের মেয়েরা কখন কাজ কর্ম্ম করে—তাহাত দেখিতে পাওয়া যায় না।"

হর। করে বই কি। না করিলে আমরা কি খাই দাই না, সংসার করি না। আর কি আছে? যে গুছাইতে এত বিলম্ব হইবে?

ক। কেন? তোমার একটা জিনিস আমি নষ্ট হইতে দিই নাই। দেখিয়াছ ত? আগুনের ভিতর গিয়া—আমি সব বাহির করিয়া আনিয়াছি।

হর। তাত দেখিয়াছি। কেন বল দেখি—তুমি আমার জন্য এত করিলে?

ক। সেটা আমার রোগ। তবে তোমার সম্বন্ধে সবটা রোগ নহে, আমার কিছু আশা আছে।

হ। কি বল দেখি?

ক। শশাঙ্ক আমায় ১০০ শত টাকা দিয়াছে। এখন সেটা তুমি প্রাণ ধরিয়া আমায় লইতে দিবে কি—না? যদি দাও—তাহা হইলে আমি খরচ করি

হ। আবার ওই কথা। কালত মিটিয়াই গেল। ও টাকা কেবল

দিন। যদি প্রয়োজন হয়—লওয়া যাইবে। এখনত প্রয়োজন হইতেছে না।

ক। কেন? সেত তোমায় দিতেছে না—আমায় দিতেছে, তোমার আপত্তি কি?

হ। যদি তাহা হয়—আমার আপত্তি নাই।

ক। আমি ওই টাকায় তোমার বাড়ী করিব।

নটনারায়ণ, কমলাকান্তকে বলিলেন, "না না ও টাকা থাক। আমি মনে করিতেছি—উঁহাকে আমি নন্দীগ্রামে লইয়া যাইব। জীবসুন্দর বসিয়া আছে—টাকার এখন অনেক প্রয়োজন।"

ক। তোমার মুখ খানি ওরূপ বিমর্ষ কেন? আমি প্রথমে আসিয়া তত বুঝিতে পারি নাই—এখন যেন বিশেষ বোধ হইতেছে।

তখন হরসুন্দরের মুখে কমলাকান্ত সমস্ত শুনিয়া বড়ই দুঃখ করিতে লাগিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন, "এতক্ষণ অন্য কথায় অনেকটা দুঃখ ভুলিয়াছিলাম—তাই তখন আপনি মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আবার আপনি সেই কথা তোলায়, দুঃখ দেখা দিতেছে—তাই এখন বুঝিতেছেন।"

হরসুন্দর, কমলাকান্তকে বলিলেন, "তোমার বহির্বাটী পড়িয়াছিল—আমি থাকায় তোমার কোন কষ্ট হইতেছে না—তখন ও টাকায় বাড়ী তৈয়ারীর কোন প্রয়োজন নাই—সে কায করিও না।"

ক। যাহার সুবাদে সুবাদ—সেই যখন বাড়ী ত্যাগ—সংসার ত্যাগ করিল—তখন নটনারায়ণ বাবু—ও আশা ত্যাগ করুন। আর বিশেষ আমরাই বা হরসুন্দরকে দেশ ছাড়া করিব কেন? করিতে দিব কেন?

নটনারায়ণ, হরসুন্দরের মুখ লক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমি বৈবাহিক বটে—কিন্তু সে সম্বন্ধ সত্বেও—মনে মনে আমি অন্য সম্বন্ধে আপনাকে লইয়াছি। লইয়াছি—না লইয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে আমার মনের কোন ক্ষমতা নাই। আমি বুঝিয়াছি—আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ—গৌণ, হৃদয়ে যে মুখ্য সম্বন্ধ উদয় হইয়াছে—তাহারই জন্য ঈশ্বরের এ খেলা।"

নটনারায়ণের চক্ষে জল দেখা দিল। এ কথা হরসুন্দর ব্যতীত আর কেহ বুঝিল না। আর হরসুন্দরের দিকে তাকাইতে তাঁহার চক্ষু স্থির থাকিল না। তিনি ইঙ্গিতে কমলাকান্তকে ডাকিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন প্রতিবাসী কয়েক জন আসিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্যোতিঃপ্রসাদের বড় মাছ ধরা বাই। যদি কখন শুনিলেন যে, অমুখ পুষ্কর্ণিতে বা ঝিলে বড় বড় মাছ আছে—তাহা হইলে সে যত দূরই হউক—আর যত কষ্টই হউক না কেন—তাহাতে জ্ঞান থাকে না। বিলাসীর এ সকটা সহজেই হইয়া পড়ে—আর লঘু চিত্তেই ইহা অধিক স্থান পায়।

শশাঙ্ক বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কাছারীতে আবশ্যকীয় কর্ম্ম গুলি সারিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদের সহিত দেখা করিলেন—বলিলেন, "নন্দন-ঝিলে" অনেক দিন মাছ ধরা হয় নাই—চলুন যাই।"

জ্যো। তুমি দেবীগ্রামে যাও নাই ?

শ। না। ভাবিলাম—"নন্দনঝিলে" মাছ ধরিতে যাইব—আর দেবীগ্রামে বেড়াইয়া আসিব।

জ্যো। তুমিত মাছ ধরিতে ভালবাস না—আজ যে সক হইল ?

শ। ওই দিকে যাইব—তাই ভাবিতেছি।

জ্যো। বটে—বটে, অনেক দিন "নন্দনঝিলে" মাছ ধরা হয় নাই। এত দিনে মাছ গুলা বোধ হয়, এক মোন দেড় মোন হইয়া থাকিবে। ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ।

তখনি ভৃত্যকে ডাকিয়া মাছ ধরার সরঞ্জাম ঠিক করিতে বলিলেন।

"নন্দনঝিল" দেবীগ্রামের নিকটেই—অৰ্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান মাত্র। এই সময়ে শশাঙ্কের, জ্যোতিঃপ্রসাদকে একবার হরসুন্দরের মূর্ত্তি—দেখাইবার বড় ইচ্ছা; কিন্তু কি সুযোগে ইহা ঘটে—বার বার তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার "নন্দনঝিলের" কথা মনে হইল। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে কায নাই—বেহারাদের খবর দাও।"

শ। আজ এখন গিয়া আর কতক্ষণ ধরা হইবে—কাল যাওয়া যাইবে।

শশাঙ্কের চিত্ত হরসুন্দরের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। প্রভাবতীর বাক্যে তিনি এখনও মায়াপুরে। নচেৎ জ্যোতিঃপ্রসাদ—এখনও শশাঙ্ককে মায়াপুরে দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু নিজ চক্ষে—আর পর চক্ষে দেখা—কিছু স্বতন্ত্র। তিনি হৃদয়ে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। পাছে জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহা বুঝিতে পারেন—সে জন্য তাঁহার ওরূপ বাক্য ভঙ্গি।

জ্যো। না—না। যখন মনে করিয়া দিলে, তখন আর কাল বিলম্ব করিলে চলিবে না। আর বেলাই বা কত? ১১।১২ টা হইবে—পঁহুছিতে না হয় ৩।৪ ঘণ্টা লাগুক—আর কি?

তখন উপযুক্ত সাজসরঞ্জামে উভয়েই রওনা হইলেন। যথা সময়ে "নন্দনঝিলে" পঁহুছিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ একবার ঝিলের চারি ধারে বেড়াইলেন। মনমত স্থান আর নির্ব্বাচন হয় না। শশাঙ্ক এক স্থানে বসিলেন, দেখাদেখি জ্যোতিঃপ্রসাদও সেই স্থানে বসিলেন।

শশাঙ্ক বলিলেন, "তবে আমি একবার—এই বেলা দেবীগ্রাম হইয়া আসি।"

জ্যো। তাও কি হয়? এখন ত ধর।

শ। আমি এইখানে আসিয়াছি জানিলে—আর যদি না যাই, তাহা হইলে তোমায় দোষী হইতে হইবে—এবং সন্দেহ করিবে। সে আমি বড় ভয় করি।

জ্যো। জ্যোতিঃপ্রসাদ দোষে ভয় করে না। জ্যোতিঃপ্রসাদ থাকিতে—শশাঙ্কের ভয় কি? শশাঙ্কের জন্য জ্যোতিঃপ্রসাদ সন্তান ভুলিতে পারে।

শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিলেন—লোকে দড়ী দিয়া বাঁধে সে ভাল—বন্ধন দেখা যায়—খোলা যায়; কিন্তু এ ভালবাসা বন্ধন—হৃদয়ের কোন নিভৃতে—দেখা যায় না—তা খুলিব কি? জ্যোতিঃপ্রসাদ! তোমার ভালবাসা সুন্দর—যদি কৃষ্ণ প্রেমে অন্তর বাহির এক হয়—তবেই সে সুন্দর—সুন্দর হয়। নচেৎ যাহা দিয়াছি—তাহা ফিরাইয়া লইতেও পারা যায় না—আবার বিশ্বাসে তোমায় হৃদয়ে রাখিতেও—ভয় হয়।

শশাঙ্ক বলিলেন. "সে আর ফুটিয়া বলিতে হইবে কেন? শশাঙ্ক কি তাহা জানে না।" এই বলিয়া শশাঙ্ক দেবীগ্রামাভিমুখে চলিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—জ্যোতিঃ! যদি তাহা না জানিতাম—তবে আমার এ খেলা কেন? প্রভা! তোমার কথা সত্য। জগাই মাধাই-য়ের হৃদয়ে প্রেম ছিল—তবে আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। যদি না থাকিত—তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের হৃদয়ে—এ কি? যদি সত্য হয়—তবে এই রূপেই আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু দুঃখ বড়— অন্ধ যে—সম্মুখে অনন্ত সৌন্দর্য্য থাকিলেও—সে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

ক্রমে শশাঙ্ক, হরসুন্দরের দগ্ধিকৃত, শ্রী হীন, ভগ্ন কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হৃদয় অমনি ব্যথায় ব্যথায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। যে বুদ্ধি হৃদয়কে উজ্জ্বল রাখিয়াছিল—তাহা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কল্পনার যেন সে শ্রী আর নাই। হস্ত পদের বল যেন—কে আকর্ষণ করিয়া লইল। তিনি অনেকক্ষণ একভাবেই তাহা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—প্রভা! জানিও—ভীষ্মের শর কৃষ্ণে ব্যথা দিতে পারে নাই। ভীষ্মকেই ব্যথা দিয়াছিল। যদি দুর্য্যোধন ভীষ্মের সে ব্যথা বুঝিত—তবে সে কৃষ্ণে বঞ্চিত হইত না। ছার রাজত্বের অহংকার তাহার হৃদয় গ্রাস করিতে পারিত না। জ্যোতিঃপ্রসাদ! যদি হরসুন্দরের কৃষ্ণে মতি থাকে—তবে দুর্য্যোধনের ভাগ্য স্মরণ কর—পশ্চান্মুখ হও। তবে বুঝিবে—শশাঙ্ক তোমায় কত ভালবাসে। অন্তর দৃষ্টি করিতে শিখ—কেবল বহির্দৃষ্টিতে মানুষ পশু তুল্য—অন্তর বহির্দৃষ্টিতে মানুষ—দেবতা। তবে বুঝিবে পশুর প্রেমে—আর দেবতার প্রেমে—কত প্রভেদ।

আবার ভাবিলেন, "হরসুন্দর! যদি তোমায় কখন শিক্ষা গুরু বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকি—তবে ইহাই আমার শ্রীমন্দির। আমিই ভাঙ্গিয়াছি —আবার আমিই গড়িব। ভাঙ্গিয়াছি—মায়ার মোহিনী মূর্ত্তির আকর্ষণে, গড়িব—হ্লাদিনীর কর্ষণে। তুমিইত শিখাইয়াছ ঃ—

"অস্থির শিষ্যের মন ধায় নানা স্থানে।
ধন্য গুরু বলি তারে টিকী ধরে টানে॥"

পদাশ্রিতে কৃপা—কৃষ্ণের মহিমা নহে। তাই চৈতন্য অবতারে জগাই মাধাই দিয়া—সে কৃপা প্রদর্শন। শশাঙ্ক পদাশ্রিতের যোগ্য নহে বলিয়াই কি—কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হইবে? তাহাই দেখিতে শশাঙ্কের এ খেলা।"

তখন কমলাকান্তের বাটী অভিমুখে গমন করিলেন। হরসুন্দর এখন তাঁহার বহির্ব্বাটীতেই—এ কথা তিনি প্রভাবতীর মুখে শুনিয়াছিলেন।

প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—হরসুন্দর বহিঃগৃহে বসিয়া আছেন। শিবসুন্দরের ন্যায়—জামাতাও সম্মুখে। তিনি চারিধার তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন, দেখিলেন—কমলাকান্ত বহির্ব্বাটী হইলেও এক প্রকার বাসের যোগ্য করিয়া দিয়াছেন। বুঝিয়াও হরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে ও বেড়াটা কেন?"

হর। ইহার মধ্যেই অন্দর বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

শ। তোমার আর অন্দর বাহির কি? তুমিত সব গুরুতে সমর্পণ করিয়াছ? মাগি মিন্‌শে খোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তাই আবার সকলকে হতেও বল। বুঝনা ত—কাহার মাথায় কত ভার সয়। আপনার মত সকলকেই দেখ। ঘাটে আসিবার বয়সে—সকলেই অমন খোজা হইতে পারে—সেটা জানা আছেত?

হর। তোমার—ওরূপ কথা আমায় বলিতে লজ্জা হয় না? কি সম্বন্ধ বল দেখি?

শ। যখনি মেয়েটী লইয়াছিলে, তখনিত বলিয়া ছিলাম—কুকুরকে নাই দিও না—ওজন ঠিক রাখিতে পারিবে না। এখন বলিলে আমি শুনিব কেন? আমায় যখন ঘরে লইয়াছ—তখন আর আমি ভিখারীর

ন্যায় ভিক্ষা লইব কেন? না দাও—কাড়িয়া লইব—আর আদালতের ভয় নাই।

হর। দিবা রাত্রি বিষ্ঠা মাখিয়া থাকিলে—স্নানে কি গন্ধ যায়? আমি না হয় জল ঢালিলাম—ধৌত করাইলাম—তাহাতে ফল কি? সে দেশে কি মায়ার সুবাদ চলে?

শ। চলুক না চলুক, যথন ঘরে লইয়াছ—তথন সব ভুগিতে হইবে। না ভুগিতে চাও—দুষ্ট গরু গোয়াল ভাঙ্গিবে—দোষ দিও না। এ দুঃখ আমার আছে। যতদিন না ঘুচাইবে—ততদিন থাকিবে!

এই রূপ কথাবার্ত্তায় উভয়ে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। জীবসুন্দর বসিয়া বসিয়া শুনিতে ছিলেন। ভাবিলেন—এ আবার কি? এতদিন বিবাহ হইয়াছে—কই এ ভাবত ইঁহাদের মধ্যে দেখি নাই? আর কথা গুলিই বা কি? তাহাও ত বুঝা যায় না। তাঁহার শশাঙ্কের উপর কেমন ঘৃণা—শশাঙ্কের এ ভাব—তাঁহার যেন ভাল লাগিল না।

হরসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা—শশাঙ্ক! শিবসুন্দর নিরুদ্দেশ, বাড়ী পুড়িয়া গেল, কই? সে কথাত একবার তুলিলে না? তুমি কি মানুষ না—কি?"

শ। সে কথা তুমিই জান। মানুষ হই—না হই, তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া শিবসুন্দরের নিরুদ্দেশ বা ঘর পোড়ার কিছুই দেখিতে পাই-লাম না—তবে সে কথা তুলিব কেন? ভান করিয়া কথা সাজাইতে বল—আমি সে গুরুর শিষ্য নহি।

এই রূপ কথা লইয়াই আবার কতক্ষণ কাটিল। তথন বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা উঠিল। কিন্তু হরসুন্দর কিছু লইতে চাহেন না, বলেন—সাহায্যের প্রয়োজন নাই—যদি হয়—সংবাদ দিব। সে বিষয়ে শশাঙ্ক হারিলেন।

শশাঙ্ক বুঝিলেন—বুড়া সব জানে—কিন্তু উপরে যেন বুঝিয়াও বুঝে না। ভাবিলেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর—কৃষ্ণ চৈতন্যের এই রূপে লীলা। মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিলেন—তোমার ঈশ্বর লীলা ভক্ত বুঝিতে পারে—কিন্তু মানুষ লীলা গোপী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। তাই

সংসারে শাস্ত্রপাঠে এ লীলার আদর থাকিলেও—বর্ত্তমানে কেহ লইতে পারে না। তাই লোকে শাস্ত্রপাঠে গুরু কৃষ্ণে অভেদ জানিয়াও—ভেদ দেখে। তাই গুরু সম্মুখে রাখিয়াও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘুরিয়া মরে। মুষিক বাহন গণপতি—মহাদেব প্রদক্ষিণে জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়াও কার্ত্তিক—সে পুরস্কার লাভ করিতে পারেন নাই।

হরসুন্দর, শশাঙ্ক প্রদত্ত অর্থ না লইলেও—শশাঙ্ক মনক্ষুন্ন হইলেন না। তিনি চিন্ময়ীর সহিত দেখা করিলেন—তখন চিন্ময়ীর রাত্রিযোগের সেই মুখ তাঁহার আবার মনে পড়িল। আর তিনি অধিকক্ষণ চিন্ময়ীর নিকট বসিতে পারিলেন না। শিবসুন্দর ও গৃহ দগ্ধের কথা লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া একবার বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দেখা করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শশাঙ্ক মনে মনে হাসিলেন—মনে মনে বলিলেন, মা! তুমি যাহার দাসী হইতে আকুল—আমি তাহারি দাস। কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস দেখিলে প্রফুল্ল হয়। যদি আমি সত্য দাস হই—যদি তুমি সত্য দাসী হইতে পার—তবে তুমিই তোমার অভিমান ভাঙ্গিবে—শশাঙ্ক তাহার জন্য ব্যস্ত নহে।

প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমিত কথা কহিবে না, তবে আমি যাই।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষে তখন জল আসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বড় ঠাকুরের খবর কিছু করিতে পারিলেন কি? লোকে জমীদার বাবুকে সন্দেহ করে। যদি তাহা হয়—তবে ....।"

এই বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া শশাঙ্কের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ। সে কথা—লোকে বলিতে পারে, আমিত কিছু বুঝি না। তবে চেষ্টা করিতে পারি—যদি মায়াপুর যাও। কিন্তু ধার্ম্মিকের বাড়ী—প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে পারিবে কি?

বি। যদি আপনি প্রতিশ্রুত হন—আমি যাইব।

শ। তাহার এখনও দেরি আছে—আর এক দিন বলিব।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবে শশাঙ্ক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলাকান্ত সঙ্গে নটনারায়ণ অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিলেন, পরে বলিলেন, "তবে চলুন একবার বসন্তবাবুর সহিত দেখা করিয়া আসি, তাহা হইলে যাহা হয় একটা স্থির হইবে।"

বসন্তকুমার হরসুন্দরের বৈবাহিক—শিবসুন্দরের শ্বশুর। কমলাকান্ত বলিলেন, "অনেকটা দূর—আর তিনি কি এখন বাড়ী আছেন? মোক্তার মানুষ—অনেক ফেরে ফেরেন।" নটনারায়ণ বলিলেন, "সেই জন্যইত তাহার নিকট যাওয়া—যদি কোন ফিকির তিনি বাহির করিতে পারেন, এবং নরনারায়ণের ও যদি কোন সংবাদ দিতে পারেন।"

পল্লিগ্রামে জমীদার আসিলে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা জ্যোতিঃপ্রসাদের আগমন সংবাদ পাইলেন।

কমলাকান্ত বা নটনারায়ণ কেহই জমীদার সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইলেন না—বরং কি যেন একটা ঘৃণা বা ভয় তাঁহাদের মনে উদয় হইল।

ক্রমে তাঁহারা বসন্তবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বসন্ত তাঁহাদের দেখিয়া বলিলেন, "আপনারা থাকিতে শিবসুন্দরের কোন সংবাদ হইল না—এই বড় দুঃখ।"

কমলাকান্ত বলিলেন, "নরনারায়ণটী নিরুদ্দেশ—তাহা শুনিয়াছ কি? উহাকে আর কি বলিতেছ? সেই জন্যই এখানে আসা—যদি কোন উপায় স্থির করিতে পার।"

তখন নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শেষ শিবসুন্দরের কথা উঠিল। নটনারায়ণ বসন্তকে বলিলেন, "তাহার জন্য ভাবিতেছেন কেন? আপনার জামাতা—যথাসাধ্য আপনার করা উচিত। মনে খেদ রাখেন কেন?"

ব। যাহার পুত্র—সে না করিলে আমি কি করিতে পারি? আমি সে বিষয়ে অনেক ভাবিয়াছি। বৈবাহিকের সঙ্গে এ বিষয়ে—অনেক কথা হইয়াছে। হাতে পর্য্যন্ত ধরিয়াছি—আমি কি চেষ্টা করি নাই? তাঁহার জন্যই আমাকে বাঁধা থাকিতে হইয়াছে।

কমলাকান্ত বলিলেন, "সেত আমাদের সম্মুখেই—প্রতিবাসী সকলেই এ জন্য অসন্তুষ্ট। হরসুন্দরের ভাব কেহ বুঝিতে পারে না। তবে এইটী বড় সুন্দর—তাহাকে দেখিলেই ভক্তি হয়—এই জন্যই তাহার সহিত বিবাদ হয় না। নচেৎ অনেক বিষয়ে বিবাদ হইয়া পড়িত।"

ব। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। যদি আমি কিছু করি—তাহা হইলে আদালতে তাহা দাঁড় করাইতে পারিব না। কারণ আদালত—আগে উহাকে ডাকিবে, উনি হয়ত যাইবেন না। তাহাতে আদালতের অপমান—সে আবার আর একটা নূতন বিপদ হইবে, এবং আমাদেরও কোন কায হইবে না। বিশেষ এ সকল কাযে টাকা খরচ কত? পয়সা ছড়াইতে হয়। একটা এত বড় জমীদারের সঙ্গে লাগাত মুখের কথা নহে? বিশেষ জ্যোতিঃপ্রসাদের মত জমীদার বড় সহজ নহে—ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব নাই—সকলেই জ্যোতিঃপ্রসাদের হস্তগত।

ক। সে জন্য ভয় নাই। গ্রাম শুদ্ধ আমরা তাহার জন্যই ব্যস্ত। সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য খরচের জন্য দিতেও প্রস্তুত। শিবসুন্দরের জন্য খরচে কেহই কুণ্ঠিত নহেন।

নট। খরচের জন্য আমি ভাবি না—যাহা খরচ লাগে আমি দিব।

ব। কত দিবেন? কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, দশ টাকাতেও হইতে পারে—এরূপ কাযে আবার দশ হাজরও লাগিতে পারে—দিতে পারিবেন?

নট। দিব। যদি আপনি সেই মত ব্যবস্থা করেন। আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।

বসন্ত কিছুক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "পারিতাম—যদি হরসুন্দর আমার কথা শুনিতেন—তাহাত হইবে না। সেই জন্যই আমি এ কাযে হাত দিব না। কারণ হরসুন্দর না হইলে মকর্দ্দমা টিকিবে না। আপনারা তাঁহাকে রাজি করান—তাহা হইলে কত বড় জ্যোতিঃপ্রসাদ বা শশাঙ্ক আমি একবার দেখিয়া লই। তা না হইলে আমরা যাহা করিব—উঁহারা সাধুতা প্রকাশ করিয়া সব নষ্ট করিবেন। শিবসুন্দরও তখন বাপের দিকে দাঁড়াইবে—বেশ জানিও।"

ক। সে কথা আপনি ছাড়িয়া দিন, ছেলেবেলা হইতে ওই দেখিয়া আসিতেছি—আমাদের আর নূতন বলিয়া বোধ হয় না। আর সে জন্য বেশী কথা আর আমরা কহি না। তাহার উপর যাহা পারেন—দেখুন।

ব। বৈবাহিকের এই সকল ভাব দেখিয়াই মেয়েটী দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে এরূপ পাগল—তাহা জানিতাম না। কি বলিব বল—এই সময়ে মেয়েটাকে আনিতে গেলাম—সেও আসিল না। বলে—শ্বশুরের কষ্ট হইবে। মেয়েটাও যেন এক রকম হইয়া গিয়াছে। উঁহাদের কথা আর আমায় বলিও না। আমি জানি সব। শশাঙ্ক বাবুর দোষ দিতেছি বটে—কিন্তু তাঁহার কিছু মাত্র দোষ নাই। সেই প্রায়শ্চিত্ত লইয়া এ বিবাদের সূত্রপাত। বল দেখি—মেয়ের এরূপ জীবন্মৃত ভাবে—কে ব্যথিত না হয়? তাইত এ গোল। আমার বোধ হয়—সব সেই শশাঙ্কের খেলা। তা এইবার মজা দেখুন।

নট। মজা আর কি দেখিবেন? বৈবাহিক মহাশয় একবারও—এ বিষয়ে চিন্তা করেন কি না সন্দেহ।

ব। তবেইত বলিতে হয়—এ কিরূপ ধর্ম্ম বল? যদি এরূপ হয়, তবে সংসারে থাকা কেন? বনইত ভাল। তাহা হইলে ত কোন গোলই হয় না। অবলা নারীজাতি—তাহাদের কি ইহাতে কষ্ট হয় না? যে যেমন—তার ঘটেও তেমন। মরা মানুষ আবার কে বাঁচাইতে পারে? শুনি, জীবসুন্দরের স্ত্রী মরিয়াছিল, সন্ন্যাসী বাঁচাইয়া গেল। এ কি বিশ্বাসের কথা?

ক। সে কথা—আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না। এক জন নহে, শ্মশানে আমরা তখন দশ জন—স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আর হরসুন্দর তখন ছিলেন না যে, কিছু মিথ্যা করিয়া ভেল্কী দেখাইয়াছেন—বলিবেন। যদি মিথ্যা হয়—তবে বাঁচিল কি রূপে? ভেল্কিতে কি—মানুষ বাঁচে?

ব। অমন রোগে অজ্ঞান হইয়া পড়ে—আবার চেতন হয়। সে কথা অনেক ডাক্তার কবিরাজের মুখে শুনিয়াছি—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহাতে ধর্ম্মের বাহাদুরী আর কি?

এই লইয়া বাজে তর্ক উঠিল, মূল কথা ডুবিয়া গেল। নটনারায়ণ বলিলেন, "যা করিতে আসা গেল, সেই কথাই ভাল। যে বিচার তুলিয়াছেন—সে মীমাংসার যোগ্য আমরা নহি। যে—যে বিষয় চিন্তা করে না—কার্য্যে ব্রতী হয় না—ফলে দৃষ্টি করে না, সে—সে বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারে না।"

ব। আমি জানি—আপনি এ সকল বিশ্বাস করেন। যখন কথাটা উঠিয়াছে—তখন আপনি কি জানেন বলুন।

নট। আমি জানিনা। তবে শাস্ত্রে এ কথার উল্লেখ আছে, এবং যে রূপ বিবৃত আছে, তাহাতে বিশ্বাস হয়। আমি নরনারায়ণের পীড়ার সময় তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সে দিন হরসুন্দর বাবুর সহিত একথা উঠিয়াছিল—তিনি যাহা বলিয়াছিলেন—তাই বলিতেছি।

"জাগতিক কার্য্যে যেমন প্রকৃত শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষা লাভ হয় না—বা কার্য্যে সুফল দৃষ্টি হয় না, তেমনি এ সকলেও প্রকৃত গুরুর আবশ্যক। যেমন অশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারায় সুফল না পাওয়ায়—অন্য শিক্ষক অনুসন্ধান করা হয়, তত্রাচ বিষয়কে মিথ্যা বলা হয় না—তেমনি এ সকল বিষয়েও প্রকৃত গুরুর আবশ্যক—সাধনের আবশ্যক—বিশেষ না জানিয়া মিথ্যা বলা উচিত নহে। ইহার সত্য মিথ্যা জানিতে আপনি কয় দিন সময় দিয়াছেন? কিন্তু সামান্য বিদ্যার জন্য আপনাকে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হইয়াছে—তবে তাহা লাভ করিয়াছেন। যাহা অলৌকিক, তাহা আপনাকে এক দিনে শিখায় নাই কেন? অতএব তাহা মিথ্যা—মানুষের এ অহংকারের জ্ঞান—বৃথা নহে কি?

"শাস্ত্র বাক্য—আমাদের মত অহংবোদ্ধা—মানুষ পশুর নহে। তাঁহারা যশ বা ধন প্রার্থনায় এ সকল প্রকাশ করেন নাই। মায়া প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় খেলা—মানুষ যতটা আয়ত্ব করিতে পারে—তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

"যোগ মার্গে অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। অগ্রে তাহার জন্য আসন, প্রাণায়াম—যম নিয়মাদি সিদ্ধ করিতে হয়—পরে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ত্রয়ে—সংযমে বিভূতির প্রকাশ। তাহাতে অবিশ্বাস কেন? আমরা

এইরূপ লঘু চিত্ত বলিয়াই—শাস্ত্র আমাদের পশু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আপনি আমি চেষ্টা করি না, বা চেষ্টায় অগ্রসর হইয়া অপারক হই—তাই বলিয়া কি সকলেই অপারক হয়? অপদার্থ ভিন্ন এ বিশ্বাস—কাহার হৃদয়ে স্থান পায়? আপনার আমার বুদ্ধি হাত বাড়াইয়া পায় না বলিয়াই কি—সকলের বুদ্ধিই হাত বাড়াইয়া পায় না? এইত গেল মায়া শক্তির কথা। তাহার পর সাধুরা বলেন বা শাস্ত্র বলেন যে—মায়াতীত আর একটী শক্তি আছে। যদি তাহা সত্য হয়—তবে সে শক্তিতে যাঁহারা শক্তিমান—তাঁহাদের অসাধ্য কি? যাঁহারা মায়ায় আচ্ছন্ন—সে শক্তি যাঁহাদের নাই—তাঁহারা তাঁহাদের বিচারে অগ্রসর হন কেন? যাহা মায়াতীত—তাহা মায়ার উপর আধিপত্য করিতে না পারিবে কেন?

ব। এতই যদি ক্ষমতা—আর বৈবাহিক মহাশয় যখন এতই ধর্ম্ম পিপাসু—তবে তাঁহার সে শক্তি লাভ হয় নাই কেন? তাহা হইলে ত জ্যোতিঃপ্রসাদকে জব্দ করিতে—আদালতের আশ্রয় লইতে হয় না।

নট। সে সকল কথার এ সময় নহে। তবে কথা উঠিল—তাই বলিতে হইতেছে। যখন আত্মা—মায়াসঙ্গ শূন্য হইতে চান ও মায়ার এরূপ স্থান অধিকার করেন—যেখানে মায়া কেবল সত্ব স্বরূপিণী—সেই খানেই এই বিভূতি লাভ। পরে যখন আত্মা সে জড় সঙ্গও অতীত হন—তখন কেবল মাত্র চিন্মাত্র অবস্থায় নীত হন। নির্ব্বাণ সমাধির এই অবধি গতি।

"এই বিভূতিগুলি সাধনের অবান্তর ফল। যাঁহারা এই ফলের জন্য যোগী হইতে চেষ্টা করেন—তাহারা যোগ ভ্রষ্ট হন। যাঁহারা ঈশ্বর জন্য যোগী হন—তাঁহারা এ ফলে মুগ্ধ হন না—কারণ এ ফল তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। এ গুলি মায়ার পরীক্ষা মাত্র—অর্থাৎ যদি ইহাতেও সমাধিসাধক—পশ্চান্মুখ হন। কারণ মায়া সহজে কাহাকেও নিজ রাজত্ব হইতে মুক্তি দিতে চাহেন না। অতএব বিভূতি গুলি যোগ-সাধকের বাধা মাত্র।"

ব। তবে যে এক এক যোগী গুণ প্রকাশ করেন—তাঁহারা কি অমনি যোগ ভ্রষ্ট হন ?

নট। না। যদি বিভূতিতে মুগ্ধ হন—তাহা হইলেই যোগ ভ্রষ্ট হইতে হয়; নচেৎ, যদি ফলাকাঙ্খা রহিত হইয়া পরোপকার করেন—তাহাতে যোগ ভ্রষ্ট হইতে হয় না। কিন্তু বার বার এরূপ করিতে গেলেই মুগ্ধতা আসিয়া পড়ে। কারণ যোগী—মায়া ত্যাগ করিতে চাহেন—কিন্তু মায়া তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন না। এ জন্য তখন মায়া এরূপ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেন যে—তাহা অতীত হওয়া বড় সহজ নহে।

"কিন্তু—কৃষ্ণ ভক্তির জন্য যাঁহারা লালাইত—তাঁহারা মায়া ত্যাগ করিতে সাধন না করিলেও—কৃষ্ণ ভক্তিতে মায়া আপনি ত্যাগ হইয়া যায়। যেমন অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতে অনেক সাধনের আবশ্যক—কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সাহায্যে—অগ্নি বৃদ্ধি রূপ কার্য্যে—অন্ধকার হইতে আলোকে আসার সাধন না সাধিলেও—অগ্নির আলোকে—অন্ধকার আপনি পলায়। বীজরূপ হরিনাম সেইরূপ স্ফুলিঙ্গ কণা। কৃষ্ণ বীজরূপ এই অমূল্য ধনে ধনী—হরসুন্দর। তবে হরসুন্দর মায়া-গুণের ভিখারী হইবেন কেন ? তবে—যে ভক্ত সে পরশক্তিতে শক্তিমান—তাঁহার অসাধ্যও কিছু নাই।

"জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের সহিত ভক্তি যোগের যে পার্থক্য—তাহা বলিলাম। প্রাপ্তি ও সেই জন্য—স্বতন্ত্র। অর্থাৎ অন্ধকার পারে যে আলোক—তাহা অবশ্য কোন বস্তুর—সেই বস্তুই কৃষ্ণ সূর্য্য। জ্ঞান যোগী মায়া পারে নীত হইয়া সূর্য্যের বহিঃমণ্ডলই দেখিতে পান, এবং সেই খানেই সে ব্রহ্ম রসানন্দ ভোগ করেন। কিন্তু বৈষ্ণব—ভক্তি বীজে অনুরাগ জল সিঞ্চনে, বীজগত লতা অবলম্বনে, সে তনুভা ব্রহ্মভেদ করতঃ, কল্পতরু কৃষ্ণ পাদপদ্মে স্থান অধিকার করেন। আর অষ্টাঙ্গযোগী, মায়ায় অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের পরমাত্মা রূপই পরম তত্ত্ব জ্ঞানে—তাহাতেই আত্ম সমর্পণ করেন।"

ব। তা যেন শুনিলাম—অনেক কথাত বলিলে। এখন বল দেখি—মরা বাঁচান কোন্ বিভূতি বলে হয় ? তাহাত শাস্ত্রে দেখি নাই ?

নট। পড়িয়াছেন স্মরণ নাই—কেন? মহাভারতে দেখায়ায়, বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, যাঁহারা হত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককে আনাইয়া দেখাইয়াছিলেন ত? এখন সেরূপ লোক বিরল—তাই দেখিতে পান না। তবে এটি বিভূতির ফল নহে। যখন জীব বিভূতিবান—তখন তাঁহার জড় সম্বন্ধ থাকে। সে সম্বন্ধে অহংকারে সে সৃষ্টি নষ্ট করিতে পারে—এ জন্য ঈশ্বর জীবকে সে ক্ষমতা দেন না। কারণ মৃতকে জীবন দান—মায়া ক্ষমতাধীন নহে। সে জন্য মায়া বিভূতিতে তাহা লাভ হয় না।

"যদি কোন সময়ে কাহার ভাগ্যফলে—ঈশ্বরের এ লীলা ইচ্ছা হয়—তাহা হইলে তিনি সিদ্ধ যোগী হৃদয়ে—বা স্বগত ভক্ত হৃদয়ে বসিয়া এ রূপ লীলা প্রকাশ করেন। যে অবলম্বনে তাঁহার এ লীলা—যদি সে অবলম্বন অহংকারে—ইহা সাধন গত বিভূতি মনে করেন—তাহা হইলে তিনি পতিত হন। কিন্তু যিনি সে অহংকার অতীত হইয়াছেন—তিনি ঈশ্বরের এ লীলা দেখিয়া ভক্তিরসে অবলম্বন মাত্র থাকিয়া কৃতার্থ হন।"

তখন কমলাকান্ত সে কথা ফিরাইয়া বলিলেন, "সেত সত্যই—তবে ও সকল কথার এখন সময় নহে—এখন কি স্থির হইল বল দেখি?"

বসন্ত বাবু বলিলেন, "আমায় যদি ভরসা দেন—তাহা হইলে আমার ত তাহাই ইচ্ছা—তবে কি জানেন—এই সময়ে আবার নরনারায়ণের কথা শুনিয়া মনটা বড় তেজ হীন হইল—কারণ নটনারায়ণ বাবু কি আর সেরূপ উৎসাহে কার্য্যে যোগ দিতে পারিবেন?"

নট। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই। নরর জন্য আমার চিন্তা নাই—কারণ তাহাকে আমি জানি। যদি জানিতাম—সে বুদ্ধি দোষে গৃহত্যাগী—তবে তাহার জন্য ভাবিতাম। আর তাহার অনুসন্ধানের জন্যও আপনাকে কিছু করিতে হইবে না।

ব। আমার ভয় যে, যাহার জন্য করিব—সেই শেষে আমাদের না গোলে ফেলে। আমার জামাতাকে আমি বেশ জানি। যদি আমরা জ্যোতিঃপ্রসাদকে আইনে আনিতে পারি—তাহার কষ্ট দেখিয়া বাবাজী না সে সময় তাহার দিকে হন। তাহা হইলে জ্যোতিঃপ্রসাদ আমা-

দের ছাড়িবে না—তাহা জানেন? বাবাজী তখন আবার দয়ার অবতার হইয়া সব গোল না করেন। যেমন পিতা—তেমনি পুত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্ক, বিষ্ণুপ্রিয়াকে তদবস্থায় রাখিয়া হরসুন্দরের নিকট আসিয়া বসিলেন। হরসুন্দর, জীবসুন্দরকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন। জীবসুন্দর ভক্তি ভরে তামাক সাজিয়া সবে মাত্র হুকাটী হরসুন্দরকে দিতে ছিলেন—শশাঙ্ক হাত বাড়াইয়া হুকাটী লইলেন। জীবসুন্দরের ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি মুখে কিছু বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন। তাহাতে ভক্তি জীবসুন্দরকে কিছু ব্যথিত করিল। জীবসুন্দরের সে মুখ ভঙ্গিতে শশাঙ্ক মনে মনে হাসিলেন, প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, মনে মনে বলিলেন—বাবাজী! এখনও অনেক দূর। বুড়াকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পার—আমার এ কার্য্যে বুড়া সমধিক প্রীত কি না। যদি হয়—তবে যাহার প্রীতির জন্য সেবা—তাহার প্রীতি না তাকাইয়া স্বপ্রীতি সেবায় কি তাহা লাভ হয়?

যখন তামাকটী বেশ ধরিল—তখন শশাঙ্ক হুকাটী হরসুন্দরের হস্তে দিয়া বলিলেন—"তবে আমি আজ আসি?"

হর। হা সন্ধ্যা হইয়া আসিল—আর বিলম্ব করিও না।

শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জাত ও গেল—পেটও ভরিল না।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ তখন এক দৃষ্টে ফাতনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি রূপ?"

শ। এবার আমাদের হার। তা আর বলিয়া কি হইবে—চলুন, আর মাছ ধরায় কায নাই। দেখিতে পাইতেছেন কি?

জ্যো। না—আর দেখা যায় না, চল। আজ কার মুখ দেখিয়া বাহির হইয়াছিলাম—একটা খেলে না—কি বল দেখি ?

শ। আর কি বলিব। আমাদের সব দিকেই হার।

জ্যো। কি বলিতেছ—খুলিয়াই বল ? জ্যোতিঃপ্রসাদের হার কোথায় ? হরসুন্দর কি করিতেছে—কেমন দেখিলে ?

শ। যেমন দেখিতাম—আজও তেমনি দেখিলাম। নূতন কিছুই নহে।

জ্যো। সে কি রূপ ? তবে কিছু বুঝিতে পারে নাই—না ? সে ত ভালই।

শ। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। ছেলে নিরুদ্দেশ—গৃহদগ্ধ—কিন্তু ছেলে বুড়া কাহারও মুখে দুঃখের চিহ্ন মাত্র নাই। তবে আর তুমি কি করিলে ? তাই বলিতে ছিলাম—আমাদের হার।

জ্যো। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। জ্যোতিঃপ্রসাদের কাছে সকলকেই মাথা নোয়াইতে হয়। মাথা কি আর রাখিয়াছি যে, মাথা তুলিবে—তবে হার কি সে ?

শ। না বিশ্বাস কর বাড়ী চল।

জ্যো। এ যে বিশ্বাস যোগ্য কথা নহে ? আমি ঢের হরসুন্দরের মত ভণ্ড দেখিয়াছি—তুমি আমায় নূতন শিখাইবে ?

শ। তাই মনে করিয়া থাক—আর কথায় কায নাই।

জ্যো। আমি যাহা বলিতেছি—তাহা কি মিথ্যা ?

শ। তবে স্বচক্ষে দেখ না কেন ? ভ্রম আপনি ভাঙ্গিবে—কাহাকেও ভাঙ্গাইতে হইবে না।

জ্যো। তবে কি হইল ? যাহা প্রতিজ্ঞা—তাহাত করা চাই।

জ্যোতিঃপ্রসাদ কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন, "তোমার সকল রহস্য শুনি—এ রহস্য শুনিব না। যদি বৈবাহিক বলিয়া ব্যথা লাগিয়া থাকে—তোমার জন্য তোমায় শিবসুন্দরকে ভিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু ভাবিও না—জ্যোতিঃপ্রসাদ নির্ব্বোধ। জ্যোতিঃপ্রসাদের নিকট যে মাথা নোয়াইয়া চলে—জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহার জন্য সব করিতে পারে। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদ কাহার অহংকার রাখে না।"

শ। তবে আমার উত্তর নাই—শশাঙ্ক মিথ্যাবাদী।

জ্যো। সে কথাও মনে স্থান পায় না।

এই লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। শশাঙ্কের উদ্দেশ্য যাহা—জ্যোতিঃপ্রসাদ সেই জালেই আপনি ধরা দিলেন—বলিলেন, "তবে আমায় স্বচক্ষে দেখিতে হইবে। ইহাতে যে বেদনা পায় না—সে মানুষ নহে।"

শ। মানুষ হউক বা নাই হউক—আমি তোমার এ ভ্রম আজ ঘুচাইব। তোমার জ্ঞান—তুমি আমি যেমন—সকলেই তেমন। যদি চক্ষু পাতিয়া দেখ—দেখিতে চাও—তাহা হইলে দেখাইতে পারি—তাহা নহে। তাই বলিতে ছিলাম—এখানে তোমার হার।

জ্যো। তবে হরসুন্দরের লুকান টাকা আছে—সেই জন্যই মনে কষ্ট নাই।

শ। কিছু না—আমার তাহা জানিতে বাকি নাই। খাজনা আদায় নাই—জীবসুন্দরের কোন কর্ম্ম নাই—এখনত তাঁহারা নিরাশ্রয়? ভিক্ষা উপজীবিকা—টাকা কোথায়?

জ্যো। তবে ত জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়াছে—আবার কি চাও?

শ। কিসে সম্পূর্ণ? জ্যোতিঃপ্রসাদ—কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল? বৈবাহিকের দুঃখ দেখিতে? কই দুঃখ কোথায়? জ্যোতিঃপ্রসাদই দুঃখ পাইতেছে। মনের প্রতিজ্ঞা মনেই রহিল—মন যা চাহিল—তাহা করিতে পারিল না। হরসুন্দরের হাসিমুখে হাসিই রহিল—কিন্তু জ্যোতিঃ-প্রসাদ কাঁদাইতে গিয়া তাহার হাঁসিতে আপনিই বেদনা অনুভব করিল—কাঁদিল, তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের হার নহেত কি?

জ্যো। ও সকল জ্যোতিঃপ্রসাদ শুনিতে চাহে না, জ্যোতিঃ-প্রসাদকে দেখাইতে পার? তবে—জ্যোতিঃপ্রসাদ বিশ্বাস করিতে পারে।

শ। জমীদার—বড় লোক হইয়া কি রূপে দেখিবেন? যদি দেখিতে চান—তবে কষ্ট লইতে হয়। পারিবেন কি? কখন যেখানে যান নাই, এখন সেখানে গেলে লোকে সন্দেহ করিবে, সন্দেহত করিয়াছেই

—আরও বাড়িবে। তাহাত হইবে না—দেখিতে হইলে লুকাইয়া দেখিতে হইবে। যদি দেখিতে সাধ হয়—আমি দেখাইতে পারি।

জ্যো। যে রূপেই হউক—আমায় স্বচক্ষে দেখিতে হইবে। তাহার কি কথা বল?

শশাঙ্ক অনেকক্ষণ ভাবিলেন—পরে বলিলেন, "তাহা হইলে আজ রাত্রে—এই খানে থাকিতে হয়। এখন লোক দেখাইয়া কিয়ৎদূর চল। লোকে জানুক—আমরা মায়াপুরে চলিলাম। পরে অন্ধকারে পদব্রজে—এই টুকু চলিয়া আসিলেই হইবে।

জ্যো। তার পর?

শ। সে সন্ধান আমি রাখিয়াছি। পাশে একটা বটগাছ আছে, তাহার একটা ডাল প্রাচারের উপর দিক দিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে গিয়াছে। আমি সেই সাহায্যে বহির্ব্বাটীতে গিয়া তোমায় কপাট খুলিয়া দিব। কিন্তু এ সকল বিশেষ সাবধানের কর্ম্ম, সাবধান হইতে পারিবেন ত? চোরের কায।

জ্যো। যদি কেহ টের পায়? সে বড় লজ্জার কথা। এখনও কি গাছে চড়িতে পার?

শ। সে আমার ভার। আপনি কথা কহিবেন না, শব্দ করিবেন না, এ অবধি আপনার ভার। দায়ে পড়িলে গাছে চড়া কেন—এ বয়সেও শশাঙ্ক সব পারে।

জ্যো। তা যেন হইল। রাত্রে কি দেখাইবে? সকলেত ঘুমাইবে?

শ। না। উহারা অনেক রাত অবধি জাগিয়া থাকে। দুই দশটা কথা বা মুখের ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। জ্যোতিঃপ্রসাদ কি এমনি নির্ব্বোধ?

জ্যো। হা করিলেই জ্যোতিঃপ্রসাদ পেটের কথা বুঝিতে পারে।

শ। তবে?

মনে মনে শশাঙ্ক বলিলেন—জ্যোতিঃপ্রসাদ! অহংকারই সর্ব্ব অনর্থের মূল। সেই অনর্থেই ঘুরিতেছ—ভাবিতেছ—আমি যাহা বুঝি, এমনটী আর কেহ বুঝে না। বলিলেও পাছে বুঝ—এজন্য মায়া তাহা কাণে

লইতে নিষেধ করে। সেই নিষেধেই না শুনিয়াই উপহাস কর। তুমি ত মূর্খ—তোমারই বা দোষ কি? অনেক অহংবোদ্ধা অর্থকরী বিদ্যায় এই রূপ সংসারে ঘুরিতেছে। তাই বা কেন? অনেক ভবঘুরে আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়া সেই অহংকারেই ঘুরে—ঋষি হইয়া শাস্ত্র লিখিতে বসে। পরের অহংকার খুঁজে—কিন্তু নিজের অহংকার ধরিতে পারে না। কাহারও দোষ নাই—ভণ্ড গুরুর ভণ্ড চেলাই হইয়া থাকে। জানি—হরসুন্দর সত্য পথের পথিক, এখন দেখিতে ইচ্ছা—সাধু দর্শনের মহিমা কেমন। তাই শশাঙ্কের এ খেলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রেই দেবেন্দ্র, নরনারায়ণের গৃহত্যাগের কথা শুনিলেন। তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। ইন্দ্রনারায়ণের সহিত অনেক কথা হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের সে রহস্য ভাব, যেন নরনারায়ণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন—হৃদয়ে যেন সে ভাব আর নাই।

তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথাও অনুসন্ধান না করিয়া নিজ কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন। আর উঠেন না। পরদিন দেবেন্দ্রের মাতা আহারের জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। দেবেন্দ্র খাইলেন না।

এইরূপে সে বেলা গেল। রাত্রেও তাঁহার মাতা অনেক চেষ্টা করিলেন, কোন মতে খাওয়াইতে পারিলেন না।

সন্তানের এই ভাব দেখিয়া তাঁহার মাতার বড় ভয় হইল। পাছে—দেবেন্দ্রও নরনারায়ণের মত হইয়া যান। তিনি অনেককে ডাকিয়া আনিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র কাহারও কথা শুনিলেন না। এই মাত্র তাঁহার কথা যে, যখন বাঁচিয়া আছি, তখন খাইতেই হইবে—তবে

আজ আমার মনটা বড় ভাল নহে, সে জন্য আজ আমায় মাপ করিবেন।

এ কথায় মার প্রাণ শীতল হইতে পারে না। অনেক রাত্রে তিনি নটনারায়ণের নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নটনারায়ণ বলিলেন, "আজ সমস্ত দিন খায় নাই? চলুন দেখি—যদি খাওয়াইতে পারি। এ ছোক্‌রাকে লইয়া বোধ হয়—কিছু ভুগিতে হইবে।"

নটনারায়ণ দেবেন্দ্রকে বড় ভালবাসেন। দেবেন্দ্রের এ ভাবে, তাঁহার দেবেন্দ্রের প্রতি স্নেহ যেন, আরও বৃদ্ধি হইল। একে নিজের মন ভাল নহে—তাহার উপর দেবেন্দ্রের এই ভাবে—মনে মনে বলিলেন—ইন্দ্র! দেবেন্দ্রের নিকট ভাব শিক্ষা কর। আহার, নিদ্রা, মৈথুন পশুরও আছে, কিন্তু দেবেন্দ্রের এ ভাব তোমাতে নাই—থাকিলে আজ তুমি সুখনিদ্রায় শান্তি পাইতে না।

নটনারায়ণকে দেখিয়া দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন। তখন কথায় কথায় নটনারায়ণ নানা কথা পাড়িয়া তাঁহাকে আহারের জন্য বলিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র খাইতে চাহেন না। নটনারায়ণ বলিলেন, "দেবেন্দ্র! আমা হইতে কি তুমি নরনারায়ণকে ভালবাসিতে পারিয়াছ? আমার যাহা সহজ, তোমার তাহা আকর্ষণগত।"

এইরূপ কথায় অনেক ক্ষণ কাটিল। নটনারায়ণ বলিলেন, "কাহার জন্য দুঃখ করিতেছ? কে কাহার বল দেখি? তাহার জন্য দুঃখে তোমার ফল কি? বরঞ্চ ইহাতেই সংসারের ভালবাসা যে কিছুই নহে, সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া লও—লইয়া কৃষ্ণভক্তির জন্য প্রস্তুত হও।

"নরনারায়ণের কথা ছাড়িয়া দাও। যদি কোন আত্মীয় মরে—তাহার জন্যই কি শোক করা কর্ত্তব্য?—না—তবে আমরা শোক করি কেন? করি—অন্ধ বলিয়া। আমরা আত্মার প্রকৃত স্বরূপটী চিনি না, চর্ম্ম চক্ষে তাহাকে মায়াদেহে দেখিয়াই চিনি। যদি সেই মায়াদেহ না দেখিতে পাই বা সে দেহ ত্যাগে সে অন্য দেহ অবলম্বন করে, তবে আর তাহাকে চিনিতে পারি না। পারি না বলিয়াই তাহার মরণ ভাবিয়া দুঃখ করি, বা তাহার সাক্ষাতে যে সুখ, তাহার অভাবে তাহার জন্য

ভাবি। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, যদি সে আমাদের ভালবাসা অপেক্ষা অন্য স্থানে সুখ পায়, তাহাতে আমাদের দুঃখ করা উচিত নহে। কারণ যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার সুখেই যে সুখী, তাহার ভালবাসাই নিঃস্বার্থ, তাহাই আদরের। যদি তাহা হয়—তবে নরনারায়ণের জন্য তোমার দুঃখ উচিত নহে, কারণ সে সুখের জন্য তোমাদের ত্যাগ করিয়াছে। তাহার যদি তাহাতেই সুখ হয়—তবে তোমাদের তাহার সুখেই সুখ বোধ করা উচিত। তুমি ভাবিতেছ—সে আছে কেমন, যদি তাহার কোন কষ্ট হয়—ইহাই তোমার দুঃখ। কিন্তু তাহাও মনে করা উচিত নহে, কারণ সে ছেলেমানুষ নহে, সে সব জানে। জানিয়াও যখন সে তাহা লইয়াছে, তখন তাহাতেই তাহার সুখ। তাহাতে তুমি সুখ পাও না—তাই তোমার মনে হইতেছে যে, সে কষ্ট পাইবে—কিন্তু তাহা তোমারই ভুল।

"তাহার পর দেখ, যদি সে মরে, আর দেখা না হয়—তাহাতেও দুঃখ নাই। কৃষ্ণই আমাদের সে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কারণ আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা জন্ম, মৃত্যু রহিত—অবিনাশী। দেহেরই পরিণাম—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, রূপান্তর, হ্রাস, নাশ—আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন। মরণে স্থূল দেহের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ সমান থাকে। আত্মা তখন সেই দেহে থাকিয়া আবার স্থূল দেহ সংগ্রহ করেন। অতএব জ্ঞানী—আত্মার জন্ম স্বীকার করেন না। ইন্দ্রিয় দ্বারে এ সব সংযোগ—কেবল সুখ দুঃখ ভোগের কারণ। কিন্তু ইহা যে নিত্য নহে—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানী এই সকল দৃষ্টি করিয়া ইহাতে সুখ দুঃখ মনে করেন না এবং অভিভূত হন না। যিনি এই আত্মা বিনাশী মনে করেন, বা নিজে এইরূপ জ্ঞানে আত্মঘাতী হন—তিনি ভ্রান্ত। যদি বল আত্মার নাশ না হউক, সেই দেহ নাশে, আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না, সেই জন্যই আমাদের দুঃখ—কিন্তু সে দুঃখও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ জীর্ণবাস ত্যাগে কাহার দুঃখ হয়? যদি বল—সকলেই ত বৃদ্ধ বয়সে মরে না, তাহার কারণও দুঃখ করা উচিত নহে। কারণ কার্য্যসূত্রে এই শরীর এক দিন না এক দিন—ত্যাগ

হইবেই হইবে। যাহা হইবেই নিশ্চয়—তাহার জন্য দুঃখ করা জ্ঞানীর উচিত নহে।

"যদি তাহার জন্য নিতান্ত ব্যথিত হও, তবে আত্মার স্বরূপ নিৰ্দ্ধারণ কর—যে রূপ দর্শনে আর তাহাকে হারাইতে হইবে না। মায়াগত আবরণে তাহার স্বরূপ রূপটী আবৃত। মায়াচক্ষে তাহা দৃষ্টি হয় না। মায়া ভেদ করিয়া দেখিতে পারিলে—আর এ ভ্রম থাকিবে না। আত্মা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হন না, জলে গলেন না, আগুনে পুড়েন না, বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারেন না। তাঁহার সর্ব্বভূতে স্থিতি—তিনি অনাদি, নির্ব্বিকার—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর—মন যিনি—তিনিও তাঁহাকে জানেন না। এইরূপ জ্ঞানে—জ্ঞানী শোকে অভিভূত হন না। যত দিন আত্মা শরীর ধারণ না করেন, তত দিন তিনি প্রকৃতিতে বিলীন থাকেন। পরে শরীর ধারণে ব্যক্ত হন, মরণে আবার অব্যক্তে লীন হন। এইরূপ নিত্য চলিয়া আসিতেছে—তাহার জন্য দুঃখ উচিত নহে।

এই আত্মা—তোমার দেহে—আমার দেহে—সর্ব্বদেহে বিদ্যমান। অতএব মায়াবশে—অহংকারগত জ্ঞানে—প্রণয় অভিমানে—আত্মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। এই যে তুমি সমস্ত দিন খাও নাই, ইহাতে কাহাকে কষ্ট দিতেছ বল দেখি ? অবিবেকে যাহাকে না দেখিতে পাইয়া তুমি কষ্ট পাইতেছ, অজানিত ভাবে তাহাকেই আবার কষ্ট দিতেছ—? ইহাই কি তোমার ভালবাসা ? উঠ—আহার কর, যদি বিষয়ে বিরাগ জন্মিয়া থাকে—তবে নরনারায়ণের মত ভ্রান্ত হইও না—বৃথা কষ্ট পাইবে। সংসারে থাকিয়া নিষ্কামে কর্ম্ম করিতে চেষ্টা কর। কামনারহিত কর্ম্ম—অঙ্গহীন হইলেও ক্ষতি নাই। সাধ্যমত করিতে চেষ্টা কর। ঈশ্বর উদ্দেশে যাহা কৃত—তাহাতে পাপ নাই। অসম্পূর্ণ হইলেও—তাহা স্বকাম কর্ম্মের ন্যায় বিফল হয় না। কারণ স্বকাম কর্ম্মে ঈশ্বরনিষ্ঠা নাই। নিষ্কাম কর্ম্মের—ঈশ্বর প্রেমই উদ্দেশ্য। স্বকামীর বুদ্ধি স্বতঃই কামনায় মলিন। তাহারা কামনায় মুগ্ধ হইয়া বেদগত নৈমিত্তিক কর্ম্মে ধন, পুত্র, স্বর্গে সর্ব্বদাই অনুরাগী। সে মায়াজ্ঞানে তাহারা মনে করে যে, ইহার অপেক্ষা

আর কিছু নাই। যে ঈশ্বর মায়াতীত, তাহারা সংসারের জ্ঞানে তাঁহাকেও মায়া মধ্যে গণনা করে। তাহারা যে জন্ম, কর্ম্মফলে নিত্যভ্রান্ত, আবার তাহারই প্রার্থনা করে, এবং তাহারই প্রতিপোষক যত বেদবাক্য, তাহারা তাহা ব্যতিত অন্য বাক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। এইজন্যই তাহাদের হৃদয় নিষ্ঠাশূন্য হয়। নিষ্ঠাশূন্য হৃদয়ে বেদ-মার্গে বিচরণ করত নিত্য দিন জন্ম মরণে—তাহাদের আনাগোনাই সার হয়। মুক্তির পথ যে অবরুদ্ধ—সেই অবরুদ্ধই থাকে। যদি বল—তবে বেদ কেন এ সকল উপদেশ দিয়াছেন। তাহার কারণ—যিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন—ভগবান দয়ালু। যাহারা স্বর্গাদি ফল প্রার্থনা করেন, তাহাদের জন্যই এ উপদেশ। ইহাই স্বকাম কর্ম্ম। নিষ্কামী ঈশ্বর নিষ্ঠায় কর্ম্ম করেন বটে—কিন্তু সে কর্ম্মগত ফল—তিনি কামনা করেন না। ঈশ্বরেই সে ফল অর্পণ করেন। কেবল ঈশ্বর প্রীতির জন্য তাঁহার সে কার্য্য। এ কর্ম্মে—বন্ধন আপনি ত্যাগ হয়। অতএব স্বকাম কর্ম্ম—বন্ধের কারণ, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম—মুক্তির কারণ।

"এইরূপ কর্ম্মে—যখন জ্ঞানের উদয়ে তোমার মন শান্ত হইবে, তখন তুমি বুঝিবে যে, শরীর হইতে আত্মা স্বতঃই পৃথক আছেন। তখন তুমি যে কর্ম্মেই উপনীত হইবে—তাহাতেই বৈরাগ্যের উদয় দেখিবে। তাহাতে যে মন এখন নানা বিষয়ে ধাবিত হইতেছে, সে মন অভ্যাসগুণে আর কিছুতেই আকৃষ্ট হইবে না। তখন তুমি তত্ত্বজ্ঞানে আর বিষয় বিষে জর্জ্জরিত হইবে না।

"যে আত্মা নিষ্কামে আত্মাতেই রমণ করেন, তাঁহাকেই স্থিরপ্রজ্ঞ বলা হয়। যাঁহার দুঃখে দুঃখ হয় না, সুখে সুখ হয় না, বিষয়ে অনুরাগ থাকে না, যিনি ভয়ক্রোধহীন—তাঁহাকে মুনি বলে। সকলকে সমজ্ঞান অর্থাৎ পুত্র মিত্রের প্রতি যাহার স্নেহ আবদ্ধ নাই, যাঁহার ভাবি সুখ দুঃখে স্পৃহা বা দ্বেষ নাই, যিনি উদাসীনের ন্যায়—সংসার সুখাপেক্ষা না করিয়া—ঈশ্বর মহিমা প্রকাশ করেন, তিনিই ঈশ্বরনিষ্ঠ। যখন জ্ঞানী ইন্দ্রিয় জয়ে বিষয় হইতে স্বতন্ত্র হন, তখন তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানী

বলে, মচেৎ ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তি মনগত অভিলাষ বশে ইন্দ্রিয় অভাবে কষ্টই লাভ করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের জন্মে না। অতএব ধর্ম্মে ইন্দ্রিয় জয় উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয় নষ্ট উদ্দেশ্য নহে।

"কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় বশেই ফল হয় না। অগ্রে মন বশই প্রয়োজন। মন বশ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই বশ থাকিতে পারে না। মন বশ না হইলে সে চিন্তাযুক্ত থাকে, যে চিন্তায় মাৎশর্য্যের উদয়, যে উদয়ে—অভিলাষ—তাহার ব্যঘাতে—ক্রোধের উদয়—তাহাতে জীব বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়ে। কাযেই সে শাস্ত্র, গুরুর উপদেশ তুচ্ছ করে। ইন্দ্রিয় জয় ভিন্ন গুরু উপদেশে সফলকাম হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয় প্রভাবে গুরু উপদেশগত কর্ম্মে সে ব্রতী হইতে পারে না।

"যদি বল—তত্ত্বজ্ঞানীওত সংসারে বিষয়ভোগ করিতেছেন, তবে তাঁহারা বিষয়ে আবদ্ধ নহেন কেন? তাহার কারণ—মায়া আর তাঁহাকে আপন মোহিনী মূর্ত্তিতে আশক্ত করিতে পারেন না। কাযেই তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও—ব্রহ্মনিষ্ঠায় চ্যুত হন না। এই ভাবে যিনি ভাবি—তিনিই প্রকৃত বিষয়ী। তাঁহার মতন বিষয়ী হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে সংসারে আর কোন কর্ম্মে সুখ দুঃখ ভাগী হইতে হইবে না। যিনি কেবল মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ অবসানে দৃষ্টি রাখেন—প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত উভয় বিষয়েই আশক্ত হয়েন না—তিনিই মোক্ষের উপযুক্ত। এই রূপ কার্য্যে মরণ সময়ে যদি এই নিষ্ঠার উদয় হয়—তাহা হইলেই আর তাঁহাকে জন্ম মরণের অধীন থাকিতে হয় না।"

শুনিতে শুনিতে দেবেন্দ্রের মন অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া নটনারায়ণ তাঁহার মাতাকে বলিলেন—"অন্ন লইয়া আসুন" তাঁহার মাতা তখনি অন্ন লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

নটনারায়ণ বলিলেন, "দেবেন্দ্র! যাহা বলিলাম, কৃষ্ণ এ উপদেশ-কর্ত্তা। যেমন তোমায় বলিলাম, তুমি শুনিলে—তেমনি আমিও শুনিলাম। তোমায় সন্তানের মত দেখি, সন্তান যে—তাহাকে হারাইয়াছি; এখন আইস—তোমায় আমায় যাহা শুনিলাম, কৃষ্ণ সত্য ভাবিয়া—তাঁহার বাক্যকে তিনিই ভাবিয়া—তাঁহার সন্তোষের জন্য তাঁহার সেবায় যোগ

দিই—নচেৎ সংসার দুঃখময়, কে কাহার ক্রন্দন নিবারণ করিবে বল? উঠ—মাতা অন্ন আনিয়াছেন, আর তাঁহাকে ব্যথিত করা তোমার উচিত নহে। যদি আমায় ভালবাস—তবে ভালবাসায় দুঃখ দিও না। একে আমার হৃদয় দুঃখে কাতর—আর দুঃখের পর দুঃখ দিইও না।"

তখন দেবেন্দ্র আহারে বসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণের স্নেহ বাক্যে, জ্ঞান উপদেশে—দেবেন্দ্র আহারে বসিলেন। সে রাত্রি সেই ভাবেই গেল। প্রাতে নিদ্রা ভাঙ্গিতেই তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, নরনারায়ণের দিব্য ছবি—যেন তাঁহার সম্মুখে। তিনি সে কল্পনার মূর্ত্তিকে মনে মনে বলিলেন, ভাই! না বুঝিয়া কত কি বলিয়াছি, কতই হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছ—যদি আমায় ভাল বাসিয়া থাক—তবে আজ আমি ক্ষমা প্রার্থনায় দাঁড়াইয়াছি, ক্ষমা করিয়া সুখী হইতে দাও।

একে বাল্য বন্ধু—তাহাতে ধর্ম্ম সহায়। দেবেন্দ্রের মন কিছুতেই সুস্থির হইতে চাহে না। কাহার সহিত আলাপে দেবেন্দ্রের সুখ নাই।

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল দেখিয়া তাঁহার মাতা বড়ই ভীতা হইলেন, ভাবিলেন—যেরূপ কাতর দেখিতেছি—যদি নরনারায়ণের মত এও বিবাগী হয়? বিশেষ বৌমা এখানে নাই। বলিলেন—"দেবেন্দ্র! বৌমাকে অনেক দিন আনিতে বলিতেছি—তুমি আনিলে না। এখন তোমার মন ভাল নহে—এই সময় দুই দিন বেড়াইয়া আইস ও বৌমাকে লইয়া আইস। তাহা হইলে অনেকটা স্থির হইতে পারিবে। নচেৎ এরূপে শরীর মন উভয়ই নষ্ট হইবে।"

দেবেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। তিনি চঞ্চলার সহিত দেখা করিতে গেলেন। চঞ্চলার চক্ষের জল কে নিবারণ করিবে? তারা, কিরণশশী কত বুঝান—কিন্তু যোগমায়ার মুখে বাক্য নাই। তারা, কিরণশশী কত দুঃখ করেন—কিন্তু যোগমায়ার মুখে বাক্য নাই। তারা, কিরণশশী কত কাঁদেন—কিন্তু যোগমায়ার চক্ষে এক বিন্দু জল নাই। চঞ্চলার তাহা বিষ বোধ হয়—তারা, কিরণশশীর হাসি পায়।

চঞ্চলা বলিলেন, "বাবা দেবেন্দ্র! তুমি জান—সে তার পিসিমাকে বড় ভালবাসে; মধ্যে মধ্যে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। আমার বোধ হয়, সেখানে একবার দেখা না করিয়া সে কোথাও যাইবে না। যদি এই বেলা একবার সে সন্ধানটা করিতে পার।"

দে। সে কথাও মিথ্যা নহে। আমায় সেখানে যাইতে বলেন—আমি যাইব।

চ। অনেক দূর যাইতে বড় কষ্ট—তোমায় কি বলিব।

দে। নরনারায়ণ আমার ভাই, আমি আপনার সন্তান। তার জন্য আমি কষ্টকে—কষ্ট মনে করি না।

এই বলিয়া দেবেন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন। চঞ্চলা বলিলেন, "তোমার স্ত্রীকেত আনিতে হইবে—অনেক দিন গিয়াছে—এক কাযে দুই কায হইবে—তবে তুমিই যাও। তোমার শ্বশুর বাড়ী হইতে সে বাড়ী কত দূর?"

দে। পাশা পাশি—দূর কি?

চ। তবে ত ভালই। তবে তুমি আজই রাত্রে রওনা হও।

পরদিন দেবেন্দ্র শ্বশুরালয়ে পঁহছিলেন। পঁহুছিয়াই নরনারায়ণের সংবাদ লইলেন। কিন্তু নরনারায়ণ কোথায়? পাছে পিসিমাতা তাঁহার মুখ ভঙ্গিতে বুঝিতে পারেন—এ জন্য আর তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না। কাহাকেও কিছু প্রকাশ করিলেন না।

সন্ধ্যা হয় হয়—দেবেন্দ্র বিষণ্ণ মনে ভাবিতেছেন। জেষ্ঠ শ্যালক রামেশ্বর বলিলেন—"এবার তুমি এরূপ সর্ব্বদাই চিন্তিত কেন?"

দে। আর কিছু ভাল লাগে না, মনটা কেমন হইয়াছে।

রা। কেবল সংসার চিন্তা—টাকা টাকা—একটু হরিনাম কর?

দে। এ ভাব তোমার আবার কবে হইল? আমি এতক্ষণ দৃষ্টি করি নাই—তিলক, টিকী, মস্ত ঝুলি, ব্যাপার কি বল দেখি? যা—তা খাওয়াটা কি ছাড়িয়াছ? না—সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে চলে? সে সব সঙ্গ ছাড়িয়াছ কি?

রা। ও সব গ্রাম্য কথা ছাড়িয়া দাও। গুরুদেবের কৃপায় আমি এখন মুক্ত। ছুটা হরি কথা বল শুনি—বৃথা গ্রাম্য কথায় সময় নষ্ট, আমি ভাল বুঝি না।

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমি এখন মুক্ত কি রূপ?"

রা। বৈষ্ণব মায়াতীত। প্রভু বাক্য, বৈষ্ণবের দেহ মায়াময় নহে—চিদঙ্গ।

দে। বটে বটে—প্রভু যা বলিয়াছেন—সে সত্য। সত্য যে তাহার বাক্যও সত্য—কিন্তু বৈষ্ণব কাহাকে বলে তাহা জান?

রা। কৃষ্ণের নিত্য দাসই বৈষ্ণব। তা এখনি কি বৈষ্ণব হইতে পারিয়াছি—বৈষ্ণবের দাস, কাযেই বৈষ্ণব না বলিয়া কি বলি।

দে। সে যে বড় শক্ত কথা—বৈষ্ণবের দাস হইতে পারিয়াছ কি?

রা। তবে আবার কাহার দাস—তোমার? ছি ছি ও সব তর্ক ছাড়িয়া দাও। প্রভু বাক্য—আমি বৈষ্ণব দাস—একবার যে মনে করিতে পারে—সেই বৈষ্ণব।

এই বলিয়া রামেশ্বর প্রভুকে উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

দেবেন্দ্র ভাবিলেন—এ বড় সহজ বৈষ্ণব নহে। আর কোন কথা কহিলেন না। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রামেশ্বর যেন অষ্ট সাত্বিক ভাবে বিভোর। প্রতিবাসী যাঁহারা কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন—তাঁহারা রামেশ্বরের নিকট যেন যোড় হস্ত। দেবেন্দ্র বুঝিলেন—রামেশ্বর বৈষ্ণব ভাণে আর কিছু লাভ করুক বা নাই করুক—ভণ্ড মহলে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। প্রাণের লোভ না হইলে—মনের লোভ—মন এই রূপেই চরিতার্থ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকারে—দেবীগ্রাম নিস্তব্ধ। কমলাকান্ত এবং প্রতিবাসী কয়জন বসিয়া হরসুন্দরের সহিত গল্পামোদ করিতেছেন। কমলাকান্ত বলিলেন, "তোমাদের এ কিরূপ? লোকের বাড়ীতে আহারের একটা নিয়ম আছে—রন্ধনের একটা ব্যবস্থা আছে। তোমাদের দেখি এক দিন ১০টায়—একদিন ২টায়, রাত্রেও তেমনি—একদিন সন্ধ্যায়—একদিন ২টায়—এ কেন? সময়ে আহারে শরীর ভাল থাকে। তাহার পর—একটা ভাল জিনিস খাইতে চাহ না—একটা ভাল রাঁধিতে দেখি না। এতদিন এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—এখন বাড়ীর মধ্যে তাই মনে হইতেছে।

হর। যখন যাহা ঘটে—তাই হয়। ওর কি নিয়ম আছে? শরীর রক্ষার জন্য আহার, শরীরত বেশ আছে—কোন অসুখ নাই। অত ভাল মন্দ বিচার করিতে গেলে—যে জন্য শরীর রক্ষা—তাহা ভুলিতে হয়।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়! আর ও সব কথা জিজ্ঞাসায় কায নাই—যাহাই জিজ্ঞাসা করিবে —তাহারই ওইরূপ উত্তর পাইবে। একটা মজা দেখ—ভাগবৎ শ্রবণে মনের যেরূপ সংসারে আস্থা কমে, শাক মাছের গল্পে আমাদের মন সেই রূপ হইতেছে। ইহাতে মনে হয়, হরসুন্দর—শিবসুন্দর নিরুদ্দেশে, গৃহদগ্ধে—সত্যসত্যই কাতর নহে—নচেৎ তাহার শাক মাছের গল্পেও আমাদের এ ভাব হয় কেন? এতদিন ভাই! আমরা হরসুন্দরকে লক্ষ করি নাই—এখন নিত্য বেড়াইতে আসিতে হইবে।"

রাত্রি অনেক হইল দেখিয়া সকলেই উঠিলেন, কমলাকান্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনেকক্ষণ হরসুন্দর ও জীবসুন্দর নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন—যেন ঘরে কেহ নাই। জীবসুন্দর আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না—তিনি উঠিয়া তামাক সাজিলেন—সাজিয়া হরসুন্দরের হস্তে দিলেন।

হরসুন্দর তামাক টানিতেছেন, জীবসুন্দর বলিলেন, "শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আপনার ওরূপ ব্যবহার, আমার ভাল বোধ হয় না—কারণ তিনিই আমাদের দুঃখের কারণ। জ্যোতিঃপ্রসাদের—মন্ত্রদাতা।"

হরসুন্দর হাসিলেন—বলিলেন, "জীব! যে কার্য্যের লক্ষ কৃষ্ণ—তাহা দোষের নহে। তাহা যে রূপেই সাধিত হউক, হৃদয় পাতিয়া দিও—কৃষ্ণের দৃষ্টিতে হৃদয় শুদ্ধ হইবে। তোমার শ্বশুর হইলেও—তুমি সে দিনের কথা জান না। একদিন শশাঙ্ক—কৃষ্ণ সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু মনের হাত এড়াইতে না পারিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। না পারিলেও—আত্মবঞ্চক হয় নাই—কৃষ্ণের নিকট বল ভিক্ষায়, সে আবার বল পাইলেও—মনের মায়া এখনও ভুলিতে পারে নাই—তাই সে মনের গতিতেই গতি ধরিয়া কৃষ্ণোন্মুখী হইতেছে। কিন্তু মনকে তাহা জানিতে দেয় নাই—কারণ মনকে জানাইলে মন কৃষ্ণ সেবায় রাজি হইবে না। অতএব শশাঙ্কের—কৃষ্ণই লক্ষ। মানুষ যে কিরূপে কৃষ্ণ লাভ করে—তাহা অচিন্তনীয়। আমরা কেবল ভক্তের মুখ তাকাইয়া কৃষ্ণ অনুরাগ দর্শন করি। তাহার কার্য্য দৃষ্টি করি না। যেখানে অনুরাগ দেখি না, তাহার কার্য্য ভাল হইলেও—ভাল নহে। কারণ কৃষ্ণ লাভ যাহাতে হইল না—তাহার আর ভাল কি? যেখানে অনুরাগ দেখি—তাহার কার্য্য লোকে মন্দ বলিলেও—হৃদয় মন্দ বলে না। কারণ যাহা কৃষ্ণ আকর্ষণ করে—তাহাই আমার মাথার শিরোমণি। অতএব শশাঙ্কের কার্য্য প্রতি—তুমি দৃষ্টি করিও না।"

জী। ধর্ম্ম শাস্ত্রে কর্ম্ম সম্বন্ধে ত একটা ভাল মন্দ ব্যবস্থা আছে? নচেৎ কার্য্য বিচার না করিলে লোক স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে।

হর। অবশ্য সে জন্য শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে উপদেশ আছে।

জী। কর্ম্ম সম্বন্ধে আমায় কিছু বলুন।

হরসুন্দর তামাক টানিতে টানিতে বলিতে লাগিলেন, "জীব প্রকৃতির আকর্ষণ গুণে যাহা করে, বা যাহা তাহার শারীরিক ব্যাপার —তাহাই কর্ম্ম।

"প্রকৃতির আকর্ষণে, জীব কখন কর্ম্ম হীন থাকিতে পারে না। জীব

মায়াপ্রকৃতির কর্ম্ম বন্ধনেই বদ্ধ। কর্ম্ম বন্ধন স্বরূপ বটে, কিন্তু কর্ম্ম মাত্রেই নহে। কারণ তাহা হইলে জীব কখন মুক্ত হইত না। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যে কর্ম্ম—তাহা তাহাদের স্বতঃপ্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য। অভ্যাস ভিন্ন তাহাদের কার্য্য রোধ করা যায় না। অতএব যে অভ্যাস রূপ কর্ম্মে—তাহাদের বোধ করা যায়—তাহা তেজ্য নহে।

"যদি তুমি হটকারিতায় বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগ কর—কিন্তু মনের হাত ত এড়াইতে পারিবে না? তাহা হইলে সে—কর্ম্ম ত্যাগ রূপ কর্ম্মে—তুমি কর্ম্ম ত্যাগী হইতে পারিলে কই? কেবল প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘণে, পাপ অর্জ্জন করা মাত্র। সে অহংকার বৃদ্ধিতে লাভ কি?

"যাঁহারা একবারে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশ সাধারণের জন্য নহে। অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃতিকে আপন বশে আনিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের জন্য। তাঁহাদের কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই। যেমন একদিকে প্রয়োজন নাই—তেমনি আর একদিকে প্রয়োজন আছে—তাহা পরে বলিতেছি।

"কর্ম্মে প্রকৃতির বশ্য হওয়াই দোষ ও বন্ধন। প্রকৃতি যাঁহাদের বশ্য হইলেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিতেও পারেন—না করিতেও পারেন। উভয় সমান। প্রকৃতি আর তাঁহাদের বন্ধন করিতে পারেন না। পারেন না বলিয়াই তাঁহারা ঈশ্বর সন্তুষ্টির জন্য যাহা করেন—তাহাতেই সাধারণের হিত হয়। তবে কর্ম্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কারণ সাধু আচার ভিন্ন, সাধারণে কর্ম্ম ত্যাগে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পাপে নিমগ্ন হয়। সাধু আপনি আচার পালনে নিম্নাধিকারীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাহাতে নিম্নাধিকারী—কর্ম্মত্যাগে উপযুক্ত হয়।

"কর্ম্ম দুই প্রকার। অর্থকর্ম্ম এবং গুণকর্ম্ম। যাহার দ্বারায় আত্মায় অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়—তাহাই অর্থকর্ম্ম, এবং যাহার দ্বারায় বস্তু সংস্কৃত হয়—তাহাই গুণকর্ম্ম।

"অর্থকর্ম্ম আবার তিন প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক, এবং কাম্য। যাহাতে চিত্ত শুদ্ধি হয়—যাহা না করিলে পাপ আছে—তাহাই নিত্য

কর্ম্ম। যাহা কোন নিমিত্ত উপলক্ষে কৃত—তাহাই নৈমিত্তিক। বৈষয়িক সুখ অভিলাষে বা স্বর্গাদি পুণ্যফল কামনায় যে কর্ম্ম—তাহাই কাম্য।

"এই কাম্য কর্ম্ম আবার ত্রিবিধ। যাহা দ্বারায় ইহলোকে ফলের উৎপত্তি—তাহাই ঐহিকফলক, যাহার দ্বারায় পরলোকে ফল উৎপত্তি—তাহাই আমুষ্মিকফলক, এবং যাহা দ্বারায় ইহলোক ও পরলোকে ফল উৎপত্তি—তাহাই ঐহিকামুষ্মিক।

"শাস্ত্র—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মকেই শুভ এবং এতদ্‌ব্যতীত যাহা নিষিদ্ধ—তাহাকেই অশুভ বলিয়াছেন। শুভ কর্ম্মের অকরণকেই—অকর্ম্ম, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাকেই—পাপ বা বিকর্ম্ম বলিয়াছেন।

"যাহা বলিলাম—এগুলি সকাম। নিত্যধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া সংসার কামনা শূন্যে—ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম—তাহাই নিষ্কাম। কর্ম্ম ফল অবশ্যম্ভাবী। স্বসুখ বাসনা না থাকায়, সে কর্ম্ম ফল ঈশ্বরেই অর্পিত হয়।

"অহংকর্ত্তা ভাব ত্যাগে, জীবের প্রতি স্নেহ, শত্রুর প্রতি মিত্রের ন্যায় ব্যবহার, ফল বাসনা শূন্যে যে কর্ম্ম—তাহাই সাত্ত্বিক। ইহার বিপরীত রাজসিক, এবং নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা না করিয়া স্বসুখে বিত্ত নাশ করতঃ পরহিংসা রত হইয়া যে কর্ম্ম—তাহাই তামসিক।

"অতএব কর্ম্ম বিচারে দেখা যায়, কাম্য কর্ম্ম ত্যাগই—সন্ন্যাস, এবং কর্ম্ম ফল ত্যাগই—ত্যাগ। নচেৎ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম—ত্যাগের নহে। কারণ তাহা ক্রমোন্নতির সোপান।

"জ্ঞানযোগ যদিও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিধেয় কর্ম্ম ভিন্ন যখন তাহার অধিকার জন্মে না—তখন একাবারে কর্ম্ম ত্যাগের কল্পনাই—বন্ধের কারণ। তাহাতে কর্ম্ম ত্যাগ হয় না, বরং বিকর্ম্মেই পড়িতে হয়। বিশেষ, কর্ম্মাতীত হইয়াও যদি ঈশ্বর লীলা উদ্দেশে অনাশক্তিতে সাধারণ হিতার্থে কর্ম্ম না করা হয়—তাহাও বন্ধন। অতএব নিষ্কামীরও কর্ম্ম—ত্যাগের নহে।

"কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। অতএব শুভ কর্ম্মের ফল একজন্মে না পাইলেও—জন্মান্তরে লাভ হইবে। ক্রমোন্নতিক্রমে সাধক কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অতএব সকামীরও কর্ম্ম—ত্যাগের নহে।

"সেই জন্যই শাস্ত্রকার, যাহাতে শুভকার্য্য সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—চারি বর্ণাশ্রম, ও চারি আশ্রম ধর্ম্মে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

"এখন দেখ—জীব মায়াবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই তাহার কর্ম্ম। মায়া বন্ধন ছিন্ন হইলেও যতক্ষণ তাহাকে মায়াদেশে থাকিতে হইবে—ততক্ষণ তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। যদি সে মায়াবদ্ধ না হইত—এ দেশে না আসিত—তাহা হইলে কিন্তু নিসর্গগত কোন কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। অতএব নিসর্গের কর্ম্ম নিত্য নহে। আত্মাই নিত্য। আত্মাই বাস্তব বস্তু। বস্তু থাকিলেই তাহার স্বভাব থাকে। স্বভাবই ধর্ম্ম। আত্মা নিত্য বলিয়া তাহার স্বভাব ও নিত্য। ধর্ম্ম থাকিলেই কর্ম্ম থাকে, নিত্যধর্ম্মের—কর্ম্মও নিত্য।

"আত্মার সেই কর্ম্ম কি ?—না, কৃষ্ণের সেবা। সেই সেবা রূপ কর্ম্মই—আত্মার নিত্যকর্ম্ম। মায়াগত বাসনায় লিপ্ত নহে বলিয়া—তাহা নিষ্কাম। অতএব মায়া সেবা রূপ কর্ম্ম—নিত্য নহে। ইহাতে কোন না কোন মায়াগত নিমিত্ত থাকে। যাহা মায়াগত নিমিত্ত উপলক্ষে—তাহাই নৈমিত্তিক। অতএব—অর্থকর্ম্মের নিত্য কর্ম্মও—নৈমিত্তিক। কারণ তাহাও চিত্তশুদ্ধি রূপ নিমিত্ত উপলক্ষে কৃত। যদি তাহার নিত্যধর্ম্মের প্রকাশ থাকিত—তাহা হইলে এ কর্ম্মে প্রয়োজন হইত না। যখন প্রয়োজন হইতেছে—তখন তাহা মায়া নিমিত্তগত বলিতে হইবে।

"তবে শাস্ত্র তাহাকে নিত্য শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? কারণ চিত্তশুদ্ধিতে মুক্তি—মুক্তিতে নিত্য ধর্ম্মের প্রকাশ—তাহা সেই নিত্য ধর্ম্মের সহায় বলিয়া তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলা হয়। নচেৎ নিষ্কাম কর্ম্মই—নিত্যকর্ম্ম। কারণ তাহাতে যে ঈশ্বর সন্তুষ্টি উপলক্ষ, তাহা উপলক্ষ নহে—তাহা তাহার স্বভাব। তাহাই তাহার স্বরূপ—স্বধর্ম্ম। অতএব জড়াশ্রিত সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মই—নৈমিত্তিক। কারণ জীব যদি বদ্ধ না হইত, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, তপস্যায় কিছুই প্রয়োজন ছিল না—অতএব এ সকল মুক্তি নিমিত্তে—নৈমিত্তিক।

"জীব নিত্য। যে কর্ম্ম তাহার নিত্য করণীয়, সেই কর্ম্মই তাহার নিত্যকর্ম্ম। মুক্তাবস্থায় যখন মায়াগত কর্ম্ম থাকে না, তখন তাহা নিত্য নহে। যদি বল—বদ্ধাবস্থায় সেবা রূপ ধর্ম্ম থাকে না—তাহা বলিতে পার না। কারণ, যাহা যাহার অস্তিত্ব—যদি তাহা নষ্ট হইত—তাহা হইলে সেও থাকিত না—তবে মায়া চক্ষে তাহা দৃষ্ট হয় না। স্নেহকে যে রূপেই অবস্থান্তরিত করা হউক না কেন—তাহার স্নেহত্ব নষ্ট হয় না। তেমনি নিসর্গ ভাব বিদূরীত হইলে—ভক্তের সে নিত্যধর্ম্ম আবার প্রকটিত হয়।

"এখন দেখ—শশাঙ্কের এ কর্ম্ম—স্বকাম কি নিষ্কাম। মায়া চক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মও—স্বকামের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কারণ—স্বকামীর হৃদয় নিষ্কামের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না—কিন্তু নিষ্কামের কারণ—মায়াগত নহে—অতএব তাহা মায়াতীত। অর্থাৎ নিসর্গের কর্ম্ম—মায়াগত এবং নিত্যধর্ম্ম গত কর্ম্ম—পরাগত।

"বৃহৎ কর্ম্মের জন্য ক্ষুদ্র কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। সে স্থলে ক্ষুদ্র কর্ম্মের উদ্দেশ্য বৃহৎ কর্ম্মের উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয়। অতএব সে স্থলে ক্ষুদ্র কর্ম্মের ফল দ্রষ্টব্য নহে। তোমরা শশাঙ্কের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাহার আনুসঙ্গিক কর্ম্মের বিচারে, তাহার প্রতি দোষারোপ করিতেছ কেন?

"মায়া শক্তিতে নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ মায়া শক্তিতে মায়া ঘুচে না—বা মায়া কামনা নষ্ট হয় না। কিন্তু যে শক্তিতে জড়ানুরাগ নষ্ট হয়—সে শক্তিতে যে শক্তিমান—তাহার নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার আছে। সেই শক্তিই জীব দেহে কুণ্ডলিনী।

"যত দিন না এই—কুণ্ডলিনী রূপ পরাশক্তির উদয় হয়—ততদিন শাস্ত্রোদিষ্ট নিত্য কর্ম্ম পালন করিলেও তাহা নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে। কারণ মন কোন নিমিত্ত উপলক্ষ না করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না। যদি বল—ওই নিমিত্তই ঈশ্বর হউক—তাহা হইতে পারে না। কারণ অন্ধকার যেমন সূর্য্যোদয়ে অদৃশ্য—তেমনি মন ওই শক্তির উদয়ে অদৃশ্য হয়। যখন এ মন বর্ত্তমান—তখন উহা তাহার কল্পনাগত; অতএব—তাহা ঈশ্বর হইতে পারে না। পরাশক্তির উদয়ে যখন

মায়া মন অদৃশ্য হয়—তখনি পরাগত মনের উদয় হয়—সেই মনের কর্ম্মই নিষ্কাম।

"যিনি এই কৃষ্ণ সেবা রূপ নিত্যকর্ম্মে অধিকারী—তিনিই বৈষ্ণব, এবং যিনি বেদোক্ত নিত্যকর্ম্মে অধিকারী—তিনিই ব্রাহ্মণ। অতএব ব্রাহ্মণ, বিধি শাস্ত্রের অধীন, এবং অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব—বেদাতীত। নচেৎ বহিরঙ্গ ভেকধারী বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানীয় নহে।

"শশাঙ্ক নিত্যধর্ম্মে—সঞ্চারী। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মে—তাহার অধিকার আছে। এখন অপেক্ষা কর—দেখিতে থাক—তাহার এ কর্ম্ম—স্বকাম কি নিষ্কাম।"

আহার প্রস্তুত। চিন্ময়ী সংবাদ দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হরসুন্দর উঠিলেন, যাইতে যাইতে বলিলেন, "অতএব জানিয়া রাখ—যে শশাঙ্কের নিন্দা করে—সে যেন আমার মুখ দর্শন না করে। আমি যাহাকে ভালবাসি—শশাঙ্ক তাহারই দাস অভিমান করে। যে বারেক তাহাকে দেখিয়া তাহার দাস হয়—সেই তাহার সত্য দাস। হরসুন্দর সে দাসের দাস—নচেৎ কল্পনায় মনের স্তানে দাস হইলে, তাহাকে দাস বলে না। যে তাহার দাস অভিমান করে—সে আমার মাথার ঠাকুর। তাহার জন্য যদি প্রাণ যায়—তাহাতেও ব্যথিত নহি—কিন্তু তাহার নিন্দা শুনিলে বড় ব্যথিত হই। কারণ তাহার নিন্দা শ্রবণে কৃষ্ণ প্রীতি হন না—কৃষ্ণ প্রীতিই জীবের পরম প্রয়োজন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিষয়ানন্দ আবার পূর্ব্ব সুস্থতা লাভ করিয়া প্রবাসে বহির্গত হইলেন।

মৃত্যু শয্যার ভাব—মানুষের কত দিন থাকে? বিষয়ানন্দের আর সে ভাব নাই। মন যখন জড়ে ক্ষীণ হয়—তখন হৃদয়ের যে ভাব, মনের সংসার পুষ্টতায় তাহা দূর হয়—তৎস্থলে আবার অহংকার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় রূপে অধিকার স্থাপনে—পূর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

বিষয়ানন্দের হইয়াছেও তাহাই। এই ত জীবন—এই আছে, এই নাই—ক্ষণ ভঙ্গুর; অতএব যাহাতে দুই দশ টাকার স্থিতি হয়—ছেলে গুলা খাইতে পায়—গৃহিণীকে ভিক্ষা না করিতে হয়—সে দৃষ্টি তিনি ভিন্ন আর কে করিবে? তবে হরিনাম পথের সম্বল—সেই সঙ্গে সঙ্গে যতটা হয়।

পরদিন প্রাতে বিজয়পুরে—রামেশ্বর ও দেবেন্দ্র বহির্ব্বাটীতে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে—বিষয়ানন্দ উপস্থিত।

গুরুদেব আসিয়াছেন দেখিয়া রামেশ্বর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ তাঁহার পদধূলী আর রাখিলেন না। পরে পদ ধৌতে পৃথক আসনে বিষয়ানন্দকে বসিতে আসন দিলেন।

দেবেন্দ্র প্রণাম করিলেন মাত্র। মনে মনে ভাবিলেন—তবে ঠিক হইয়াছে—রামেশ্বর যথা স্থানেই পড়িয়াছে। যে যেমন—তাহার অকর্ষণও তেমন—ঘটেও তেমন।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর—রামেশ্বর, গুরু দেবের সেবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বিষয়ানন্দ দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি এখানে কয় দিন?"

দে। কাল আসিয়াছি।

কথায় কথায় বিষয়ানন্দ, নরনারায়ণের গৃহ ত্যাগের কথায় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, "এ দোষ তাহার নহে—

নটনারায়ণের। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, এ সব ঘটিবে তখনি আমি বুঝিয়াছিলাম, তোমরাত তাহা বুঝিলে না—হরিনাম কর্ণে গেলে—এ বিপদটী হইত না। রামেশ্বরকেত বরাবর জান—তুমিত নূতন দেখিতেছ—তাহা নহে। এখন কেমন বল দেখি? দেখিলে যেন ভক্তি আপনি আইসে—এইত উত্তম বৈষ্ণবের লক্ষণ। প্রভু বাক্য—অন্যমত হইবার নহে।”

দেবেন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না। বিষয়ানন্দ মনে মনে বলিলেন, হবে না? কৃষ্ণ কি কখন—ভক্তের অপমান সহ্য করিতে পারেন?

রামেশ্বরের সেবা ভক্তিতে বিষয়ানন্দ বড়ই প্রীত। শাস্ত্র কথা—হরি কীর্ত্তনে—সে দিন যে কোথা দিয়া কাটিল—বিষয়ানন্দ, রামেশ্বরের তাহা বোধগম্য হইল না।

ক্রমে রাত্র হইল। রামেশ্বর নিজ কক্ষে শয়ন করিতে যাইবেন, দেবেন্দ্র বলিলেন, “রামেশ্বর! গুরুদেব একালা শুইবেন—আর তুমি স্ত্রীর কাছে শুইবে—তাহা ভাল দেখায় না। তুমি বাহিরেই গুরু দেবের নিকট শয়ন কর।”

রা। না—গুরুদেবের সে আজ্ঞা হয় নাই। যদি আজ্ঞা হয়—তাহাতে আর আপত্তি কি?

দে। তিনি কি তোমায় বলিবেন যে—স্ত্রীর কাছে শুইও না। এ সব ভক্তির কথা। সেবাত তোমার কার্য্য।

রা। চাকরটাকে সাবধান থাকিতে বলিয়াছি। গুরু দেবের কোন কষ্ট হইবে না। সে কি আমি বুঝি না? সেবার যে কি মর্ম্ম—অন্যে তা কি বুঝিবে?

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “ভাল—সেবার মর্ম্মত আমরা বুঝি না। এখন আমার একটা সন্দেহ ভঞ্জন করিবে? আমি জিজ্ঞাসু—রাগ করিও না।

রা। গুরুদেব বর্ত্তমান—আমি কি বলিব?

দে। না—সে তোমারই কথা। তোমার কথা তুমিই বলিতে পারিবে—অন্যে কি রূপে বলিবে? জিজ্ঞাসা করি—অশ্রুপাত, স্বেদ, কম্প, পুলক ইত্যাদি যে অষ্ট সাত্বিকের ভাব—তোমাতে এগুলি সত্য কি?

রা। কৃষ্ণ জানেন—আমি কি বলিতে পারি। বলিতেও নাই। তুমি কি মিথ্যা বল?

দে। কৃষ্ণত জানেনই। মিথ্যা বলিতেছি না। তবে মায়ার খেলা অনির্ব্বচনীয়—তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

রা। যদি মিথ্যাই মনে কর—মিথ্যা করিয়া ওইরূপ কর দেখি? দেখি কত বাহাদুর।

দে। সাধন ভিন্ন সাধ্য লাভ হয় না। যাহার যেরূপ সাধনা—তাহার সেই রূপ সাধ্য লাভ। ভক্তি শূন্য হৃদয়ে মায়াও ভান শিখাইতে ছাড়ে না। অষ্ট সাত্ত্বিকের ভান ত সামান্য।

রামেশ্বর সপ্তমে চড়িলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তবে ও কথা ছাড়িয়া দাও। যখন হৃদয়ে রাগ দেখা দিতেছে—তখন আর তোমার কথার উত্তরে আমার প্রয়োজন নাই—তাবেই হৃদয় ভাব প্রকাশ হয়।"

রা। দেবেন্দ্র! বৈষ্ণবের হৃদয় সমুদ্র তুল্য—তাহা বুঝাও বড় কঠিন। তবে প্রভু বাক্য—বৈষ্ণব—বৈষ্ণব নিন্দুকের মাথা কাটিয়া ফেলিবে—তাই রাগকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইয়াছে।

দেবেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না—রামেশ্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন বিষয়ানন্দ, রামেশ্বরের ভক্তিতে বড়ই প্রীত—উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "রামেশ্বর! কৃষ্ণ কৃপায় এখন তুমি বৈধীমার্গ অতিক্রম করিয়া রাগমার্গে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছ—অতএব তোমায় গুহ্য সাধন তত্ত্ব বলিব।

"নিজের স্বভাব বিচার করিয়া রুচি অনুসারে—রস অবলম্বনে নিত্য সিদ্ধের অনুগমন কর। ইহাকেই রাগানুগা সাধন বলে। এ সকল বিষয় এতক্ষণ যাহা শুনিলে—সেই মত সেবায় ব্রতী হও।"

রামেশ্বর বলিলেন, "প্রভো! যখনই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করি—প্রভুর লীলা অনুশীলন করি—তখনই আমার শ্রীমতি ললিতা দেবীর ন্যায়—যুগল সেবায় ইচ্ছা হয়।"

বি। বুঝিয়াছি—আর বলিতে হইবে না। তুমি শ্রীমতি ললিতা

দেবীর অনুগতা—মঞ্জরী বিশেষ। ভাল—তোমার কিরূপ সেবায় অনুরাগ?

রা। আমার বোধ হয়—যেন শ্রীমতি ললিতা দেবী, আমায় পুষ্প চয়নে আজ্ঞা দেন—আমি মালা গাথিয়া তাঁহার শ্রী হস্তে দিলে—তিনি কৃপা হাস্যে লইয়া—তাহা রাধা কৃষ্ণের গলে অর্পণ করেন।

বি। কৃষ্ণের ইচ্ছা। আমি আশীর্ব্বাদ করি—কৃষ্ণের ইচ্ছায়—কৃষ্ণের কৃপায়—তুমি এ সেবা সাধনে সিদ্ধ হও।

তখন দুই দশ জন প্রতিবাসী সঙ্গে মহাসমারোহে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সে দিন সে কীর্ত্তনে রামেশ্বরের হৃদয়ে শ্রীমতি ললিতা দেবীর ভাব উদয় হইল, এবং রামেশ্বর বিষয়ানন্দকে যেন সাক্ষাৎ শ্রীমতি ললিতা দেবী দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

আনন্দ ভরে রামেশ্বর নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আর আমার আপনার কৃপায় বাকী কি রহিল?"

বি। আর—বাকী কি? তবে সিদ্ধদেহের নাম—রূপ—পরিচ্ছদ, তোমায় শুনিতে হইবে। এ গোলমালে তাহা হইবে না—অন্য দিন হইবে।

রামেশ্বর ধূলায় পড়িয়া গুরুদেবের চরণ রেণু আস্বাদ করিলেন। আবার নূতন উদ্যমে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে—একজন পিয়াদা দ্বারে আসিয়া দাড়াইল। দূর হইতে দেখিয়া বিষয়ানন্দ তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। অমনি রামেশ্বরের অষ্টসাত্বিক ভাব কোথায় লুকাইল—তিনি ব্যস্ত হইয়া পিয়াদার কথা শুনিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্র পার্শ্বের ঘরে বসিয়া বসিয়া বিষয়ানন্দের তত্ত্ব কথা শুনিতে ছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন—বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি—মনের কল্পনা? যদি না হয়—তবে রামেশ্বরের মন ত মরে নাই? যদি মরিত—তবে পিয়াদা আসিতে না আসিতে—সে অষ্ট সাত্বিক ভাব কোথায় গেল?

দেবেন্দ্র কি ভাবিতে ভাবিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। শ্বশ্রু ঠাকুরাণীকে বলিলেন, "আমি এবার রামেশ্বরের ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত

হইলাম।” তিনি বলিলেন, “বাবা! দুই দিন থাকিলে—এ আহ্লাদ টুকু আর থাকিবে না। ঘরের কাণ্ড আর বাহিরে কি বলিব। ঘরটা নষ্ট হইল। বউটা নড়িবে না—আমার এই বুড়া বয়সে—আর খাটিতে পারি না। আর ভৎর্সনাও খাইতে পারি না। বউমার কথা বলিলে—কি উত্তর দেয় জান—“মা! ওকে হরিনাম করিতে দাও—কেন আর উঁহাকে সংসারে ডুবাও।” তা দেখ—বৌমাকেত আমি একবার হরিনাম করিতে দেখি না—গহনাও গড়ান হইতেছে—আতর গোলাপের গন্ধও ঘরে পাই। কি বলিব বল—তাহারি ছেলেগুলা লইয়া আমারই মরণ হইয়াছে। আমার পেটের ছেলেও যাহা—তুমিও তাহা—তাই বলিয়া ফেলিলাম—যেন আবার না শুনে—তাহা হইলে আর আমার রক্ষা নাই।”

দেবেন্দ্র বলিলেন, “মা! আর আমায় বলিতে হইবে না। এবার আপনাদের গুরুদেবের ছেলের—উপনয়ন হইবে। আপনি বা রামেশ্বর কি দিবেন—ঠিক করিয়াছেন?”

তিনি বলিলেন, “সেও এক কথা। ঠাকুর দেবতায় যদি কোন জিনিস দিবার ইচ্ছা হয়, রামেশ্বরের জন্য তাহা দিবার যো নাই।”

এমন সময়ে রামেশ্বর আসিয়া বলিলেন, “গুরুদেবকে আজই মায়া-পুরে যাইতে হইবে—জমিদার জ্যোতিঃপ্রসাদের স্ত্রী অনেক করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন।”

রামেশ্বরের মাতা বলিলেন, “এবারত উঁহার পুত্রের উপনয়ন—কি দিলে ভাল হয়? আমি মনে করিয়াছি—কর্ত্তারাত টাকা এই জন্যই রাখিয়া গিয়াছেন—আর তাঁহারা ইহাকেই কায মনে করিতেন—যে হারছড়াটী তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি—এবং নগদ ৫০টী টাকা দিলে—যেন ভাল দেখায়।”

রা। বুড়া হইলে মানুষ পাগল হয়। আমরা কি আজই মরিতেছি যে, আর আমাদের কিছু দরকার নাই? সবই যদি দিবে—তবে ছেলে-গুলা খাইবে কি? গুরুদেবের অভাব কি? মনে মনে ভক্তিই প্রয়োজন, উপরে দেখাইতে হয়—অন্যবার ২ টাকা দাও—এবার না হয় ৫ টাকা দাও—আবার কি? সে হাজার টাকা আজও দিলেন না—অভয় নালিশ

করিব করিব—বলিতেছে।” গৃহিণী বলিলেন, “সে টাকাও তোমারই—তবে সে নালিশ করিবে কি?”

রামেশ্বর বলিলেন, “আমার টাকা কে বলিল? আর যাহার টাকাই হউক—টাকার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? টাকাত মায়া।” গৃহিণী বলিলেন, “তাই বলিয়া কি—গুরুদেবের উপর নালিশ, মুখে আনিতে আছে? দুই টাকা কোন কার দেওয়া হয় না—তুমি ২৲ টাকা দাও বটে—কিন্তু আমি আবার ৪৲ টাকা দিই।”

মাতা পুত্রের এ বিবাদ—আর অধিক শুনিয়া কাজ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অন্ধকারময়ী—গ্রাম্যপথে লোকের সমাগম নাই। অতি ধীরে ধীরে জ্যোতিঃপ্রসাদ ও শশাঙ্ক—হরসুন্দর আবাসের বট বৃক্ষ তলে উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের কর্ণে কর্ণে বলিলেন, “তুমি সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হও—আমি বৃক্ষ শাখা অবলম্বনে বাড়ীর ভিতর গিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব।”

ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রবেশ করিলে—শশাঙ্ক আবার দ্বার বন্ধ করিলেন—কিন্তু নিঃশব্দে।

শশাঙ্ক যেখানে যান—জ্যোতিঃপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন। শশাঙ্ক একবার চিন্ময়ীর শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন—বাতায়ন পথে দেখিলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া, চিন্ময়ীর হাত ধরিয়া কাঁদিতেছেন—আর বলিতেছেন, “আমিত উপযুক্তা নহি—কে কৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন—কৃষ্ণ সেবার অধিকারী হইতে পারে? আমায় কৃষ্ণ সেবার অধিকারী করুন—কৃপা করুন। যদি না করিবেন—তবে আমায় এ সংসারে আনিলেন কেন? যদি

আপনাদের ভাব চক্ষে না দেখিতাম—তবে বুঝি এ ক্ষুধা জন্মিত না—যখন ক্ষুধা আনিয়াছেন—তখন আহার দিতে হইবে।"

শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন—মা! যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া চৈত্ত্য রূপে সদসৎ বিচার করিতে চক্ষু দিয়াছেন—তবে আর ছাড়িও না। এ সংসারে তোমার আহার দিতে—হরসুন্দরের পরিবার ভিন্ন—আর কেহ নাই। আমি মনের বশে ক্ষুধা হারাইয়াছি—তাই আহার থাকিতে উপবাসী।

কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদত এ ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিবেন না—এ আনন্দে জ্যোতিঃপ্রসাদ—ক্রন্দনই দেখিবেন। শশাঙ্ক আর সে স্থানে দাঁড়াইলেন না। তিনি হরসুন্দরের গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিনা বাক্যে হস্তস্পর্শে জ্যোতিঃপ্রসাদকে জানাইলেন যে, এই খানে বইস। তখন বাতায়ন নিম্নে উভয়ে বসিলেন—বসিয়া কিন্তু গৃহের সমস্তই দেখিতে লাগিলেন। কারণ পুরাতন গৃহ, বাতায়ণের এক পার্শ্বে অঙ্গুলি প্রমাণ অনেকগুলি ছিদ্র ছিল।

জীবসুন্দর সম্মুখে বসিয়া আছেন—হরসুন্দর বলিতেছেন, "জীব! আপনাকে আপনি না জানিতে পারিলে—তত্ত্ব বোধ হয় না। তত্ত্ব তিনটী—মায়িক তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভগবান তত্ত্ব। ভগবান প্রভু—মায়া—জীব—তাঁহার দাস। ভগবান—জীব ও মায়ার—আশ্রয়।

"তিনি শক্তি শক্তিমান। তাঁহার স্বরূপশক্তির নানা বিক্রম আছে। জীব সেই অনন্ত বিক্রমের তিনটী মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে। তাহা হইতেই—এই তিন তত্ত্বের প্রকাশ।

"তাঁহার অন্তরঙ্গা চিদ্বিক্রম হইতে, তাঁহার সমস্ত তত্ত্বই সিদ্ধ। তাঁহার তটস্থ জীববিক্রম হইতে অনু অংশরূপ জীবের প্রকাশ। এবং তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াবিক্রম হইতে—এই দৃষ্ট জগৎ।

"এই তিনের, তিনের সহিত যে সম্বন্ধ—তাহা জ্ঞাত হওয়াই সম্বন্ধ বোধ। সম্বন্ধ বোধ না হইলে—কে তেজ্য—কে পূজ্য—জ্ঞান হয় না। মায়া চক্ষে, আপাতজ্ঞানে—যেমন মায়া সম্বন্ধ বোধ, তেমনি পরাচক্ষে, দিব্য জ্ঞানে—পরা সম্বন্ধ বোধ ভিন্ন, মনের কল্পনায় পরতত্ত্বে সম্বন্ধ বোধ হয়

মা। তবে ভক্তি বৃদ্ধির জন্য বলিতে হয়। ভক্তি মূর্ত্তিমতি হইলে —সে বোধ আপনি জন্মায়।

মাগ ভিক্ষা চরণের ধুলী,
সঞ্চারী বৈষ্ণব তাঁর, গুরু বর্গ যথা আর,
শ্রীগুরু, শ্রীনাথ, বনমালী।

অপার করুণা সিন্ধু যিনি,
পরশিতে কণা তাঁর, সাধ্য কি বল আমার,
গুরু উপদেশ শিরোমণি।

যথা কৃপা তাঁর হৃদয়েতে,
তাঁর বাক্য মিলাইয়া, শাস্ত্র মর্ম্ম বিচারিয়া,
দিব্য যাহা—ইচ্ছা সে কহিতে।

শাস্ত্র যথা—বাক্য মহাজন,
সেই মম শিরোমণি, হই আমি তাতে ঋণী,
করি—সে পদ অনুসরণ।

কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম,
আমার জীবন যেই, তাঁহার জীবন সেই,
জীবনের জীবন সে শ্যাম।

শুন জীব! তাঁহার স্বরূপ,
অপরূপ রস কুপ, নাই তাঁর অনুরূপ,
সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ।

ভগবান পরম ঈশ্বর,
একা সর্ব্ব অবতারী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ধারী,
আর যত তাঁর অবতার।

মূল তিনি কারণ কারণ,
সর্ব্বের কারণ পাই, তাঁহার কারণ, নাই,
তাই তিনি সবার প্রধান।

সৎ-চিদানন্দ তাঁর তনু,
ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন, সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ হন,
রসপূর্ণ শক্তিমান কানু।

অপ্রাকৃত নবীন মদন,
কামের গায়ত্রী আর, কামবীজ মুলাধার,
তাই লয়ে তাঁর উপাসন।

কিন্তু যেন চিন্ময় সকলি,
নহে তাহা মায়াগত, এই শরীর সম্ভূত,
তাহে নহে তাঁর রস কেলী।

চরাচর স্থাবর জঙ্গম,
পুরুষ যোষিত আর, আকর্ষণে ফিরে তাঁর,
সাক্ষাৎ সে মন্মথ মদন।

নানা মত রসামৃত হয়,
অধিকারী ভেদে তাই, কণা মাত্র খেতে পাই,
সকলের সেই সে আশ্রয়।

রস রাজ ময় মুর্ত্তিধর,
শৃঙ্গার আপনি সেই, আপ্ত পর্য্যন্ত তাহাই,
দেখ তাই সর্ব্ব চিত্ত হর।

লক্ষ্মীকান্ত অবতার যিনি,
তিনি যাঁর আকর্ষণে, অবতীর্ণ বৃন্দাবনে,
আকর্ষণে—তাঁর নারী জানি।

অন্যে পরে আর কিবা কথা,
আপন মাধুর্য্যে হেরে, আপন মানস বরে,
আপনা আপনি পেয়ে ব্যথা—
আপনারে চাহে আলিঙ্গিতে।
কৃষ্ণদাস লেখনিতে, রামানন্দ শ্রীমুখেতে,
তত্ত্ব যাহা আছে এই মতে।

ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে ভগবান,
ঐশ্বর্য্য রূপেতে রন, পরব্যোমে নারায়ণ,
মাধুর্য্য রূপেতে কৃষ্ণ হন।

সে রূপের এতই মহিমা,
ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্য ভারে, আচ্ছাদিত একাধারে,
কেহ নারে দিতে তার সীমা।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে নাহি ভেদ,
রস আস্বাদন কালে, কৃষ্ণই সকল স্থলে,
রসাধার, রসের নির্ব্বেদ।

ভাগবৎ তত্ত্ব এই সার,
তাঁহারি অঙ্গের প্রভা, নির্গুণ সে মাত্র শোভা,
ব্রহ্ম যিনি—হন নির্ব্বিকার।

কৃষ্ণে নাহি ত্রিগুণের লেশ,
চিন্ময় ঐশ্বর্য্য যেই, ষড়ৈশ্বর্য্য ভাবে রই,
একাধারে বিশেষাবিশেষ।

কল্পতরু শ্রীহরি আপনি,
শ্রীরূপে আপনি অঙ্গী, অঙ্গরূপে তাঁর সঙ্গী,
ঐশ্বর্য্য সে বীর্য্য যশঃ মানি।

যশঃ জ্যোতি নির্ব্বিকার জ্ঞান,
আর বৈরাগ্য নিলয়, ব্রহ্মের স্বরূপ হয়,
সিদ্ধ তত্ত্ব একা কৃষ্ণ হন।

ঐশ্বর্য্য সে বীর্য্য দুই গুণ,
ব্যপ্ত হয়ে একাধারে, করে সৃষ্টি চরাচরে,
তার মধ্যে বিষ্ণুরূপে র'ন।

পরমাত্মা জগৎ জীবন,
জগতের শিরোমণি, মহাবিষ্ণু হন তিনি,
অংশ তিনি, অংশী নারায়ণ।

সৃষ্টি হেতু কারণ অর্ণবে,
স্বরূপেতে হন স্থায়ী, নাম কারনাব্ধি শায়ী
মহেশ্বর তিনি—এই ভবে।

মহত্তত্ত্বে গর্ভোদক শায়ী,
তাঁহারি ঈক্ষণ শক্তি, ঈক্ষণের অংশ শক্তি
জীব হৃদে—ক্ষীরোদক শায়ী।

তিনি ঈশ কর্ম্ম ফল দাতা,
অধিযজ্ঞ ভাবে রন, এক মাত্র দ্রষ্টা হন,
জীব পক্ষী কর্ম্ম ফল ভোক্তা।

কূর্ম্ম আদি দশ অবতার,
অংশ রূপ হয় তাঁর, বিধি আর হরি হর,
হ'ন গুণ—অবতার তাঁর।

কৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা সব,
কে বল বর্ণিতে পারে, ব্রহ্মা আদি শিব করে,
হয়ে আছে সবে পরাভব।

এক রূপে অনন্ত অপার,
যথা ব্রহ্ম রূপ তাঁর, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আর,
পরমাত্মা রূপ হয় তাঁর।

নহে ক্ষুদ্র দুজ্ঞেয় সে অতি,
তাই তাঁরে ক্ষুদ্র বলে, নহে পূর্ণ দীপ জলে,
পরিপূর্ণ সম সেই ভাতি।

লুপ্ত শক্তি কভু তিনি ন'ন,
লয়ে চিৎশক্তি গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হ'ন,
স্বইচ্ছায় স্বয়ং ভগবান।

মায়া কার্য্য নিত্য সত্য নয়,
জীব জাত ইচ্ছা মত, নহে তাঁর ইচ্ছা যত,
নির্ব্বিকার সকলি চিন্ময়।

কৃষ্ণরূপ মধ্যম আকার,
এ দুয়ের সে আশ্রয়, সর্ব্বভাব সমাশ্রয়,
এই রূপে সে সারাৎসার।

ভগবান পূর্ণ শক্তিমান,
যদিও অভেদ প্রাণ, স্ব শক্তিতে শক্তিমান,
তথাচ শক্তির বশ ন'ন।

স্বতন্ত্র আপনি ইচ্ছাময়,
ইচ্ছায় শক্তির দ্বারে, নানা রূপ কেলী করে,
পরিপূর্ণ র'ন দয়াময়।

চতুঃষষ্ঠি গুণে বিভূষিত,
হ'ন নিরদ বরণ, ষষ্টি গুণে নারায়ণ,
শিবাদি না তাহাতে ভুষিত।

শিব আদি সব দেবগণ,
পঞ্চ পঞ্চাশৎ গুণ, অংশে পেয়ে হৃষ্ট মন,
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ ভগবান।

পঞ্চাশৎ গুণে জীব গুণী,
আবৃত তা মায়া গুণে, হ্লাদিনীর সে স্ফুরণে,
সে সব প্রকট হয় জানি।

দেব দেবী কৃষ্ণ গুণে গুণী,
অতএব কৃষ্ণ গুণে, প্রণম সবারে মনে,
কৃষ্ণ ছাড়া স্বতন্ত্র না মানি।

কৃষ্ণ সেবে সবে ভক্ত হন,
পরিপূর্ণ ভক্তি তত্ত্বে, শিব হন পরতত্ত্বে,
অভেদ সে একতত্ত্বে র'ন।

হরি হরে যার ভেদ জ্ঞান,
বৃথা তার গুরু দীক্ষা, হরিনামে কৃষ্ণ ভিক্ষা,
গুরুতত্ত্বে দিবসে প্রমাণ।

যতই শুনিতেছেন, জীবসুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে যেন—কি এক বন্যা আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। তিনি যেন অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকারে—প্রাচীতের ক্ষীণ আলোকে। তখন যোড় হস্তে হরসুন্দরের পদ তলে পতিত হইলেন। ভয়, লজ্জা—যেন কোথায় সরিয়া গিয়াছে—জ্ঞান যেন আর—হরসুন্দরকে সামান্য মানুষ জ্ঞান করিতে চাহে না। কিন্তু সে ভাব—কি বলিয়া ব্যক্ত করিবেন—তাহা তাহার জ্ঞান নাই। হৃদয়ের এ ভাব যে কেন—তাহাও তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছেন না—তবে যাহা হইতেছে—অনুভব করিতেছেন মাত্র।

হরসুন্দর সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাড়াইলেন। বলিলেন, "কর কি? কর কি? ও—কি?"

জী। আমায় সেই শক্তি দিন, যে শক্তিতে জীব—গুরু, কৃষ্ণ এক দেখে। যে দর্শনে আমি নিত্য তোমার সেবায় কৃতার্থ হই।

"সে কৃপা ভিন্ন আর কিছুতেই হৃদয় স্থির হইতে চাহে না। আর শৈশবের সে ছেলেখেলা ভাল লাগে না—দিন গেল, কিন্তু যে শৈশব—সেই শৈশবই রহিলাম। আমায় কৃপা করুন—আর আমায় এ সংসার গত সুখে আবদ্ধ রাখিবেন না। মনত সংসার ছাড়িতে চাহে না—যদি এ জ্ঞান দিতেছেন—তবে সে খেলা হইতে আমায় তুলিয়া লউন। যখন এ জ্ঞান দেন নাই—বালক রাখিয়াছিলেন—বালকের খেলায় ভুলিয়া ছিলাম। এখন জ্ঞানে বৃদ্ধ করিয়া—আর তাহাতে মগ্ন রাখিবেন না। হৃদয় তাহা আর চাহে না। এত দিন বিধি মার্গে মনের যে শান্তি ছিল—আজ তাহাতে সে শান্তি নাই। তখন পাইব ভাবিয়া স্থির থাকিয়া সংসারে দিন কাটিত—এখন না পাইলে আর স্থির হইতে পারিতেছি না।

"আমার উপর তাহার এত দয়া—আমি তাহা একবারও তাকাইয়া দেখি নাই। "আপ্তসুখেই" উন্মত্ত ছিলাম, আমার মত স্বসুখী আর কেহ নাই। সে আমার জন্য যে, বিধি উপদেশ দিয়া রাখিয়াছে—আজ তাহা সিদ্ধ হইতে বসিয়াছে। তাহারই ফলে আজ—আমার এ দৃষ্টি স্ফুটিতেছে। আপনার উপদেশ কর্ণে লইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু যাহার জন্য এ সুকৃতি—যত দিন তাহার লাভ না হয়—তত দিন কি হইল—তাহাতে আর শান্তি নাই।

"আমি তাহাকে ভুলিয়া ধর্ম্ম চাহি না—স্বর্গ চাহি না—নরক চাহি না—পুণ্য চাহি না—মুক্তি চাহি না—ঐশ্বর্য্য চাহি না—সংসার চাহি না—চাহি তাহাকে—তাহাকে লইয়া তাহার ইচ্ছায়—সে যাহা দেয়—তাহাই চাই। দাও পিত! যদি জন্ম দিয়াছ—তবে সেই জ্ঞান দাও—সেই ভক্তি দাও। সংসারে যে এমন কিছু দেখিতেছি না—যাহাতে এ মনকে শীতল করিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে ভয় করিব।

"আমি কৃষ্ণ, বিষ্ণু চিনি না—তোমায় এক চক্ষে দেখিতাম—আজ তোমার কৃপায়—আর চক্ষে দেখিতেছি; যাহা দেখাইতেছ—তাহাতেই কৃষ্ণ বস্তর দরদ হৃদয়ে জাগিতেছে—তবে আর কোথায় খুঁজিতে যাইব

"ধন্য তোমার মহিমা—আমি না খুঁজিতে—আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি সংসারে যাহাকে খুঁজিতাম—বুঝিতাম না—কাহাকে খুঁজি; বুঝি

তাম না—সংসারে মায়া খেলায় তাহা লাভ হয় না—তাই তোমায় দেখিয়াও দেখি নাই। যদি বুঝাইয়াছ—তবে দেখা দাও। আমি তোমাকেই খুঁজিতাম। কৃষ্ণ প্রেম স্বরূপ—আধার ভিন্ন প্রেম দাঁড়ায় না—তুমিই সেই আধার—আশ্রয়। আশ্রয়ী আমি—আশ্রয় দাও।”

হর। আমি গুরু নহি। গুরু একজন আছেন—

“গুরু কারু কেনা নয়,
যেই ভজে তারি হয়।”

কি কল্পনার স্বপন টানিয়া আনিতেছ? যাহা বলিতেছ—তাহা কি তোমার অবস্থার কথা? এইরূপ কল্পনায় লোক আত্মবঞ্চক হয়। কাজ ভুলে। ভুলিয়া—আত্মতত্ত্ব না করিয়া—কৃষ্ণের কথা কয়। যাহাতে —আত্মবঞ্চক হইয়া পরকে বঞ্চনা করে। অবস্থা না পাইয়া অবস্থার কথা কহিও না। যাহা দেখ নাই—মনের জ্ঞানে তাহার কল্পনা বাড়াইও না। তাহাতে তোমারও কল্পনা বাড়িবে—যে শুনিবে—তাহারও কল্পনা বাড়িবে। স্বরূপ দর্শন ঘটিবে না। যে—স্বরূপে কথা কয়—উপদেশ দেয়—তাহার উপদেশে—কথায়—স্বরূপ লাভ হয়। যে বিরূপে সেই কথাই শুনিয়া বলে—লেখে, তাহার বিরূপ ভাবে শ্রোতা বিরূপই লাভ করে। অতএব মনের এ কল্পনা—কবিত্ব—ছাড়িয়া দাও। ইহাতে আত্ম-বঞ্চকের সৃষ্টি হয়।

জী। আমার যে সে শক্তি নাই? যে শক্তিতে তাহার সাধন সাধিতে পারি। আর জ্ঞান তত্ত্বে হৃদয় স্থির হইতে চাহে না—আমায় বর্ত্তমানে দেখা দাও।

হর। স্থির হও—স্থির হও। ব্যস্ত হইলে কি—ফল ফলে? মূলের রসে—ফল আপনি ফলে। তুমি কি—সে শক্তি লাভ কর নাই? যে চিণ্ময় কৃষ্ণ নামে দীক্ষিত—কৃষ্ণ শক্তি তাহার হৃদয়ে। ভক্তি বারিতে হৃদয় আর্দ্র কর—বীজ আপনি অঙ্কুরিত হইবে। বীজের পাঠ ছাড়িয়া ফল তত্ত্বে—ফল লাভ হইবার নহে। ভিক্ষায় কয় দিন উদর ভরিবে?

“যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরে আপনি শ্রীহরি।”

জী। আমার হৃদয়ের ভিতর যেন কিরূপ হইতেছে। আমি যেন কিরূপ হইয়া যাইতেছি। মন দিয়া তাহা দৃষ্টি করিতে গেলে—তাহা হারাই।

হর। মন থাকিতে তাহার উদয় হইবে না। নামে মিলিয়া যাও। মন আছে কি না—দেখিতে আসিও না। তবে তাহার উদয় হইবে।

জী। আমার সাধ্যে কুলাইতেছে না। আমায় দেখাইয়া দিন। পিতা বলিয়া এতদিন আপনাকে জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছিলাম—আজ যেন সে জ্ঞান চলিয়া যাইতেছে—ভক্তিতে ভক্তি হইতেছে—তাই দেখিতেছি —সে জ্ঞানগত ভক্তি—ভক্তিই নহে। জ্ঞানে—ভক্তি দিতে শিখাইয়াছিলেন—আজ ভক্তিতে ভক্তি দিতে শিখান।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে শশাঙ্কও যেন কেমন এক রূপ হইয়া উঠিলেন। পাছে কিছু শব্দ হয়—জ্যোতিঃপ্রসাদ টের পান—এ জন্য তিনি স্থির ভাবে সে স্থান হইতে উঠিলেন। ধীরে ধীরে বহির্দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দূরে একটা বৃক্ষ তলে বসিয়া হৃদয় আবেগ কণ্ঠ হইতে নির্গত করিতে লাগিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন, শশাঙ্ক তাহা দেখেন নাই। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন,—"ভাই! তোমার এত আনন্দ কেন? কিসের আনন্দ? এরূপ ভাবে হাসিতেছ কেন?"

শশাঙ্ক একটু অপ্রতিভ হইয়া জ্যোতিঃপ্রসাদের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন—বলিলেন, "তুমিও ভাই—কাঁপিতেছ কেন?"

জ্যো। উহাদের ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় কেমন হইতেছিল। আর এরূপ স্থির ভাবে কখন বসা অভ্যাস নাই—তাই আমার শরীর

কাঁপিতেছে। মন ও কেমন নিরাশ মত হইয়াছে। হরসুন্দরের কথা কিছুই বুঝিতে পারি নাই—কিন্তু কেন যে স্থির হইয়া শুনিতেছিলাম—তাহাও বলিতে পারি না। আমি এরূপ ভাবে স্থির হইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিলাম কেন—তাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি।

শশাঙ্কের কণ্ঠে আবার আনন্দধ্বনি উঠিল। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "শশাঙ্ক! তোমার হাসি অনেক বার শুনিয়াছি—কিন্তু এরূপ হাসিত শুনি নাই? শুনিয়াছি—একটা হাসির দল আছে—তুমি তাই নাকি?"

শ। কোন দলেরই আমি নহি। জগতে অনেকদল আছে, কোন দলের সহিত আমার বা হরসুন্দরের সম্বন্ধ নাই।

জ্যো। তবে এ হাসি কি? হাসি বলিলে যাহা বুঝি—ইহা সে হাসি নহে—ইহাই আনন্দ। আজ আমি আনন্দ—আর হাসির প্রভেদ দেখিলাম।

ক্রমে শশাঙ্কের, জ্যোতিঃপ্রসাদের ভাবে সে ভাব সম্বরিত হইল। বলিলেন, "কি দেখিলে? হাসি আর কি? আমিও এরূপ মুখ বুজিয়া কথন থাকি নাই—তাই চেঁচাইতে ছিলাম—ও কথা ছাড়িয়া দাও—যাহা দেখিতে আসিয়াছিলে—তাহার কি দেখিলে বল?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ, অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া পরে বলিলেন, "সে কথা আমার মনেই ছিল না—তুমি যাহা বলিয়াছিলে তা—সত্য। তোমার কথা সত্য। তোমার কথা তখন বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু এখন আর অবিশ্বাস করিতে পারি না। হরসুন্দর কি সত্য সত্যই—সাধু?"

শ। তুমিও যেমন—সকলেই সাধু। সাধু সাধু করিয়া নিজ কার্য্য ভুলিবে না কি? এমন জানিলে তোমায় আনিতাম না। এখন—কি সে তোমার প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে—তাহার চেষ্টা দেখ। জ্যোতিঃপ্রসাদ কি একটা সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে হারিবে?

শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন—এ শ্মশান বৈরাগ্য—অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। এখন সামান্য ঊর্দ্ধে তুলিয়াছি—এখনি ফেলিলে অস্থি, মজ্জা চূর্ণ হইবে না—মন মরিবে না—দাড়াও, আগে আকাশে তুলি—তবে ফেলিব। তখন সে পতনে মন মরিবে।

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদের আবার প্রতিজ্ঞা মনে হইল—গৃহদগ্ধ মনে হইল—শিবসুন্দরের মুখ মনে হইল—বলিলেন, "জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে। দেখিব—হরসুন্দরের চক্ষে জল আনিতে পারি কি না?" মনে মনে বলিলেন—বলিতেছি বটে, কিন্তু আজ কেন মনের সে বল নাই? ভাবিতে ভাবিতে জ্যোতিঃপ্রসাদের মন বড়ই অপমানে কাতর হইল। শশাঙ্ক বলিলেন—"একটু অপেক্ষা কর—আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া শাখা সাহায্যে আবার শীঘ্রই আসিতেছি।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রবেশ করিলেন। শশাঙ্ক দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে বসিলেন, জ্যোতিঃপ্রসাদও তাঁহার পার্শ্বে ধীরে ধীরে বসিলেন।

হরসুন্দর বলিতেছেন, "স্থির হও—স্থির হও—একাগ্র চিত্তে নামে—ভক্তিতে—তাহাকে ডাকিতে থাক—সে দয়াল—ভক্তের আহ্বানে সে কখন স্থির থাকিতে পারে না। যদি তাহার জন্য সত্য বেদনা উঠিয়া থাকে—তবে একবার তাহাকে ডাক দেখি—একবার হৃদয় খুলিয়া তাহার অদর্শন ব্যথায় ব্যথিত হইয়া—একবার বল দেখি :—

এই বলিয়া হরসুন্দর ঊর্দ্ধে যোড়হস্তে কি এক প্রফুল্ল মুখে দরদর চক্ষুধারে স্বরযোগে ডাকিলেন—

"আসতে হল হে—ও কাঙ্গালের ঠাকুর।
আমি শুনেছি শ্রীনাথের মুখে—
তোমার কাঙ্গালের প্রতি দয়া প্রচুর।
একবার—আসতে হবে হে।"

হরসুন্দরের বাক্য জীবসুন্দরের হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়া যেন জীবসুন্দরকে বাহ্য দৃষ্টি হইতে অন্তরে আকর্ষিত করিল। জগৎ যেন নাই, জগৎ আছে কি—না—সে জ্ঞান যেন আর নাই। জীবসুন্দর যেন আর নাই। যেন কি এক ভাবময় শক্তি—হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূল দেশ হইতে হৃদয়ে প্রকটীত হইল। হৃদয় যেন সে বেগ আর সহ্য করিতে না পাইয়া—বহির্দ্দেশে আনন্দ ধ্বনিতে প্রকাশিত হইল। তখন স্বপ্নের ন্যায় জগৎ যেন হৃদয়ে ভাসিতে লাগিল। আনন্দ যেন তাঁহার আসন—

আনন্দ যেন তাঁহার দৃশ্য—আনন্দ রূপে তিনি যেন দ্রষ্টা—হরি হরি জগৎ যেন আনন্দময়। যেন নিরানন্দ কোথাও নাই—মুখে কেবল—হায় হায় হায়!

হরসুন্দর বলিলেন, "ছাড়িয়া দাও—যখনই খুঁজিবে, তখনই হৃদয়ে পাইবে—ভয় নাই—পাগল হইতে হইবে না। এখন তোমায় খুঁজিতে হইতেছে—প্রেমের এমনি স্বভাব, এমন দিন আসিবে—সে তোমায় খুঁজিবে—হারাইতে হইবে না—ভয় নাই—ছাড়িয়া দাও।"

হরসুন্দরের কথা জীবসুন্দরের কানে যাইতেছে বটে—কিন্তু সে কথা কে শুনিবে? মন যে তখনও প্রকৃতিস্থ নহে। মন যতই প্রকৃতিস্থ হইতে যাইতেছে—ততই কি এ শক্তি মনকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে, আর জীবসুন্দর এ বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেছেন।

তখন হরসুন্দর উচ্চ ভর্ৎসনায় বলিলেন, "ও—কি করিতেছ? ছাড়িয়া দাও—তামাক সাজ।"

সে ভর্ৎসনায় সে অন্তরগত শক্তি যেন কিছু দূরে গেল, মন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। তিনি গালবাদ্যে আনন্দ উদ্গীরণে তামাক সাজিতে বসিলেন। এমন সময়ে বাহিরে কি এক শব্দ হইল। হরসুন্দর বলিলেন—"দেখত—কিসের শব্দ হইল।"

শশাঙ্ক স্থির হইয়া বসিয়া জীবসুন্দরের ভাব দেখিতেছিলেন—কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদ, জীবসুন্দরের এ আনন্দ ধ্বনিতে মর্ম্মাহত হইতেছিলেন। শশাঙ্কের টিটকারিতে তিনি ভাবিতেছিলেন—তবে জ্যোতিঃপ্রসাদ কি করিল? ভাবিতে ভাবিতে তিনি আর পূর্ব্ববৎ স্থির থাকিতে পারেন নাই—পাশে একটা বাঁশ দাঁড় করান ছিল, অন্ধকারে তাঁহার হস্ত বেগে, তাহা পড়িয়া যায়—তাহারি শব্দ হরসুন্দরের কর্ণ গোচর হইয়াছিল।

জীবসুন্দর কপাট মুক্তে বাহিরে দাঁড়াইলেই, আবার সেই শক্তি দ্বিগুণ বেগে তাঁহার হৃদয় বিস্ফারিত করিয়া, তাঁহাকে আনন্দময় করিয়া তুলিল। তিনি—চক্ষু সম্মুখে দুই মূর্ত্তি থাকিতেও—তাঁহাদের যেন দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না—কেবল গালবাদ্যে—আনন্দ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার সম্মুখ দিয়াই—শশাঙ্ক ও জ্যোতিঃপ্রসাদ তীব্র বেগে শাখা সাহায্যে বৃক্ষে উঠিলেন—কিন্তু জীবসুন্দর সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া—নৃত্য করিতে লাগিলেন মাত্র।

তখন হরসুন্দর, জীবসুন্দরের হাত ধরিয়া গৃহ মধ্যে বসাইলেন—বলিলেন, "যে অবস্থায় তুমি আনন্দময় হইয়া বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়াছিলে—তাহাই তুরীয়—স্বরূপ অবস্থা। তাহাই তোমার স্বরূপ। যে শক্তিতে ওই স্বরূপ ভাবে নীত হইয়াছিলে—তাহার সঞ্চারই—শক্তি সঞ্চার। ওই শক্তিই কুণ্ডলিনী। জীব, কুণ্ডলিনী সহযোগে ভাবাঙ্গে স্বস্বরূপে নীত হয়। কিন্তু জড়গুণ, তাহাকে তাহাতে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দেয় না। আবার সে বহির্ম্মুখ হয়। ওই স্বরূপে যে পরম আবেশ—তাহাকে রাগ কহে। ওই রাগে বহির্ম্মুখে ওই স্বরূপে লোভ জন্মে।

"বালক যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিষয়ের অধিকারী হয়—কিন্তু বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা হয় না—পরে বয়সে সাবালক হইলে তাহার রসভোগী হয়—তেমনি সাধনানন্দ ভোগে বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা লাভ হইবে। লোভে সাধনে যখন যখন ওই স্বরূপ প্রকট হয়, স্বরূপগত ভক্তিরসে রাগ শান্ত হইতে থাকে—ইহাকেই সাধনানন্দ বলে। সাধন ক্রমে—ওই অবস্থা ক্রমশঃ নির্গুণে স্থায়ী হইতে থাকে। কারণ প্রবর্ত্ত, সাধক অবস্থায় সগুণে তাহা স্থায়ী হয় না। কিঞ্চিৎ স্থায়ী হইলে রাগ, ত্রিগুণে লিপ্তালিপ্ত ভাবে ভাবভক্তিতে পরিণত হয়।

"ওই স্বরূপগত যে ভক্তি—তাহাই রাগাত্মিকা। স্বরূপ—নিত্য সিদ্ধগণে অভেদে—নিত্য সিদ্ধ ভাবে—রাগাত্মিকা ভক্তিতে সিদ্ধ। রাধা চিত্তে অভেদে স্থিতি। সখি রূপে তাঁহার ভাবাঙ্গ—কায়ব্যূহ। আজ হইতে তোমার হৃদয়ে সেই স্বরূপের প্রকট হইল। বহির্ম্মুখে এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত হইয়া যে সাধন—তাহাকে রাগানুগা বা রাগ বলে। সঞ্চারে ওই স্বরূপ জীবের প্রকট হয়—তাই তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম বলে। অর্থাৎ মায়ায় প্রকটে—বদ্ধ জীব, শুদ্ধসত্ত্বে প্রকটে—মুক্ত, স্বরূপ জীব। যেমন জন্ম না হইলে জগৎ মিথ্যা—তেমনি দ্বিতীয় জন্ম না হইলে চিণ্ময় জগৎ ও মিথ্যা। চিণ্ময় দেশে না জন্মিয়া—লোকের যে ধর্ম্ম, কর্ম্ম—

সকলই মনের কল্পনা। দুঃখের বিষয় তাহাতে লোক অন্ধ হইয়া পরতত্ত্বে অগ্রসর হয়। তাই সে বিফল মনোরথ হয়।

"গর্ভেতে জীব যেমন দেহে আবদ্ধ হইতে থাকে, আবদ্ধ হইয়া দেহের উপর কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব পাইলেই ভূমিষ্ঠ হয়—কিন্তু পরিপুষ্টতা অভাবে জ্ঞানের উদ্দীপন হয় না; তেমনি মুক্ত জীব পরাগর্ভে সাধন কালে শুদ্ধসত্ত্বে নীত হয় বটে—কিন্তু যত দিন কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব না হয় —ততদিন ত্রিগুণ অতীত হইতে পারে না—অর্থাৎ চিন্ময় দেশে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না। ভাব ভক্তিতে শুদ্ধসত্ত্বে চিন্ময় দেশে ভূমিষ্ঠ হইলেও চিদঙ্গ অপরিপক্কতায় দিব্য জ্ঞান অভাবে তখনও সে গুরু, কৃষ্ণ চিনিতে পারে না—যেমন শিশু, পিতা মাতাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না। কারণ তাহার জ্ঞানের অভাব থাকে। যখন শুদ্ধসত্ত্ব দেহে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়—তখন সে গুরু, কৃষ্ণ চিনিতে পারে। যতদিন সাধনে সাধকের ওই ভাব অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি থাকে—যে রূপ বালক নিজের শরীরের ভাবেই স্থির থাকে—ততদিন সাধকের সেই ভক্তি —রাগানুগা; কারণ তাহার লক্ষ ওই ভাবাঙ্গেই। পরে যেমন বালক জ্ঞানে প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিতে সেই ভাবে অবস্থান করে—তেমনি সাধক দিব্য চক্ষে গুরু, কৃষ্ণের ভাবে অবস্থিতি করে। সেই অবস্থিতিই— রাগাত্মিকা। বাল্য অবস্থায় যেমন একদিকে শরীরের রসভাবে, ও আর দিকে প্রিয়জনের রসভাবে—সে স্থির থাকে; ভাবভক্তিতে সেই রূপ হওয়ায় তাহা পূর্ণ রূপে নির্গুণ নহে। যুবা যেমন যৌবনে— আত্ম সমর্পণে সুখী হইতে থাকে—তেমনি সাধক ভাবসাধনে, প্রবর্ত্ত সাধক অবস্থা উত্তীর্ণে—কৃষ্ণে আত্মসমর্পণে—প্রেমভক্তি লাভে উন্মুখ হয়। এই উন্মুখতার অবস্থাই—ভাবসাধনের সিদ্ধাবস্থা—ত্রিগুণ অতীত। যেমন যৌবনের প্রেম স্থায়ী নহে—প্রবীনে তাহা স্থায়ী হয়—তেমনি সেই স্থায়ী ভাবই—প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তিই জীবের প্রয়োজন। তবে এখনি কি দেখিলে? যে, আনন্দ ধারণ করিতে পারিতেছ না। ধারণ করিতে শিখ—স্থির হও—ছাড়িয়া দাও। বাহিরে চোর আসিয়াছিল, দেখিতে পাইলে না? দেখাইবার জন্য তোমার

পাঠাইলাম—তবুও ধরিতে পারিলে না?" এই বলিয়া হরসুন্দর হাসিতে লাগিলেন।

জীবসুন্দর উত্তর দিতে যান—দিতে পারেন না, তৎপরিবর্ত্তে আনন্দই উদ্‌গীরিত হয়। তখন হরসুন্দর নিজ হস্তে তামাক সাজিতে বসিলেন। জীবসুন্দর তাহা দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ বহির্দৃষ্টিতে উপস্থিত হইলেন, তখনও আনন্দ—কিন্তু সে আনন্দে তিনি তামাক সাজিতে সক্ষম।

শশাঙ্ক ও জীবসুন্দর, ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। পরে মায়াপুরাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "শশাঙ্ক! তোমার জামাতাও কি পাগল?"

শ। পাগল ছিল না—আজ হইতে হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একটা উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে সন্ন্যাসীর আশ্রম। আশ্রম আর কি—একটী বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষের কোঠর। কোঠরটী প্রশস্ত, দুই তিন জন তাহাতে বসিতে পারে।

বহু প্রান্তর, নদ, নদী অতিক্রম করিয়া নরনারায়ণ কত দিনে যে, এ আশ্রমে পঁহুছিলেন—তাহা তিনি ঠিক রাখিতে পারেন নাই। ক্ষুধায় সন্ন্যাসী যাহা দিতেন—তাই খাইতেন। সন্ন্যাসী অনেকটা নরনারায়ণের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন—তাঁহাকে নিদ্রার সময় নিদ্রায় ও আহারের সময় আহারে অনুমতি দিতেন।

ইহাতে যেন নরনারায়ণ কিছু শারীরিক দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। কিন্তু মানসিক তিনি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ। সন্ন্যাসী বেশী কথা কহেন না—নরনারায়ণের দুই একটী কথার উত্তর দেন মাত্র।

এ জন্য নরনারায়ণ—অনেক কথা জিজ্ঞাসার সময় পান নাই। পথে নরনারায়ণ বা সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা করিতে হয় নাই। অনেকে খাদ্য স্বেচ্ছায় যোগাইয়া ছিল। আর যখন লোকালয় হইতে দূরে—বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তখন বনের ফল বনই দিয়াছিল। অনেক ফল নরনারায়ণ চক্ষেও দেখেন নাই—সন্ন্যাসী পাড়িয়া পাড়িয়া দিতেন। অনেক দিন বন মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল—কিন্তু কোন বন্য জন্তুর ভয়, নরনারায়ণের হয় নাই—কারণ কিছুই দেখিতে পান নাই। নরনারায়ণ নিদ্রা যাইতেন—কিন্তু সন্ন্যাসী বসিয়া থাকিতেন। জিজ্ঞাসিলে বলিতেন—তুমি নিদ্রাগেলে আমি শয়ন করি। কিম্বা কোন দিন বলিতেন—তোমার সহিত আমিও নিদ্রা গেলে—এ বনে নানা হিংস্র জন্তু আছে—সেটা ভাল কি? মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, নরনারায়ণ দেখিতেন যে, সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন বটে—কিন্তু ধ্যানে—সে জন্য আর কিছু বলিতেন না।

সন্ন্যাসী আশ্রমে পঁহুছিয়া শুষ্ক তৃণগুচ্ছ দ্বারা আশ্রমটী পরিষ্কার করিলেন। দূর হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল আনিয়া রাখিলেন। কতকগুলি ফলমূল একত্র সংগ্রহ করিলেন। প্রায় দশ বিঘা জমির বাহিরে একটী গণ্ডি দিলেন—বলিলেন, "বৎস্য! ভয় নাই, এই গণ্ডির মধ্যে কোন হিংস্র জন্তু আসিতে পারিবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন কর।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী দিব্য যোগাসনে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ক্রমে রাত্র হইল। সন্ন্যাসী সেই এক ভাবেই ধ্যানে মগ্ন। দেখিতে দেখিতে অধিক রাত্রও হইল—তখন নরনারায়ণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল।

নরনারায়ণ এক একবার ভাবিতেছেন—কিসের ভয়? শুনিয়াছি, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" কেবল শুনিয়া থাকিব কি? দেখিব —না হয় মরিব—এমন প্রাণে লাভ কি?

কিন্তু সে গ্রীষ্মেও নরনারায়ণের শীত করিতে লাগিল। অগত্যা তাঁহাকে তাহার উপায় দেখিতে হইল। একবার ভাবিলেন—সন্ন্যাসীকে ডাকি—কিন্তু ভরসায় কুলাইল না। তিনি জ্ঞানে, সে ভয় দূর করিতে

ইচ্ছা করিলেও—মন কিন্তু তাহা মানিতেছে না। শেষ ভয়ে, শীতে, এক প্রকার হতগজ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অগ্নির চেষ্টা না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। কোথায় চেষ্টা করিবেন? এ অন্ধকারে লোকালয় কত দূর—প্রাণ যায় যায়—তবুও সন্ন্যাসীকে ডাকিতে তাঁহার সাহস কুলাইল না।

দিনে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ গণ্ডির মধ্যে দেখিয়া ছিলেন। ভাবিলেন—শুনিয়াছি. কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, যদি হয়—একবার দেখিতে ক্ষতি কি?

তিনি উঠিলেন। কিন্তু ভয়ে, শীতে, হস্তপদ যেন বদ্ধ হইয়াগিয়াছে। ভাবিলেন—ধিক্ আমায়! আমি না—একালা সন্ন্যাসী হইতে বাহির হইয়াছিলাম? এই বুঝি তাহার লক্ষণ? এই বুঝি নরনারায়ণের বৈরাগ্য?

তিনি মনের ভয় শুনিলেন না। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কাষ্ঠ স্তূপের নিকট পঁহুছিলেন। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন—কিন্তু সে ঘর্ষণে অগ্নি দেখা না দিলেও, তাঁহার কম্প বা শীত কমিল, ঈষৎ ঘর্ম্ম দেখা দিল—ভাবিলেন ইহাই বা মন্দ কি?

যে দেহ, মন, সংসারে পালিত—বনের তাহা উপযুক্ত নহে। একটা দেশলায়ে না অগ্নি জ্বলিলে—দ্বিতীয়ে যাহার বিরক্তি জন্মিত, আজ তাহার হস্তে কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নির উৎপত্তি—বড় সহজ নহে।

চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া নরনারায়ণ অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে ঘর্ম্ম শুখাইল—আবার শীত দেখা দিল।

বিরক্তি থাকে কতক্ষণ? না হইলে—চলে যতক্ষণ। আবার নরনারায়ণ ঘর্ষণে প্রস্তুত—এবার অনেক কায়দা কারণে যেন অগ্নি একবার দেখা দিল—কিন্তু আবার কোথায় গেল?

তখন দূর হইতে কি একটা বিকট শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হস্ত বদ্ধ হইয়া গেল—শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু কি করেন—মনকে বুঝাইয়া আবার ঘর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

মনের এইরূপ অবস্থা বা ভাব দেখিয়া মনকে জিজ্ঞাসিলেন—মন!

বাড়ী ফিরিবে কি? মন যেন নেকা সাজে—কিছু বুঝেনা। তিনি হাসিলেন, বলিলেন—তোমার সংসারের সে বস্তু কোথা? এখন আমার হাতে পড়িয়াছ—করি বলিয়াই অমনি একটা কায হঠাৎ করিয়া আমার ঢাকা দিতে পারিবে না। তোমার উৎপাতে অনেকে বনবাসী হইয়াও সন্ন্যাস ত্যাগে—আবার সংসারী।

এবার অগ্নি দেখা দিল—কাষ্ঠ প্রজ্জলিত হইল। তখন দূরে দুই একটী বন্য জন্তুও দেখিলেন। কিন্তু অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না। ভয়ের উপর ভয় হইলেও, গণ্ডির ভিতর আসিতেছে না দেখিয়া সন্ন্যাসীর উপর বড়ই ভক্তি বাড়িল, এবং এক প্রকার স্থির রহিলেন।

মনে হইল—গণ্ডির ভিতর আসিতেছে না কেন? গণ্ডির এমন কি ক্ষমতা? সংসারে অনেক জ্ঞানের কথা পাঠ করিয়াছি—ইহা কি—কিছু বুঝাইতে পারে কি? সংসারের বুদ্ধিকে ধিক্! এ জন্য কত—গুলি, গোলা, লাঠিয়েল, সৈনিক, ছি! কেবল তৃণকে পর্ব্বত করা। ধিক্! অবিদ্যার খেলা—তবুও এ সকলের দিকে দৃষ্টি ইচ্ছা হয় না। ওই বুদ্ধির খেলাকেই মান্য করে।

আবার ভাবিলেন—সাধ করিয়া করে কি? এ সব লোক দেখিতে পায় না—তাই যাহা জানে—তাহাই করে। আবার ভাবিলেন—তাহাত নহে? তাহা হইলে বলিলে উপহাস করিবে কেন? শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিবে কেন? যদি না করিত—তবে এতদিনে দুই একজন করিয়া অনেকেত জানিতে পারিত? যাহা জানা নাই—অথচ শাস্ত্রে আছে—তাহা উড়াইয়া দিয়া কি ফল? না হয়—তোমার না আবশ্যক থাকুক, যাহার আবশ্যক—সে জানিবে; তুমি উড়াইয়া দিয়া, তাহা আরও গুপ্ত কর কেন? যাঁহারা সে জ্ঞানে জ্ঞানী—তাঁহাদের হতাদর কর কেন? সে হতাদরে যে, মনুষ্যের এক একটী জ্ঞান অঙ্গ লোপ পাইতে বসে—তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ না কেন? তুমি বল—মিথ্যা—মিথ্যা—কি সত্য, একবার অনুসন্ধানের মত অনুসন্ধানে দেখিতে অগ্রসর হও না কেন? মিথ্যা হয়—কে তাহা লইবে? সংসার! তুমি কিন্তু এ ব্যথা বুঝ না, তাই জ্ঞানী তোমার কৃপা করেন।

সে দিন সেই রূপেই কাটিল। পরদিনও সেই রূপ—সন্ন্যাসীর ধ্যানে ভঙ্গ নাই। নরনারায়ণ ক্ষুধায় ফল মূল ভোজন করিলেন, তৃষ্ণায় কমণ্ডলু হইতে জলপান করিলেন—আর কাষ্ঠাহুতিতে অগ্নিকে প্রজ্জলিত করিয়া রাখিলেন।

নরনারায়ণ অলস ভাবে বসিয়া আর দিন কাটাইতে পারেন না। তাঁহার ওই রূপ ধ্যানে বসিতে ইচ্ছা হইল। বাটীতে এরূপ সাধনে বসা—তাহার অভ্যাস ছিল। তিনি যোগাসনে বসিলেন।

কিন্তু বসিলে কি হইবে? মন নানা উপদ্রবে তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে বসিল। দুই এক ঘণ্টা কাল বসেন—কিন্তু তাহার অধিক শরীরও সহ্য করিতে পারে না। মনকেও দমনে রাখিতে পারেন না।

এইরূপে আর একদিন কাটিল। সে দিনও সন্ন্যাসীর সেই এক ভাব। মানুষ কায কর্ম্মে ব্যস্ত হয়—আবার কোন কায কর্ম্ম না থাকিলেও ব্যস্ত হয়। দরিদ্র—পেটের জ্বালায় ব্যস্ত। ধনী—মানের জ্বালায় ব্যস্ত। ধার্ম্মিক—ধর্ম্মের জ্বালায় ব্যস্ত। অধার্ম্মিক—অধর্ম্মের জ্বালায় ব্যস্ত। মনের হাত না এড়াইতে পারিলে—ব্যস্ততা ঘুচে না।

নরনারায়ণ ভাবিলেন—কিরূপে মনের হাত এড়ান যায়? সন্ন্যাসীর নিকট তাহা জানিতে হইবে। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু এদিকে ফল মূল ও ফুরাইল—তৃষ্ণার জল ও শুখাইল। নরনারায়ণের গণ্ডির বাহিরে যাইবারও ভরসা নাই—আবার তাহা ভিন্ন গত্যন্তরও নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্র পরিবার লইয়া যথাসময়ে বাটী পঁহুছিলেন। কিন্তু নরনারায়ণের কোন সংবাদ হইল না। চঞ্চলা বড় ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার মনভাব হৃদয়ে লইয়া দেবেন্দ্রও বড় ব্যথিত হইলেন—কিন্তু উপায় নাই। নরনারায়ণের বিরহে, দেবেন্দ্রেরও কিন্তু সংসারে ঔদাস্য ভাব

দাঁড়াইয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন—সংসার কি? এইত—এত ভাব—এত ভালবাসা—সব ফাঁক—কিছুই নহে—এই রূপত মরণেও হইবে? তবে কেন? নরনারায়ণ! সত্যই, তোমার বৈরাগ্য—বৈরাগ্য। আমরা-এত দেখিয়া শুনিয়া—ভুগিয়াও—এইত—যে কে সেই। আমরাই জ্ঞানপাপী। না—আর এ রূপ আমোদপ্রিয়তা ভাল নহে।

দেবেন্দ্র বাড়ী আসিয়া কাহার সহিত মিশেন না। বন্ধু বান্ধবেরা আসিয়া আর সেরূপ আমোদ পান না।

প্রতিবাসী গণেশচন্দ্র, দেবেন্দ্রের সহ পাঠী। আজ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়া দেবেন্দ্রকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। গণেশচন্দ্র বলিলেন, "এত বৈরাগ্য কবে হইল?"

দে। আজ।

গ। কেন?

দে। তোমাদের দেখিয়া।

গ। কি দেখিলে?

দে। তোমরা আমায় ভালবাস না। তোমরা আমার নিত্য সঙ্গী নহে। যে নিত্য সঙ্গী, সে ভালবাসা ত্যাগ করিতে পারে না। তোমরা আমার এই ভাবে—আর আমায় ভাল বাসিতে পারিবে না। তবে তোমরা আমায় ভালবাসিতে না; আমার ভাবকে ভাল বাসিতে। আমার যে ভাবকে তোমরা ভালবাস, সে ভাব আমায় অস্থির করে। তাহাতে আমি ব্যথিত হই—তোমাদের সে দৃষ্টি নাই। যখন সে দৃষ্টি নাই—তখন আমাকে তোমরা ভালবাস না। তবে এ ভালবাসার মোহে আর কাজ নাই—এ ভালবাসা—বন্ধন। নরনারায়ণ তাহা আমায় শিখাইয়া গিয়াছে। সংসারের ভালবাসার মর্ম্ম সে সত্য বুঝিয়াই—এ কথা বলিয়াছে। যে ভালবাসার হেতু আছে—সে সত্য ভালবাসা নহে। তাহাই মায়ার আকর্ষণ।

গ। আমরা কি ভালবাসিব না বলিতেছি? তবে অত কেন? যেমন সকলে করে—তেমনি কর না। ধর্ম্ম আর কে—না করে?

এই লইয়া দুই চারি কথা উঠিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "আর আমার

তর্কে প্রয়োজন নাই। তোমাদের সহিত অনেক তর্ক করিয়াছি। নরনারায়ণ তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছে। সে কথা সত্য। কারণ সে তর্কে কি ফল হইয়াছে? তোমরা যেমন ছিলে—তেমনি আছ।"

গ। বাজে কথা ছাড়। যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর দাও—শুধু বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিলেই কি ধর্ম্ম হয়?

দে। এতদিন তোমাদের সহিত হাসিয়া দেখিলাম। কিন্তু বৃথা দিন গেল। সাধারণ যাহাকে ধর্ম্ম বলে—তাহাও করিলাম—কিন্তু যাহা ছিলাম—তাহাই রহিলাম। এখন বিমর্ষ হইয়া দেখি—ইহাতেই বা কি হয়।

গ। নরনারায়ণই তোমার মাথা খাইয়াছে।

দেবেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। গণেশ বলিলেন—"কত দেখা গেল—আবার দেখা যাক—এ ভাব কতদিন থাকে। এখন চল সভা বসিবার আর দেরি নাই।"

দে। কিসের সভা?

গ। তুমি কি ইহার কিছুই শুন নাই?

দে। না।

গ। তোমার—নরনারায়ণের জন্যই এ সভা। ইন্দ্রনারায়ণ আজ বক্তৃতা দিবে।

দে। কেন—কিসের বক্তৃতা?

গ। তিনি ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করিলেন। ইহার ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং তাঁহার বিরহে শোক প্রকাশ করা—এই সভার উদ্দেশ্য।

দেবেন্দ্র যাইবেন না—গণেশ কিছুতেই ছাড়িবেন না। শেষ—দেবেন্দ্র ভাবিলেন—ইন্দ্র কি বলে শোনাই যাক—এই মনে করিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন।

তখন ইন্দ্রনারায়ণ, আর সে ঘরের ইন্দ্রনারায়ণ নাই। তিনি কল্পনা চক্ষে নরনারায়ণের ভক্ত হইয়া সাধু-মহিমা-বর্ণনা সংগ্রহ করিতেছেন। কল্পনায় নরনারায়ণকে সংসার সুহৃদ ভাবিয়া—তাঁহার অভাবে

সংসারের যে ক্ষতি—তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেছেন। না করিলে অন্য হৃদয়ে কিরূপে অঙ্কিত করিবেন? মুখ খানি এমনি গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যে—পাড়ার লোকও যেন তাঁহার নিকট অপরিচিত।

তখন ইন্দ্রনারায়ণ বলিতে লাগিলেন, "ভদ্রগণ! সভ্যগণ! আজ আমি যে জন্য আপনাদের সম্মুখে—হয়ত অনেকে তাহা জানেন না। মনে করুন—সংসারের অতি দূরে—পর্ব্বত কন্দরে—নির্জ্জনে—নিভৃতে, যদি একটী ফুল ফুটে—তবে সাধারণ তাহার গন্ধমদে আমোদিত হইতে পারে না। তেমনি আপনাদের অনেকের নিকট যিনি অপরিচিত, আজ সেই মহাত্মার কথাই উল্লেখ করিব। সে উল্লেখে তাঁহার গুণবাদ বর্ণনায়, তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়াই—এ সভার উদ্দেশ্য, এবং তাঁহার বিরহে মনস্তাপ প্রকাশও এ সভার অন্যতর উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে জগতে দুঃখ বা হর্ষ প্রকাশের এরূপ প্রথার প্রচলন হইয়াছে—সেই দিন হইতেই জগৎ সভ্য হইয়াছে। অতএব আজ আমরা ইহাতে যোগ দিতে পারি।

"সভ্যগণ! যিনি এই নন্দীগ্রামে * *"

আর দেবেন্দ্র বসিলেন না। তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে গণেশও বাহিরে আসিলেন—বলিলেন, "চলিলে যে?"

দে। ডাকিয়া সভা করিয়া দুঃখ প্রকাশের আমার প্রয়োজন নাই। সে দরকার যাঁহাদের থাকিবে—তাঁহারা শুনিতে পারেন। দুঃখত কাহার দেখিলাম না। তবে দুঃখ হওয়া উচিত—তাই এ সভা। বাঁচিয়া থাকিলে অনেক শিক্ষা হয়। ভাল—সভ্য মহলে কি সকল কাযেই এই রূপ সভ্যতা?

"আমার আর বলিবার কিছু নাই. তবে তাহার নামে এ বিদ্রূপ কেন? নরনারায়ণ সামান্য ব্যক্তি, তাহার জন্য এ সভার প্রয়োজন কি? তিনি এমন কি করিয়াছেন যে—সাধারণে তাঁহার জন্য কাঁদিবে? অভাব বোধ করিবে? এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য নরনারায়ণকে পরিচিত করা নহে—নিজেই পরিচিত হওয়া—কারণ বক্তার ভাতৃভাব ত আমাদের জানিতে বাকী নাই।"

তখন আর দুই একটী সভ্য বাহির হইয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র বাবু! আপনি বাহিরে কেন? অতি সুন্দর বক্তৃতা হইতেছে—হবে না কেন? লেখা পড়া শিখিয়াছেন।"

দে। লেখা পড়া না শিখিলে বুঝি—সভ্যদের দুঃখ প্রকাশটা ভাল হয় না?

আর এক সভ্য বলিলেন, "কি ভাতৃ-ভক্তি! কি উন্নত হৃদয়! কি সাম্যভাব—যথার্থই ইন্দ্রবাবুর হৃদয় অতি সুন্দর। কেবল যে লেখা পড়ার জন্য—বা "মেজিষ্ট্রেট" হইয়াছেন বলিয়া বলিতেছি—তাহা নহে।"

অতঃপর সভা ভাঙ্গিল। শেষ সাব্যস্ত হইল এই যে, তাঁহার জন্য যিনি দুঃখিত—তিনি অবশ্য একগাছি কাল ফিতা অঙ্গে ধারণ করিবেন।

তখন এক জন দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "আপনার অবশ্য এ শোক চিহ্ন, প্রথমেই ধারণ করা উচিত—কারণ, আপনি তাঁহার একজন "বুজুম ফ্রেণ্ড।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "নরনারায়ণ কি মরিয়াছে—না শাস্ত্রের আদেশ—যে, তাহার জন্য শোক চিহ্ন ধারণ করিব? তোমরা দুঃখ করা উচিত বলিয়া দুঃখ কর—ফিতা বাঁধ—নহিলে দুঃখ হয় না। আমার যখন তাহা নহে—তখন ফিতা কেন? ও তোমরা গলায় বাঁধ।"

এমন সময়ে ইন্দ্রনারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন, "কি হইয়াছে?" গণেশ বলিলেন—"দেবেন্দ্র ফিতার কথায় বিদ্রূপ করিতেছে।"

ই। এ সকল হৃদয়ের বিষয়, তাঁহার জন্য যাঁহার হৃদয় কাঁদিবে, তাঁহাকে বলিতে হইবে না। বলাও বিচারে সঙ্গত নহে। একদিনে কি মানুষ সভ্য হয়। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিতে হৃদয় যতই সুন্দর হইবে—ততই এ সকল বিষয়ের মর্ম্ম হৃদয় উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই বলিয়া ইন্দ্রনারায়ণ ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহাভিমুখী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যবর্গও চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্র বাটী আসিয়া ইন্দ্রনারায়ণের চরিত্র ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বড়ই দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন—এ দুঃখে ফল কি? ইন্দ্র কি বুঝাইলে বুঝিবে? এই জন্যই নরনারায়ণ এক দিন বলিয়াছিল যে, আমি যে চেষ্টা করি নাই—তাহা নহে—তবে জানিয়াছি যে, ভ্রাতৃ ভালবাসা আমার কপালে নাই। বলিব কি—শুনিবে কে? কেন শুনিবে? কি দিয়া শুনিবে? যাহার হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয়, যে ভাবে ভাবিত—সে সেই ভাব না পাইলেই সরিয়া যায়—অন্য ভাবে দৃষ্টি—সে দিতে পারে না। তবে যে আপন স্বভাবে বিরক্ত—অন্য ভাবের জন্য লালায়িত—সেই অন্য ভাব দৃষ্টি করে—ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে পারে—ইন্দ্রের কি সে দিন হইয়াছে? যতদিন না হইতেছে—ততদিন ইন্দ্রকে বিরক্ত করা আমাদের অন্যায়। বিবেকীর জন্যই সাধুদের ধর্ম্ম কথা—কিন্তু আমরা যথাতথা কহিয়া—তাঁহাদের কথার মূল্য নষ্ট করি। যে স্বভাবে—মানুষ সংসারে সুস্থ হইয়া বসিয়া আছে—সে স্বভাবে কি ধর্ম্ম কথা ভাল লাগিতে পারে?

নরনারায়ণের গৃহত্যাগ অবধি দেবেন্দ্র আর তত নটনারায়ণের সহিত দেখা করেন না। বৈকালে নটনারায়ণ আসিয়া ডাকিলেন—"দেবেন্দ্র!"

দেবেন্দ্র বাটী হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন? ভিতরে আসুন?"

নটনারায়ণ দেবেন্দ্রের বহির্ব্বাটীতে বসিলেন। বলিলেন, "আর যে তত দেখা কর না? আমি সেই জন্যই আসিলাম। নরনারায়ণ গৃহত্যাগী হইয়াছে—তুমিত হও নাই। তোমায় হারাই কেন?"

দে। ও বাড়ীতে গেলে—আমার মনে বড় দুঃখ হয়—আর কাকি মা বড় দুঃখ করেন—সে দুঃখ দেখা যায় না।

তখন ইন্দ্রনারায়ণের বক্তৃতার কথা উঠিল। নটনারায়ণ বলিলেন, "তুমি যেমন পাগল—তাহা আবার শুনিতে গেলে কি বলে?"

দে। আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়াছে—সংসার যেন আমারও

আর ভাল লাগিতেছে না। তাই একবার ভাবিলাম—দেখি ইন্দ্র কি বলে। দাদার জন্য সে—যেরূপ কাতর, তাহাত দেখিতেছেন।

নট। ও সব পাগলামি ছাড়িয়া দাও। জ্ঞানমার্গে চলিও না। ভক্তিমার্গ অনুসরণ কর।

দে। জ্ঞানমার্গ—ভক্তিমার্গ কিছুই বুঝিতে পারি না। শাস্ত্র পড়ি বটে—কিন্তু এ সকল ভেদ করিতে পারি না। আপনি আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

নট। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞান ভিন্ন, জ্ঞানের আলোচনা হয় না। সেই জ্ঞানের আলোচনায় যাঁহারা সক্ষম, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রের যে উপদেশ—তাহাই জ্ঞানকাণ্ড, এবং ওই জ্ঞানলাভে উপযোগী করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মের উপদেশ—তাহাই কর্ম্মকাণ্ড।

"এই জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড প্রত্যেকে আবার দুই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বকাণ্ডে—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের উল্লেখ। উত্তর কাণ্ডে—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির উল্লেখ। ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ এবং ব্রহ্ম উপাসনা, উত্তর কাণ্ডেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

"অতএব প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মই—কর্ম্মকাণ্ড, এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মই—জ্ঞানকাণ্ড। নিসর্গ গত কর্ম্ম কখন নিত্য হইতে পারে না। জ্ঞানের নিমিত্তই কর্ম্ম—অতএব কর্ম্ম নশ্বর। জ্ঞান নিত্য। কিন্তু যেন মনে থাকে—এ আপাতজ্ঞান—জ্ঞান নহে। ইহা অজ্ঞান। কর্ম্মে এই জ্ঞান খর্ব্ব হয়—ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়।

"জ্ঞানকাণ্ডে যে জ্ঞানের উপদেশ, তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করায়; অতএব সে জ্ঞানকেও প্রবীণের জ্ঞান বলা যায় না—কারণ তাহা ভক্তি মার্গে লুক্কায়িত হয়। প্রবীণ অবস্থায় যাহার উদয়—যে অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই—তাহাই নিত্য; অতএব ও জ্ঞানকেও নিত্য বলিতে পারা যায় না—ইহাই ভক্তিমার্গের কথা। ভক্তিমার্গে যে জ্ঞান—তাহাই নিত্য—কারণ তাহার অন্যথা হয় না।

"কিন্তু জ্ঞানমার্গে—ভক্তিমার্গের কথা গ্রহণ সম্ভব নহে। কারণ ভক্তি—নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাতীত। ভক্তিতে যে জ্ঞান—তাহা নির্ব্বিশেষ

জ্ঞান নহে। ভক্তিতে কৃষ্ণ সবিশেষ—অতএব সৎ-চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অতীত। অথবা তাহা কৃষ্ণের নির্গুণ রূপ। কৃষ্ণের অঙ্গ দ্যুতিই—সেই ব্রহ্ম। জ্ঞানী—জ্ঞানকাণ্ডের চরমাবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ওই তনুভাই উপলব্ধি করে—এবং তদ্গত আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহাতে সে তখন তন্ময় হয় বলিয়াই—তন্ময়ের পূর্ব্বাবস্থায় ওই জ্ঞান জন্মে। কিন্তু—পুনর্স্টি কালে অতিদিন ব্রহ্ম সহবাসে সে ব্রহ্মানন্দে থাকায়, সে আনন্দ তখন ধারণায় আইসে, এবং সে অভিভূত ভাব দূর হইলে, তখন তাহার ওই জ্যোতিঃ মধ্যে সুন্দর পুরুষে দৃষ্টি পড়ে। যে দৃষ্টিতে তখন সে ভক্তি পথের পথিক হয়। তাহার তখন যে জ্ঞানের উদয় হয়—তাহাই নিত্য জ্ঞান।”

দে। তবে শাস্ত্র—তন্ময় নির্ব্বাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কেন?

নট। শাস্ত্রের দোষ নাই—ব্যাখ্যার দোষ। বস্তুত অদ্বৈত বাদীরাই ওইরূপ ব্যাখ্যায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরম বা শেষ তত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বেদের তাহা উদ্দেশ্য নহে—বা বেদ তাহা বলেন নাই। কারণ বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ উভয় বলিয়াছেন, এবং ব্রহ্মের শক্তি স্বীকারে, তিনি হস্ত না থাকিলেও কার্য্য করেন, পদ না থাকিলেও গমন করেন, ইত্যাদি নির্দ্দেশে, তাঁহার সবিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈত বাদীরা তাঁহাকে একেবারে নিঃশক্তি করিয়া বর্ণনা করেন। ভক্তিমার্গে ওই সবিশেষ ব্রহ্মই উপাস্য। তাঁহারা বলেন যে, এ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ যাঁহার, অবশ্য তিনি চৈতন্য বস্তু হইবেন, কারণ বস্তু না থাকিলে বস্তুর জ্যোতিঃ কোথা হইতে আসিবে। যাহা সত্য—তাহা না দেখিলেও শাস্ত্র পাঠে তাহার যে জ্ঞান—তাহাকেও তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই পরোক্ষ জ্ঞান। যদি তাহা দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়—তবে তাহাই অপরোক্ষ জানিবে।

“যদি তুমি পৃথক পৃথক বস্তুতেও, এক অব্যয় আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পার—তবে সে জ্ঞান সাত্ত্বিক। যদি তাহা না হয়—পৃথক পৃথক পদার্থ সকলে, এক পরমাত্মাকে পৃথক পৃথক ভাবে উপলব্ধি কর—তবে তোমার সে জ্ঞান রাজসিক। আর যদি প্রতিমা প্রভৃতি এক একটীতে,

ঈশ্বরাবির্ভাব মনে কর, এবং অন্যতে তাঁহার আবির্ভাব স্বীকার না কর, এই রূপ সীমা বদ্ধ নিকৃষ্ট জ্ঞানকে—তামসিক বলা যায়। যে জ্ঞান ঈশ্বর সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারে না—এবং যে বস্তুর যে সত্ত্বা নহে—তাহাকে তাহাই জ্ঞান করায়—তাহাই অজ্ঞান—অবিদ্যা—বা আপাতজ্ঞান।

“যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা জ্ঞান বা কর্ম্মকে দুই মনে করেন না। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানের উদয় নাই, জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মের সম্পাদন নাই। যাঁহারা দুই মনে করেন, তাঁহাদের সে জ্ঞান—দিব্য নহে। যাহা দিব্য—সে স্থলে কর্ম্ম নাই বটে—কিন্তু সে অবস্থায়ও, নিষ্কামে কর্ম্ম আবশ্যক। নচেৎ নিয়াধীকারী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। ভগবান কৃষ্ণ ও, কর্ম্ম করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। জ্ঞান বা কর্ম্মের উদ্দেশ্য এক, এবং গন্তব্যও এক; যাহার গন্তব্য ও উদ্দেশ্য এক—তাহা সাধন কালেও ভিন্ন নহে।

“যাঁহারা ভক্তি শূন্য ব্রহ্ম উপসনায় রত, তাঁহারা বহু ক্লেশ পাইয়া থাকেন—কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিতান্তই অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু ভক্তি মার্গে—ভক্ত, সবিশেষ চিণ্ময় বিগ্রহ কৃষ্ণের কৃপায় অনায়াসে তাঁহার চরণ লাভ করেন। ইহাই ভাবগত জ্ঞান। জ্ঞানমার্গে সাধকের ভগবৎ জ্ঞান লাভ—বড়ই কষ্টের ফল।

“কর্ম্মমার্গের জ্ঞান অপ্রাকৃত নহে—কারণ তাহা তখনও কর্ম্ম আবরণ ভেদে—জড় ত্যাগে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা ভগবানের স্থূল রূপ হইতে সূক্ষ্ম রূপের অনুসরণ করিলেও—তাহা তাঁহাদের জড়জ্ঞানে অপ্রাকৃত হইতে পারে না। কারণ ভগবান স্থূল, সূক্ষ্ম, অতীত —অপ্রাকৃত। প্রাকৃতের স্থূল, সূক্ষ্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।”

তখন দেবেন্দ্রের মাতা আসিয়া দেবেন্দ্রের সংসারে অনাস্থার কথা তুলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণের বহির্কক্ষে, দেবেন্দ্র একা কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন।

দেবেন্দ্রের অবস্থা তত ভাল নহে। পিতা গত, যাহা দুই পাঁচ বিঘা জমি আছে—তাহারই আয়ে একরূপ সংসার চলে। বাড়ীতে এরূপ স্থান নাই যে—দুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন।

মধ্যাহ্নে নটনারায়ণের বহির্কক্ষে কেহ থাকে না। নটনারায়ণ অন্দরেই আহারের পর একটু নিদ্রা যান। ইন্দ্রনারায়ণ আদালতে থাকেন। এই জন্য দেবেন্দ্র এই স্থানে, একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

দেবেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। নটনারায়ণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। দেবেন্দ্র তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন।

নটনারায়ণ দেখিলেন—দেবেন্দ্রের চক্ষু, জলে ভাসিতেছে। বলিলেন, "কি ভাবিতে ছিলে? নরনারায়ণের মায়া আজও ভুলিতে পার নাই—না?"

দে। সে কথায় কায নাই। এখন কিছু শাস্ত্রের কথা বলুন।

নট। কি বলিব—জ্ঞানমার্গে আমার বলা। ভক্তি আমার কোথায়? তোমায় দেখিয়া এখন একটু ভক্তির আভাস পাইতেছি।

দে। ওরূপ কথায় কায নাই। আপনি হরি কথা বলুন। ভক্তি আপনি আসিবে।

নটনারায়ণ হাঁসিলেন—বলিলেন, "ভাল লোককে ধরিয়াছ। যার ভক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ নাই—তাহার মুখের কৃষ্ণ কথা—কৃষ্ণ কথা নহে। যদি কৃষ্ণ কথা শুনিতে চাও—তবে দেবীগ্রামে চল। পুস্তক গত জ্ঞান চর্চ্চায় আর সুখী হইতে পারি না। সে জন্য এখন শুনিতেই ভালবাসি। যখন কিছুই জানি না—তখন আর লোককে কি জানাইব?"

দে। সে কথা বৃথা বলেন। আপনার নিকট অনেক উপদেশ পাই।

নট। হরসুন্দরের সহিত আলাপ করিয়া এখন বুঝিয়াছি—সাধু

অভাবে শাস্ত্র—শুষ্ক ফুল। সাধু মুখে যখন সেই শাস্ত্র প্রস্ফুটিত হয়—তখন ভ্রমর—মধু জন্য যায়। যে ভ্রমর নহে—সেই আমাদের মুখে শাস্ত্র শুনিয়া সুখী হয়। ফুলের যে রস—তাহা মূলের। সেই মূলই সাধু। যদি তাহাই না হয়—তবে সে শুষ্ক ফুলে প্রয়োজন কি?

তখন উভয়েই দেবীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—জীবসুন্দর সম্মুখে বসিয়া এক ভাবে হরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আর যেন তাঁহার চক্ষু কি এক মাদকে—ঢুলু ঢুলু। মধ্যে মধ্যে কি এক আনন্দধ্বনি তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। অমনি চক্ষু—জল ধারায় বসন সিক্ত করিতেছে।

উভয়কে দেখিয়া হরসুন্দর অভ্যর্থনায় বসাইলেন। তাঁহার ভাবে নটনারায়ণ বা দেবেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। জীবসুন্দর তামাক সাজিয়া হরসুন্দরের হস্তে দিলেন। হরসুন্দর আবার বলিতে লাগিলেন:—

শুন জীব! শক্তি-তত্ত্ব সার,
যাতে পাই কৃষ্ণ প্রেম, যেন জম্বুনদ হেম,
কৃষ্ণ হন শিরোমণি যাঁর।

একা কৃষ্ণ এক শক্তি তাঁর,
শক্তিরূপা সেই ধনী, কৃষ্ণের প্রেয়সী তিনি,
চিচ্ছক্তি রাধিকা নাম যাঁর।

যাঁর স্পর্শে লৌহ সোনা হয়,
কাঁচা তিনি—শ্রেষ্ঠ নয়, পরশে পরশ হয়,
যাঁর ক্রমে—তাঁরে রাধা কয়।

যথা কৃষ্ণ প্রেমময় রূপ,
সৎ-চিদানন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
স্বরূপের শক্তি সে—স্বরূপ।

অনন্ত বিক্রম তাঁর হয়,
তার মধ্যে তিন সার, চিৎ, জীব, মায়া আর,
চিদ্বিক্রমে—অন্তরঙ্গা কয়।

অন্তরঙ্গা সবার প্রধান,
তটস্থ সে জীবশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি,
এ তিন বিক্রম যথা নাম।

স্বরূপের লক্ষণ সে যত,
চিদ্বিক্রমে পূর্ণ রয়, স্ব স্বভাবে দীপ্তি পায়,
অনুরূপে জীবশক্তি গত।

মায়া শক্তি অপরা আখ্যান,
তাতে হয় প্রকটিত, স্বরূপ শক্তির যত
চিদ্বিমুখ বিকৃতি লক্ষণ।

অগ্রে চিৎ-শক্তির মহিমা,
গাহিতে বাড়ে উল্লাস, ভক্ত জানে সে আভাস,
আমি তার কিবা দিব সীমা।

যথা সচ্চিৎ আনন্দময়,
হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, শক্তি সে তদনুরূপ,
এ তিন প্রভাবে সদা রয়।

অপরূপ যে রূপে বাখানি,
আনন্দ অংশে হ্লাদিনী, হয় সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিৎ জ্ঞান মানি।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাই যেন,
নাম আহ্লাদিনী রাই, কৃষ্ণ তাতে সুখ পাই,
তেঁই ভক্ত সুখের কারণ।

সম্বিৎ শক্তিতে প্রকটিত,
অন্তরঙ্গ যত ভাব, তাহে রসিত স্বভাব,
হন কৃষ্ণ নিত্য সে অচ্যুত।

সন্ধিনী শক্তিতে বৃন্দাবন,
মাধুর্য্য রস সাগরে, সদা কৃষ্ণ কেলি করে,
মগ্ন ভাবে র'ন বিদ্যমান।

হ্লাদিনীর সার অংশ ভাব,
ভাব সার হয় প্রেম, যেন জম্বুনদ হেম,
প্রেম সার হয় মহাভাব।

মহাভাব রাধা ঠাকুরাণী,
প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমেতে ভাবিত সেহ,
কৃষ্ণের প্রেয়সী ধনী তিনি।

মহা ভাব রূপা সেই ধনী,
অঙ্গ জ্যোতিঃ কিবা তার, সুগন্ধি সে সর্ব্বসার,
কৃষ্ণ প্রেম মহারত্ন জানি—
তাহারি সে পরিমল বুলে।
কৃষ্ণের কারুণ্যামৃত, তাঁহারে করে রসিত,
নিত্য নব নব ভাব ছলে।
কৃষ্ণের লাবণ্যামৃত রস,
তদুপরি ঘন ঘন, সদা হয় বরিষণ,
তাতে স্নাত হইয়া ক্রমশঃ—
লজ্জাপান আপনি সে ধনী।
পট্ট বসনের প্রায়, তাঁতে লজ্জা শোভা পায়,
অনুরাগ শোভে তাহে জানি—
যথা ওষ্ঠে তাম্বুলের রাগ।
কুটিল সে প্রেম তাঁর, নয়ন অঞ্জন সার,
প্রণয়ের অভিমান ভাগ—
যেন সে কাঁচুলি শোভে তায়।
মান সেই প্রণয়ের, ধম্মিল্য সে মস্তকের,
কৃষ্ণ প্রেম মৃগমদ প্রায়।
স্বেদ, কম্প, পুলক সে যত,
সাত্ত্বিক সঞ্চারী গুণ, সে গুলি সে আভরণ,
সৌভাগ্য সে তিলক আখ্যাত।
হেন রূপে লীলা অনুকূল,
চিত্ত বৃত্তি র'ঙ্গ ধরে, বেষ্টিত সখির দ্বারে,
কায়ব্যূহ রূপ সে সকল।
নিজাঙ্গ সৌরভ হর্ম্ম্যে বসে,
কৃষ্ণ প্রেম গর্ব্বভরে, কৃষ্ণের সঙ্গ সম্বরে,
অনুদিন র'ন কৃষ্ণ পাশে।
সচ্চিৎ আনন্দ ভগবান,
তাঁর গুণানুকীর্ত্তন, বিনা নাহি স্থির হন,
রসনা করে না অন্য গান।

কৃষ্ণগন্ধ মৃগমদ জিনি,
সে সৌরভ ঘ্রাণ বিনা, নাসিকা অন্য চাহে না,
হেন রূপে কৃষ্ণ মনোহিনী।

কৃষ্ণের প্রণয় ঘন রসে,
প্রেমের প্রতিমা খানি, যেন প্রেম রসখনি,
কায়ব্যূহ সখি মাঝে ভাসে।

বিভূতি স্বরূপা সখি যারে,
উজলিয়া সেই ধনী, মহা ভাব স্বরূপিণী,
কৃষ্ণে পান করান আদরে—

প্রেমামৃত সোম সুধা ধারা।
যাতে কৃষ্ণ অভিভূত, হয়ে র'ন একমত,
অনুদিন প্রেম রসে ভরা।

রাধা অঙ্গ—কৃষ্ণ অঙ্গী তাঁর,
কৃষ্ণের যে রূপ গুণ, নির্ব্বিশেষ সে নিগুর্ণ,
সকলি সে শক্তি পরচার।

রাধা শক্তি—কৃষ্ণ সে আশ্রয়,
স্বতন্ত্র সে স্বেচ্ছাময়, এ ভাব শক্তির নয়,
স্বেচ্ছায় স্বাধীন কৃষ্ণ হয়।

কৃষ্ণ ভোক্তা—শক্তি ভোগ্যা হয়,
বিলাসেতে শক্তি তাঁরে, আবরি রেখেছে ঘিরে,
প্রেম কৃষ্ণ—রাধা সে হৃদয়।

ধর যদি স্বরূপ শক্তিতে,
রাধা ভাব—রাধা অঙ্গ, রাধার করিয়ে সঙ্গ,
তবে কৃষ্ণ পাইবে দেখিতে।

তবে হবে সে দৃষ্টি তোমার,
শক্তিতে আবৃত যেই, স্বাধীন পুরুষ সেই,
পরাধীন শক্তি হয় তাঁর।

শক্তির অতীত শক্তিমান,
স্বাধীন সে স্বেচ্ছাময়, সে স্বেচ্ছায় ইচ্ছাময়,
হয়ে শক্তি—ইচ্ছাময়ী হন।

সে স্বেচ্ছায় সেথা ইচ্ছা তাঁর,
কৃষ্ণ যে প্রাণ তাঁহার, আর ইচ্ছা কোথা আর,
আত্মা হন—কৃষ্ণই তাঁহার।

হেন রূপে অভেদাত্ম হয়,
রাধা কৃষ্ণ—এক তত্ত্ব, লীলাচ্ছলে দুয়ে ব্যক্ত,
সেবা সেবিকার ভাব নয়।

অতএব আদ্যাশক্তি রাধা,
অষ্ট ভাব সহচরি, অষ্ট রসে রূপ ধরি,
সেবে তাঁরে বিবশে সর্ব্বদা।

সেবা সখি কায়ব্যূহ তাঁর,
অষ্ট রসে অষ্ট গুণ, হয় চৌষট্টি গণন,
জ্ঞানাগুণে বুঝা কিছু ভার।

এক অঙ্গ দুঁহে দোহা মিলি,
রাধা, কৃষ্ণ রূপে খেলা, সেই সে মাধুর্য্য লীলা,
যাতে নাহি ঐশ্বর্য্যের কালি।

অভেদ সে শক্তি শক্তিমান,
কে পুরুষ কেবা নারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
কেবা তেজ কেবা তেজীয়ান।

কিবা প্রেম নাহি তার তুল,
এ নেহারে ওর পানে, ও নেহারে এর পানে,
তুমি আমি—আমি তুমি ভুল।

আপনারে আপনি সে ভুল,
আলিঙ্গিতে আপনায়, সর্ব্বাকর্ষক সে হয়,
শ্রীমতী সে তাঁর সমতুল।

যাঁর তেজে তেজী হয় ধনী,
ধনী দেখি লোভ তাঁর, আলিঙ্গিতে অনিবার,
তাঁর ভাবে মোহিত আপনি।

তেজে তেজী তেজ হয়ে যায়,
না রয় লক্ষণ তায়, সেই সে লক্ষিত হয়
তেজ তেজী ভাব নাহি রয়।

এই রূপে কৃষ্ণের স্বরূপ,
অতএব সে স্বরূপে, রাধা কৃষ্ণ এক রূপে,
যেই কৃষ্ণ—সেই রাধা রূপ।

অপরূপ যুগল মূরতি,
স্বীয় তেজে বর্ত্তমান, হয়ে হন তেজীয়ান,
তেজীয়ান সে—স্বরূপশকতি।

তেজীয়ানে—তেজ হয় প্রাণ,
তেজই সর্ব্বস্ব তার, তেজ গেলে অন্ধকার,
তেজ হয় সবার প্রধান।

যদি বল কৃষ্ণ তেজীয়ান,
রাধা হয় তেজ তাঁর, তেজ বিনা অন্ধকার,
যুগলেতে উভয় সমান।

রাধা অঙ্গ—কৃষ্ণ রাধা প্রাণ,
রাধা অঙ্গে বর্ত্তমান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ যেই হন,
অতএব রাধা তেজীয়ান।

কৃষ্ণ ধনে কোন জন ধনী?
ধন যে বিলাতে পারে, লোকে ধনী বলে তারে,
কৃষ্ণ নারে—বিলাতে আপনি।

অতএব রাধা তেজীয়ান,
তেজীয়ান তার ধরে, তেজ দেখি সে অন্তরে,
তেজ কৃষ্ণ—আমি রাধা জ্ঞান।

এত প্রেম পাই যাঁহা হতে,
কিবা অঙ্গে আছে গুণ, না হয় কেহ নিপুণ,
তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে।

তাঁতে কৃষ্ণ পরিপূর্ণ তম,
কার সাধ্য সে কর্ষণ, হৃদয়ে করে ধারণ,
নাহিক দ্বিতীয় রাধা সম।

তাই তাঁর দাসী হয়ে পাশে,
থাকে যত সখি জন, রাধা কৃষ্ণ কে মিলন,
অহরহঃ দেখিবার আশে।

রাধা সখি একতত্ত্ব হয়,
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব, সেই ভাবে ভাব লাভ,
তাতে রাধা কৃষ্ণেরে নাচায়।

সেই নৃত্য দেখে যত সখি,
অকামেতে রাধা সেবে, তাতে কৃষ্ণ পায় সবে,
রাধা সেবা বিনা নাহি দেখি।

ইহা বিনা নাহি জানি আন,
এই লীলা যেথা হয়, বৃন্দাবন তারে কয়,
যেই রাধা—সেই বৃন্দাবন।

যেই রাধা সেই বৃন্দাবন,
বৃন্দাবন বস্তুচয়, বৃন্দাবন লীলাচয়,
রাধা কৃষ্ণ প্রণয় কম্পন।

নাহি তত্ত্ব ইহার উপর,
ইহাই আদর্শ লীলা, মায়া শক্তে ছায়া খেলা,
তাই রাখে অন্তর ভিতর।

যদি হয় সে দিন তোমার,
ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, আর যত প্রেমতত্ত্ব,
সময়েতে করিব প্রচার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে জ্যোতিঃপ্রসাদ ও শশাঙ্ক কিয়ৎ দূর পদব্রজে গিয়াই—যানারোহণে মায়াপুরে পঁহুছেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদের মন বড় ভাল নহে। এক একবার মনে হয়—কি করিতেছি—আবার তাহা ভুলিয়া যান। এ ভাবে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ করিতে পারেন না, ক্রোধকেই বরণ করেন।

শশাঙ্ক মনে মনে হাসেন। কার্য্যে—যাহাতে এই বিরক্তি বাড়ে—তাহাই করেন—আর উপরে জ্যোতিঃপ্রসাদের হইয়া তাহাতে ক্রোধ দেখান। জ্যোতিঃপ্রসাদ তাঁহার কিছুই বুঝিতে পারেন না।

এই রূপে দিন যায়। একদিন জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "শশাঙ্ক! চল আজ 'সাগরতলী' যাওয়া যাক—অনেক দিন যাওয়া হয় নাই।"

'সাগরতলী' পঁহুছিয়া নানা আমোদে প্রাতঃকাল কাটিল। মধ্যাহ্নে জ্যোতিঃপ্রসাদ মাছ ধরিতে বসিয়াছেন—কিন্তু মাছ আর খায় না—বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "শশাঙ্ক! শিবসুন্দর না—বেশ গান করিতে পারে বল? শুনাও দেখি।"

শ। তাহা হইলে বন্ধন খুলিয়া দিতে হয়—নচেৎ গাহিতে পারিবে কেন?

জ্যো। তা দাও না, এর ভিতর পলাইয়া কি কিছু করিতে পারে?

শ। গলা বেশী উঠিলে, লোকে যদি গলা চিনিতে পারে?

জ্যো। তা—বুঝি জান না—এর ভিতরে হাজার চেঁচাইলেও বাহিরের লোক শুনিতে পায় না। সে আমার অনেকবার দেখা আছে।

তখন শিবসুন্দরকে আনা হইল। শিবসুন্দর আসিলে, জ্যোতিঃ-প্রসাদ সে দিকে না তাকাইয়া ফাত্না্র দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি যেন ডাকেন নাই—শশাঙ্কই ডাকিয়াছেন। কিছু পরে শিবসুন্দর বলিলেন, "আপনি ছিপ্ ধরিয়া বসিয়া আছেন কেন? মাছ তুলুন।"

শশাঙ্ক একটু হাসিলেন—বলিলেন, "মাছ না খেলে—কি তোলা হইবে?"

শি। ভাল—তুলিয়া দেখুন, কেমন মাছ না উঠে—দেখা যাক।

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "তবে কি মাছ খাইয়া বসিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছে যে—ফাত্না নড়িবে না?"

শি। এত কথার অপেক্ষা—একবার তুলিয়া দেখিলেই হয়—সন্দেহ যায়। হাতের কায হাতে না করিয়া মনের বিকারে লোক ঘুরিয়া মরে।

জ্যোতিঃপ্রসাদ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এখনি মাছ খাইত, এখন ছিপ নড়িলেই সব মাছগুলা পলাইয়া যাইবে। যদি ছিপ তুলিলে মাছ না ওঠে—তবে তোমায় না খাইতে দিয়া মারিব।"

এই বলিয়া যেমন ছিপ টানিবেন—অমনি ছিপের মুখ হইতে সুতা ছিঁড়িয়া গেল ও ফাত্‌নাটা চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শশাঙ্ক বলিলেন, "বোধ হয় বড় মাছ খাইয়া থাকিবে—তাই সুতা ছিঁড়িল, শিবসুন্দরের কথাত ঠিক!"

জ্যোতিঃপ্রসাদের তখন অন্য কথা নাই, "রামা" "রামা" শব্দে ভৃত্যদের ডাকিতে লাগিলেন। ভৃত্যরা আসিলে—বলিলেন, "শীঘ্র জলে নামিয়া ওই ফাতনাটা ধর।"

ফাত্‌না ধরা হইল এবং তাহাতে এক মণ প্রায় একটা মৎস্য উঠিল। সকলে তাহা লইয়া কিয়ৎক্ষণ গোল করিতে লাগিলেন—কিন্তু শিবসুন্দরের সে দিকে লক্ষ্য নাই।

জ্যোতিঃপ্রসাদ মাছ দেখিতেছেন—আর এক একবার শিবসুন্দরের মুখের দিকে তাকাইতে ছেন—বলিলেন, "শিবসুন্দর! তোমার কি মাছ ধরা আসে?"

শি। ছিপ্ কখন স্পর্শ করি নাই।

জ্যো। তবে মাছ খাইয়াছিল—জানিলে কি প্রকারে? এত দিন মাছ ধরিয়াও আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই।

শিবসুন্দর তাহার উত্তর দেন না। অনেক পিড়াপিড়িতে শিবসুন্দর বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিলাম, তাহাত জানি না—আমি কি উত্তর দিব—আমার মনে হইল বলিলাম, আমি আরত কিছু জানি না।"

শ। এ কিরূপ কথা? মনেত একটা কিছু হইবে—তা নহিলে মাছ খাইল কি না—কি রূপে জানিবে? ঈশ্বর কি তোমায় কাণে কাণে বলিয়া গেলেন যে—মাছ খাইয়াছে?

শিবসুন্দর একটু হাসিলেন। বলিলেন, "ঈশ্বর দর্শন—ভাগ্য। সে ভাগ্য আমার কই? আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—যেন তাঁহার নিত্য দর্শন লাভ ঘটে।"

জ্যো। এখন বাজে কথা ছাড়, কাজের কথা বল?

শি। আমি কাযের কথা কিছু জানিনা—বাজে কথা লইয়া ঘুরিয়া মরি। এতক্ষণ হরিনাম করিতে পারিলে কায হইত—কিন্তু সে ভাগ্য আমার কই?

শশাঙ্ক বলিলেন, "সেত সত্য কথা—এখন বাবু যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তাহার উত্তর দাও না। তোমার মনে কিরূপ হইল?"

শি। বাবুর ছিপ ফেলা দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন আমার হৃদয়ে কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে—তাই আমি বলিয়াছিলাম। আর আমি কিছু জানি না।

তখন সকলে হাসিয়া উঠিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদের ভাব দেখিয়া শশাঙ্ক, শিবসুন্দরকে বলিলেন, "আচ্ছা—তুমি এখন যাও।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ ভৃত্যকে বলিলেন, "দেখ—আর বাঁধিয়া কায নাই—একটা ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখ।"

শ। খুলিয়া রাখাটা কি ভাল?

জ্যো। থাক—আর বাঁধিয়া কায নাই।

জ্যোতিঃপ্রসাদ আর মাছ ধরিলেন না। তখন উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "শশাঙ্ক! হরসুন্দরের বংশই কি পাগল?"

শ। দেখিতেছি ত!

জ্যো। তা যেন হইল—এখন মকর্দ্দমার কি করিতেছ বল দেখি? বস্তুত বড়ই লাগিয়াছে দেখিতেছি। নটনারায়ণ তাহার সঙ্গে—সেত ভাল কথা নহে? উহার বেশ টাকা আছে—দশটাকা খরচও করিতে পারে।

শ। উহারইত ছেলের কাছে মকর্দ্দমা? তা যোগাড় করিয়া লওয়া যাইবে—সে ভাবনা নাই। আজ রাত্রেই সে ব্যবস্থা করিব—তবে কিছু দিতে হইবে।

জ্যো। বাপের দিকে না হইয়া কি—আমাদের দিকে হইবে?

শ। সে তুমি বুঝ না—আজ কালকার ছেলে, চক্ষের দেখাটা দেখা মনে করে না—আইনে যাহা আছে—তাহাই দেখা মনে করে। আমাদের

সাক্ষীর জবানবন্দিতে কিছু বলিতে পারিবে না—তাহা হইলেই সে আইনে বদ্ধ।

জ্যো। কাল এ পদ পাইয়াছে—আজ ঘুষ লইবে কি?

শ। ঘুষ কি? সত্যেরা কি ঘুষ লয়? তাকে আমার জানা আছে। সে আজ কালকার ছেলে—সভ্য—বিদ্যান। আজ কালকার ছেলেদের বড় বুদ্ধি, দেখনা—ঈশ্বর যে কি বস্তু, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিবে না—কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যাকার্য্য বিচারে—দুই দশ ঘণ্টার কমে—কেহ বক্তৃতা ছাড়ে না। বক্তৃতায় ইহা যে ঘুষ নহে, তা বেশ বুঝাইয়া দিতে পারে; অসভ্য মুর্খেরাই ইহাকে ঘুষ বলে। উহারা অন্ত কথা বুঝে না। উহারা শান্তি রক্ষক—যাহাতে হয়, শান্তি ত আনিয়া দেয়? তোমার তাহাতে ভয় কি? সে ভার আমার।

জ্যো। নটনারায়ণ আবার টের না পায়—তাহা হইলে তোমার সব মতলব ভাঙ্গিয়া যাইবে।

শ। সে—আমায় লুকাইতে হইবে না—সেই আপনি লুকাইবে।

জ্যোতিঃপ্রসাদ একবার মকর্দ্দমা ভাবিতেছেন—একবার শিবসুন্দরের মুখ ভাবিতেছেন। তাঁহার হৃদয় কেমন বিচলিত হইয়াছে। মন—একবার শিবসুন্দরকে পাগল বলিয়া বুঝাইতেছে—আবার আপনিই তাহা ভাঙ্গিতেছে—কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। এই চিন্তাই যেন বার বার মনে জাগিতেছে—বলিলেন, "শশাঙ্ক! জলযোগের সময় হইল—আইস কিছু খাওয়া যাক, আর উহাকেও ডাক, অনেক দিন গারদে পোরা—ভাল মন্দ খাইতে পায় নাই—কিছু খাইতে দাও। তাহার পর উহার গান শুনা যাইবে।"

শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন, "হরসুন্দর! তুমি চুম্বক বটে—নহিলে এ মরিচা ধরা লোহে—এ আকর্ষণ কাহার?"

শিবসুন্দর আসিয়া বসিলেন, জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "কিছু খাইবে কি?"

শি। কি খাওয়াইবেন?

জ্যো। প্যাড়া, বরফি, নেংড়া আম, উত্তম সন্দেশ, সব ভাজা—যাহা তোমার ইচ্ছা।

শি। ও সকল খাইতে আর ইচ্ছা নাই। এত দিন ওই সকল খাইয়া আসিলাম, পেট কিন্তু ভরিল না—তাই ও সকলে ঘৃণা জন্মিয়াছে। আপনি বড় লোক—এমন কিছু খাইতে দিতে পারেন, যাহাতে নিত্য দিনের মত পেট ভরে—আর কাহার দ্বারে উপস্থিত হইতে না হয়—তবে তাহা খাইতে ইচ্ছা আছে।

শ। কেন? এ সকল কি খাইয়াছ? তোমাদের অবস্থা জানিতে—শশাঙ্কের কি কিছু বাকী আছে?

শিবসুন্দর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "রাজার মহিষী—আর দরিদ্রের স্ত্রী—এক জিনিস। রাজার অনেক—দরিদ্রের এক, কিন্তু উপভোগ উভয়েরই সমান।"

জ্যো। ভাল, তুমি রসিকও বটে, একটা ভাল করিয়া গীত ধর দেখি?

শিবসুন্দর স্থির হইয়া রহিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "তুমি গীত গাহিতে পার, আমি বাবুকে বলায়—তোমার গীত শুনিতে বাবুর বড় ইচ্ছা। একটা ধর দেখি?"

শিবসুন্দর মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "বন্দি ভাবে আছ—মনের সুখ নাই—তাই আমোদ হইতেছে না—না?"

শি। আমি চিরবন্দি। বন্ধন আমার নূতন নহে—তবে দুঃখ কি? যখন যেরূপে থাকিতে হইতেছে—সকলি যাঁহার ইচ্ছায়—এও তাঁহারি ইচ্ছায়—তবে দুঃখ কি? তাঁহার ইচ্ছাই—আমার ইচ্ছা হউক। আমার ইচ্ছা তাকাইয়াই আমি চির বন্দি হইয়াছি। তাঁহার কৃপায় আর আমার সেই ইচ্ছা নাই। এখন তাঁহার ইচ্ছাই—আমার ইচ্ছা—তবে দুঃখ কি?

বলিতে বলিতে শিবসুন্দরের ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শশাঙ্কেরও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পাছে জ্যোতিঃপ্রসাদ বুঝিতে পারেন, এজন্য বলিলেন, "ও কথা ছাড়িয়া দাও—এখন একটা গাও দেখি।"

শি। আমি ত গীত শিক্ষা করি নাই—আর আমি বন্দি হইয়া আপনাদের সম্মুখে গীত গাহিলে—দেখিতে শুনিতে ভাল হয় কি?

জ্যো। হউক—অত সভ্যতার প্রয়োজন নাই—তুমি গাও।

শি। আমি যে সকল গীত জানি—তাহা কি আপনাদের ভাল লাগিবে?

জ্যো। ভাল একটা গাও। সুর ভাল হইলে, আমি তোমায় ভাল ভাল গীত দিব—তুমি সেই সেই সুরে গাহিবে।

অনেক পিড়াপিড়িতে শিবসুন্দর গীত ধরিলেন—

গুরু—কি কব তোমারে।*
বাক্যমনাতীত তুমি—মন বুদ্ধি হারে॥
কি আর বলিব আমি—ভক্ত নামে নামী তুমি,
চৈত্ত্যে তুমি অন্তর্য্যামী, ব্যাপ্ত চরাচরে॥
তুমি গুরু, তুমি কৃষ্ণ—তুমি সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ,
তিনে এক করে:—
পেয়ে তব পদ ছায়া—কাটে জীব মোহ মায়া—
চিনে লয় বাহ কায়া, গুরু হরি হরে॥
তুমিইত দিয়ে শক্তি—ভাবে মিলাও পরাভক্তি,
ভক্ত করে তারে:—
পেয়ে ভক্তি শক্তিসারে—শান্ত দাস্যে গুরু হেরে—
সখ্যেতে সখা নেহারে, প্রেম রাগ ভরে॥
তব বলে হয়ে বলী—বেদ ধর্ম্ম দেয় সে ফেলি,
বাৎসল্যেরি জোরে:—
সেবা ধর্ম্ম শিখাইয়ে—নিজ অঙ্গ তারে দিয়ে—
সেই অঙ্গে অঙ্গী হয়ে, দাঁড়াও বাঁশী ধরে॥

শ। গান গাহিতে বলিলেন, একটা ভাল দেখিয়া গাও—আবার "গুরু" "গুরু" করিতে বসিলে কেন?

শিবসুন্দর যেন অতি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন, "আর যে আমি কিছু—জানি না।"

---

* বেহাগ—একতালা।

শ। ভাল—কৃষ্ণ বিষয় ত জান? তাই না হয় গাও—গুরু গুরু কেন?

শি। গুরু—কৃষ্ণের দাস, আমি—গুরু, কৃষ্ণের দাস—দাসানুদাস। তাই গুরু অঙ্গেই—কৃষ্ণ দেখি। তাই গুরু শব্দ আমার বড় প্রিয়। গুরু অঙ্গ—কৃষ্ণ অঙ্গী। যতক্ষণ মায়ায় দাঁড়াইয়া—ততক্ষণ তাঁহার গুরু রূপ ভুলিতে পারি না। যখন মায়া অতীতে, ভাবাঙ্গে—তখন গুরু শিষ্যের পাঠ কোথায়?

"সে দেশ আনন্দের হাট।
গুরু শিষ্য নাস্তিক পাঠ॥"

শ। তুমি অনেক কথা কহিতেছ। ভক্তের হৃদয়েই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, তবে আবার গুরু ভিন্ন কৃষ্ণ দর্শন হইবে না কেন?

শি। গুরুই ভক্ত—কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। গুরুদেহে—কৃষ্ণই কর্ত্তা, ভাবাঙ্গ দেহরূপ—শক্তিই গুরু। শক্তি শক্তিমান অভেদ—এজন্য গুরু, কৃষ্ণ অভেদ। কৃষ্ণ শক্তি ভিন্ন, কৃষ্ণ দর্শন হয় না—এজন্য গুরুই আমার প্রিয়। গুরু জীবন—কৃষ্ণ জীবনের জীবন। জীবন ধারণ করিতে পারিলেই—জীবনের জীবন আপনিই লাভ হয়, সে জন্য ভাবিতে হয় না। একেরই দুই রূপ। তিনি চৈত্যরূপে প্রভু—মহান্তরূপে ভক্ত। মহান্তই ভক্ত শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ—কনিষ্ঠের গুরু, চৈত্য—পরম গুরু। চৈত্য-রূপে ধন, মহান্তরূপে ধনী। একরূপে নির্গুণ—একরূপে স্বগুণ। ধনীর কৃপা ভিন্ন,ধন লাভ হয় না—তাই গুরুতেই কৃষ্ণ দেখি,ধনীতেই ধন দেখি।

শ। ভাল কথা। যদি একই হইল, তবে মনে কর—একটী স্ত্রীলোক গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিল, সে কি—গুরুর নিকট কৃষ্ণ-লীলা করিবে নাকি? এই জন্যই লোক ঘৃণা করে।

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ হাসিয়া উঠিলেন। শিবসুন্দর আর কথা কহেন না। শশাঙ্ক ছাড়িবেন না—অনেক পীড়াপীড়িতে শিবসুন্দর বলিলেন, "আপনারা মায়াগন্ধ শূন্য বস্তুকে মায়াগন্ধ লাগাইতেছেন, আমায় বড় বেদনা লাগিতেছে। আমায় ক্ষমা করিয়া এ কথা ছাড়িয়া দিন, অন্য কথা বলুন। আমি সব সহিতে পারি—প্রাণ অবধি স্বীকার

করিতে পারি, কিন্তু—বে-দরদীর মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে পারি না।"

শশাঙ্ক কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না। শশাঙ্কের আগ্রহে শিবসুন্দর বলিলেন, "প্রভু রূপে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা। ঐশ্বর্য্যে তিনি নারায়ণ। নারায়ণ রূপে তিনি ত্রিগুণ অতীত—বিষ্ণুরূপে নারায়ণ, নির্লিপ্ত ভাবে মায়ায় অধিষ্ঠিত—চৈত্যগুরু। জীব—শ্রীগুরু কৃপায়, শক্তিসঞ্চারে পরা সঙ্গ লাভে, মায়া বিমুক্তে তটস্থ স্বভাবে, চিৎ-স্বরূপে নীত হইয়া পরতত্বে অভেদে—চৈত্যের মায়ায় লিপ্তালিপ্ত সদাশিব মহান্ত স্বরূপের ব্যষ্টি প্রকটরূপ শ্রীগুরু—মহান্ত; অতএব গুরুরূপ—শান্ত, দাস্যের আস্পদ। দাস, প্রভু সম্বন্ধ। ঐশ্বর্য্যে—সখ্য, বাৎসল্য, মধুরের গন্ধ নাই। যেখানে সে গন্ধ—সেখানে তিনি কৃষ্ণরূপে। কৃষ্ণের বৃন্দাবন ভিন্ন অন্যত্রে বিহার নাই। যেখানে কৃষ্ণ—তাহাই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন ত্রিগুণ অতীত—রাধাই বৃন্দাবন। মাধুর্য্য লীলায় সখা—সখি—মাতা—পিতা—কান্তা সম্বন্ধ। কান্তা ভাবে গুরু—রাধা-চিত্তবৃত্তিরূপ—সখি। রাধা-ভাবে গুরু—রাধার স্বরূপ। সখি, রাধা অভেদ—রাধা, কৃষ্ণে অভেদ—তাই গুরু, কৃষ্ণে অভেদ। অঙ্গরূপে রাধা—কৃষ্ণের শ্রী, সেই শ্রীতে কৃষ্ণ—শ্রীমান। কৃষ্ণের শ্রী বলিয়া—গুরুকে শ্রীগুরু বলি। কৃষ্ণ—শ্রীগুরুর নাথ বলিয়া—কৃষ্ণকে শ্রীনাথ বলি। শ্রীনাথ পরম গুরু—শ্রীনাথেই শ্রী শোভা পায়। যে গুরু শ্রীনাথের শ্রী নহেন—সে গুরু শ্রীগুরু নহেন। শ্রী অঙ্কেই অভেদে শ্রীনাথ—সখ্য, বাৎসল্য, মধুর লীলা করেন। তাই আমি—গুরু, কৃষ্ণে অভেদ দেখিয়া—তাঁহার শ্রীরূপেরই ভজনা করি—কারণ শ্রীই তাঁহার রূপ, শ্রীরূপেই তিনি শ্রীমান। যে শ্রীগুরুর দরদ বুঝিল না—শ্রীনাথে তাহার দরদ কই? মনের কল্পনা মাত্র। কায়ব্যূহ রূপ সখি—রাধার প্রত্যঙ্গ—সে প্রত্যঙ্গে কৃষ্ণ—পূর্ণ স্বরূপে শ্রীগুরু—কৃষ্ণের প্রকাশ রূপ। অতএব—শ্রীগুরু—শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই। যিনি ভেদ দেখেন—তাঁহার চিন্ময় চক্ষু ফুটে নাই। মায়ার কুহকে অনেকে মায়া রতির ঘোরে—কৃষ্ণ রতির ভাব লাভ করিতে চায়। যাহার চিন্ময় চক্ষু ফুটে নাই

—তাহার মধুর রসের ভাব—মায়ার ছলনা মাত্র। যদি মায়ায় বসিয়া মায়াতীত অবস্থা পান—তবে তাহার কথা। সে কথায় আর কাজ নাই।" বলিতে বলিতে শিবসুন্দরের চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

শ। অনেক গুপ্ত সম্প্রদায়েত সে রূপ সাধন দেখিতে পাওয়া যায়।

শি। যাঁহাদের প্রকৃতি অতি নীচ এবং যাঁহাদের সে দেশে জন্ম হয় নাই—তাঁহারাই সে সাধনে প্রবৃত্ত। সেই ভ্রমে তাঁহাদের সে কার্য্য। মায়ার লীলা অনন্ত। মায়া এইরূপে তাঁহাদের ভ্রান্ত করে।

তখন শশাঙ্কের চক্ষেও এক বিন্দু জল দেখা দিল, তিনি আর কথা কহিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণের গৃহত্যাগ অবধি—জীবসুন্দরের যোগমায়াকে বড় দেখিতে ইচ্ছা হয়। যোগমায়াকে মনে হইলেই তাঁহার হৃদয় বড়ই কাতর হইয়া উঠে। এখন যোগমায়া কেমন আছে—কি করিতেছে—এই চিন্তাই, তাঁহার হৃদয়কে কেমন ব্যাকুল করে। যদিও নটনারায়ণের মুখে তিনি নিত্য সংবাদ পান যে, যোগমায়া শারিরীক ভাল আছেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার শান্তি নাই।

দেখিতে বড় ইচ্ছা—কিন্তু দেখাও ঘটিয়া উঠে না। হরসুন্দর এক দিনও সে কথার উল্লেখ করেন না। পাছে পিতার কোন কষ্ট হয়—সে জন্য তিনি দূরান্তরে যাইতে পারেন না। হরসুন্দর যে যাইতে নিষেধ করেন—তাহাও নহে।

জীবসুন্দরের মনে হয়—দাদা যখন বাড়ী ফিরিবেন, পাছে তিনি পিতার কষ্ট হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হন—সে বেদনা জীবসুন্দরের সহ্য হইবে না। এই ভয়েই জীবসুন্দর কোথাও যাইতে পারেন না।

কেন? শিবসুন্দরের জন্যই জীবসুন্দরের—এ ভাব কেন? জীবসুন্দরের কি পিতৃভক্তি নাই? আছে—তবে প্রভেদ এই, হরসুন্দরের কিসে সুখ, শিবসুন্দর তাহা জানেন—জীবসুন্দর জানেন না। তাই শিবসুন্দরের মুখ স্মরণে পিতার সন্তোষ অসন্তোষ বুঝিতে হয়। বুঝিলেও কিন্তু ভুল হয়—যদি তাঁহার ভুলে দাদা ব্যথিত হন—সে বড় ব্যথার কথা।

জীবসুন্দর. হরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একদিন যোগমায়াকে দেখিয়া আসিলে হয় না?"

হর। ভালইত—একদিন দেখিয়া আইস।

জী। দেখা হইলেই সে কাঁদিবে—সে জন্য দেখিতে ইচ্ছা হইলেও—যাইতে ভরসা হয় না।

এই বলিয়া জীবসুন্দর অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "কি করিলে নরনারায়ণ ফিরে?"

হরসুন্দর হাসিলেন, বলিলেন, "মায়া-খেলায় জগৎ সংসার কাঁদিতেছে, মায়ায় যে সুখ—তাহা চিৎসুখের সহিত তুলনাই হয় না, দুঃখই বলিতে হয়। সেই সুখ, দুঃখ স্রোতে তুমিও কাঁদিতেছ, তাহারাও কাঁদিতেছে। তাহারা আপনার জন্য আপনি কাঁদিয়া কূল পাইতেছে না—তুমি কাঁদিয়া কি কিছু করিতে পারিবে? তোমার ক্রন্দনও তোমার আপনার জন্য, তাহাদের জন্য নহে—উহা বদ্ধ জীবের স্বভাব।"

জীবসুন্দর আবার অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন, "সংসারে নিত্যই এরূপ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতেছি—তত্রাচ স্থির হইতে পারিতেছি না। ইচ্ছা না থাকিলেও অবশ হইয়া তাহা করিতে হয়—জীবের এ ভ্রম কেন? আমায় জীব তত্বটী বুঝাইয়া বলুন।"

হর। স্বরূপ লাভ ভিন্ন, মায়া কাণে সে তত্ব শুনিয়া ফল নাই। চক্ষের কাজ নাকে হয় না। দিব্য চক্ষের কায—মায়া চক্ষে হয় না।

এইরূপে পাঁচ কথার পর বলিলেন, "যে স্ব স্বরূপের উদ্দেশ পাইয়াছ—সেই প্রাপ্ত স্বরূপে—সকল তত্বই বুঝিয়া পাইবে—তবে শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে—শুনিতে পার।

"জীব নিত্য। পূর্ব্বে যে শক্তি শক্তিমান ভগবান—শ্রীকৃষ্ণের

মহিমা উল্লেখ করিয়াছি—তাহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কৃষ্ণই যে একমাত্র ভগবান তত্ত্ব—তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রেই প্রতিপাদিত। যে শাস্ত্রে অন্য অন্য দেবতার উল্লেখ—সে শাস্ত্রে পরতত্ত্ব গোলকের উল্লেখ নাই—তাহাতেও দেখা যায়—সর্ব্বোপরি গোলক তত্ত্বের সূর্য্যই কৃষ্ণ—এবং কৃষ্ণই মূল তত্ত্ব। সেই মূল তত্ত্বগত স্বগত শক্তিই—চিৎশক্তি।

"জীব—সেই শক্তি শক্তিমানের জীব রূপ পরা প্রকৃতি গত বিভিন্নাংশ। সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ—কৃষ্ণের সহিত কিরণ রূপ জীবশক্তির সেই রূপ নিত্য সম্বন্ধ। অতএব জীব—কৃষ্ণ সূর্য্যের কিরণ কণা। কৃষ্ণ অদ্বয় চিৎস্বরূপ—সেই হেতু জীব—সেই চিৎতত্ত্বের কণা অর্থাৎ চিৎকণ। অতএব মায়িক বস্তুর ন্যায়—জীব অনিত্য নহে। জীব যেমন কিরণ কণ—তেমনি কৃষ্ণ স্বরূপের গুণগণের কণস্বরূপ লাভে সিদ্ধ। সেই কিরণ-কণ গত স্বরূপ জীব—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃস্বরূপ, অহংতাস্বরূপ, ভোক্তাস্বরূপ, মন্তাস্বরূপ, কর্ত্তাস্বরূপ। অণু বিধায় জীবের এ গুণ পরিমেয়, বিভু বিধায়—কৃষ্ণে অপরিমেয় অর্থাৎ কৃষ্ণ বিভু—জীব অণু। এই ভেদে কৃষ্ণ প্রভু—জীব নিত্য দাস—ইহাই সম্বন্ধ; এবং দাস বিধায় ভগবৎ রসেও তাহার অধিকার।

"এই জীবগত গুণ, কৃষ্ণের নিকৃষ্টা বা অপরাশক্তি গত অহংকারাদি অষ্ট প্রকৃতির অতীত—কারণ তাহা কৃষ্ণ গুণ কণ। ইহাতেই দেখা যায়—যে জীবশক্তি অপরা বা মায়া হইতে শ্রেষ্ঠা বা পরা। তবে কিরণ স্থানীয়।

"এই জীবশক্তিকে তটস্থা বলা যায়। কারণ জীবশক্তি, মায়া ও চিৎতত্ত্বের মধ্যে স্থিত। অণুত্ব বিধায় জীব—মায়া বশ্য। কিন্তু জীব যদি মায়ার প্রভু—কৃষ্ণের দাস হয়—তাহা হইলে মায়া আর তাহাকে সংসার জালে আবদ্ধ করিতে পারে না। যাহাতে পুনরাবৃত্তি নিষেধ হয়।

"চিৎকণ বিধায় জীব—তত্ত্বত এক। কারণ কৃষ্ণ চিৎস্বরূপ এবং জীব চিৎকণ স্বরূপ। তত্ত্বত অপৃথক হইয়াও—স্বরূপে ভিন্ন। কারণ চিৎ বিশেষ ধর্ম্মে অণুস্বরূপে নিত্য পৃথক। বিভু মায়াপতি—জীব তটস্থ স্বভাবে মায়িক জগতে মুক্তাবস্থাতেও মায়া বশ যোগ্য।

"সর্ব্বোপরি গোলক—যথায় কৃষ্ণ স্ববিশেষ মধ্যস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। তাহার বহির্ভাগে মহাবৈকুণ্ঠ—নারায়ণ ধাম। তাহার বহির্ভাগে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধ লোক—তাহার বহির্ভাগে—বিরজা নাম্নি চিন্ময় বিলাস কারণার্ণব। সেই কারণার্ণব মহাবৈকুণ্ঠগত প্রদেশ, প্রাকৃত গুণ শূন্য —অপ্রাকৃত সত্ব।

"রশ্মি যেমন রবির অন্তর দেশ হইতে তাহার বহির্দেশ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়—তেমনি চিচ্ছক্তি বিলাস বিরজা পারে—মহাবিষ্ণু দ্বারে জীবের, অন্ধকার রূপ মায়ায় প্রবেশ। কারণ বিরজা বহির্দেশই ত্রিগুণ মায়া। অতএব একদিকে বিরজা এবং এক দিকে ত্রিগুণ মায়া বিধায়—জীবশক্তি তটস্থ।

"চিৎশক্তি পূর্ণ—মায়া শক্তি অনন্ত। কিরণ যেমন অনন্ত—তেমনি কিরণরূপ জীবশক্তিতে প্রকট—কিরণ পরমাণু অনন্ত জীব। অণু বিধায় অতি সূক্ষ্ম।

"তটস্থ শক্তির স্বভাবও—তটস্থ। যে অবলম্বন প্রাপ্ত হয়—সেই ভাবই ধারণ করে। সেই তটস্থ স্বভাবে জীব প্রকট বলিয়া জীবেরও স্বভাব—তটস্থ। সে জন্য জীব যদি চিৎ অবলম্বন পায়—কৃষ্ণোন্মুখী হয়—তাহা হইলে কৃষ্ণ শক্তিতে তটস্থ স্বভাবে চিৎস্বরূপে—চিন্ময় জগতে অবস্থিতি করে। যদি কৃষ্ণ বিমুখ হয়—মায়া শক্তিতে মায়া স্বরূপে —মায়া জগতে—বদ্ধ ভাবাপন্ন হয়।

"অতএব জীবের চিৎকণ স্বরূপে—মায়ার গন্ধ মাত্র নাই। কৃষ্ণ বিমুখ হওয়ায়—অণুবিধায়—মায়ার বশ্যতা স্বীকারে—মায়াগত ত্রিগুণ শৃঙ্খলে স্থূল, লিঙ্গ দেহে—জীব বদ্ধ।

"চিৎশক্তির যেমন সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী নাম্নি তিনটী প্রভাব —তেমনি জীবশক্তিরও ওই তিনটী প্রভাব আছে। তাহা হইতে প্রকট অণু জীবেরও—অণু সন্ধিনীগত তাহার অণু চৈতন্য, অণু সম্বিৎগত তাহার অণু ব্রহ্মজ্ঞান, এবং অণু হ্লাদিনী গত তাঁহার অণু ব্রহ্মানন্দ।

"অতএব জীবশক্তি হইতে—জীবের প্রকট। চিৎ শক্তি হইতে যাঁহাদের প্রকট—তাঁহারা নিত্য সিদ্ধ—পূর্ণ। কারণ চিৎ—মণ্ডলস্থ শক্তি

বিভায়—পূর্ণ শক্তি। জীবশক্তি—পরাপ্রকৃতি হইলেও কিরণ স্থানীয় বলিয়া অপূর্ণ শক্তি। চিৎশক্তির পূর্ণ কার্য্যে—নিত্য সিদ্ধগণের প্রকট। জীবশক্তির অণুকার্য্যে—অণু জীব সকল। পূর্ণ কার্য্যে—মার্ত্তণ্ড রূপ কৃষ্ণের—রবিরূপ চিৎ জগত। তথায় স্বরূপ শক্তির হ্লাদিনী—কৃষ্ণের প্রিয়ঙ্করী মহাভাব রূপা—তাঁহার কায়ব্যূহ—অষ্টভাবরূপ অষ্ট সখি—ও সেবা ভাব রূপা—প্রিয়সখি—নর্ম্মসখি—প্রাণসখি—পরম প্রেষ্ঠ সখি ও তদানুসঙ্গিনীগণ—ব্রজের নিত্য সিদ্ধ। জীবশক্তিরও রশ্মিরূপ—জীব জগৎ। জীব জগতে প্রকট জীব—নিত্যসিদ্ধ নয়। সাধনে জীব—সিদ্ধ হয়। সিদ্ধে—নিত্য সিদ্ধের ভাব ধারণ করে। অতএব জীব—স্বরূপ অবস্থায় সাধন সিদ্ধের মধ্যে গননীয়।

"কৃষ্ণ এক এক শক্তিতে অধিষ্টিত হইয়া—এক এক স্বরূপ প্রকাশ করেন। চিৎ স্বরূপে—কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম নাথ নারায়ণ। জীবশক্তিতে —বলদেব। মায়া শক্তিতে—বিষ্ণুর স্বরূপ ত্রয়—অর্থাৎ কারণোদক-শায়ী—গর্ভোদকশায়ী—ক্ষীরোদকশায়ী স্বরূপে প্রকটিত। কৃষ্ণ স্বরূপে ব্রজের সমস্ত চিৎ ব্যাপার প্রকট করেন। বলদেব—কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ —বিলাসমূর্ত্তি। আদ্য কায়ব্যূহ। পঞ্চ রূপে ইনি—কৃষ্ণ সেবায় তৎপর। একরূপে কৃষ্ণ সেবায় থাকিয়া—চারি রূপে কৃষ্ণের সৃষ্টি লীলায় প্রকটিত। কৃষ্ণ সেবায় বলদেবগত মূলসঙ্কর্ষণ রূপে—ব্রজের অষ্ঠ সেবার জন্য—অষ্ট প্রকার পার্শদ—জীব নিচয়কে প্রকট করেন, এবং পরব্যোমে মূলসঙ্কর্ষণের বিলাসরূপ—মহাসঙ্কর্ষণ রূপে—নারায়ণ স্বরূপের অষ্ট সেবার জন্য—অষ্ট প্রকার পার্শদ সেবক প্রকাশ করেন।

"নারায়ণধামগত মহাসঙ্কর্ষণের অবতার—মহাবিষ্ণু, পরমাত্মারূপে —মায়িক জীবকে প্রকট করেন। মায়াগত অনন্ত জীব—যে পর্য্যন্ত না চিদ্বল প্রাপ্ত হয়—ততদিন ত্রিগুণের অনুগত এবং মায়া প্রবণ।

"জীব নিত্য—অতএব জীবের চিৎকণ স্বরূপের চক্ষুও নিত্য। সেই স্বরূপ চক্ষু মায়া আবরণে আবৃত হওয়ায়—সে মায়া চক্ষে—কথন প্রকট—কথন অপ্রকট দেখে মাত্র—নচেৎ জীব মায়া প্রকৃতির উৎপত্তি বিনাশশীল বস্তুর ন্যায় নহে।

"যেমন—মায়া দেহ হস্ত পদাদি চক্ষু কর্ণে শোভিত—তেমনি চিৎকণ ময় জীবের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরাদেহ আছে—তাহাই জীব স্বরূপ। সেই স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বিধায়—কৃষ্ণ বিমুখে—তাহা তটস্থ স্বভাবে মায়াগত হওয়ায়—মায়া গত দুইটি ঔপাধিক শরীর—তাহাকে আবৃত করিয়াছে। যে মনময় ঔপাধিক শরীর—মুক্তি অগ্রে মরণেও স্খলিত হয় না—তাহাই লিঙ্গ শরীর। তাহা স্থূল শরীর—এই দৃষ্টদেহ সংগ্রহের কারণ। মরণে—এই স্থূল শরীর ত্যাগে—কর্ম্ম বাসনাময় সূক্ষ্মশরীর—কর্ম্ম বাসনা অনুযায়ী দেহান্তর লাভ করে। ইহাকেই জীবের জন্ম বলে, এবং তাহাতেই জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হয়। এই সূক্ষ্মশরীর ধংশেই—জীবের মুক্তি বা স্বরূপ প্রকাশ।

"স্থূল শরীরগত জ্ঞানই—আপাতঃজ্ঞান। সে জ্ঞানে লোক সংসারে বদ্ধ —অতএব তাহা অজ্ঞান। সূক্ষ্ম বা মনময় লিঙ্গশরীরগত জ্ঞানই—আধ্যাত্মিকজ্ঞান; এবং স্থূল, সূক্ষ্ম অতীত স্বরূপ গত জ্ঞানই—চিৎগত জ্ঞান বা দিব্য জ্ঞান। স্থূল, লিঙ্গে আবৃত হইয়া জীব, দিব্য জ্ঞান অভাবে—আপাতঃ জ্ঞানে তাহার স্ব স্বরূপ যে মায়া প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই সে প্রকৃতি গত রাশিস্বরূপকে—স্ব স্বরূপ মনে করিয়া প্রকৃতির বশ্য হইয়া প্রকৃতির অভাব পূরণেই ব্যস্ত।

"পৃথক চেতনা ধাতুরও পুরুষ সংজ্ঞা—আবার আকাশাদি পঞ্চভূত এবং চেতনার সমবায়কে পুরুষ বলা যায়। এই ভূতগত চৈতন্যকে রাশিপুরুষ এবং ভূতাতীত চৈতন্যকে পুরুষ বলা যায়। বেদান্ত এই পুরুষকে জীব নামে অবিহিত করেন। আবার আত্মাও বলা যায়। অতএব আত্মা দ্বিবিধ—পরমাত্মা এবং জীবাত্মা। পরমাত্মা পরম পুরুষ এবং জীবাত্মা পুরুষ। পুরুষই জীব পদ বাচ্য। বদ্ধাবস্থায়—জীব, জীবন্মুক্ত অবস্থায় মুক্ত জীব বা শিব, চিজ্জগতে স্বরূপ জীব।

"মন, দশ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ পঞ্চ ভূত এবং মূল, মহৎ, অহঙ্কার, ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ইহাতেই পুরুষের চতুর্বিংশতি অঙ্গ বলা যায়। জ্ঞানের ভাব এবং অভাব—মনের লক্ষণ। মনযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না। অতএব মন স্বতন্ত্র। অণুত্ব ও

একত্ব—মনের দুইটী গুণ। যাহা চিন্তা করা যায় এবং জ্ঞেয়—তাহাই মনের অর্থ। ইন্দ্রিয় চালনা ও নিজের চালনা—মনের দ্বিবিধ কর্ম্ম। মনের নিশ্চয় অবস্থাই—বুদ্ধি।

"গুণ যাহার আছে সে গুণী। শব্দাদি গুণ সকলকে—ইন্দ্রিয়ার্থ বলে। গুণ সকল ইন্দ্রিয় গোচর হইলে—ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলে। যে ইন্দ্রিয় আশ্রয়ে—যে জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়—তাহাকে সেই ইন্দ্রিয় গত বুদ্ধি বা জ্ঞান বলে। মনোভব জ্ঞানকে, মনের জ্ঞান বলা যায়। কার্য্য, ইন্দ্রিয়, অর্থ ভিন্ন ভিন্ন—সে জন্য জ্ঞানও নানা প্রকার।

"এইরূপ সংযোগজ জ্ঞানে লোক অন্ধ। নচেৎ আত্মা—অজ্ঞ নহে—জ্ঞ। করণ সংযোগে ইঁহার—জ্ঞান। করণ শব্দে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ। করণের শুদ্ধতার ইতর বিশেষে, জ্ঞানের ইতর বিশেষ হয়। অযোগে মায়া জ্ঞানের লোপ হয়। কর্ত্তার সহিত করণের যোগেই কর্ম্ম—কর্ম্মেই সুখ দুঃখ রূপ ইন্দ্রিয় জ্ঞান। জীব একাকী কর্ম্ম করিতে পারে না—এবং একাকী ফলভোগ ও করে না। সংযোগেই সমস্ত সিদ্ধ হয়।

"পুরুষ অনাদি নিত্য; এবং সংযোগজ বা রাশিজ পুরুষ—হেতুজ। যাহা হেতুজ তাহাই ব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত—তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যাহা অব্যক্ত তাহা অতীন্দ্রিয়। মুল প্রকৃতি ভিন্ন আর সমস্তকেই ক্ষেত্র কহে। অব্যক্ত পুরুষই অর্থাৎ পরমাত্মা বা মুক্ত জীব উভয়েই—ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রে ব্যক্ত হইয়া রাশিজপুরুষ—রজস্তমঃ আবর্ত্তনে বার বার জন্ম, মৃত্যু ভোগ করে।

"মন অচেতন। আত্মাই ইহার চেতয়িতা। আত্মা অধিষ্ঠিত মনেরই ক্রিয়া। তটস্থ স্বভাবে মনে অস্মিতায়, মনের ক্রিয়াই আত্মার ক্রিয়া হয়। কারণ অচেতন, কর্ত্তা হইতে পারে না। এই রূপে কর্ম্ম দ্বারে জীবাত্মা আপনিই আপন কর্ম্ম সূত্রে জড়ে বদ্ধ হন। চিৎস্বভাবে পরমাত্মা বা স্বরূপ জীব, জড়ে স্থিতি করিয়াও—নির্লিপ্ত।

"এই রূপ কর্ম্ম ফলেই জীবাত্মা, আপনাকে সর্ব্ব যোনিতে প্রেরণ করেন। ইচ্ছা না থাকিলেও শেষে—কর্ম্ম ফলই তাঁহাকে চক্রবৎ নানা যোনিতে ভ্রমনে বাধ্য করে। এই রূপে জীব, আপন শুভাশুভ কর্ম্মে,

শুভাশুভ ফলভোগ করে। তাই বলিতেছিলাম—সুখ, দুঃখের অন্ত নাই। জীব যখন বার বার—সংসার ভ্রমনে ত্যক্ত হইয়া প্রকৃতি অতীত স্ব স্বরূপ লাভে উন্মুখ হয়, তখন নিজের অপরাধ স্মরণ হয়—সে স্মরণে তাহার কৃষ্ণ দাসত্ত্য ভাব উদয় হয়—সে উদয়ে কৃষ্ণের কৃপা হয়—সে কৃপাতে সে ত্রিগুণ ত্যাগে বল প্রাপ্ত হয়—সে বলে স্বরূপ প্রকাশে কৃষ্ণ দাস্য রসে সমস্ত অনর্থ দূর হয়। অনর্থ দূর না করিতে পারিলে—সংসার তাকাইয়া সুখের চেষ্টা বৃথা। সংসার নিত্য বিভিষিকাময়। বিষ বৃক্ষের মূল উৎপাটন কর—অমৃত বৃক্ষ রোপন কর—নচেৎ বিষবৃক্ষের অনন্ত পল্লব। পল্লব কাটিয়া বিষের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিবে না। মূল থাকিলে —এক কাটিবে এক অঙ্কুরিত হইবে। কিন্তু বিষ-ক্ষেত্রে অমৃত-বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইবে না। অমৃত-ক্ষেত্রে সংসার অমৃত ময়—তাহাই কৃষ্ণের সংসার। কৃষ্ণের সংসারে—কৃষ্ণের দাস্যে অনন্ত সুখ। তবে আত্মনাশ নির্ব্বাণে প্রয়োজন কি? যাঁহারা—সে সংসার লাভ করেন নাই—তাঁহারাই এক চক্ষু হইয়া সংসারকে—বদ্ধ জীবের কারাগার বলিয়াই জানেন। সংসার যেমন বদ্ধ জীবের কারাগার—তেমনি মুক্ত জীবের—কৃষ্ণ সেবা স্থল। তাই সাধু বলিয়াছেন :—

"অদ্যাবধি নিত্য লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

জীবসুন্দরের চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে। আর যেন হৃদয়—আনন্দ রসে দ্রব হইয়া যাইতেছে। হরসুন্দর বলিলেন, "সাধন গত ওই আনন্দ সমুদ্র ভেদ করিতে পারিলেই—শক্তি মূর্দ্ধাভেদে জড় শূন্যে মূর্ত্তিমতি হইবে—তখন জড় আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

জীবসুন্দর আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল—হৃদয় আনন্দ স্ফুর্ত্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল। যে দেশে যোগমায়া—সে দেশে আর জীবসুন্দর নাই—অতএব যোগমায়ার কথা আর তুলিবে কে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্নের পর দেবেন্দ্রের মাতা—নটনারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নটনারায়ণ আসিলে বলিলেন—"বুড়া হইয়াছি—নর-নারায়ণের ভাবগতিক দেখিয়া আর কিছু ভাল লাগে না। মনে করিতেছি—একবার ঠাকুরদের কথা দিই—তুমি কি বল ?"

নটনারায়ণ বলিলেন—"সেত ভাল কথাই—সুখের বিষয়। দেবেন্দ্রও বলিয়াছিল বটে।"

দে—মা। কাশির বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত নাকি—এখানে কোথায় আসিয়াছেন—দেবেন্দ্র তাঁহার কথাই বলিতেছে।

নট। তিনি পাঠ করিতে পারিবেন বটে—কিন্তু আপনারা কি—তাহা বুঝিতে পারিবেন ? অনেক পুরুষেই তাহা বুঝিতে পারে না। বিশেষ—আজ কালকার ছেলেদের ত তাহা ভাল লাগিবে না।

দে—মা। কেন ?

নট। কথকথায় অনেক রঙ্গ ভঙ্গ থাকে। হাসাইবার কাঁদাইবার জন্য—কথক মহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সেরূপ শ্রোতার জন্য পাঠ নহে—এবং পাঠের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। এ পল্লিগ্রামে—সেরূপ শ্রোতা কে ? তবে দুই পাঁচজন হইতে পারে।

দে—মা। একবার ভাগবতের কথা হইয়াছে—সেজন্য দেবেন্দ্রের তাহাতে মত নহে। যাহা তাহার মত—তাহাই হউক।

নট। হউক—তাত সুখের বিষয়। কিন্তু বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের দ্বারা পাঠ—তত সুবিধা হইবে না। অন্য কাহাকে ঠিক করিলে হয় না ?

দে—মা। কেন ? তিনি কি ভাল পারিবেন না।

নট। পারিবেন। কিন্তু ভাগবতে ভক্তি তত্ত্বের কথা—ভক্তিমার্গের লোক দ্বারায় পাঠ হইলেই ভাল হয়—তাহাই আমার ইচ্ছা।

দে—মা। সে আবার কি রকম ?

নট। সে আপনি বুঝিবেন না।

দে—মা। তবে তুমি দেবেন্দ্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বল। তোমার কথা ভিন্ন—ও কাহার কথা শুনিবে না।

তখন দেবেন্দ্রকে ডাকা হইল। দেবেন্দ্র আসিলে—নটনারায়ণ বলিলেন—"যদি পাঠ দেওয়াই তোমার মনস্থ হয়—তবে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতকে দিয়া পাঠের দরকার নাই।"

দে। কেন?

নট। ভাগবৎ ভক্তিগ্রন্থ। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত—শঙ্কর দর্শনের পণ্ডিত—জ্ঞানী। তাঁহার দ্বারায় কি—এ কার্য্য ভাল হইবে?

দেবেন্দ্রের বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের উপর বড় ভক্তি। নটনারায়ণের কথায় তিনি দুই একটা বাদ—প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না—বুঝিবার জন্য আমায় ঐরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে হইতেছে।" নটনারায়ণও তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া—বুঝাইতে লাগিলেন। শেষ দেবেন্দ্র বলিলেন—"শঙ্করকে লোকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ করে—তাঁহাকে মান্য দিতেছেন না কেন?"

নট। শঙ্কর—ভগবানের অবতার—তাহা স্বীকার করি। ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর—দুই রূপে উপদেশ দেন। একরূপে কেবল বর্ত্তমান সময়োচিত ধর্ম্ম উপদেশ দেন—আর রূপে নিত্যধর্ম্মের উপদেশ দেন। এই ভারতবর্ষে এমন এক দিন আসিয়াছিল—যে, সনাতন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মে—অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছিল। ভক্তিহীন চিত্তকে ফিরাইতে জ্ঞান শক্তি ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই—কারণ ভক্তি শুদ্ধ হৃদয় ভিন্ন উদয় হন না। সেই জন্যই শিব—শঙ্কর রূপে উদিত হইয়া—এ জ্ঞানতত্ব প্রসঙ্গ করেন। যাহাতে একদিন—বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ প্রায় হওয়াতে—আজ অবধি বৌদ্ধ ধর্ম্ম—লুকাইত ভাবে। ইহার নাম মায়াবাদ। মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম্ম নহে। ইহাতে বৌদ্ধ মতের গন্ধ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মতকে—অঙ্কুর ভাবে নীত করিয়া—আসুরিক ভাবকে দমন করাই ইহার উদ্দেশ্য। নচেৎ—একেবারে বৌদ্ধ মতকে নিরঙ্কুর করিতে গেলে—তাহারা তখন একেবারে ভক্তিতত্বে আসিতে পারে না—

তাহাতে তাহারা ভ্রষ্ট হয়—এই জন্যই শঙ্কর রূপে এ কার্য্য। আসুরিক স্বভাব নষ্ট হইলে—অবশ্য ভক্তি তত্ত্বে তখন দৃষ্টি পড়িবে, এবং তাঁহাতে সে বৌদ্ধ ভাব নিরঙ্কুর হইবে। সাধারণ জ্ঞানে—ইহার অধিক ঈশ্বর কার্য্য আলোচনা হয় না। মায়াবাদীর মুখে ভাগবৎ শ্রবণ করিতে নাই। মায়াবাদী কেবল সূত্রের গৌণ ব্যাখ্যা করেন। কারণ তাঁহার হৃদয় ভক্তি শূন্য। তাই বলিতেছিলাম—বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত এ কার্য্যের উপযুক্ত নহেন। যাঁহার ভক্তি আছে—এরূপ ব্যক্তিকে মনোনীত কর।

দে। পূর্ব্বকাল হইতেই—অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাইত—এ পথের পথিক দেখিতে পাই। আমরা শঙ্কর দর্শনানুযায়ী দুই চারি খানি পুস্তক পড়িয়াছি বটে—তবে তাঁহার সম্যক ভাব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আপনি বিশেষ রূপে আমায় আজ বুঝা-ইয়া দিন—কি কি বিষয়ে—তাঁহার মতকে আপনি বেদানুযায়ী না বলেন।

নট। আর এ জ্ঞানকাণ্ড আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি নাই। অনেক দিন আমিও ইহায় মুগ্ধ ছিলাম—কিন্তু জ্ঞানানন্দ আমার সে চক্ষু ফুটাইয়াছেন। তিনিও প্রথমে—এই অদ্বৈত মার্গে ফিরিয়াছিলেন—কিন্তু এখন আর তাঁহার—সে মতি নাই। ইহা জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যবর্ত্তি হইলেও—বেদ সম্মত জ্ঞানকাণ্ড নহে। কেন সম্মত নহে—তাহা বলিতেছি। ইঁহার মতে জীব ও জগৎ সমস্তই ভ্রম—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। সেই ব্রহ্মই—বিদ্যায় ঈশ্বর রূপে এবং অবিদ্যায় জীবরূপে প্রতিবিম্বিত। এইরূপ জ্ঞানে তিনি—বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্য অন্য ভাষ্যকার—রামানুজ—মধ্বস্বামী বা বল্লভাচার্য্য—অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার হৃদয়ের ভাব যেরূপ—তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সেই ভাবেই করিয়া থাকেন। অতএব বেদ সূত্রের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে—তাহা বেদ সম্মত—তাহা হইতে পারে না। অহংব্রহ্ম জ্ঞানে ভক্তি দূরবর্ত্তি হয়। উপাস্য উপাসকের ভাব ভঙ্গ হয়। নিরস কর্কশ জ্ঞানে হৃদয় নিরস করে। স্ববিশেষ

চিৎসুখে বঞ্চিত করে। চিৎকণ—সবিশেষ আত্মাকে নির্ব্বিশেষে নীত করে। ইহা অপেক্ষা জীবের আর সর্ব্বনাশ কি? নচেৎ—নিত্যানিত্য বিবেকে—বৈষ্ণবের সহিত শঙ্করের কোন্ প্রাতিকূল্য ভাব নাই। বেদ বলেন, ঈশ্বর—মায়ায় প্রভু, জীব—কৃষ্ণের দাস। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে নিঃশক্তি কল্পনা—শুষ্কজ্ঞান তত্ত্বেই হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানমার্গেই জীবেশ্বরে—অভেদ উল্লেখ। অতএব সে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকে—কোন প্রাতিকূল্য ভাব না থাকিলে, জ্ঞানমার্গের সাধন বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে। কারণ—জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়—ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। ভক্তির ভজনে চিৎসুখ প্রাপ্তি, জ্ঞানে বহুজন্মে চক্রবৎ ভ্রমণে নির্ব্বাণরূপ—আত্ম সর্ব্বনাশ প্রাপ্তি। সে নির্ব্বাণে ফল কি? জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম—নিরাকার। নিরাকারের প্রতিবিম্ব কি? যাঁহাদের বস্তুজ্ঞান আছে—তাঁহারা বিদ্যাড়ম্বরের তর্ক ছটায় মুগ্ধ হন না। যাহাতে পরতত্ত্ব নির্ণয় হয়—তাহাই পরবিদ্যা। যাহাতে মায়াতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াও, পরতত্ত্ব নির্ণীত হয় না—তাহা বিদ্যা হইলেও—অবিদ্যা গত। এই জন্যই জ্ঞানে মুক্তি—নির্ব্বাণেই পর্য্যবসিত হয়? যদি এ বিষয় অধিক জানিতে চাও—তবে মাধ্বাচার্য্যের "শত দূষণী গ্রন্থে" দেখিবে—অদ্বৈতবাদীর ভ্রম কত সূক্ষ্মে জড়িত। সাধারণ সে সূক্ষ্ম স্থল দেখিতে না পাইয়া—আপাতঃ জ্ঞানের আড়ম্বরেই ভ্রান্ত। তাহাও অবিদ্যার খেলা।

দে। অন্যের ব্যাখ্যা যে সত্য—তাহার ঠিক কি?

নট। না হইতে পারে। তাহা দেখিবার প্রয়োজন কি? বেদান্তসূত্র প্রণেতা বেদব্যাস—আপনিই শ্রীমদ্‌ভাগবতে—আপনার ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের সহিত ঐক্য হয়—তাহাই বেদান্ত সূত্রের—উত্তম ব্যাখ্যা। শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঐক্য নাই। কেবল শুষ্ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ।

দে। আমায় সংক্ষেপে শাঙ্কর দর্শন বলুন।

নট। বার বার বলিতেছ—তাই বলিতে হইবে—নচেৎ ইহাতে আর আমার ইচ্ছা নাই। শাঙ্কর দর্শন বলিয়া একখানি পুস্তক নাই—তবে তাঁহার মতকেই শাঙ্কর দর্শন নামে নির্দ্দেশ করিতেছি। শঙ্কর

প্রণীত বা তাঁহার মতাবলম্বীদের পুস্তক—অনেক। তাহার অধিকাংশ পাঠে—আমার যেরূপ শাঙ্কর দর্শনের ভাব হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছে—তাহাই বলিতে পারি এবং বলিব। বোধ হয়—তাহা ভুল না হইতে পারে।

“কর্ম্ম ভিন্ন যখন—জ্ঞানের উদয় নাই—তখন জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে—তাহার অগ্রে অধিকারী হওয়া উচিত। অতএব ইহ জন্মেই হউক বা পূর্ব্ব জন্মেই হউক—যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অপেক্ষাকৃত সফল কাম—তাঁহারাই জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী। এ ভিন্ন সফল কাম হওয়া দুষ্কর। অতএব তাহার প্রথম সাধন—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক—অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—আর সমুদয় জগৎ মিথ্যা। দ্বিতীয়—ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ অর্থাৎ ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ ভোগে বিরাগ; তৃতীয়—শম দমাদি ষট্ সম্পৎ অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষড়্ বিধ; চতুর্থ—মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষ ইচ্ছা। এই সাধন চতুষ্টয়ে যিনি সকল কাম, তিনিই ব্রহ্ম জ্ঞানে অধিকারী।

“ব্রহ্ম সৎ বা সত্য স্বরূপ, চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ—অপরিচ্ছিন্ন—অদ্বিতীয়। তিনি নির্ধর্ম্মক, স্বয়ং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। জ্ঞান বা সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম তাঁহাতে নাই।

“যেমন এক মুখই—বস্তু ভেদে প্রতিবিম্বে—ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়, কেবল উপাধির ভেদেই ভেদ ব্যবহার—তেমনি সেই এক জ্ঞানই, উপাধি ভেদে ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট। অতএব সকল ব্যক্তির জ্ঞানই, সেই এক জ্ঞান —ভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের নামান্তরই—চৈতন্য, এবং এই চৈতন্যই —আত্মা।

“যখন জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের ভিন্নতা নাই—তখন চৈতন্যের সহিত—চৈতন্যের ভিন্নতা কোথায়? এবং আত্মাই বা ভিন্ন কি রূপে? ইহাতেই পূর্ণ চৈতন্য যে ব্রহ্ম—তাঁহার সহিত যে জীবাত্মার ঐক্য—তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার মূল মহাবাক্য—তত্ত্বমসি। কিন্তু বেদে মহাবাক্য বলিয়া—কাহারও উল্লেখ নাই। বেদে যাহা আছে—তাহাই সকলের চক্ষে মহাবাক্য। কেবল নিজ মত সমর্থনের জন্য—তিনি

একটী বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া—অন্য গুলিকে ক্ষুদ্র মধ্যে নীত করিয়াছেন।

"ষড়্‌বিধ বিকার—যথা জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপচয়, বিনাশ রূপ কোন বিকারেই—আত্মা বিকারী নহেন। তিনি সর্ব্বত্রে দেদীপ্যমান এবং আনন্দ স্বরূপ। আত্মার প্রীতির নিমিত্তই—বিষয়ে স্নেহ জন্মে। অন্যের জন্য কেহ—আত্মাকে স্নেহ করে না। ইহা সতঃসিদ্ধ ভাব। যদি বল—আত্মা আনন্দ স্বরূপ—তবে তাঁহার প্রীতির জন্য বিষয় অনুরাগের প্রয়োজন কি? তাহার কারণ এই—আত্মা অবিদ্যায় উপহিত হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার আনন্দ স্বরূপতায়—একেবারে যে প্রতীতি নাই—তাহাও নহে—আবার সম্যক প্রতীতিও নাই—সেই জন্য আত্মার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; যে দিন সম্যক রূপে তাহা উপলব্ধি হইবে—সেই দিনেই মুক্তি।

"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তন্মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মোক্ষেই মুক্তি। সেই মুক্তি মহাবাক্য জ্ঞানের অধীন—যথা তত্বমসি। তৎ শব্দে—ঈশ্বর, ত্বং পদে—জীব, এবং অসি অর্থে—একত্ব। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীব—অভেদ রূপে জানিলেই মুক্তি।

"ঈশ্বর লক্ষণ দুই প্রকার, তটস্থ এবং স্বরূপ। তটস্থ লক্ষণে—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ, এবং স্বরূপ লক্ষণে—সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ। তৎ পদের অর্থ—দুই প্রকার। বাক্যার্থে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য—লক্ষ্যার্থে মায়া রহিত—শুদ্ধ চৈতন্য।

"মায়া কি? পরমব্রহ্মের একাংশের প্রতিচ্ছায়া—সত্ব, রজঃ এবং তমগুণের সূক্ষ্মাবস্থা—বা—সৎ বা অসৎ রূপে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বে যে পদার্থ—তাহাই মায়া। জগৎ কারণ বলিয়া—প্রকৃতি বা অজ্ঞান বলা যায়।

"সত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটী দ্রব্যের সাম্যাবস্থাই—প্রকৃতি। উপকরণ দ্রব্য বা যাহা বন্ধ ও মোক্ষের সাধন—তাহাকে গুণ বা অঙ্গ বলা যায়। কারণ প্রকৃতি, আত্মার সুখ দুঃখের উপকরণ দ্রব্য।

"এই অজ্ঞানের দুই শক্তি। জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি। রজঃ এবং তম রহিত কেবল সত্ব মাত্রকে—জ্ঞান শক্তি বা বিদ্যা বলা যায়। ক্রিয়া শক্তি দ্বিবিধা—আবরণ এবং বিক্ষেপ। রজঃ এবং সত্ব রহিত কেবল তমকে—আবরণ শক্তি, ও তম এবং সত্ব রহিত কেবল রজঃকে—বিক্ষেপ শক্তি বলে। যাহা হইতে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের উৎপত্তি এবং পরে এই দৃষ্ট জগৎ।

"ওই আবরণ শক্তি বিশিষ্টা অজ্ঞানই—অবিদ্যা। মেঘ যেমন সূর্য্য পক্ষে ক্ষুদ্র হইয়াও আমাদের চক্ষুকে আবরণ করে—আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই না—তেমনি যে বৃত্তিতে—যে বৃত্তি গুণে আমরা ব্রহ্ম স্বরূপ দেখিতে পাই না—তাহাই অবিদ্যা; এবং বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্টা অজ্ঞানই—মায়া।

"ভাবভেদে অজ্ঞানের দুইরূপ। এক রূপে সত্ব—রজঃ, তমে অভিভূত—তাহাই অবিদ্যা, এবং একরূপে অনভিভূত—তাহাই মায়া। এই মায়ায় উপহিত প্রতিবিম্ব চৈতন্যই—জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর পদবাচ্য; এবং অবিদ্যায় উপহিত চৈতন্যই—জীব বা প্রাজ্ঞ। অবিদ্যা নানা এবং তৎপতিত প্রতিবিম্ব—জীবও নানা।

"যেমন একসূর্য্য বহু পরিখায় প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা—তেমনি এক পরমাত্মা শরীর ভেদে বহুধা লক্ষিত। এই বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে যথাক্রমে—ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ, ও কারণ শরীর কহে।

"জ্ঞান বা মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর হইতে—মায়া দ্বারে প্রথমত আকাশ—আকাশ হইতে বায়ু—বায়ু হইতে তেজ—তেজ হইতে জল—জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ পদার্থকে—মহাভূত—সূক্ষ্মভূত—তন্মাত্র বা অপঞ্চিকৃত ভূত বলা হয়।

"কারণ—বীজ স্বরূপ। কার্য্য তাহার—ফল। বীজে যাহা থাকে—কার্য্যে তাহা ব্যক্ত হয় মাত্র। এই ন্যায় অনুসারে—অজ্ঞানের ত্রিগুণ, পঞ্চভূতকে আশ্রয় করে। কিন্তু পরিণাম ফলে—তমঃ গুণের আধিক্যই স্বীকার করিতে হইবে।

"এই পঞ্চভূতের ব্যষ্টি সত্ত্ব হইতে, এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, যথাঃ—আকাশগত সত্ত্বাংশে—শ্রোত্র, বায়ুগত সত্ত্বাংশে—ত্বক, তেজগত সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু—জলগত সত্ত্বাংশ হইতে রসনা, ও পৃথিগত সত্ত্বাংশ হইতে নাসিকা, এবং সমষ্টিতে অন্তঃকরণ। এই অন্তকরণের বৃত্তি ভেদে চারি রূপ। সংশয়ে মন—নিশ্চয়ে বুদ্ধি—অভিমানে অহংকার, এবং স্মরণে চিত্ত।

"পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন—যথাক্রমে দিক, চন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ. অগ্নি ও চতুর্ম্মুখাদি দেবতার অধিষ্ঠানে—যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস. গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশক হয়।

"পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশের ন্যায়, ব্যষ্টি রজোহংশে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, যথাঃ—আকাশগত রজোহংশে—বাক, বায়ুগত রজোহংশে—পাণি, তেজগত রজোহংশে—পাদ, জলগত রজোহংশে—পায়ু, এবং পৃথিবীগত রজোহংশে উপস্থ। ওই রূপ যথাক্রমে—বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার অধিষ্ঠানে—উহারা যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ রূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এবং রজোহংশ সমষ্টিতে প্রাণবায়ুর উৎপত্তি। এই প্রাণ বৃত্তি ভেদে, হৃদয়ে—প্রাণ, পায়ুতে—অপাণ, নাভিতে—সমান, নাসিকা উর্দ্ধে—উদান, এবং স্নায়ু মণ্ডলে—ব্যান।

"বুদ্ধি যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে—তখন বিজ্ঞানময় কোষ। মন যখন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যোগে—তখন মনোময় কোষ। প্রাণ যখন কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে—তখন প্রাণময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ—জ্ঞান ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি সম্পন্ন। মনোময় কোষ—ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট, এবং করণ স্বরূপ। প্রাণময় কোষ—ক্রিয়াশক্তিশালী এবং কার্য্য স্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন—এই সপ্তদশটি পদার্থে যে শরীর—তাহাকেই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর বলে। যতদিন না মুক্তি হয়—ততদিন এই লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান থাকে, এই জন্য ইহা ইহলোক ও পরলোক গামী। ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরে উপহিত চৈতন্য বা জীবকে—তৈজস, সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরে উপহিত চৈতন্ত বা ঈশ্বরকে—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মক সমষ্টিপ্রাণ ঈশ্বর কহে।

"মহাভূত যেরূপে স্থূলভূতে পরিণত হয়—তাহাকে পঞ্চীকরণ বলে। পঞ্চীকরণ যথা :—আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেক ভূতকে— ষোল ভাগ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ অষ্টভাগ—এক এক ভূতের থাকিয়া অপর চারি ভূতের দুই দুই অংশ পরিমাণে—অষ্ট অংশ সহিত মিলিত হইয়া—সাকল্যে ষোল অংশ একত্র হইয়া—এক এক ভূতের পঞ্চীকরণ হয়। এই রূপে প্রত্যেকটির ধরিয়া লইতে হইবে। এই স্থূলভূত হইতেই শব্দাদি পঞ্চ গুণের প্রকাশ। সূক্ষ্মভূতেরও—শব্দাদি গুণ আছে—কিন্তু সূক্ষ্ম বিধায় তাহা মানবের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না।

"আকাশের গুণ—শব্দ। বায়ুর গুণ—শব্দ, স্পর্শ। তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ। জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস। পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বায়ুতে শব্দ—অব্যক্ত, স্পর্শ—না শীত না উষ্ণ। তেজে শব্দ—'ভুগু ভুগু' অনুকরণাত্মক, স্পর্শ—উষ্ণ। জলে শব্দ—'চুলু চুলু' অনুকরণাত্মক, স্পর্শ—শীত, রূপ—শুক্ল, রস—মধুর। পৃথিবীতে শব্দ—'কড় কড়া' অনুকরণাত্মক, স্পর্শ—কঠিন, রূপ—নানা, রস—কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ, মধুর ; গন্ধ—সুরভি এবং অসুরভি।

পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণের ন্যায়—তেজ, জল, পৃথিবীর—ত্রিবৃৎকরণ হয়। পৃথিবী, জল ও তেজকে—দুই, দুই অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকের ওই এক এক সংখ্যাকে—আবার দুই দুই অংশে বিভাগ করিয়া পৃথিবীর অবশিষ্ঠ অর্দ্ধাংশে জলের ও তেজের এক এক সংখ্যা দিয়া মিশ্রিত কর এবং ওই জলের অর্দ্ধাংশে পৃথিবীর ও তেজের এক এক অংশ দিলেই—ত্রিবৃৎকৃত জল ও তেজের সৃষ্টি হয়।

"এই পঞ্চীকৃত, ত্রিবৃৎকৃত স্থূলভূত হইতেই উর্দ্ধ সপ্তলোক, যথা :—ভূর, ভুবর, স্বর, মহর, জনর, তপর, সত্য, এবং অধঃ সপ্তলোক যথা :—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল ও স্থূল শরীর এবং অন্নপানাদির উৎপত্তি।

"স্থূল শরীর চতুর্ব্বিধ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ। বৃক্ষাদিরও চৈতন্য আছে—এবং উঁহাদেরও পাপ, পুণ্য ভোগ করিতে হয়।

"জীব যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বিশিষ্ট জাগ্রত অবস্থায়—তখন তাহাকে বিশ্ব; সূক্ষ্ম ও কারণে স্বপ্নাবস্থায়—তখন তাহাকে তৈজস; এবং কেবল কারণ শরীরে সুষুপ্তিতে—তখন প্রাজ্ঞ বলা যায়। যখন এ তিন শরীরের অহংকার ত্যাগ হয়—তখন তিনি পরমাত্মা রূপে কথিত হন।

"এই জীবের পঞ্চ অবস্থা, যথা:—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, মরণ। পরমাত্মা যখন সমষ্টি স্থূলে—তখন বৈশ্যানর, যখন সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে—তখন হিরণ্যগর্ভ, যখন সমষ্টি মায়া কারণ শরীরে—তখন ঈশ্বর। এই স্থূল শরীরই—অন্নময় কোষ। অন্নপাকাদির দ্বারা রক্ষিত বলিয়াই উহাকে অন্নময় কোষ বলা হয়।

"শাঙ্কর দর্শন মতে—এই মায়াগত জগৎ সংসার স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা—পরম ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তবে যে মায়াগত স্থূল, সূক্ষ্মের বিচার—এ কেবল অজ্ঞ লোকদের মিথ্যা ভ্রম দূরীকরণ জন্য। কারণ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ভিন্ন জীবাত্মাই যে পরমাত্মা, পরমাত্মাই যে জীবাত্মা, এবং একমাত্র পরমাত্মাই যে নিত্য—তাহা উপলব্ধি হইবার নহে। যতদিন না নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকে জগতের অসত্যতা প্রতীয়মান হয়—ততদিন সংসার দশায় জগৎকে সত্য বলিতে হয়, এবং সেই ভাবেই জগৎ সৎ—তদন্তে অসৎ, অতএব উভয়ই বিরুদ্ধ নহে। এইরূপে যে কতদিন জগৎ চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। সে জন্য ইহার অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ যদিও জগৎ প্রলয়ে লীন হইতে শুনা যায়—কিন্তু পুনঃ সৃষ্টি প্রবাহে সে অনাদি ভাবেই বর্ত্তমান। যদি বল—যাহা জন্মে তাহা অনাদি হইতে পারে না, সেই স্থানে বুঝিতে হইবে, যে ওইরূপ ক্রমেই সংসারের অনাদিত্ব কল্পনা।

"এই লয় চারিপ্রকার। নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক, ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তিকে নিত্য প্রলয় বলে। কার্য্য ব্রহ্মার লয়ে ব্রহ্মাণ্ডের মায়াতে যে লয়—তাহাই প্রাকৃত লয়। এই লয়ে বিদেহ কৈবল্য লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্রহ্মার দিনাবসান নিমিত্তক যে লয়—তাহাই নৈমিত্তিক। এবং

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারে যে পরম মুক্তি—তাহাই আত্যন্তিক প্রলয়। এ প্রলয়ে আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ—বীজ নষ্টে আর উৎপত্তি কোথায়? প্রলয় এই রূপে সংঘটিত হয়—পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ জীবের অহংকারে, জীবের অহংকার হিরণ্যগর্ভের অহংকারে, এবং হিরণ্যগর্ভের অহংকার অজ্ঞানে লয় হয়।

"আমি বৈশ্যানর—কি আমি হিরণ্যগর্ভ—কি আমি ঈশ্বর—জীব এইরূপে উপাসনা করিলে—তাহাকে প্রাপ্ত হয়।

"এই উপাসনার তারতম্যে—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য—এই চারি প্রকার ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি বিবেক চতুষ্টয় বিহীন ও বিচার বিষয়ে অসমর্থ—তিনি গুরুর নিকট উপদেশে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলে শরীরে বা মরণাবস্থায়, অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে ফল প্রাপ্ত হইবেন।

"প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব ভেদে প্রমাণ ষড়্‌বিধ। বাহ্য বিষয়ে—চৈতন্যের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চৈতন্যের অভেদকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। এক চৈতন্য উপাধি ভেদে চারি প্রকার হয়, সে সকল বিচারের এ সময় নহে। এই প্রমাণ দ্বারা যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হয় বলিয়া এ স্থানে ইহার উল্লেখ করিতে হইল। লিঙ্গজ্ঞান অর্থাৎ হেতুজ্ঞান জন্য যে জ্ঞান—তাহাকে অনুমিতি বলা যায়। সাদৃশ্য জন্য জ্ঞানকে—উপমিতি কহে। বাক্য দ্বারা অর্থাবগতিকে—শব্দ বলে। অসিদ্ধ অর্থকে সিদ্ধ করণ জন্য ভূত অর্থান্তর কল্পনাকে—অর্থাপত্তি বলে। দর্শনোপযুক্ত বস্তুর না দেখা দ্বারা, সেই বস্তুর অভাব নিশ্চয় করাকে—অভাব প্রমাণ কহে। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ ভাবভেদে নানা রূপ। এই কয় প্রমাণের দ্বারায় যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হয়—এই জন্যই ইহার উল্লেখ মাত্র। ইহার দ্বারাই সংসারের যাবতীয় সুখ সম্ভোগাদির অস্থিরতা দেখিয়া পরম সুখস্বরূপ পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি ইচ্ছায়, জ্ঞানিগণ উহার উপায় স্বরূপ—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠানে ব্রতী হন।

"এইরূপে সমস্ত বেদান্তেরই যে তাৎপর্য্য ব্রহ্ম—তাহার অবধারণকেই —শ্রবণ বলে। ষড়্‌বিধ লিঙ্গের প্রথম লিঙ্গ—উপক্রম ও উপসংহার, দ্বিতীয়—অভ্যাস, তৃতীয়—অপূর্ব্বতা, চতুর্থ—ফল, পঞ্চম—অর্থবাদ, ষষ্ঠ —উপপত্তি। যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে—তাহার আদিতে ও অন্তে—সে বিষয়ের উৎকীর্ত্তনকে যথাক্রমে—উপক্রম ও উপসংহার কহে। ওই প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের—বার বার কীর্ত্তনকে অভ্যাস কহে। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের প্রমাণান্তর, অপ্রাপ্তিকে—অপূর্ব্বতা কহে। এবং তাহার অনুষ্ঠানের ফল শ্রুতিকে—ফল কহে। তৎ প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের তৎ প্রকরণে প্রশংসাকে—অর্থবাদ কহে। তৎ প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদনার্থ যুক্তির উপন্যাসকে—উপপত্তি কহে। এই রূপে অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের—বেদাদি সম্মত গুণ যুক্তি দ্বারা অনুদিন চিন্তনকে—মনন বলে। এবং বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধি ধারাকে —নিদিধ্যাসন বলে।

"সমাধি দ্বিবিধ। সমাধি বিষয়ে পাতঞ্জল দর্শনে বহুবিধ উপদেশ আছে। তাহাতেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অলঙ্কারের ন্যায় অণিমা প্রভৃতি বিভূতির উল্লেখ, এবং যেরূপে প্রারব্ধ ক্ষয়ে শরীর পতনান্তে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি রূপ পরম মুক্তি লাভ হয়—তাহা বিবৃত আছে, তাহা অন্য সময় বলিব।

"যেমন দ্রবীভূত স্বর্ণকে নানা ছাচে ঢালিলে—ছাচ অনুযায়িক সে রূপ ধারণ করে—তেমনি অবিদ্যাগত চিত্তরূপ ছাঁচে, আত্মা বিকার প্রাপ্ত হন। ওই চিত্ত ত্রিগুণাত্মক—তাহার ধর্ম্ম—সুখ দুঃখ মোহ—যথাক্রমে উপলব্ধ হয়। এ জন্য রজঃ, তমঃ নিবৃত্তিতে—সত্ত্বের বৃত্তি উৎকর্ষতাতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। উক্ত নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ, সাধন অনুষ্ঠানের যথা বিধি উপদেশ, সমস্তই পাতঞ্জল দর্শনে উল্লেখ আছে।

"জ্ঞানমার্গের এইরূপ আভাষ। ভক্তিমার্গ কিন্তু ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ভক্তিতে জ্ঞানগত মোক্ষ—নরক তুল্য। জ্ঞান, কর্ম্ম যোগে যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর

স্মরণ—তাহা কেবল সাধনাবস্থায়। সিদ্ধিতে তাহা নাই। অতএব তাহা-দের ওই কৃষ্ণ, বিষ্ণু—মায়াগত কল্পনা মাত্র। ভক্তি তত্ত্বে কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—নিত্য। এই জন্যই ভক্ত, ভক্তি যোগে—কৃষ্ণ দাস। সে মতে জীব দাস—ঈশ্বর প্রভু। জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ, ঈশ্বর এবং মায়ার অধীন। ঈশ্বর কৃপায়—ভক্তিতে সে মায়া উত্তীর্ণ হয়। জ্ঞানের যুক্তি সে দেশে গমন করিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণ শক্তিমান —শক্তি তাঁহার দাসী। তিনি নির্ধর্ম্মক নহেন—চিন্ময় গুণে গুণী। মায়া গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞান, কর্ম্ম যোগে তাঁহার চিৎজগৎ দৃষ্ট হয় না। তাই তাঁহারা চিণ্ময় গোলক—পর ব্যোমের সত্ত্বা—স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মই পরম তত্ব—বা তাঁহার মায়া অধিষ্ঠিত পরমাত্মাস্বরূপই পরম তত্ব—বোধ করেন। অতএব যিনি এই রূপ জ্ঞান মার্গে পণ্ডিত—তাঁহার ভক্তিতত্ব উপদেশে অধিকার নাই। তিনি যে সাধনে ব্রতী, ভক্তি সাধন তাহা হইতে স্বতন্ত্র। নরনারায়ণ এই ভ্রমেই হস্তের ধন ফেলিয়া আকাশ মুখাপেক্ষী বনবাসী।”

তখন নরনারায়ণ সম্বন্ধে নানা কথা উঠিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আদালতের বিচার গৃহে—উচ্চ আসনে ইন্দ্রনারায়ণ বারদিয়া বসিয়া আছেন। সন্মুখে শতাধিক মানব তাঁহার মুখ চাহিয়া আছেন।

নরনারায়ণের গৃহত্যাগে, ইন্দ্রনারায়ণের মনের ভাব—সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন হয়। হইবে না?—ভাই! হওয়াই উচিত। বিচারের একটা বিষম সমস্যা মাথায় আসিয়া ঘুরিতেছে, তাহার জন্য মাথাকে বড়ই খাটাইতে হইতেছে, এবং বেদনাও লাগিতেছে। ইন্দ্রনারায়ণ মনে মনে

ভাবিতেছেন—দাদা! সংসারের এত কর্ত্তব্য—মনের এত উচ্চতা ফেলিয়া অপদার্থ হইতে বনে কেন? আহা! বড় বৌয়ের কি দুঃখ! যৌবন কাল—বড় বিষম কাল। এ সকল কি চক্ষে দেখা যায়? অনেকেত ভৈরব ভৈরবী হইয়া থাকে—উহাকেও লইয়া গেলে না কেন—তাহা হইলেত চক্ষের ব্যথা আর থাকিত না? এগুলি কেবল আমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য তোমার এ বুদ্ধি। আর কোথায় সে দাঁড়াইবে? তার বাপের এইত অবস্থা—তাও যদি লিখিতে পড়িতে জানিতেন—বুদ্ধি ভাল হইত—না হয় একরূপ চলিত—তাই বা কই? কিরণশশীর সহিত আদৌ বনে না, তবে কাহার কাছে দাঁড়াইবেন? আর আমিই বা কিরণকে জেদ করিব কিরূপে—অসৎ সঙ্গ ত্যাগ মানুষের কর্ত্তব্য—ইহা একটি নীতি বিশেষ। কিরণশশী যদি সে নীতি জ্ঞানে, আমার কথা না শুনে—তবে আমার আর জোর কি?

ইন্দ্রনারায়ণের নিস্তব্ধতায় কিন্তু দর্শক মণ্ডলির মধ্যে বড়ই গোল হইয়া উঠিল। এ ইহার কাণে ও উহার কাণে, চুপি চুপি কতই কি বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ বলিতেছে—"হাকিমটি নূতন বটে—কিন্তু বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করেন, দেখিতেছ না—সেই অবধি ভাবিতেছেন?" আর একজন বলিল—"আরে নূতন হাকিম, এখন ওকে পাঁচ বৎসর শিখিতে দাও—তবেত শীঘ্র শীঘ্র বিচার করিবে।" আর একজন বলিল—"বড় কড়া হাকিম। আইনে যা বলে—তা ভিন্ন অন্য কথা নাই।"

ইন্দ্রনারায়ণের চমক ভাঙ্গিল। তখন চিন্তার ফল প্রকাশ পাইল। মন্তব্যের কাগজ খানি হাতে করিয়া বলিলেন—"তোমার নাম হরি পোদ্দার—তোমায় আদালত বলিতেছেন যে—তুমি নোটিশ পাইয়াও "লাইসেন্স" লও নাই। সে জন্য ৫ টাকা জরিমানা হইল।"

অমনি পিয়াদা "নফর দাস, নফর দাস হাজির" এই বলিয়া হাক দিল। নফর দাস উপস্থিত।

ইন্দ্র। তোমারও ওই কথা?

নফর। প্রতি বৎসর আমরা যে সময়ে "লাইসেন্স" লই, তাহার

অগ্রেই নোটিশ দেওয়া হয়, আমরা যথা সময়ে "লাইসেন্স" লইয়াছি।

ইন্দ্র। তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।

আবার পিয়াদা হাঁকিল, "বীর দাস হাজির" বীর দাস সাক্ষীমঞ্চে উপস্থিত হইতে না হইতেই—ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "তোমারও ওই কথা? তোমারও পাঁচ টাকা জরিমানা।"

বীর। না—আমি যখন নোটিশ পাই—তখন আমার গোলায় কাঠ আদৌ ছিল না। আর আমি ব্যবসা তুলিয়া দিয়াছি।

ইন্দ্র। তোমারও পাঁচ টাকা জরিমানা।

বীর। হুজুর—কাঠ আমার গোলায় আদৌ ছিল না।

ইন্দ্র। দশ টাকা জরিমানা।

বীর। হুজুর—আমি ব্যবসা ছাড়িয়াছি। সেই জন্যই লাইসেন্স লই-নাই।

ইন্দ্র। পনের টাকা জরিমানা!

বীর। হুজুর—আমার * * *

ইন্দ্র। কুড়ি টাকা জরিমানা।

তখন পিয়াদার একটু দয়া হইল। বীরচাঁদের হাত ধরিয়া সে নামাইয়া দিল।

আবার পিয়াদা হাকিল, "রাখাল দাস হাজির" রাখাল দাস উপ-স্থিত।

ইন্দ্র। তুমি এ বার্লি বিক্রয় করিয়াছিলে? কোন ভয় নাই—সত্য বল।

রা। হুজুর—আমরা লেখা পড়া জানি না। যা লোকে বলে পাঁচজনে যাহা আনিয়া বিক্রয় করে, তাই আমিও মহাজনের নিকট হইতে আনি—বিক্রয় করি। উহা যে আদত নহে—আর একজনের তৈয়ারি তাহাত জানি না—উহার উপরে অতি ছোট অক্ষরে আবার কার নাম লেখা আছে, তাহাত আমরা পড়িতে জানি না। তাই আমি সেই টীন হইতে ৵১২॥ পয়সার বিক্রয় করিয়াছি।

অমনি "ডিটেক্‌টিভ" মহাশয় টীনটি ইন্দ্রনারায়ণকে দেখাইবার জন্য

হস্তে হস্তে হাকিমের নিকট দিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—এক পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে নির্ম্মেতার নাম আছে মাত্র। নচেৎ আর সব—যে বার্লি বলিয়া বিক্রয় করিয়াছে—তাহারই মত। ভাবিলেন—এ সকল গুলি দেখাত আবশ্যক, বিলাতে দোকানদারেরাও লিখিতে পড়িতে জানে—এখানে লেখা পড়া শেখে না কেন? সেই জন্যইত এরূপ প্রতারণার প্রশ্রয়। ইহা বড় অন্যায়—এ প্রথা যাহাতে উঠে—আমাদের সে দিকে দৃষ্টি অবশ্য রাখা উচিত। প্রকাশ্যে বলিলেন, "রাখাল দাস। তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

রা। হুজুর—আমি বড় গরিব—পাঁচ টাকা কোথায় পাইব। পাঁচ টাকা আমার দোকান বিক্রয় করিলেও হইবে না।

ইন্দ্র। সাত টাকা জরিমানা।

এইরূপ নানা বিচারে অনেক আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ, ঘড়ি প্রতি নজরে সে দিন বিচার বন্ধ করিলেন। পথে আসিতে আসিতে জমিদার জ্যোতিঃপ্রসাদের মোক্তারের সহিত দেখা হইল। ইন্দ্রনারায়ণ পাল্কিতে শুইয়া শুইয়াই বলিলেন—"সে দিন বাবুর নিমন্ত্রণে যাইতে পারি নাই—বাবা তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, বিশেষ বাবার অমান্যত করিতে পারিব না। জমিদার বাবুর সহিত আমার "চারুচন্দ্রের" বাড়ীতে দেখা হইয়াছিল। জমিদার মানুষ. তাঁহার কথা রাখিতে হয়, মানির মান যাবে কোথায়? তা বাবু যাহা বলিতেছেন—উহাতে হইবে না,তাঁহাকে বলিবে * * *" এই রূপ কথায় কথায় গৃহে আসিতে সন্ধ্যা হইল। কিরণশশী তাড়াতাড়ি আসিয়া পাখায় হাওয়া করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "পাখা দাও—তোমায় কষ্ট দিতে আমার কষ্ট হয়। বাবার জন্য একটা বেশী চাকর রাখিবার যো নাই।"

কি। বাহিরে যেমন টানা পাখা করিয়াছ—এ ঘরেও তেমনি কর না কেন?

ইন্দ্র। দাঁড়াও—সেজন্য বাবার কত রাগ, আমায় চোর বলি-

তেও বাকি রাখেন নাই। আমি চোর কি সাধু—তাহা ত দেখিতে পাইতেছ?

নানা কথার পর—কিরণশশী আদরিণী ভাবে গড়াইয়া বলিলেন, "আহা! বড় দিদির একটা যদি ছেলেও থাকিত, তাহা হইলেও কথা থাকিত না—একরূপে দিন যাইত। তা এদিকে আবার কত ধর্ম্ম ভাব, যেমন তিনি—তেমনি ইনি। যে যেমন তেমনি ঈশ্বর করেন। বাপেরত যুগ্যাত্তা ওই—আবার বাপের বাড়ী যাবার জন্য আজ কয়দিন বড় ব্যস্ত। তা মা পাঠাইবেন কেন? সংসারের কাজ কি সামান্য। তোমাদের একটা ব্রাহ্মণী রাখা উচিত। কেমন—রাখিবে বল—তাহা হইলে আমি বুঝিব যে, তুমি আমায় ভালবাস। আমার রাঁধা কি ভাল দেখায়? তোমার মানের জন্যই বলিতেছি। আর পারিয়াও উঠি না—মেয়েটি হইয়াছে, তাকে একবার কোলে করিয়া আদর করিতে পারি না।"

কিরণশশীর মন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বেই একটী সন্তান হইয়াছে। নানা কথার পর আবার কিরণশশী বলিলেন "দেখিলে—খুকির কেমন পয়? নহিলে কি তুমি হাকিম হইতে পারিতে?" এই বলিয়া কিরণশশী রসে তন্ময়। ইন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন—সংসারই স্বর্গ। তখন চঞ্চলা আসিয়া দেখা দিলেন—বলিলেন, "বাবা! একটু জল খাও—সমস্ত দিন খাটিয়া আসিলে, তোমার মুখ তাকাইয়া আমি সংসারে এখনও আছি—নচেৎ আমি কি আর আমাতে আছি? নর আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে।" কিরণশশীকে বলিলেন, "দাও মা! একটু জল খাবার দাও। আমারত আর দাঁড়াইবার যো নাই—ব্যঞ্জন চড়াইয়া আসিয়াছি, এখনি পুড়িয়া যাইবে।"

ই। কেন? দিদি কি করেন? তবে ব্যঞ্জন পুড়িয়া যাইবে কেন?

এইরূপ নানা কথা বার্ত্তায় ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "মা! তোমাদের কষ্ট আমি দেখিতে পারি না, বড় কষ্ট হয়। এত বড় একটা সংসারের কাজ কি—দুইটা স্ত্রীলোক দিয়া হয়? বিশেষ একটা বই বাবা চাকর রাখিবেন না—আর ওই যে মাগিটা আছে—ও আর কি করে? কয়-

খানা বাসন মাজে—জল আনে বইত না। তাই বলি যখন আমরা মানুষ হইলাম—তখন একটা ব্রাহ্মণী রাখ, বুড়বয়সে আর খাটিয়া মরিবে কেন?"

চ। বাবা! চিরদিন এইরূপ ভুগিতেছি। আজ বউটি হইয়াছে, সে জন্য এ কথা বলিতেছ—এতদিন কে তাকাইয়াছিল বল? যে বৎসরে তোমার বিবাহ হয়—ছেলেটা হয়ে পেটেই মারা গেল, মেয়েটা শূল বেদনায় শয্যাশায়ী—তখন কতই বলিয়াছিলাম—তুমিও তখন কর্তার দিকে হইয়াছিলে। কেবল আমার নয় আমার দিকে হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে হয়—বলিব—আমায় কে দোষ দিবে বল? মন্দ কাযত করিব না, তা ভালইত—একটা ব্রাহ্মণী রাখ না—আর কি তোমাদের মা হইয়া রান্না ভাল দেখায়?

ই। আমি কি বারণ করিয়াছিলাম? সেটা তোমার বুঝিবার ভুল। বাবা টাকার সংব্যবহার জানেন না। এই দেখনা হরসুন্দর বাবুকে বোধ হয় টাকা চালিতেছেন। যাহারা খাটিয়া খাইতে পারে—তাহাদের ওরূপ প্রশ্রয় দিলে জগতের অনিষ্ট করা হয়।

চ। আহা! তাঁহাদের এ সময়ে এক আধটু সাহায্য না করিলে হইবে কেন? সেটা মন্দ করিতেছেন না। আমায় কে দোষ দিবে বল, সত্য বলিতেই হয়।

ই। তুমি ওসব বুঝ না। কিন্তু সকলতাতেই কথা কহিতে যাও। তাই স্ত্রী শিক্ষার বড় প্রয়োজন হইয়াছে। আর কি সে দিন আছে। এখন কর্তব্যের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে।

কিরণশশী চঞ্চলাকে বলিলেন, "তোমার যেমন কথা, উঁহারা লেখা-পড়া শিখিয়াছেন—পাস দিয়াছেন—কত বিচার করিতেছেন, উঁহারা কি বিচার না করিয়া কোন কথা কন?"

চ। কি জানি আমরা স্ত্রীলোক, অত বুদ্ধি আমাদের নাই—যা যুয় তাই কয়। আমার ও সব দিকে আর এখন তত নজর নাই—সব আমার মাথা খাইয়া গিয়াছে।

এই বলিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—

"আর সমস্ত দিন ওই ঘ্যান ঘ্যানানি সহ্য হয় না। সে জন্য কি আমাদের অনুতাপ হয় নাই? তাঁহার এ মূর্খতা নষ্টের জন্য, অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল—বাবাইত আদর দিয়া তাঁহাকে প্রশ্রয় দিতেন। নচেৎ আর ভাল লোকের সহিত বেড়াইলে কি এ বুদ্ধি হইত?"

চ। আমরা অজ্ঞানমেয়ে মানুষ—তবে বউটাকে দেখিলেই প্রাণটা জ্বলাইয়া যায়।

এই বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কিরণশশী বলিলেন, "মা! এই উনি খাটিয়া খুটিয়া আদালত হইতে আসিলেন। এত চাকরি নয় যে, কলম ফেলিলাম আর হইয়া গেল—ভাবিতে হয় কত? কেন আর উহাকে এখন বিরক্ত কর—একটু ঠাণ্ডা হইতে দাও।"

তবুও চঞ্চলা সে কথা শুনিতে চাহেন না। কিরণশশী বলিলেন, "তোমার ওই দশাতেইত বড় ঠাকুর সংসার ছেড়ে চলিয়া গেলেন।"

এই বলিয়া কিরণশশী আর সে স্থানে দাঁড়াইলেন না। ইন্দ্রনারায়ণও কিঞ্চিৎ জল যোগের পর বাহিরে দেখা দিলেন।

দেবেন্দ্র বাহিরে বসিয়াছিলেন—বলিলেন, "কি—আজ যে এখনি বাহিরে এলে—এর মধ্যেই বিশ্রাম হইয়া গেল?"

ই। না হে না। দাদার জন্য মা কাঁদিতে ছিলেন—তাই বুঝাইতে ছিলাম। দাদার জন্য কি আমাদের অনুতাপ হয় নাই? বৃথা কাঁদিয়া ফল কি?

দে। তা আর হয় নাই! আমার পর্য্যন্ত কাল ফিতা উঠিল। করিবার মধ্যে কেবল একটা সভা করিয়া কিছু অনুতাপ করা। তাওত করা হইয়াছে—আর অনুতাপটা উচিত বলিয়াই করা উচিত। কাঁদিয়া ফল কি?

ই। দেবেন্দ্র! জান—আর আমি সে ছেলে মানুষটী নাই। আর এরূপ কথায় (personal attack) পারসোন্যাল এটাক হয়?

দেবেন্দ্রের আর সে দিন নাই। তবে স্বভাব যাইবে কোথায়? সেই জন্যই এরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন। নচেৎ নরনারায়ণের গৃহত্যাগ অবধি, তাঁহার আর এ সকলে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ হয় না। পূর্ব্বে

ইন্দ্রনারায়ণ গালি দিলেও দুঃখিত হইতেন না—আর এই সামান্য কথায় তাঁহার বড় দুঃখ হইল। মনে মনে ভাবিলেন—ঈশ্বর! যদি সংসারে রাখিলে—তবে সংসার হইতে নরনারায়ণকে লইয়া এ কাহাকে রাখিলে! গোক্ষুরার বিষ শিক্ষা বুঝে—এ যে ঢোঁড়া, মানুষকে কিছু করিতে না পারিলেও—অনেক গরুর প্রাণ নষ্ট করিবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতার অনুমতি লইয়া অতি প্রত্যূষে জীবসুন্দর—নন্দিগ্রামে নটনারায়ণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যেরূপ নটনারায়ণের গৃহ, তাঁহার চক্ষে সুন্দর দেখাইত, আজ যেন সে সৌন্দর্য্য, তাঁহার চক্ষে প্রতিভাসিত হইতেছে না। যাহা দেখিতেছেন, তাহাই যেন ম্রিয়মান। কেবল কল্পনাগত নরনারায়ণের মুখচ্ছবি—তাঁহার চক্ষে—কোথা হইতে উপস্থিত হইতেছে। অমনি চক্ষের জল চক্ষে ধরিতেছে না।

ইন্দ্রনারায়ণ প্রভাত সমীরণ সেবনে বাহির হইয়াছিলেন। গৃহে পঁহুছিয়াই সম্মুখে জীবসুন্দরকে দেখিলেন। অমনি গ্রীবাটী—একবার যেন আপ্যায়িত ভাবে নড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু—অবনত হইল না। একবার নিজের অঙ্গপ্রতি দৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ আমি কি, যেন একবার দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন—তাঁহার কল্পনাগত সভ্যতার মূর্ত্তিতে—তিনি মূর্ত্তিমান। তাহাতে যে অহংকার, সে অহংকারে তিনি জীবসুন্দরের অভ্যর্থনায় একটী চুরুট বাহির করিয়া বলিলেন, "অভ্যাস আছে কি?"

জীবসুন্দর এ অভ্যর্থনায় মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন—বিমল কাচ খণ্ড—যেমন তেজ কুণ্ডে অগ্নির স্বরূপে দৃষ্ট—তেমনি ক্লেদ পরিখায়—ক্লেদ স্বরূপে সমাহিত। জড় মায়া বৈচিত্র্যে অস্মিতায়, আজ রাজপুত্র, চিণ্ময়-পিতৃগত ঐশ্বর্য্য-অহংকার, বাম পায়ে ঠেলিয়া নশ্বর জড় ঐশ্বর্য্যের অহংকারে অহংকারী। তাই ইন্দ্রনারায়ণের এ ভঙ্গী। নশ্বর ধনে অস্মিতায় ধনীর অহংকার, নশ্বর ধনের নির্ধনতায় দরিদ্রের অহংকার পরিস্ফুট না হইলেও সে অহংকারে, সে নির্লিপ্ত হইতে পারে না, কারণ সে স্বরূপগত চিণ্ময় ~~ঐশ্বর্য্যের~~ আস্বাদ একেবারে ভুলিয়াছে; তাই দরিদ্রের নিকট ধনীর এত আদর, তাই দরিদ্র, চিণ্ময় ধনীর অনুসন্ধান করে না—মায়া ধনীর পদ লেহনে কল্পনাতেও সুখী হয়। মায়া ধন অনন্ত, কাহার ধর্ম্ম তৃষ্ণা, কাহার মানের তৃষ্ণা, কাহার প্রেমের তৃষ্ণা—তৃষ্ণা ছাড়া কে? জীব থাকিলেই তৃষ্ণা থাকে, তবে মায়াগত তৃষ্ণাকেই তৃষ্ণা বলে; যাহা মায়াতীত, তাহা মায়ার নামে নির্দ্দেশিত হয় না—তাই সাধুর সে তৃষ্ণা নিষ্কাম। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ, তাহা না বুঝিয়া এ তৃষ্ণার প্রতি এত অগ্রসর কেন?

জীবসুন্দরের আর ভাবিবার অবসর হইল না। ইন্দ্রনারায়ণ কথায় কথায় নানা কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। জীবসুন্দর দেখিলেন—দুই একটার উত্তর না দিলে ইন্দ্রনারায়ণ দুঃখিত হ'ন। ইন্দ্রনারায়ণ উত্তরে বিলম্ব দেখিয়া অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন—"অহংকারে ওরূপ উৎসাহ হীন হওয়া গর্দ্দভের কায—বড় দাদাও এই রূপ করিয়া নিজের উন্নতি নিজে নষ্ট করিলেন। সংসারের সহিত যুদ্ধ নিয়ত করিতে হইবে—তবেত উন্নতি।"

জীবসুন্দর কোন উত্তর করিলেন না। ইন্দ্রনারায়ণ আবার বলিতে লাগিলেন—"আপনাদের জন্যই দাদার মাথা খারাপ হইয়া গেল, আমায় আজ বুঝাইতে হইবে—কেন আপনারা ওরূপ করেন।"

জীবসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমরা কি করি এবং আমাদের জন্য দাদার মাথা খারাপ হইল, তাই বা আপনাকে কে বলিল। বিশেষ, তাহার যে মাথা খারাপ হইয়াছে—তাই বা জানিলেন কি রূপে?"

ই। বলিবে কে? আমিই বলিতেছি, যদি ইহাই না বুঝিব, তবে এতদিন কি করিলাম। কিসে সমাজের উন্নতি, সাহিত্যের উন্নতি, তাহা আপনারা জানেন না।

জী। সকলের উন্নতিত ধরিলেন—কিন্তু নিজের উন্নতির কথাত উল্লেখ করিলেন না?

ই। আপনার কথাত আমি বুঝিলাম না—ইহাই ত নিজের উন্নতি। তবে আপনি সমাজ, সাহিত্য কাহাকে বলে, জানেন না।

জী। অবশ্য সে কথা আপনি বলিতে পারেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি জড় যে, জড়ের উন্নতিতে আপনার উন্নতি? সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদিত জড়গত।

ই। তবে কি আপনি ওসকল উন্নতি অস্বীকার করেন? সমাজ, সাহিত্যই মানুষকে গঠিত করে। আপনি সেই সমাজ, সাহিত্য ছাড়িয়া কাহার উল্লেখ করিতেছেন।

জী। যাহার জন্য সমাজ, সাহিত্য জীবিত, আমি তাহারই উন্নতির জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ইন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন—"আজ কাল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে দুই একজন আত্মা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু তাহা এখনও সর্ব্ববাদি সম্মত নহে। অতএব তাহা সমালোচনার যোগ্য নহে—বৃথা সময় নষ্ট মাত্র।"

জী। যদি একদিন সর্ব্ববাদি সম্মত হয়, তবে এ সময় বৃথা যাইতেছে না কি? আর আপনি যাহা করেন, তাহাই কি সর্ব্ববাদী সম্মত?

ই। এ রূপ কথায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে আমি ইচ্ছা করি না। আপনি কি এ সকল উন্নতিকে উন্নতি বলেন না?

জী। না বলিব কেন? তবে তাহা আত্মার জড়োন্নতি বলিতে হইবে। আত্মা যদি চৈতন্য হন—তবে, জড়োন্নতি আত্ম পক্ষে অবনতিই বলিতে হইবে।

ই। ধরিয়া লউন—এ জড় উন্নতি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এগুলির প্রয়োজন কি না?

জী। আত্মোন্নতির জন্য এ গুলি যতটা সাহায্য করিবে—ততটা প্রয়োজন, তাহা বাদে নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমে বিচার বাড়িয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া জীবসুন্দর বিচারে পৃষ্ঠ দেখাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই ইন্দ্রনারায়ণ সম্মুখ রণে। ইন্দ্রনারায়ণের সে মূর্ত্তিতে জীবসুন্দর মনে মনে বলিলেন—গুরুদেব! শত কোটী অপরাধ ক্ষমা কর—আমায়—তোমার মহিমা শ্রবণ করাও—তোমার পাদ পদ্মে চক্ষু আকৃষ্ট হউক। ভাবিতে ভাবিতে জীবসুন্দরের চক্ষু জলে ভাসিল।

সে জল দেখিয়া ইন্দ্রনারায়ণের বিচারের তৃষ্ণা কমিল। ভাবিলেন—বৃথা বিচার, যথেষ্ট হইয়াছে। জীবসুন্দরের ভাবে তাঁহার দয়া হইল। তিনি বিচারে ক্ষান্ত হইয়া দুই এক কথায়—জীবসুন্দরকে বুঝাইতে লাগিলেন। যদিও ইন্দ্রনারায়ণের বাক্য, কর্ণে স্পর্শ করিতেও জীবসুন্দরের ব্যথা বোধ হইতেছিল—তত্রাচ তিনি স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন—কারণ পাছে ইন্দ্রনারায়ণ মনে করেন যে, তাহাকে অগ্রাহ্য করা হইতেছে। অগ্রাহ্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—হরি কথার অভাবই তাঁহার ব্যথা। ভাবিলেন—এ দণ্ডে বুঝি আমার সে ভাগ্য নাই।

ইন্দ্রনারায়ণ ভাবিলেন—এতক্ষণে জীবসুন্দর নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়াছেন। অতএব ইহাই শিক্ষার উপযুক্ত সময়, বলিলেন—"বিচার স্থলে কথা হইতেছে—আপনাকে দুঃখিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সংসারে সাম্য ভাবই শ্রেষ্ঠ সে দিকে লক্ষ্য করিয়া উন্নতির চেষ্টাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তাহাই ধর্ম্ম। আমি নীতি হীন ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছি না—নীতিই ধর্ম্ম। সুখে দুঃখ অপরিহার্য্য বলিয়া সুখকে দুঃখ কল্পনা—বাতুলের ভ্রম। বিলাতের কোন দার্শনিকই পরলোক স্বীকার করেন না, তাঁহারা যখন স্বীকার করেন নাই, তখন আমাদের মাথায় তাহা আনিতে যাওয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ। সময় অমূল্য, সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারই কর্ত্তব্য। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদের সৃষ্টি, যখন লোক জ্ঞানালোক পায় নাই, তখন উহাতে অন্ধ হইত, পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আর সে দিন নাই। এখন লোকের চক্ষু

ফুটিয়াছে। দেখুন—বেদ যাই বলে, অনুষ্ঠানে কোন ফল হয় না। অতএব তাহার সে স্বর্গ, অপবর্গ, আত্মা ইত্যাদি আকাশকুসুম, মূলে কিছুই নহে। দেখুন—যদি শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তি তৃপ্ত হয়, তবে এখন অনেকে বিদেশে চাকরির জন্য যান এবং সে জন্য আহার বিহারে পথে অনেক সময় কষ্ট পাইতে হয়, যদি তাহা সত্য হইত—তবে পাথেয় দিবার প্রয়োজন হইত না। অতএব এ সকল বিষয় চিন্তার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।"

জীবসুন্দরের অসহ্য হইয়া উঠিল, কর্ণ আর ইন্দ্রনারায়ণের বাক্য ধারণ করিতে পারে না। সে ব্যথায় তাঁহার মুখ আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল, তখন অন্দর হইতে নটনারায়ণ বহির্গৃহে দেখা দিলেন।

অনেকক্ষণ নানা কথার পর নটনারায়ণ জীবসুন্দরকে বলিলেন, "আজ কেন তোমার সে প্রফুল্লতা দেখিতেছি না?" জীবসুন্দর কিন্তু—ইন্দ্রনারায়ণের কোন কথার উল্লেখ করিলেন না। বলিলেন, "না—আপনাকে দেখিয়াই আমি সেই প্রফুল্লতা ভোগ করিতেছি।"

নটনারায়ণ অন্দরে জীবসুন্দরের আগমন সংবাদ দিতে গেলেন। ইন্দ্রনারায়ণ আবার সেই কথা তুলিতে চান। জীবসুন্দর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ছাড়িয়া দিন—এ সকল কথার কোন প্রয়োজন নাই।" ইন্দ্রনারায়ণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, অনেকক্ষণ এই রূপ চলিলে বলিলেন, "যে যদি এ সকল স্বীকারই করিতেছেন—তবে বৃথা উন্নতির প্রতিবন্ধক হন কেন?"

জী। কেন হই তাহা কি রূপে বলিব? তবে অবশ্য আমাদের মন, আমাদের আয়ত্তের ভিতর হয় নাই—সে জন্য উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি না।

ই। মন আবার কাহার আয়ত্তের ভিতর নহে—আমি যাহা ইচ্ছা করিব তাহাইত হইবে?

জী। তুমি কে—আগে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছ কি? মন—বস্তু কি—তাহা ভাবিয়াছ কি?

ই। সে আর কি বলিতেছেন—আমরা কি "লজিক" পড়ি নাই?

সংস্কৃতে 'ফিলজফির' কি আছে? বিলাতের এক একজন 'ফিলজফার' যুগান্তর করিয়াছেন।

জী। তাহাত আমরা পড়ি নাই, কারণই মন আমাদের হস্তগত নহে। আমাদের সহিত আপনাদের তর্ক করিতে আসা কেবল আপনাদের সময় নষ্ট করা। এ সময়ে কত উন্নতির কায করিতে পারিতেন। আমি মুর্খ, ক্ষুদ্র, আপনারা স্বাধীন হইয়া যে দিকে কূল পান নাই, আমি দাস হইয়া সেই দিকে যাইতে চাই—যদি কূল পাই। আপনারা স্বাধীন হইয়া যে সুখে বঞ্চিত, যদি দাস হইলে সে সুখময়ের কৃপা হয়। যে দাস হইতে ইচ্ছা করে, তাহার যাহা থাকে, অবশেষে আপনাকেও সমর্পণ করে। আমার কি পুঁজি আছে যে, আপনাদের তাহা দিয়া সুখী করিব? আপনারা উন্নতির মুখে পুঁজি করিতেছেন, লোকে ধন দেখিয়া আপনাদের চিনিতে পারে, আমি পুঁজি ছাড়িয়া সংসারের অপদার্থ হইতে চাই— আপনায় আমায় মিলিবে কেন?

বলিতে বলিতে জীবসুন্দরের চক্ষে জল আসিল—দুই এক বিন্দু জলও ঝরিল। মনে মনে বলিলেন,—গুরুদেব! ইন্দ্রনারায়ণকে কৃপা কর, তোমার স্বরূপ-কৃপা অভাবেই ইন্দ্রনারায়ণ, তোমায় জানিতে চাহে না। বিরূপে অন্ধের অপরাধ কি?

রৌদ্র উঠিল। নটনারায়ণ অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া জীব-সুন্দরের চক্ষে জল দেখিয়া বলিলেন—কি হইয়াছে? জীবসুন্দর অন্য কথা পাড়িলেন। তখন উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ইন্দ্র-নারায়ণ অন্দরে প্রবেশ করিলেন—মনে মনে ভাবিলেন, মূর্খ গুলাকে এক একবার এইরূপে না দেখাইলে সমাজের উন্নতি হয় না।

নটনারায়ণ, জীবসুন্দরকে অন্দরে লইয়া যোগমায়ার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। নটনারায়ণ সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে, যোগমায়া জীবসুন্দরকে ডাকিয়া আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জীবসুন্দর গৃহে প্রবেশ করিলে যোগমায়া যেমন ভ্রাতার চরণ স্পর্শে দণ্ডবৎ হইবেন, অমনি তাঁহার মস্তকে দুই চারি বিন্দু উষ্ণ জল পড়িল। সে জল স্পর্শে তিনি ভ্রাতার মুখপানে তাকাইয়া শূন্য দ্রষ্টার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জীবসুন্দর ভাবিলেন—বহির্ম্মুখে আমি পুরুষ প্রকৃতি—যোগমায়া স্ত্রী প্রকৃতি। আমার চক্ষে জল কেন? যোগমায়ার চক্ষেত জল নাই?

যোগমায়া বলিলেন, "দাদা! কাঁদিতেছ কেন? বাড়ীর সব ভালত? কাহার অসুখ—হয় নাইত? মা, বাবা, বড় বৌ, ছোট বৌ—ভাল ত?"

জী। সব ভাল। আমি কাঁদি নাই। তুমি—ছোট ভগ্নী, তোমরা ভাল থাকিলেই আমরা ভাল থাকি। সংসারে যাহাদের লইয়া থাকা যায়, তাহাদের সুস্থতাই সংসারীর সুস্থতা। তোমার পূর্ব্বকার ভাব আমার মনে হইতেছে—তাই একবার চক্ষে জল আসিয়াছিল।

যোগমায়া গ্রীবা নত করিলেন। অঞ্চল ধরিয়া তাহার সূতা বাহির করিতে লাগিলেন—তত্রাচ জীবসুন্দরের কথায় উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ বাদে জীবসুন্দর বলিলেন, "যোগা! বদ্ধ জীবন—স্বপ্নময়, একদিন এ স্বপ্নও থাকিবে না। যেমন থাকিবে না, তেমন স্বপ্নের জন্য ভাবিও না। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা এই সংসারেরই ছায়া, এ সংসারে যাহা দেখা যায়, তাহা যে সংসারের ছায়া, সেই সংসারের জন্য, সেই সংসারের সংসারীকে অন্তরে ভাবিতে থাক। যাহা নিত্য—তাহাই সত্য। সে সত্য বস্তু, তাহার ভালবাসাও সত্য—নিত্য। ছায়া সংসারের সংসারী নিজে অসত্য—অনিত্য, অতএব তাহার ভালবাসাও অসত্য—অনিত্য। যাহা যাহার স্বভাব, তাহাতে দুঃখ বা অভিমান করিতে নাই—তাহা তাহার দোষ নহে। সে অভিমানে নিজেও অসত্য, অনিত্য হইতে হয়।"

যোগমায়ার মুখ যেন রক্তাভ হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমায় ছায়া দিয়াছেন—ছায়াই পূজা করিয়া আসিতেছি। আর ত কিছু দেন নাই? যদি সে ছায়া হয়, যাহাকে একবার পূজা করিয়াছি—তাহাত আর ফেলিতে পারিব না। তাহাতেই কায়া দেখাইতে হইবে।"

জী। ছায়ার চক্ষে ছায়াপতি, স্বরূপ চক্ষে স্বরূপপতি। ছায়ার দেশে ছায়ার বিধিই সুন্দর, কিন্তু স্বরূপ সে বিধির অতীত। অতএব

ছায়াতে ছায়া পতির স্বরূপে, স্বরূপ পতির কৃপা ভিক্ষা কর, দেখিবে—ছায়ার মধ্যেই স্বরূপ নির্লিপ্ত ভাবে বর্ত্তমান।

যোগমায়ার গাত্র শিহরিতে লাগিল, কণ্ঠ আবদ্ধ হইয়া আসিল—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি স্বরূপে কৃষ্ণ কথায়, ছায়া পতির স্বরূপ সঙ্গে, কৃষ্ণ রসাস্বাদন করি। তিনি যেন কৃষ্ণে বঞ্চিত না হন—তাঁহার নিকট আমার আর কোন ভিক্ষা নাই—কিন্তু তাঁহার জন্য আমার—এই ভিক্ষা।"

জীবসুন্দর মনে মনে বলিলেন,—ভগ্নি! এ বড় দূরের ভাব। স্বরূপ দৃষ্টির পূর্ব্বে এই ভাব ধরিতে গিয়া লোক মায়ার কুহকে—এই জড় দেহ-কেই স্বরূপ দেহ মনে করিয়া—স্বধর্ম্ম নষ্ট করে। মায়া ধর্ম্মে আরও জড়িত হয়, হইয়া চিৎ বিশেষ ধর্ম্মে যে জীবের স্বরূপ নিত্য পৃথক, তাহা দৃষ্টি করিতে পারে না, রাধা কৃষ্ণ হইয়া বসে—তাই মায়া তাহাদের লইয়া সংসারে—'সহজ' 'বাউল' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। চিণ্ময় কায়া—স্বরূপে স্বরূপে সে মাধুর্য্য, ছায়া মায়ার বিরূপ স্ত্রী, পুরুষ প্রকৃতির সহিত তাহার কোন সাধন নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"যোগা! আজ তুই সতীর অন্তর দেখাইলি। অসতী—স্বামীর ইষ্ট বিঘ্ন। যে স্ত্রী স্বামীর ইষ্ট প্রাপ্তির অনুকূল—সেই সতী। যে স্ত্রী স্বসুখ আশায় স্বামীর ইষ্ট প্রাপ্তির প্রতিকূল—সে অসতী। জগতে সেই ধন্য যে, তোমার মত স্ত্রী লাভ করিয়াছে।"

ভ্রাতা ভগ্নীতে আর কোন কথা হইল না। উভয়ের চক্ষেই জল ঝরিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ সাত দিন। সন্ন্যাসীর ধ্যানের ভঙ্গ নাই। মুদিত চক্ষু, যোগাসনে বদ্ধহস্তপদ—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

এদিকে ফল মূল বা জল দুই দিন ফুরাইয়াছে। তৃষ্ণায় হৃদয় ফাটিতে বসিয়াছে—ক্ষুধায় জগৎ জ্বালা ফুটিয়াছে—সহ্য হয় কি?

নরনারায়ণ দৈহিক জ্বালায় অস্থির। মনে হইতেছে—একটু বারি তাঁহাকে যেন কৃতার্থ করিতে পারে, তাহা হইলে যেন অশান্তির জগতে আর কিছুই থাকে না।

দুই তিন দিন হইতে নানা বন্যজন্তু বার বার আসিয়া গণ্ডীর চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গর্জ্জন করিতেছে, আর যেন নরনারায়ণকে লক্ষ্য করিতেছে। প্রথমে প্রথমে যত ভয় হইয়াছিল, এখন সে ভয় অনেকটা কমিয়াছে।

নরনারায়ণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর থাকিতে পারেন না। অসহ্য হইয়াছে। গণ্ডীর বাহিরে যাইলেও মরণ, না যাইলেও মরণ নিশ্চয়। সন্ন্যাসীকে ডাকিলে বা ধ্যান ভঙ্গ করিলে, যদি তিনি ক্রোধবশতঃ বিরূপ হন, তাহাই ভাবনা। ভাবিলেন—যদি মরণই নিশ্চয়, তবে সন্ন্যাসী, গুরুদেবের ক্রোধে মৃত্যু কেন? ডাকিব না।

মন কিন্তু প্রবোধ মানিতে চাহে না। অবশেষে ডাকিতে হইল। ডাকিয়া বলিলেন—"প্রভো! গুরো! প্রাণ যায়। একদিন মৃত্যুশয্যায় প্রাণ দিয়াছিলেন, আজ আবার তৃষ্ণা-শয্যায় প্রাণ দিন। যদি প্রাণ দিয়া থাকেন, তবে যাহাতে তাহা থাকে, তাহা করুন!"

কিন্তু তাহাতেও সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না। শেষে গাত্রস্পর্শ করিলেন, দোলাইলেন; কিন্তু কিছুতেই সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না।

তখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গণ্ডীর বাহিরে যাইবেন মনস্থ করিলেন, ভাবিলেন—প্রাণত গিয়াছেই, না হয় বন্য জন্তুর উদর পূরণ হউক।

যে মুহূর্ত্তে গণ্ডীর সীমা হইতে পদবিক্ষেপ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই দূর হইতে একটা ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া বিকট চীৎকারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নির্জ্জীবের মত পতিত হইল। নরনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন—তখনও তাঁহার চক্ষু হইতে কি এক প্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া তাঁহাকে উজ্জ্বল করিতেছে।

সে উজ্জ্বলতায় নরনারায়ণ সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"প্রাণ যায়, তৃষ্ণায় হৃদয় ফাটিতেছে, এখনও একটু জল দিন—আমি বাঁচিব।"

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে যেন নরনারায়ণের তৃষ্ণা কমিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে কি যেন এক স্নিগ্ধতা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তৃষ্ণায় বারি কোন ছার, এ যেন স্বর্গীয় সুধা। পদাঙ্গুলি হইতে মস্তকের কেশ অবধি যেন সে সুধায় শীতল হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "জল খাইবে?"

নর। না—আর তৃষ্ণা নাই।

স। তুমি গণ্ডীর বাহিরে যাইতেছিলে কেন?

নর। তৃষ্ণায়—ক্ষুধায়।

স। খাইবে?

নর। এখন আর ক্ষুধা নাই।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অবিদ্যার রাগ থাকিতে বৈরাগ্য হইবার নহে, তুমি বাড়ী যাও। আমরা বনচারী, বনবৃক্ষে কেহ বারি সেক করে না। যতক্ষণ বারির তৃষ্ণা থাকিবে, ততক্ষণ তুমি বনের উপযুক্ত নহ। সংসার লইয়া যদি ফিরিবে, তবে বনে আসিলে কেন? যদি বনে আসিলে, তবে—সংসার হৃদয় হইতে ফেলিলে না কেন?"

নর। আমার যাহা সাধ্য, আমি তাহা ফেলিতে সক্ষম; কিন্তু যাহার প্রতিঘাত হৃদয় সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে আমি কি করিতে পারি।

স। যদি তাহার প্রতিঘাত এত অসহ, তবে ভুলিতে বসিয়াছ কেন? এরূপে বৈরাগ্য স্থান পায় না।

নরনারায়ণ আর উত্তর করিলেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি সত্যই বলিয়াছ। তুমি অসীম সমুদ্রে কূল না পাইয়া স্থির হইবে কি প্রকারে? তাই তোমার চিত্তের এ অবস্থা। বৎস! চিত্তকে বহির্ম্মুখ হইতে অন্তর্ম্মুখে একাগ্র করাকে চিত্তবৃত্তির নিরোধ বলা যায়, তাহারই নাম—যোগ। মনকেই চিত্ত বলে। আমি তোমায় সেই যোগাঙ্গে ব্রতী করাইব।"

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঘটা আমায় মারিয়া ফেলিত নিশ্চয়; কিন্তু উহার ওরূপ অবস্থা হইল কেন?

স। তোমার কি বোধ হয়?

নর। আপনার চক্ষুর তেজে মরিল।

স। কই মরিয়াছে—দেখ দেখি?

নরনারায়ণ দেখিলেন, সে স্থানে বাঘ নাই। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন।

স। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।

নর। ছাড়িয়া দিয়াছেন? কি দিয়া ধরিয়া ছিলেন, তাহাত দেখিতে পাই নাই!

স। এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না, পরে আপনিই জানিতে পারিবে। কিরূপে কার্য্য হয়, বুঝাইলে বুঝিতে পারিবে না, সাধনে আপনি সন্দেহ মিটে। এ গুলি সিদ্ধি। সংসারী এ সকল জানে না, জানিতেও চাহে না। অবিদ্যা ধর্ম্মে বদ্ধ হইয়া তাই নানা উপায়ে নিজের মরণ নিজে ডাকিয়া আনে; আনিয়া তাহাতেই কষ্ট পায়। যাহা পরের জন্য আনয়ন করে, একদিন তাহাতেই নিজে প্রাণ দেয়। আইস বৎস! বনের জন্ত তোমায় কিছু দান করি, নচেৎ এ বনে নানা ভয় বিঘ্ন উপস্থিত হইবে; মনকে স্থির রাখিতে পারিবে না।

তখন কাণে কাণে কি শুনাইলেন। বলিলেন, "যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তখন এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সে কার্য্য উদ্ধার করিবে, কোন বিঘ্নে পড়িবে না। নচেৎ এ মন্ত্র সংসারের বেশ্যা বশ করিতে,

শত্রু মারিতে বা পরের সর্ব্বনাশ করিতে সাধুর মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। যাহার জন্য নির্গত হইয়াছে, আজ তাহার জন্যই তোমায় দিলাম, তাহার সাধনের জন্যই ব্যবহার করিবে। যদি অন্য ইচ্ছায় ব্যবহার কর, যোগভ্রষ্ট হইবে, পাপের ভাগী হইতে হইবে।"

তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে আসন সম্বন্ধে উপদেশে বলিলেন, "আসন ভিন্ন দেহ স্থির হয় না, দেহ স্থির ভিন্ন চিত্ত স্থির হয় না, অতএব আসন অভ্যাস আবশ্যক।"

নরনারায়ণ বলিলেন, "আসন, প্রাণায়াম অভ্যস্ত করিতে আমি অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছি।"

স। ভাল—পদ্মাসনে স্থির হও।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল নরনারায়ণ স্থির হইয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট। সন্ন্যাসী বলিলেন, "কুম্ভকে স্থির হও।" কিন্তু নরনারায়ণ কুম্ভকে অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন না।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি অনেকাংশে অগ্রসর আমি জানি।" তখন নরনারায়ণ বকুল তলায় সেই দিব্য ভাবের কথা উত্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাহাত আমায় এক দিন বলিয়াছিলে! সংসারের কথা ছাড়িয়া দাও, কোন সাধু সন্ন্যাসীর কথা হইলে, তাহা ভাবিবার বিষয় হইত। যাহা বলিতেছ, তাহারই সাধ্যসাধনায় প্রবৃত্ত হও।"

নরনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না। ভাবিলেন—যখন বলিতেছেন যে, যাহা বলিতেছ—তাহাই সাধ্য, তখন ইনিই সেই আগন্তুক, নচেৎ সে কথা উত্থাপনেই উড়াইয়া দেন কেন; আবার তাহারই সাধনার কথা বলিলেন কেন?

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি কি গৃহে যোগে বসিতে?"

নর। নিত্যই কিছু কিছু অভ্যাসের চেষ্টা করিতাম।

স। ভাল—স্থির হইয়া আসনে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধিকার দেখিয়া লই।

নরনারায়ণ ধ্যানে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী নরনারায়ণের সাধনাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "মনকে স্থির করিতে হইবে,

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমশঃই নটনারায়ণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। এতদিন তিনি নিজের বুদ্ধিকে আপনার ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, বুড়া হরসুন্দরের ভাবে তাঁহার সে ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহাতে চিন্তা অনেক সময়েই তাঁহাকে স্থির হইতে দেয় না, তাহার পর—নিজের সংসার চিন্তা, হরসুন্দরের অবস্থা চিন্তা, শিবসুন্দরের মকর্দ্দমার চিন্তা, তাঁহাকে তরঙ্গবৎ চঞ্চল করিতেছে। চিন্তায় বিভ্রান্ত হইলেও কোনটিই তাঁহার ফেলিবার নহে। এ দিকে মকর্দ্দমারও আর বিলম্ব নাই। তদ্বিরে খরচও হইতেছে, কিন্তু কি হইবে—তাহা ভগবানই জানেন। নটনারায়ণ জানেন—"ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়" তাই নটনারায়ণ এ কার্য্যে ব্রতী। আত্মার উন্নতিই—জয়, অবনতিই—ক্ষয়। সাংসারিক জয়, পরাজয়, আর আত্মার উন্নতি, অবনতি—স্বতন্ত্র। কোন সময়ে আত্মার উন্নতি, অবনতির সঙ্গে জয়, পরাজয় মিলে, কোন সময়ে মিলে না; তাই সময়ে সময়ে সাধারণের ভ্রম হয়। কিন্তু ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় নিত্য। এই জয়ে, ক্ষয়ে যদি হার জিত মিলাইয়া লও, তবে অমিল দাঁড়াইতে স্থান পায় না। এ সত্য কলিকালেই স্পষ্ট দেখা যায়। এই বিধিতেই বিধি লিপিবদ্ধ, তোমার আমার জ্ঞানানুসারে বিধির বিধি হয় নাই।

নরনারায়ণের গৃহত্যাগে নটনারায়ণ বাহ্যে চঞ্চল হন নাই। অন্তরেও চঞ্চলতা দেখিতে পান নাই, কিন্তু শারীরিক কিছু দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়াছেন। তাহাতে মানসিক যে দুর্ব্বল হন নাই—তাহা নহে। তাহাতেই বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান। যে জ্ঞান মায়া বৈভবের অভাবে ক্ষীণ হয়, তাহা দিব্য হইতে পারে না। যাহা দিব্য, তাহা যতই মায়া বৈভব শূন্য হইবে, ততই উজ্জ্বল হইবে। তাহা হইল কই? তাই হরসুন্দরের কৃপাই এখন প্রার্থনীয়। তাই শিব-সুন্দরের তুষ্টিই এখন প্রার্থনীয়। যদি সে তুষ্টিতে—সে কৃপা লাভ

হয়। সে তুষ্টি, সে কৃপাই লক্ষ্য, তাহা লাভের নিমিত্ত যে ক্রিয়া তাহা তদনুবর্ত্তীই হয়, তাই এ ক্রিয়া; নচেৎ মকর্দ্দমা ইত্যাদি তাঁহার লক্ষ্য নহে। ধর্ম্মের জয়ে, অধর্ম্মের ক্ষয়ে তাঁহার সংশয়ও নাই—পরীক্ষাও নাই।

যোগমায়া—দেবীগ্রামে গিয়াছেন। নটনারায়ণই ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। নচেৎ বাড়ীতে নিত্যই অশান্তি। চঞ্চলা আপন ভাবেই সংসারের মর্ম্ম বুঝেন, অন্যের ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তারা, কিরণশশী তাহাতে যোগ দেন, দোষী হইতে যোগমায়াই হন। নটনারায়ণ তাহা চক্ষে দেখিতে পারেন না। বিশেষ এ সময়ে কাহার পিতা, মাতাকে একবার দেখিতে না ইচ্ছা হয়? চঞ্চলার পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নটনারায়ণের কার্য্যে আপত্তিও করেন নাই। ইন্দ্রনারায়ণ কথাই কহেন নাই।

নটনারায়ণ দেবেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্র আসিলে বলিলেন, "তোমায় আজ একবার দেবীগ্রামে রামহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাইতে হইবে।"

দে। কেন?

নট। আমার পূজা সারিয়া বসন্ত বাবুর সহিত না দেখা করিলেই নয়, কাল মকর্দ্দমা; ও দিকে আর যাইতে পারিব না।

দে। কি দরকার?

নট। রামহরি বাবুকে পঞ্চাশটী টাকা দিয়া আসিতে হইবে।

দে। বাড়ীর জন্য বুঝি? বাড়ী কি তৈয়ারী হইয়া গেল?

নট। খড়ের বাড়ী—আর কতদিন লাগিবে? বিশেষ বেশী বেশী লোক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয়। আর দুই তিন দিন হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

দে। হরসুন্দর বাবুর অমতে করিলেন, যদি তিনি বাড়ীতে না আসেন?

নট। হউক, সে আমি বুঝিয়া লইব। আমার টাকা খরচ হইতেছে, এই তাঁহার কষ্ট—এই জন্যই তাঁহার অনিচ্ছা।

একাগ্র করিতে হইবে। মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে মন্ত্র ভুলিয়া মন অন্য ছবি দেখিতেছে কেন? উহাই যে মনের ক্ষিপ্তাবস্থা। ওই যে অন্য ছবি ফেলিয়া আবার মন মন্ত্রে স্থির হইতে চেষ্টা করিতেছে, উহাই যে মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা।

"উহাও গ্রাহ্য নহে। মনকে একাগ্র করিতে হইবে। আবার ও কি? সংসার মনকে তন্দ্রাভিভূত করিতেছে কেন? উহাই যে মনের মূঢ়াবস্থা। উহাতে মন নিস্তেজ হয়, বৈরাগ্যের হীনতা জন্মে। সাবধান! ছাড়িয়া দাও, ত্যাগ কর, মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, নচেৎ ধ্যান হইবে না। ধ্যান ভিন্ন সমাধি বিকল—হইবার নহে।

"মন বড়ই অস্থির দেখিতেছি। ভাল—চক্ষু উন্মীলিত কর, আমি যাহা বলি শ্রবণ কর। যদি যোগাসনে কষ্ট বোধ হয়, তবে সহজাসনে উপবিষ্ট হও।

"বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগে, মন যখন নিশ্চল—অবিকম্পিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে, তখনই তাহাকে একাগ্র বলা হয়। কারণ রজঃ, তমঃ বৃত্তিই চিত্তকে চঞ্চল করে। যখন সেই রজঃ, তমঃ বৃত্তি আর কার্য্য করিতে পারিবে না, তখন সত্ব বৃত্তি স্ফূরিত হইবে, তাহাই চিত্তের একাগ্রতা। এই একাগ্রতাই সাধনকালে লক্ষ্য।

"চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, আত্মা চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিতি করে। তাহাই সমাধি। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, যে দিকে লক্ষ্য করে—সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি এই পাঁচ বৃত্তিতে চিত্ত নিত্য ক্লিষ্ট। অতএব তাহা ত্যজ্য, কারণ এ সকল যোগের বিঘ্ন। বিষয়ে অনুরাগ শূন্যতাই যোগের প্রধান উপায়। দ্বিতীয় উপায়—অভ্যাস। এই অভ্যাসের বলেই চিত্ত বিষয়-অনুরাগরূপ চঞ্চলতা শূন্য হয়, অতএব স্থির হয়।

"দৃষ্ট বা আনুশ্রবিক বিষয়ে যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তদ্দারা চিত্তের বশীকরণ সংজ্ঞাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে—বৈরাগ্য বলে। এই বৈরাগ্যই যোগের মূল। বিশেষ বৈরাগ্য যুক্ত পুরুষকেই বিবেকী বলা যায়। বিবেকীর সংশয় ও বিপর্য্যয় শূন্যে প্রকৃষ্টরূপে ভাব্য বিষয়ের চিন্তা বদ্দারা হয়,

তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই তাব্য বিষয় দুই প্রকার—ঈশ্বর এবং তত্ত্ব সকল। তত্ত্ব আবার দুই প্রকার। অবিদ্যাগত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং চৈতন্য বা আত্মা।

"সম্প্রজ্ঞাত চারি প্রকার। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ, অস্মিত। ইহাদের সহিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ, সাস্মিত বলে। যে সময়ে মহাভূতাদি কোন স্থূল বস্তুর চিন্তা করা যায়, তৎকালীয় বস্তুর প্রভেদ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যে চিন্তা—তাহাই সবিতর্ক। আর যখন শব্দ অর্থে প্রভেদ নির্দ্দেশ না থাকে—তখনই নির্ব্বিতর্ক। ইন্দ্রিয় তন্মাত্রাদি যোগে শব্দ অর্থে বস্তু প্রভেদ নির্দ্দেশে যে চিন্তা—তাহাই সবিচার। আর যখন শব্দ অর্থে প্রভেদ নির্দ্দেশ না থাকে—তখনই নির্ব্বিচার।

"রজ, তমগুণের ছায়ামাত্র এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে যে সমাধি, তৎকালে যে সুখ স্বরূপের উদয়—তাহাই সানন্দ সমাধি। রজ ও তম হীন, কেবল সত্ত্বে যে চিৎশক্তির উদয়ে সমাধি, তাহাকেই সাস্মিত বলা হয়। অতএব উপরোক্ত চারি প্রকার সমাধিই সবীজ, কেন না, বস্তু লক্ষ্যেই পর পর সোপানে ইহার সাধন। যদি ইহাতেও পরম পুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎ না হয়, তবে প্রকৃতি লয় আবশ্যক।

"যখন চিত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সমস্ত লক্ষ্যহীন হইয়া, যোগ বিশ্বাসে পুনঃপুনঃ অভ্যাসে কেবল মাত্র সংস্কার বিশেষে নীত হয়—তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাই নির্ব্বীজ, কারণ ইহাতে বস্তু লক্ষ্যরূপ বীজ নাই। চিত্তরূপ প্রকৃতি তখন আত্মাতে লয় প্রাপ্ত।

"বৎস! ইহাই জীবের চরম ফল। অতএব ইহাই সাধ্য। এই সাধ্যের সাধন উপদেশে তোমায় ব্রতী করাইব। ইহার জন্য মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা কর।"

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

দে। বৈবাহিকের সাহায্য গ্রহণ সকলে স্বীকার করে কি?

নট। আমি কি তাঁহার সহিত বৈবাহিকের ন্যায় ব্যবহার করি—না ব্যবহার প্রত্যাশা করি? বিশেষ বাড়ী যে আমার টাকায় হইতেছে, তাহা কাহাকেও জানিতে দিই নাই। এ বাড়ীতে তাঁহার কষ্ট হয়, আমার সে কষ্ট সহ্য হয় না।

দে। কত টাকা খরচ হইবে?

নট। বেশী নহে—চারি পাঁচ শত।

দে। এত কেন?

নট। যাহা ছিল তাহার অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। পাকা করার আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাছে বেশী ব্যয়ে তিনি একেবারে যাইতে অস্বীকার করেন, তাই ভয়ে সে দিকে যাই নাই।

দে। ইন্দ্রনারায়ণ বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার ইহাতে বড় রাগ, তবে ইহাত আপনি করিতেছেন প্রকাশ নাই, তাই কিছু মুখে বলে নাই।

নট। তুমি জান না। মুখে বলে নাই—ও আজ কালকার সভ্যতা। তা হইলে যে কথায় হারিতে হইবে। পরের উপকার করিতে, উহারাই বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়। পরের উপকারের জন্য উহারাই বিলাত পর্য্যন্ত লড়াই করে। উহার কি কিছু বলিবার যো আছে? তবে অন্তর কি, বাহিরের জ্ঞানে প্রবোধ মানে? ভিতরে সে সমান থাকে। স্বার্থ সিদ্ধি আগে দেখে। মকর্দ্দমাটার কি করিবে—কে জানে! জ্যোতিঃপ্রসাদ ত কাহারও হাতে ঢালিতে বাকী করে নাই।

দে। সত্য বলিয়াছেন। পরশ্ব তারিখে জ্যোতিঃপ্রসাদের একজন পিয়াদা আসিয়াছিল। রাস্তায় কি কথা হইতেছিল—রামার বাপ আমায় বলে।

নট। ঘরের শত্রুকে ধরিবারও যো নাই, বলিবারও যো নাই। সে জন্য আর ভাবিলে কি হইবে? মকর্দ্দমাটা আবার উহার হাতেই পড়িল।

এমন সময়ে ইন্দ্রনারায়ণ আসিয়া বসিলেন। মকর্দ্দমার কথাই উঠিল। ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "আমাদের সম্মুখে এ সকল কথা তুলি-

বেন না। কারণ—বিচারে মাতা, পিতা ও ভাই বন্ধু দেখিবার যো নাই। সকলকেই বিচারের চক্ষে দেখিতে হয়। সুবিচারই প্রার্থনীয়। তখন আর চিন্তা কি? বিশেষ—ঘটনা যাহা, তাহা ত আমার বিশেষরূপ জানা আছে। আহা! তাঁহারা গরিব, তাঁহাদের পক্ষে দেখিবার কে আছে? আপনারা যে দেখিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট। এইরূপ সহানুভূতি বাঙ্গালীর নাই বলিয়াই ত বাঙ্গালী হীনজাতি।"

নট। জ্যোতিঃপ্রসাদের লোক তোমার নিকট আসিয়াছিল কেন?

ইন্দ্র। কই—না।

দেবেন্দ্র বলিলেন, "রামার বাপ বলিল,—বটতলায় কি কথা হইতেছিল।"

ইন্দ্র। সে জ্যোতিঃপ্রসাদের লোক কে বলিল?

দেব। না কেন? "মোহন" জ্যোতিঃপ্রসাদের পিয়াদা নহে?

ইন্দ্র। ও—মোহনের কথা বলিতেছ? সে আদালতের একটা কাযের জন্য আসিয়াছিল। জমিদারেরা কি আদালত ছাড়া এক দিন থাকিতে পারে?

এইরূপে ইন্দ্রনারায়ণ সে কথা চাপা দিলেন। বলিলেন, "বড় বৌকে এ সময়ে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখা কি ভাল হয়? হরসুন্দর বাবুর এই মন্দ অবস্থা, আর শিবসুন্দর বাবু নিরুদ্দেশ। তাঁহাকে ত সাহায্য করিতেছেনই, এ গুলিও দেখা আবশ্যক।"

দেব। আনিলেই হইবে, তাহার জন্য ত ভাবনা নাই। এখন হরসুন্দর বাবুর এই উপকারটা কর দেখি?

ইন্দ্র। আমরা কর্ত্তব্য কায করিব। ইহাতে আর উপকার কি বলুন? বিশেষ হরসুন্দর বাবু সজ্জন লোক, আত্মীয় এবং বাবার সহিত যেরূপ হৃদ্যতা, তাহাতে আমার দ্বারা তাঁহার যত দূর উপকার হইতে পারে, করা উচিত বই কি? তাঁহার বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে না?

নট। হাঁ।

ইন্দ্র। শুনিতেছি খরচ আপনার!

নট। মা'—কে বলিল ?

ইন্দ্র। যদি হয় সে ত ভালই। পরের উপকার যত করা হয়, ততই ভাল। তবে এই টাকাগুলা দেশের উপকারের জন্য খরচ হইলে দশজন তাহা ভোগ করিতে পায়, দশজনে জানিতে পারে। সাধারণ তাহাতে অনেক শিক্ষা করিতে পারে। তাহার পর আমাদেরও ছেলে পিলে হইতে চলিল, যাহা মাহিনা—তাহাতে ত সম্মান রাখিয়া চলিতে কুলায় না। আপনি যদি তাহা না বুঝেন, তবে কি বলিব। আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, তাহা ত জানেন।

নটনারায়ণ, দেবেন্দ্র মনে মনে হাসিতেছেন, কিন্তু এ সময়ে ইন্দ্রনারায়ণকে বিরক্ত করা হইবে না বলিয়াই কিছুই বলিলেন না। এ দিকে বেলাও হইল, ইন্দ্রনারায়ণ আদালতের জন্য প্রস্তুত হইতে উঠিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়ার ভাবে জীবসুন্দর—মনে প্রফুল্লিত—বুদ্ধিতে স্তম্ভিত। ভাবিলেন—বালিকার যাহা আছে, আমাতে তাহা নাই কেন ? বালিকার—মনের দৃঢ়তা, একাগ্রতা, নির্ভরতা, ভক্তিপ্রিয়তা, আমাতে নাই কেন ? সংসার ঝটিকায় তাহার এ শান্ত মূর্ত্তি কাহার কৃপায় ? সংসার মাধুর্য্যে—এ নির্ভরতা—এ ভক্তিপ্রিয়তা—কি সুন্দর! যে মাধুর্য্য ভক্তিকে দূরে রাখে, কামে পরিণত করে—মোহে আবৃত করে, সে মাধুর্য্য ফুটিয়া ভক্তির এ মাধুর্য্য—কেমন সুন্দর। হায়! হায়! পাষাণসম হৃদয় আমার, তাই আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিলাম না।

এ বালিকা-হৃদয়েও যে আছে, আমার হৃদয়েও সে আছে। যাহার অধিষ্ঠানে ভক্তিশক্তির এ মাধুর্য্য, সে আমার হৃদয়েও আছে। যখন সে আছে, তাহার ভক্তিশক্তিও আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার এ লাবণ্যও আছে, তবে আমি কেন সে লাবণ্য শূন্য! মায়া! মায়া! মায়া। মায়া আমায় তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছে। মায়া! তোমায় কোটী কোটী

অগণ্য প্রণাম, আমি তোমার রূপে তোমাতে ভুলিয়াছি, তাই আমার সে নলিন হৃদয় পাষাণ। তুমি যাহাতে ভুলিয়া আছ, তাহাতে ভুলিলে, তুমি আমায় পাষাণ করিতে পারিতে না। ধন্ত তোমার খেলা! যাহার খেলায় তুমি খেল—সেই ধন্ত।

তুমি অনন্তের শক্তি—অনন্ত তোমার খেলা। আমি অন্ত না পাইয়া তোমায় প্রণাম করি। প্রসীদ মায়া! কাহার শক্তিতে কে তোমায় জয় করিবে? তুমি যে অনন্তের শক্তি, শক্তিরূপে তুমি যে অনন্ত। যে তোমার যুদ্ধে, জয়ের আশায় ধাবিত—সে ভ্রান্ত। সে জানে না—তাহার যে যুদ্ধবল, সেও তোমার শক্তি। তুমি না কৃপা করিলে কাহার সাধ্য—তোমার ভালবাসার বস্তু লাভ করে? তাহাতে যাহার ভালবাসা নাই—তুমি তাহাকে তাহার অন্তরালে রাখ। প্রেমের বস্তুকে অপ্রেমিকের নিকট দিতে কাহার হৃদয়ে ব্যথা না লাগে? তুমিই ভাল বাসিতে শিখিয়াছ—তাই তুমি পরম বৈষ্ণবী। আমি তাহাকে ভুলিয়া যাহা ভাল বাসিয়াছি, তুমি তাহাই আমায় দিয়াছ। কারণ, তাহা তোমার বাহিরের বস্তু। বাহিরের বস্তু দিয়া দেখাইতেছ যে, যে মাধুর্য্য লইতে তাহা লইয়াছি, তাহাতে তাহা নাই। দেখিতে দেখিতে যে দিন, সেই দিনই সে স্থির থাকিবে, পরদিন সে আকুল হইবে। দেখিতে স্থির থাকার দিনই তাহার মায়ায় বদ্ধতা। সে আপন নালেই আপনি বদ্ধ—তোমার কি দোষ? তুমি দয়াময়ী—দয়াময়ী না হইলে কি তাহার সে আকুলতায় তোমার হৃদয় গলিত! না গলিলে কি তুমি, তোমার অন্তর হইতেও যে অন্তরতম রূপ—সে রূপে প্রকাশ পাইতে? না পাইলে জীব কি তোমার এ কুহক বাগুরা ভেদ করিতে পারিত?

কে বলে তোমায় জড়ময়ী! যে বলে, সে অন্ধ—জড়। সেও তোমার খেলা। জড়—তোমায় স্বরূপ আবরণ। যে ভগবানে বীতরাগ সে তাহার শক্তির স্বরূপ মূর্ত্তিতেও বীতরাগ। সে যাহাতে স্বরাগী, তাহার জন্তই তোমার এ জড়রূপ। ধন্ত তোমার কৃপা, যাহার কৃপায় তোমার এ কৃপা—সেই ধন্ত।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে দিন জীবসুন্দর, বেলা দ্বিপ্রহরে নন্দীগ্রামে পঁহুছিলেন। বাটী আসিয়া কাজ কর্ম্মে যোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার যেন আর লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয় এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, যাঁহার উপলক্ষে এ ভাব, তাঁহার প্রতিও আর সে লক্ষ্য নাই। যোগমায়া এখন বাড়ীতেই। তিনি কনিষ্ঠা বলিয়া তাঁহার সহিত যে ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল, এখন আর সে ভাবে কথোপকথনেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। এখন যেন জীবসুন্দর সকলেরই কনিষ্ঠ। জীবসুন্দর নিজের হৃদয়ে ভক্তি খুঁজিয়া পান না, কিন্তু সকল হৃদয়েই যেন ভক্তিকে মূর্ত্তিময়ী দেখেন। তাই তাঁহার এ ভাব। কাহার সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও—তাঁহার দাস্য ভাব—তাঁহাকে যেন নিবারিত করে।

যোগমায়াও আর সে যোগমায়া নাই। এবার—পিত্রালয়ে আসিয়া কন্যা যেরূপ মাতা পিতার স্নেহ নির্ভরে নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে—যোগমায়ার যেন আর সে নির্ভরতা নাই। যোগমায়া যেন হীনজাতি, কন্যা নহে—গৃহের দাসী। হরসুন্দর পরিবার যেন ভক্তির আশ্রয়।

হরসুন্দর, চিন্ময়ী, বিষ্ণুপ্রিয়া—যোগমায়ার এ ভাব দেখিতেছেন—কিন্তু কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা যতই দেখিতেছেন, ততই তাঁহার হৃদয় দ্রবিভূত হইতেছে। তিনি এ ভাব কিন্তু কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই। আজ আর হৃদয় চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, বলিলেন—"যোগা! তোমার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে আমরা থাকিতে তুমি গৃহ-কর্ম্মে এত ব্যস্ত কেন? বা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এত গৃহ-কর্ম্ম থাকিতে লোকের বাড়ীতে দাসীর যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম করিতেই তুমি অগ্রসর হও কেন? রন্ধন বা অন্য অন্য সেবায় তুমি এবার কেন এত দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা কর?"

যোগমায়া বলিলেন, "আমি রাঁধিতে পারি, কিন্তু তোমাদের মতন্ত রাঁধিতে পারিব না। না রাঁধিতে পারিলে, তোমাদের তাহা ভাল লাগিবে না। তোমাদের যাহা ভাল লাগে, আমার যেন তাহাই করিতে

ভাল লাগে, সেই আশীর্ব্বাদ আমায় কর।" এই বলিয়া যোগমায়া যেন আর কি বলিবেন—কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না। অপ্রতিভ হইয়া মুখ চুণ করিয়া রহিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। তিনি তাঁহার অন্তর ভাব বুঝিলেন, কিন্তু তাহা আবরণ করত জিজ্ঞাসিলেন, "লোকে বাঁধে—পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ীকে খাওয়ায়, তাহাতে আবার আমাদের মত, তোমাদের মত কি? আমি বুঝিলাম না—তুমি কি বলিতেছ?"

যোগমায়া তাহাতে কোন উত্তর দিতে চান না। বিষ্ণুপ্রিয়ার বার বার প্রস্তাবে বলিলেন, "লোকের পিতা বা লোকের ভাই—যে রূপ, আমার পিতা, আমার ভাই কি—সেই রূপ? যদি তাহাই হইত, বড় দাদার নিরুদ্দেশে বাবার উৎকণ্ঠা হীন সাম্য মূর্ত্তিতে, কি বউদিদি সেই সাম্য মূর্ত্তি অনুসরণ করিতে পারিতেন? ইচ্ছা হইত—মন মানিত?"

বিষ্ণু। স্থির না হইয়া কি করিবেন? ব্যাকুল হইলেত কোন উপায় নাই।

যো। এ কথা সকলেইত জানে, জানিয়াও যেমন লোকে অস্থির হয়, কই সে অস্থিরতা তাঁহাতে কোথায়? কেবল জানিয়া ফল কি?—ইহাই ফল।

বিষ্ণু। ভাল, তুমিওত অস্থির হও নাই, তবে তাঁহাতে তোমাতে প্রভেদ কি?

যো। ভেদ আছে বই কি দিদি! যদি বউদিদির মত আমি হইতাম, তাহা হইলে আমার মুখেও ঐ রূপ বিমল আভা খেলিত। আমি কেন শুষ্ক হইতে বসিয়াছি? আমার জ্ঞান—এ ভক্তিহীন শুষ্ক হৃদয়ের সেবা, সে সেবার উপযুক্ত নহে। আমি বহু ভাগ্যে এই সংসারের দাসী হইতে পাইয়াছি। আমি সে সেবার মর্ম্ম না বুঝিয়া সেবা করিতে গিয়া, এ ভাগ্য হারাইতে ভয় করি। সেবায় আমার বড় ইচ্ছা, কিন্তু আমি বড় মলিন। হৃদয় শুচি হইল কই? আমার ত্রুটী পদে পদে, তাই ভয় করি।

কার্য্য অনুরোধে জীবসুন্দর গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন। যোগ-

মায়ার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি গৃহে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতেই শুনিতে ছিলেন। যোগমায়ার কথায় তাঁহার শিবসুন্দরকে মনে পড়িল। আর তিনি দাঁড়াইলেন না,প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ যোগা! আমাদের ক্রটী পদে পদে, ভগবৎ সেবার— সাধু সেবার যোগ্য হৃদয় আমাদের নহে। যাঁহারা যোগ্য, তাঁহাদের সেবা দেখিবার যোগ্যও আমরা নহি। যদি হইতাম, তাহা হইলে বড়দাদার দ্বারে যে সেবা, তাহা যখন দেখিয়াছি, তখন দেখিবার চক্ষু ফুটে নাই কেন? যদি ফুটিবার সময় হইল, তবে বড় দাদাকে, সে সেবা হইতে অন্ত সেবায় লইলেন কেন? দাদা একদিন বলিয়া ছিলেন, ভগবানের লীলা এবং ভাগবতের সেবা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেবক রূপে ভাগবৎ—সেব্যরূপে ভগবান। শক্তিগত যত বিলাস, সকলই সেবক রূপেরই রূপান্তর। শক্তিমানগত যত বিলাস, সকলই সেব্য রূপের রূপান্তর। ভগবৎ শক্তিতে সেই সেবা ত্রিবিধ—বৈধী, রাগ এবং প্রেম। মায়ার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা না জানিলে, তাঁহার বৈধী সেবা যে কি, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি হয় না। আপ্তসেবায় যে সাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাহার তাহা বৈধী সেবা নহে। কারণ তাহা মায়ার জগৎ মোহিনী মূর্ত্তির খেলা। মায়ার জগৎ তারিণী মূর্ত্তির যে খেলা, তাহাতে জীব যেমন আপ্তসেবা ভুলে, তেমনি ভগবান, ভাগবতের সেবাও ভুলে; কিন্তু মায়ার ভগবৎ সেবা যে মূর্ত্তির খেলা, তাহাই তাঁহার বৈধী সেবা মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিতে তাঁহার বৈধী সেবা ভিন্ন, তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তির রস, রক্তের আসঙ্গ লিপ্সায় বা জগৎ তারিণী মূর্ত্তির জীবব্রহ্ম জ্ঞানে, তাঁহার বৈধী সেবা হয় না। হয় না বলিয়াই নানা উপধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, অমল কৃষ্ণে দাগ লাগায়।

"রাগ সেবা, প্রেম সেবাত দূরেরকথা, —তাঁহার বৈধী সেবাই বুঝিলাম না। মায়ার যে কি খেলা, তাহা যাহার মায়া—সেই জানে। সেই মায়ার ভগবৎ সেবা মূর্ত্তির খেলায়, আজ তোমার যে মূর্ত্তি, সে মূর্ত্তিতেও তুমি ভগবৎ সেবায় যোগদিতে কুণ্ঠিত, আর আমি কৃষ্ণেরপ্রকাশ রূপ গুরুকে মায়ার মোহনী মূর্ত্তির খেলায় মনুষ্য জ্ঞানে, তাঁহার সেবায় যোগ

দিতে ত্রুটী বোধ করি না। ধিক্ আমাকে—যোগা! আজ তুমি আমাকে তাঁহার বৈধী সেবার যে কত দূর পরভাব, তাহা বুঝাইলে কামিনী কুলে তুমি ধন্যা।”

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না,—সেই ভাবেই অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ মকর্দ্দমার দিন। বিচারে অনেক বাদানুবাদের পর, জ্যোতীপ্রসাদ যে, শিবসুন্দরকে “গুমি” করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই স্থির হইল এবং সে জন্য থানা তল্লাসির হুকুম বাহাল হইল।

আদালতে শশাঙ্ক, নটনারায়ণের সহিত কথা কহেন নাই। বসন্ত, শশাঙ্ককে দুই একটা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু শশাঙ্ক সে বিদ্রূপে কান দেন নাই।

সপ্তাহ মধ্যে থানা তল্লাসির হুকুম। এবার কোথায় স্থান ঠিক করা যায়, শশাঙ্কের ইহাই ভাবনা। কারণ শশাঙ্ক, বসন্তের বিদ্রূপে বুঝিয়া ছিলেন যে, সকলেই ‘সাগরতলীতে’ সন্দেহ করে।

যথাসময়ে শশাঙ্ক বাটী ফিরিয়া জ্যোতীপ্রসাদকে তাহা জানাইলেন। অনেক পরামর্শের পর উভয়ে “সাগরতলী,” অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেও পরামর্শের ত্রুটি হইলনা। কিন্তু উভয়েরই মন যেন বিচলিত। জ্যোতীপ্রসাদ বলিলেন, “এদিকে সন্ধ্যাও হইল, আজ রাত্রেই ‘সাগরতলী’ হইতে সরাইতে হইবে, ও সকল নহে, আমি মনে করিতেছি, “চন্দনতলার” গদীতে উহাকে রাখিব।”

শ। তাহা হইলেত ভাল হয়, কিন্তু এ রাত্রে মধ্যে গঙ্গা, একা নদী বিশক্রোশ, ঘটিয়া উঠিবে কি? বিশেষ আর পাঁচজনকে জানান হইবে না। যাহা করিতে হয়—আমিই করিব। যদি তাহাই মত হয়, একা আমিই সঙ্গে থাকিব, পাঁচমুখে কথা প্রকাশের সম্ভাবনা।

জ্যো। সেত সত্যই—তবে তোমায় একেলা একার্য্যে ছাড়িয়া দিই বা কি প্রকারে? মধ্যে যদি কোন বিপদ হয়, কে—সে সংবাদ দিবে? বিশেষ—সংবাদের জন্য অপেক্ষায় থাকিলেও হইবে না। সে জন্য আমিও সঙ্গে যাইব।

শ। বড়ই কষ্ট হইবে। বিশেষ বর্ষার দিন—যদি জল ঝড় উঠে, বিপদের সম্ভাবনা। আমি বলি—তোমার গিয়া কাজ নাই—আমাদের কষ্ট সহ্য আছে।

জ্যো। না—তাহা আমি ভাল বুঝিতেছিনা,—আমার যাওয়ার প্রয়োজন।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় "সাগরতলী" পঁহুছিয়াই দ্বারবান দ্বারায় "মনরু" মাঝিকে বার দাঁড়ে নিজের ছিপ প্রস্তুত রাখিতে হুকুম দিলেন।

এদিকে শশাঙ্ক ভৃত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শিবসুন্দরের চক্ষু বাঁধিয়া তাহাকে এইখানে লইয়া আয়।"

ভৃত্য তাহাই করিল। শিবসুন্দর সম্মুখে—মুখে মৃদু মন্দ হাসি। "সাগরতলী" হইতে গঙ্গা এক ক্রোশ। পথি মধ্যে যদি শিবসুন্দর চিৎকার করেন, সে জন্য শশাঙ্কের কানে কানে জ্যোতীপ্রসাদ বলিলেন, "উহার মুখ বাঁধিতে হইবে না কি? পথের মধ্যে বিভ্রাটত ভাল নহে?"

শ। মাঠ দিয়া লইয়া যাইব, এ রাত্রিতে সে ভয় নাই।

জ্যো। তবে আর বিলম্ব কি? বেহারা পাঁচ সাতটা সঙ্গে লও। চারি জনে বহিবে। বাকী সঙ্গে থাক—কি জানি।

যথা সময়ে, ভৃত্য শিবসুন্দরকে পাল্কিতে উঠাইয়া দিল। নিঃশঙ্কে শিবসুন্দর তাহাতেই প্রস্তুত—মুখে সেই মৃদু মন্দ হাসি। জ্যোতিপ্রসাদ কিন্তু তাহা দেখিতে ভুলেন নাই। সে দর্শনে শশাঙ্কের হৃদয় যেন আর এ খেলায় যোগ দিতে চাহে না। কিন্তু যাহার জন্য এ খেলা, সে এখনও খেলা ভুলে নাই।

যথাসময়ে সকলেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত। "মনরু মিয়া" হাজির। প্রথমেই শিবসুন্দরকে ছিপে তুলিতে আদেশ। যে মুহূর্ত্তে শিবসুন্দর ছিপে পা দিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। শশাঙ্ক আকাশ

প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন—স্থানে স্থানে সামান্য মেঘের রেখা থাকিলেও এ লক্ষণ ভাল নহে। তাঁহার ইচ্ছা—সে দিন ফিরেন, কিন্তু জ্যোতী প্রসাদ তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। তখন বেহারাদিগকে বিদায় দিয়া জ্যোতীপ্রসাদ ছিপ খুলিতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ তীব্র বেগে ছিপ ছুটিল। ক্রমে ক্রমে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া শশাঙ্ক তখনও ইতস্ততঃ করিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে মেঘের পর মেঘে আকাশ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সে অন্ধকারে শিবসুন্দরের ন্যায় জ্যোতীপ্রসাদ, শশাঙ্কও অন্ধবৎ হইলেন। তাড়াতাড়িতে "মনরু" ছিপে দীপ লইতে ভুলিয়াছিল, সে জন্য তাহার অদৃষ্টে আজ কি ঘটিবে, সে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

ক্রমে ঝড় উঠিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ মাথা তুলিয়া শিবসুন্দরকে দেখিতে লাগিল, আর জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্ককে বিদ্রূপ করিবার জন্য ছিপ লইয়া নানা ভাবে খেলা আরম্ভ করিল। ঝটিকা মহা বিক্রমে সেই খেলায় তরঙ্গের সঙ্গে যোগ দিল।

তখন জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্কের কথা মনে করিতে লাগিলেন। শশাঙ্ক কিন্তু আর সে কথা তুলিলেন না। জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন, "আমি যে সাঁতার জানি না"।

শ। তাহা জানি, কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি, সাঁতারেও ফল অসম্ভব। আবার সাঁতার ভিন্ন অন্য উপায় ও নাই। ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বাবু সাজিয়া থাকা আর ভাল হইতেছে না।

তখন সকলেই লজ্জাবস্ত্র মাত্র রাখিয়া বেশ ভূষা ত্যাগ করিলেন। শিবসুন্দরের কোন চেষ্টাই নাই। শশাঙ্ক তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন—সেই মৃদু মন্দ হাসি। তাহা দেখিয়া জ্যোতি-প্রসাদের মস্তক ঘুরিয়া গেল, বলিলেন—"শিবসুন্দর! তুমি সাঁতার জান?"

শি। দুই একবার সাঁতার দিয়াছিলাম।

জ্যো। আমি সাঁতার জানি না। যদি ডুবিতে হয়, আমি তোমায় আর শশাঙ্ককে ধরিব।

শ। তাহা ধরিতে পার, কিন্তু হাত বা পা ধরিবে না—সাবধান! নচেৎ ধরিয়া কোন ফল হইবে না। অথচ সকলকেই মারা যাইতে হইবে।

এখন আর সে জ্যোতীপ্রসাদ নাই। সেই জ্যোতীপ্রসাদ, সেই মন, বুদ্ধি, কিন্তু সে ভাব আর নাই। এখন জ্যোতীপ্রসাদ, শিবসুন্দরের সাহায্য প্রার্থী।

হঠাৎ মাঝিরা গোল করিয়া উঠিল, আল্লার নাম করিল। হঠাৎ শিবসুন্দর এক হাতে জ্যোতীপ্রসাদের হাত ধরিলেন, আর হাতে জল আলোড়নে সন্তরণ খেলায়। জ্যোতীপ্রসাদ অমনি বুঝিলেন—তিনি জলে ভাসিতেছেন।

অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার। শিবসুন্দরের মুখে এখনও সেই মৃদু মন্দ হাসি। কিন্তু তাহা জ্যোতিপ্রসাদ চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। কে জানে কেন—শিবসুন্দরের হস্ত স্পর্শে জ্যোতীপ্রসাদ বুঝিলেন যে—এ বিপদেও তাঁহার কেহ আছে।

এইরূপে যে কতক্ষণ গেল, জ্যোতীপ্রসাদ সে অন্ধকারে, অন্ধকার গত হৃদয়ে তাহার ধারণা করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের কথা মনে হইল, অমনি একটা তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার জ্ঞান রোধ করিল।

ক্রমে প্রভাতের আভা দেখা দিল। জ্যোতিপ্রসাদ আধ অন্ধকারে দেখিলেন, শিবসুন্দরের মুখে—সেই মৃদু মন্দ হাসি। হরি! হরি! জ্যোতি প্রসাদ ভাবিলেন—শিবসুন্দর! তুমি মানুষ না দেবতা। দেবতা না হইলে, এক হস্তে আমায় ধরিয়া, আর হস্তে অবহেলে এ সন্তরণ, এ কেমন? কচিৎ কেহ এ বলে বলী হইলেও, এ সময়ে এ প্রশান্ত মূর্ত্তি, শত্রুর প্রতি এ প্রশান্ত হৃদয়, দেবতা ভিন্ন মানুষেত সাজে না? বলিলেন, "শিবসুন্দর! একবার আমায় ছাড়িয়া দাও, তাহাতে মৃত্যু হয় হউক, একবার তোমায় যোড় হস্তে প্রণাম করিয়া লই। আর আমার হৃদয়ে প্রাণের মমতা নাই। আমার প্রাণের জন্য যাহার, আমার মত জীবের প্রতি এত দয়া—প্রাণ যায়—যাউক, যেন প্রণামের সময় ব্যর্থ না যায়।"

শিবসুন্দর হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। দূরে যেন তীর অনুভব করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণে তিনি অগ্রসর। ক্রমে সেই লক্ষ

নিকটের পর নিকটে, তীর বটে—কিন্তু তাহা প্রাচিরের ন্যায় জাগিলেও তটে, গভীর জল—দাঁড়াইবার স্থান নাই। বৃহৎ বৃক্ষের একটা জীর্ণ শাখা সেই তটে, জলোপরি আসিয়া ঝুলিতেছিল। অনেক কষ্টে শিবসুন্দর তাহা ধরিলেন। দেখাদেখি জ্যোতীপ্রসাদও তাহা ধরিলেন। কিন্তু জল হিল্লোলে উভয়েরই অঙ্গ দুলিতেছে, সে দোলাইত উভয় শরীরের ভর, সে জীর্ণ শাখা ধারণ করিতে ক্রমশঃই ছিন্নপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল, তাহা দেখিয়া শিবসুন্দর একবার জ্যোতিপ্রসাদের দিকে চাহিলেন. বলিলেন—"ছাড়িও না—একের ভারে ছিড়িবেনা।" তিনি কিন্তুহাত ছাড়িলেন, জ্যোতীপ্রসাদ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

চতুর্বিবংশ পরিচ্ছেদ।

আদালত হইতে হাকিম ইন্দ্রনারায়ণ বাড়ী আসিয়া একটু বিশ্রামের পর, একটী মিহি গেঞ্জি গায়ে দিয়া হারমোনিয়মে সুর দিলেন।

ইন্দ্রনারায়ণ বাহিরে বেশীক্ষণ বসেন না, কারণ পল্লীগ্রামের লোক তত সভ্য নহে, বিশেষ তিনি হাকিম হইয়া সকলের সহিত মিশিলে, তাঁহার গুরুত্বের হানি হয়। কিন্তু তিনি হাকিম হওয়া অবধি দেশের কতক গুলি শিক্ষিত, তাঁহার নিকট নিত্য দেখা করিবার প্রত্যাশায়, হাজির থাকেন, এবং যথা সময়ে দেখাও পান।

এখনও তাঁহারা সকলে উপস্থিত হন নাই। বিশেষ—সব গুলি উপস্থিত হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিবে, তখন ইন্দ্রনারায়ণ, ওরফে হাকিম বাবু উচ্চ হইতে নিম্নে নামিবেন।

হারমোনিয়মে সুর দিতেছেন বটে, কিন্তু মনে সুখ নাই। কিরণ শশি কেন এইরূপে বাজাইতে শিখিল না। বড় ঘরের মেয়েরা আজ কাল সকলেই বাজাইতে শিখেন। মাষ্টার রাখিয়া কন্যাকে স্বরলিপি শিক্ষাদেন, ইহাইত বড় লোকের লক্ষণ। নচেৎ পয়সা আনিলেই আজ কাল তাহাকে বড় লোক বলা যাইবে না। পয়সার সঙ্গে সভ্যতা, চাল, চলন দোরস্ত চাই। এ সকল নহিলে কি প্রেমের উদয় হয়?

হারমোনিয়মের সুর শুনিয়া কিরণশশি হেলিতে দুলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্বে একখানি চেয়ার; ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "বস প্রিয়ে! আজ শাক্যসিংহের বাড়ী গিয়াছিলাম, তাঁহার স্ত্রী কেমন হারমোনিয়ম বাজাইলেন। কিরণশশি বসিলেন না॥ যখন কিছুতেই বসিলেন না, তখন ইন্দ্রনারায়ণ মুখ খানি বিরস করিয়া যাহা হয়, বাজাইতে লাগিলেন। কিরণশশি মুখ খানি ভার করিয়া বলিলেন, "তোমার ত ওই রূপ সকলের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করা স্বভাব, তাহারা আবার বন্ধু, আমি ওসব ভাল বাসি না"

ই। ছি—কিরণ! তুমি সাম্য ভাবের মর্ম্ম বুঝিলে না। বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রীতে কি ভেদ আছে? আমাতে তোমাতে কি ভেদ আছে? তবে আমি যাহা ভোগ করিব, তুমি তাহা ভোগ করিতে পাইবে না কেন? ঈশ্বর, স্ত্রী, পুরুষকে কি ভিন্ন বস্তুতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? প্রেমের মর্ম্ম যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সে "প্রেজুডিস্" আর রাখেন না।

কি। রাখুক বা নাই রাখুক, আমার তাহা জানিবার দরকার নাই। তুমি কিন্তু কাহারও স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে পাইবে না। পর-স্ত্রীর মুখ দেখিবে না।

ই। কি বলিব কিরণ! মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। বাবার জন্য তোমার এক খানা 'ফটো' তুলিতে পারা গেল না। শাক্যসিংহ বিপিন কত সে জন্য দুঃখ করে।

কিরণশশি বসিতে চাহেন না। ইন্দ্রনারায়ণের অনেক আগ্রহে তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তুমি ভাব—তুমি বড় শেয়ানা, আর সকলেই বোকা। আমি এক দিন কোথাও তোমার ভয়ে যাইতে পারি না। যদি তোমার মনে এতই সাম্য ভাব, তবে আমায় কোথাও যাইতে দাও না কেন? আমি ওসকল ভাল বাসি না।" এই বলিয়া কিরণ শশি বিমর্ষ মুখে চলিয়া যান, ইন্দ্রনারায়ণ যাইতে দিবেন না। তখন ইন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "কিরণ! ছেলে বেলা কত কি ভাবিতাম, তখনও মনে সুখ পাই নাই—ভাবিতাম—বিষয়

হইলেই বুঝি সুখ হয়। যখন বিবাহ হয় নাই—ভাবিতাম—বিবাহ হইলেই বুঝি সুখ হয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি—আমার কপালে সুখ নাই। যাহা লইয়া জীবন, যে জীবনের এক মাত্র সহচরী, তাহার মুখের হাসি ভিন্ন—জগৎ দুঃখময়। এক দিন বক্তৃতায় সমগ্র ইউরোপের অধীশ্বর "নেপোলিয়ন" বলিয়াছিলেন, "আমার পৃথিবী জয়ের মূল শক্তি "জোসেফাইনা" আমি নাম মাত্র। যদি আমাতে প্রশংসার কিছু থাকে, তাহা জোসেফাইনার—আমার নহে। কারণ নারীই পুরুষের শক্তি। হায়, হায়, কিরণ! এ প্রেমের মর্ম্ম তুমি বুঝিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। ধন্য নেপোলিয়ন! তুমিই প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলে। কিরণ! বিশুদ্ধ প্রণয় স্বতন্ত্র বস্তু, তাহার সহিত সাধারণ প্রেমের তুলনা হয় না। প্রেমের মাধুর্য্য ইংরাজই জানে। প্রেমের এই বিশুদ্ধ ভাব দেখাইতে গিয়া বেদব্যাস কি কুৎসিৎ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। হইবে না কেন? তখন ইংরাজি সভ্যতায় মানব অলঙ্কৃত নহে। বেদব্যাস যে প্রেমের এ মর্ম্ম মাথায় আনিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তিনি ধন্য। তবে তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ ছিল না, তাই তাহা পশুত্বে পরিণত হইয়াছিল।"

আবার কিরণশশি বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "ঠাকুরদের নিন্দা? এত ভাল নহে। কাহার বলেতে তুমি হাকিম বল দেখি?"

ইন্দ্রনারায়ণ "হো" "হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বলিয়াছ ভাল, তোমার এমনি কৃষ্ণ—যে, দুই খানা বাতাসার লোভে তিনি আমার হাকিম করিয়া দিলেন, তবে তাঁহার বাতাসায় এত লোভ কেন?"

এত বক্তৃতায় যে অভিমান, ইন্দ্রনারায়ণ ভাঙ্গিতে পারেন নাই, তাঁহার, এই বিষম হাকিমি হাসিতে, সে অভিমান, কিরণশশিকে ছাড়িয়া পলাইল। কারণ এ রূপ হাস্যে কিরণশশির বড় লজ্জা হয়। ভাবেন—তবে বোধ হয় কোন 'বেফাঁশ' কথা বলা হইয়া থাকিবে। বলিলেন, "তাই বা কই দেওয়া হইল, একটু সোণার জন্য বাঁশিটা আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না।"

ই। আমার দোষ দেওয়া তোমার স্বভাব। তোমার সাজাইবার জন্য

কি না করিয়াছি? এত সুগন্ধি তৈল, বডি, সেমিজ, অলঙ্কার, ইহাতেও তুমি প্রেমের মর্ম্ম বুঝিলে না। বুঝিবে কি প্রকারে, তুমি বুঝি "নভেল" গুলি সব পড় না?"

কি। ছেলের বেলা—হার ইত্যাদি কত গহনা হইল, ঠাকুরও দিলেন। কিন্তু আমার গহনাগুলি ঠাকুর যে লইলেন, তাহা তুমিও দিলে না, ঠাকুরও দিলেন না। তা দিবে কেন! আমিত কেহ নহি।

ই। স্ত্রী ধনে তাঁহার অধিকার কি? ইংরাজি শিক্ষা পান নাই, কাজেই সে বুদ্ধি তাঁহার নাই। যাক, তিনি একদিক দিয়া তাহা লইয়াছেন, আমিও অন্য দিক দিয়া তাহা আদায় করিতেছি, সে জন্য ভাবনা নাই।

তখন শিবসুন্দরের মকদ্দমার কথা উঠিল। ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "যেন এ কথা প্রকাশ না পায়।"

কি। কাজ করিতেছ বটে, কিন্তু প্রকাশ হইলে বড় নিন্দার কথা। তবে তোমরা হাকিম মানুষ, যখন দশ জনের বিচার কর, তখন সে বুদ্ধি তোমাদের আছে, আমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝি। এবার কি গড়ান হইবে?

ই। তোমার অনেক দিন হইতে মুক্তা-মালার সাধ। আমি আজও সে সাধ পুরাইতে পারি নাই। এই বার জানিবে, আমি তোমায় কত ভালবাসি। কিন্তু এ সকল যেন কোন ক্রমে প্রকাশ না পায়।

কি। তুমি পাগল হইয়াছ না কি? পুরুষ মানুষ কোথায় কি করে, মেয়ে মানুষের সে খোঁজে কি দরকার।

ই। তাইত চাই। সংসারে হাকি হইলেই অসভ্য গুলা মাথায় চড়িতে চায়।

এখন সকলে বুঝুন—বিশুদ্ধ প্রণয়ের বিশুদ্ধ ভাব—কেমন সুন্দর

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে কতকগুলি জটাজূট ধারী সন্ন্যাসী, স্থির। শান্ত মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন। নিবিড় নির্জ্জন কানন, সংসারের কোলাহল সেখানে যাইতে পারে না। সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া এক জন বলিলেন, "গুরুদেব! দিব্যানন্দকে যে যোগশাস্ত্রের ক্রিয়াযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।"

এখন হইতে আমরা নরনারায়ণ-গুরু সন্ন্যাসীকে, পূর্ণানন্দ নামে এবং নরনারায়ণকে দিব্যানন্দ নামে উল্লেখ করিব। কারণ, যোগাশ্রমে তাঁহারা এই দুই নামেই নির্দ্দেশিত।

পূর্ণানন্দ বলিলেন, "চিত্ত বৃত্তির নিরোধে আত্মা, চিন্মাত্র অবস্থায় স্থিতি করেন। চিত্ত বৃত্তিতেই আত্মা, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত, তাহার নিরোধেই আত্মা, ঈশ্বরে একীভূত। এজন্য এই নিরোধীকরণকে যোগ বলা হইয়াছে। যোগ দ্বিবিধ—সমাধি যোগ এবং ক্রিয়াযোগ। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মের প্রবৃত্তি নাই, কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানের উদয় নাই। অতএব উভয়ই অঙ্গাঙ্গী ভাবে দৃষ্ট। অযোগী ব্যক্তির চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা নহে। গুরু, শাস্ত্রগত জ্ঞানের দ্বারায় ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত এবং একাগ্র অবস্থাগত চিত্তকে নিরুদ্ধ অবস্থায় আনয়ন করিতে যে, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান—তাহাই ক্রিয়াযোগ বা কর্ম্মযোগ। সেই কর্ম্মযোগে চিত্তের, ঐ চতুর্ব্বিধ অবস্থা অতিক্রমে যে, নিরুদ্ধ অবস্থার উদয়—তাহাই সমাধিযোগ। অতএব অন্য চতুর্ব্বিধ অবস্থা হইতে চিত্তকে, তাহার নিরুদ্ধ অবস্থায় যুক্ত করার নামই—যোগ। কারণ সেই নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্ত, আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্টা হ'ন, এবং তাঁহার সেই নিশ্চেষ্ট ভাবে, আত্মা বা দ্রষ্টা স্ব স্বরূপে উদিত হয়েন। ক্রিয়াযোগ তিন প্রকার—তপস্যা, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর প্রণিধান। আপনারা প্রাণায়াম যোগে সকলেই ক্রিয়ায় অগ্রসর। যাহার চিত্ত বিক্ষেপ শূন্য, একাগ্র, তাহার ক্রিয়াযোগে প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি চিত্ত অস্থির হয়, স্থিরতা রক্ষার জন্য তাহার উপায় উপদেশ শ্রবণীয়।"

"তপঃ অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং পঞ্চ-তপা ও জলস্তম্ভ ইত্যাদির অভ্যাস, স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রণব কিম্বা মন্ত্রাদির জপ, ঈশ্বর প্রনিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি, এই সকলের অভ্যাসকে ক্রিয়াযোগ বলা হয়।

"আমি দিব্যানন্দের সম্বেগ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র হিসাবে সম্বেগের তিন অবস্থা, আবার এক একটি অবস্থার এইরূপ তিন তিন অবস্থা। আমি দিব্যানন্দের যোগ-যত্ন-তৎ-পরতা দেখিয়া তাহাকে অধিমাত্র সাধকই বিবেচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, দিব্যানন্দের যোগ-যত্ন—অধিমাত্রের তীব্র সম্বেগ। অতএব সিদ্ধি সম্মুখেই। তোমরা সম্বেগ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা কর, তীব্র সম্বেগেই অবিদ্যার ধ্বংশ—ক্ষয়।

"যে জ্ঞান অনিত্যকে—নিত্য, অশুচিকে—শুচি, দুঃখকে—সুখ, এবং অনাত্ম পদার্থকে আত্ম পদার্থের ন্যায় বোধ করায়—তাহাই অবিদ্যা।

"এই অবিদ্যাদি মন ধর্ম্ম রূপ পঞ্চক্লেশ যথাঃ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, ক্রিয়াযোগের দ্বারাই দমন হয়।

"পঞ্চক্লেশের বাসনাকেই সূক্ষ্ম ক্লেশ বলা হয়। যেমন বস্ত্রের স্থূলমল ধৌত করত, অনলযন্ত্রের দ্বারায় তাহার সূক্ষ্মমল ধৌত করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ ধ্যান দ্বারা স্থূল ক্লেশ ও মনের একাগ্রতায়, বাসনা ত্যাগে সূক্ষ্ম ক্লেশ বিনষ্ট হয়।

"অবিদ্যাদি ক্লেশই বাসনার মূল। যদি তাহা সমূলে উৎপাটিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে আনন্দ বা পরিতাপ ফলে, চিত্ত স্থির হইবে না।

"অনাগত দুঃখই হেয়। কারণ যাহা গত—তাহা ভুক্ত, যাহা বর্ত্তমান—তাহার ভোগ বিনা উপায় নাই। যাহা সম্মুখে, যাহাতে তাহা গ্রাস না করিতে পারে, তাহাই কর্ত্তব্য।

"প্রকৃতি পুরুষ সংযোগের মূলই—অবিদ্যা। এই অবিদ্যা যদি ক্রিয়াযোগে নিরঙ্কুর হয়, তাহা হইলেই পুরুষ, সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। কারণ প্রকৃতিগত সুখ—দুঃখগত, অতএব তাহাও তেজ্য।

"কারণ আত্মা ও প্রকৃতি—স্বতন্ত্র তত্ত্ব। অবিদ্যার এক তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হওয়ায়—আত্মার এ বদ্ধাবস্থা। ক্রিয়াযোগে এইরূপ চিন্তা করিতে যে, এক অভূত পূর্ব্ব প্রজ্ঞার উদয় হয়—তাহাই বিবেক খ্যাতি। এই বিবেক খ্যাতিতে অবিদ্যার নাশ। এই বিবেক খ্যাতির অবস্থা বিশেষে সপ্ত সোপানে, যখন আত্মা কেবল চিন্মাত্র অবস্থায় নীত হন, তখন ঐ প্রজ্ঞারও ধ্বংশ হয়।

"যোগসিদ্ধির সাধনাঙ্গ আটটী। উত্তরোত্তর সাধনে জ্ঞানের দীপ্তি এবং তাহার শেষ সীমাই বিবেক খ্যাতি। সেই আটটী কি কি?

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। এইজন্যই ক্রিয়াযোগকে—অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়।

"অহিংসা, সত্যানুষ্ঠান, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ উপস্থ ইন্দ্রিয়ের দমন, অপরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগবিলাসে অনাসক্তি, এই কয় প্রকার কার্য্যের নাম—যম।

"শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই কয় প্রকার কার্য্যের নাম—নিয়ম। এ সকল 'যম' সাধনের সহিতই সাধনীয়।

"যাহাতে শরীর স্থির হয়, চিত্ত স্থির হয়, এরূপ ভাবে উপবেশনের নাম—আসন। আসন অনেক প্রকার। যে আসনে যাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই আসনই তাহার প্রকৃষ্ট।

"আসন সিদ্ধ হইলে সমাধির বিঘ্ন থাকে না। স্থির অবিকম্পিত সুখলাভে যোগী—শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসাদিতে অবিভূত হ'ন না।

"আসন সিদ্ধিতে প্রাণায়াম অভ্যাসের যোগ্যতা লাভ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের রেচন, পূরণ ও স্তম্ভন রূপ কুম্ভকই—প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। বাহ্য নিশ্বাস ত্যাগ, অন্তরে টানিয়া লওয়া এবং বদ্ধ করিয়া রাখা।

"উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম—যদি শরীরগত, স্থানগত পর্য্যালোচনায় কৃত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য করা হয়। আবরণরূপ অবিদ্যাক্লেশ—প্রাণায়ামে ক্ষয় হইতে হইতে সত্বঃগুণের প্রকাশ

হইতে থাকে। যদি এই প্রাণায়াম আয়াস সাধ্য এবং সুখোৎপাদক হয়, তবেই তাহা সুসিদ্ধ বলিয়া জানিবে। তাহাতে মন বিক্ষেপ শূন্য হইলেই স্থিরতায় ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়।

"যখন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামে—শরীর ও মন শুদ্ধ হইবে, তখন ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া চিত্তের অনুগামী হয়, এবং চিত্তের স্থিরতায় তাহারাও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়—ইহাই প্রত্যাহার।

"প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয় সকল বাধ্য হয়। অতএব যে যে ক্রিয়ায় সমাধি লভ্য তাহা শুনিলে। তাহার পালনেই ফলের দর্শন।

"ধারণা, ধ্যান, সমাধি কর্ম্মমার্গ অতিক্রমে, জ্ঞানের প্রাধান্যেই—যোগসিদ্ধির নিতান্ত অন্তরঙ্গ। এ বিধায় তাহা যোগকথনের সহিত অন্য দিন বলিব। এখন যম ও নিয়ম পালনের বিঘ্নের উল্লেখ করি।

"তামস মনোবৃত্তিগুলির নাম—বিতর্ক। যম ও নিয়ম পালনের সময় অনিমন্ত্রিত ভাবে এ গুলি আসিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে ছাড়ে না। সে জন্য প্রত্যেক বিতর্ক বৃত্তির বিরুদ্ধে, তন্নিবারক মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত রাখিতে হয়। ইহাতেই বিতর্ক বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

"অবিদ্যায় হিংস্র চিত্ত যাহার, যদি তাহার চিত্ত সত্য হিংসাশূন্য হয়, তাহা হইলে, সে চিত্তের নিকট হিংস্র জন্তুরও হিংসাপ্রবৃত্তির উদয় হইবে না। এজন্য বন্যজন্তু হইতে সমাধিস্থ যোগীর ভয় নাই।

"মিথ্যাকে যদি হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার বাক্য সিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ তোমার বাক্যতেজে তাহারা পুণ্য না করিয়াও পুণ্যফল ভোগ করিবে।

"যদি হৃদয় অচৌর্য্যে বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত রত্নাদি অনায়াসে লভ্য হইবে।

"যদি ব্রহ্মচর্য্যে সুসিদ্ধ হও, ব্রহ্মবীর্য্যে বীর্য্যবান হইবে।

'যদি অপ্রতিগ্রহে ভূষিত হইতে পার, তবে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান জন্মের কিছুই জানিতে বাকি থাকিবে না।

"শৌচ সেবা দ্বারা স্বশরীরে বা পরশরীরে তুচ্ছতা জন্মে, পরসঙ্গে ঘৃণা জন্মে। এ তুচ্ছতা, এ ঘৃণা—বৈরাগ্যের প্রকৃষ্ট সহায়।

"শৌচ অভ্যাসে সত্ব গুণের প্রকাশে যে সুখানুভব হয়—তাহাতে মনের প্রীতি জন্মে। সে প্রীতিতে বিষয় অনুরাগ দূর ও চিত্ত স্থির হয়। চিত্ত স্থির হইলেই, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল পরাঙ্মুখ থাকিলেই, ইন্দ্রিয় জয় হয়। ইন্দ্রিয় জয় হইলেই আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়।

"সন্তোষ অভ্যাসে যে সুখ লাভ, বাহ্য সুখের সহিত তাহার তুলনাই হয় না।

"তপস্যা অভ্যাসে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর, এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা জন্মে যে, তাহাতে ইচ্ছা মাত্র—শরীরকে অণু বা বৃহৎ করিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়দিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থে বা বহু দূরবর্ত্তী পদার্থে সংযোগ করিতে পারা যায়।

"স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ সম্মত প্রণব জপে বা ইষ্ট দেবতার স্তোত্র পাঠ ইত্যাদিতে ইষ্ট দর্শন লাভ হয়।

"ঈশ্বর প্রণিধানে পরিপক্বতা লাভ হইলে, বিনা যোগ সাধনে সমাধি লাভ হয়।

"অতএব যম ও নিয়ম প্রত্যেকরই পালনীয়। এ ভিন্ন আসন, প্রণায়ামে সমাধি ফলে নিরাশ হইতে হয়। দিব্যানন্দ সংসারে এই যম নিয়মে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল, এ জন্য তাহার সম্বেগ অনেকটা বিঘ্ন শূন্য।"

তখন সকলেই দিব্যানন্দ দর্শনে মনস্থ করিলেন। সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দও তাঁহাদের সঙ্গে দিব্যানন্দ দর্শনে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছদ।

বহু সৌভাগ্যে জ্যোতীপ্রসাদ প্রাণে বাঁচিয়াছেন। শিবসুন্দরের সাহায্যে বিশেষ কষ্ট ভোগও করিতে হয় নাই। দুই এক দিনেই পূর্ব্ব সুস্থতা লাভ করিয়াছেন।

শশাঙ্ক, জ্যোতীপ্রসাদের অগ্রেই বাটী ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবে বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কষ্ট পান নাই। উভয়ের প্রথম

দর্শনে উভয়ের যে আনন্দ, তাহা উভয়েই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবসুন্দরের কোন তত্বই পাওয়া যায় নাই। এ জন্য উভয়েই মনে মনে দুঃখিত থাকিলেও, কেহ কাহাকে কোন কথা প্রকাশ করেন নাই; গোপনে গোপনে দেবীগ্রামে শিবসুন্দরের তত্ব লওয়াও হইয়াছিল, কিন্তু শিবসুন্দর বাড়ীও ফেরেন নাই। শশাঙ্ক সাঁতার জানেন, অথচ জ্যোতিপ্রসাদের সে অবস্থায় কোন সাহায্য করেন নাই; সে জন্য শশাঙ্ককে, জ্যোতিপ্রসাদের নিকট হইতে দুই চারিটা বাক্যও শুনিতে হইয়াছিল। তবে সে অন্ধকারে, কে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল, কে কাহার তত্ব লইতে পারে? এজন্য কোন মন-মালিন্য ঘটে নাই।

শিবসুন্দরের অন্বেষণ জন্য অনেক চেষ্টাও করা হইতেছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। শিবসুন্দরের সাহায্যে জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণরক্ষা; তত্রাচ জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্কের নিকট তাহার কোন উল্লেখই করেন নাই; বরং তিনি শশাঙ্কের নিকট অনেক কথাই গোপন করিয়াছেন। অনৈক মাঝির দ্বারা তাহার প্রাণ রক্ষা, ইহাই প্রকাশ। শশাঙ্কও, জ্যোতিপ্রসাদের এ রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই।

শিবসুন্দরের নিরুদ্দেশে শশাঙ্ক বা জ্যোতিপ্রসাদ মনে মনে বড়ই চিন্তিত এবং দুঃখিত। কিন্তু কেহই কাহাকে মনের ভাব বুঝিতে দেন নাই।

সপ্তাহ মধ্যে থানা তল্লাসির হুকুম। এদিকে চারি পাঁচ দিন হইয়া গেল, কাহারও দেখা নাই। নিত্যই প্রতীক্ষায় থাকিতে হইয়াছে। তবে এখন আর সে ভয় নাই। তাহার অনুসন্ধানেই এখন উভয়ে ব্যস্ত।

জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্ককে বলিলেন, "শশাঙ্ক! কাজটা বড় ভাল হয় নাই। এখন বুঝিতেছি—বৃথা লোকটাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে।"

শ। আমিও তাই দেখিতেছি।

জ্যো। আমি ভাবিতাম—তুমি বুদ্ধিমান।

শ। আমিও তাই ভাবিতাম।

জ্যো। এখন দেখিতেছি—তাহা নহে।

শ। আমিও তাই দেখিতেছি।

জ্যো। কিন্তু, তাই বলিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবে না।

শ। তাও কি হয়।

জ্যো। শিবসুন্দরের নিরুদ্দেশে বিশেষ সুবিধাই হইল।

না। হইবে বৈ কি।

এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, আজ দুই প্রহরের সময় "সাগরতলীতে" খানাতল্লাসি হইবে। জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন "এখন বেলা কত ?"

শ। আরত তাহা হইলে দেরী নাই; আমাদের তাহা হইলে এই বেলাই প্রস্তুত হইতে হয়—প্রায় ৮টা হইবে।

তখন উভয়েই "সাগরতলীর" জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলেন। যথাসময়ে উভয়েই সাগরতলীতে উপস্থিত হইলেন। তদগ্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। সাক্ষীগোপালের ন্যায় জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্ক—তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানেও বসন্ত, নটনারায়ণ কোন সন্ধানই করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের যাহা বল, ভরসা—তাহা ফুরাইল। বুদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, উভয়ে মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন।

শশাঙ্ক, বসন্ত বাবুকে বলিলেন, "বসন্ত বাবু! এতদিন মোক্তারি করিয়া বয়সে বুড়া হইলেন কিন্তু, বুদ্ধিতে সেই ছেলেমানুষটিই রহিলেন দেখিয়া দুঃখিত হইতে হইল। আমরা আপনাকে বুদ্ধিজীবি বলিয়াই জানিতাম।"

বসন্ত বাবু ঘাড়টি নাড়িয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে—বলিলেন, "জানিবেন, জানিবেন—এখনি হইয়াছে কি ? অনেক বাকি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নোটবহিতে কি টুকিয়া লইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বইখানি ধীরে ধীরে "পকেটে" পুরিলেন। আবার চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। পরে যানারোহণে বিদায় লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত, নটনারায়ণও চলিলেন। দুই চারিজন আমলাবর্গ কিছুক্ষণ

জ্যোতিপ্রসাদের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাহা দেখিয়া শশাঙ্ক তাঁহাদের দূরে লইয়া গিয়া কি বলিলেন—তখন তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্কের মনে সুখ নাই। কেন নাই—তাহা কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিছু বিশ্রামের জন্য উভয়ে বৈঠকখানায় আসিলেন। ভৃত্য হাজির—যখন যে হুকুম, তাহাই তামিল হইতেছে কিন্তু, উভয়েরই মন যেন অস্থির।

অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিল। জ্যোতিপ্রসাদের এক এক বার মনে হইতেছে, সে অগাধজলে আমার জন্যই শিবসুন্দর মরিয়াছে। শশাঙ্ক ভাবিতেছেন, আমি খেলিতে পারিলাম না, শিবসুন্দর আমার খেলা ভঙ্গ করিল। যাহা ভাবিলাম, তাহা হইল না – যাহা ভাবি নাই, তাহাই হইল। এখন জ্যোতিপ্রসাদের প্রতিজ্ঞার উপায় কি? তাই বা ভাবি কেন?—হরসুন্দরে সবই সাজে। সে সংসারের জুতা মাথায় করিয়া লইয়াছে, আমার সাজে কি? যদি না সাজে—তবে আমার সাজাইতে যাওয়াও ভাল হয় নাই।

ভাবিতে ভাবিতে উভয়ের তন্দ্রা আসিয়াছে, উভয়ের পার্শ্বে বসিয়াই কে যেন গাহিতেছে;—

"ভবে সেদিন কবে হবে রে—
সিদ্ধ হবে পীরিতি সাধন।
অপ্রিয় জনে দেখিব সপ্রিয় রত্নধন॥
অকাম-অরুণ উদিবে, কামনা-নিশি নাশিবে,
হৃদকমলে প্রকাশিবে চিনি আকিঞ্চন॥
সঙ্গেতে অঙ্গ মিশাবে, সঙ্গের সঙ্গী হয়ে র'বে,
নিরহেতু নিরখিবে নিত্য নিরঞ্জন।
যেখানে সেখানে যাব, সুখ পেয়ে সুখে ভাসিব,
প্রেমামৃত রস রসনায় পিব, অকারণ দরশন॥"

কতক্ষণ যে এরূপে গিয়াছে, কে জানে। উভয়েরই চমক ভাঙ্গিয়াছে। উভয়েই চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তখনও আধনিদ্রা, যতই তন্দ্রার অপ্রসাদ—

ততই সে সুর দূরে। এখন বহু দূরে। যাহা শুনিতেছেন, তাহা অস্পষ্ট। অস্পষ্ট হইলেও যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছে।

জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন, "শশাঙ্ক! এ গলা শিবসুন্দরের বোধ হইতেছে না?"

শ। বোধ ত হইতেছে।

জ্যো। তবে শিবসুন্দর কি এইখানেই আছে? তাহাত বোধ হয় না।

শ। তাত হয়ই না।

এই বলিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষে জল, মুখ বিস্ফারিত, বর্ণ আরক্ত দেখিয়া একজন ভৃত্য কি বলিতে আসিতে ছিল, তাহা আর বলিতে সাহস পাইল না—সরিয়া গেল। তিনি হৃদয় আবেগ আর সহ্য করিতে পারেন না। হৃদয় কি ফুটিয়া বলিতে চায়, মুখ আর তাঁহার, বুজিয়া থাকিতে চাহে না। এবম্বিধ ভাবে শশাঙ্ক একটু দূরে, ভিন্ন গৃহে যোড়হস্ত হইলেন, বলিলেন, "হর-সুন্দর! বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না। অনেক ব্যথা দিয়াছি, সেই ব্যথায় হৃদয় ব্যথিত হইয়া এখন বুঝিল—এতদিন বুঝে নাই, তাই আমার এ খেলা। কিন্তু আমিত একার জন্য খেলিতে বসি নাই—খেলা ভঙ্গ করিলে কেন? কৃষ্ণত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই? জ্যোতিপ্রসাদত এখনও বুঝে নাই, প্রতিজ্ঞা ভুলে নাই, শির বিকায় নাই, তবে এ কি করিলে? জগাই মাধাইকে দিয়া মহিমা বিস্তার না করিলে, আমার মত পাষাণ হৃদয়—কে তোমার সাধুসঙ্গের মহিমা গাহিবে? তোমাকে তোমার মতন ভালবাসিতে পারি নাই। সংসার মায়ায়, কন্যার মায়ায়, তোমার নির্গুণ রূপ দেখিতে পাই নাই, দেখিবার জন্যইত আমার এ খেলা? কি সকাম নিষ্কাম দেখাইতেছ? আমাতে আমিত্বইত সকাম। সেই চক্ষেই তুমি স্বকাম, নচেৎ তোমাতে স্বকাম নিষ্কাম শব্দ স্পর্শে কি? নিষ্কাম যে স্বকামেরই পর-পৃষ্ঠ। কামই যে মায়া, তোমাতে মায়া স্পর্শে কি? ধন্য আমি—তাই আমার জন্য তোমার এ খেলা।"

তখন জ্যোতিপ্রসাদ ডাকিলেন, "শশাঙ্ক!" শশাঙ্কের আর সে ভাব নাই। সে শশাঙ্ক আর নাই। ধন্য শশাঙ্ক, জগৎ তোমার এ অন্তর সৌন্দর্য্যে অন্ধ। জগৎ তোমায় চিনে না। জগৎ—ঝোলা, মালা, গেরুয়া, টিকী চিনে। চিনে বলিয়াই জগতে এত সাধুর হাট।

শশাঙ্ক দেখিলেন, জ্যোতিপ্রসাদ তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। শশাঙ্ককে দেখিয়া জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন, "কি ব্যাপার বল দেখি?"

শ। রামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা যা'ক, সে যেন কি বলিতে আসিতেছিল, আমি সে কথায় কান না দেওয়ায়, সে চলিয়া গেল।

তখন 'রামাকে' ডাকা হইল সে বলিল, "জলঘরে কে যেন গাহিতেছে। নৌকা শিকলে বদ্ধ, সে জন্য আমি চাবি চাহিতে আসিয়াছিলাম, একবার জলঘরে গিয়া দেখিতে হইবে।"

জ্যো। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে ত আমরা জলঘরে সকলেই গিয়াছিলাম। তখন ত কেহ ছিল না? তাহার পরত আমরা আসিয়াই নৌকা চাবি বন্ধ করিয়াছি, তবে জলঘরে কে থাকিবে?

রামা কোন উত্তর করিল না। গৃহ হইতে চাবি বাহির করিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্কও চলিলেন।

সকলেই 'জলঘরে' উপস্থিত। দেখিলেন, সেই আয়তলোচন, দিব্যকান্তি, স্নিগ্ধকিরণ ভাবাঙ্গ মণ্ডিত—সেই সুন্দর, শিবসুন্দর—তাঁহাদের সম্মুখে। কি রহস্য জানি না—উভয়েই একবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। উভয়েই যেন উভয়কে কি লুকাইতে, ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইলেন, উভয়েই উভয়ের সে ভাব ধরিতে পারিলেন না।

কিছু পরেই জ্যোতিপ্রসাদ, শিবসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমায় না বলিয়া এখানে প্রবেশ করিলে কেন?"

শিব। আপনার হুকুম আমি তামিল করিয়াছি। আপনি ত আমায় বিদায় দেন নাই, আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে কি?

জ্যোতি। হউক না হউক, সে তত্ত্বে তোমার প্রয়োজন কি? তোমার সহিত আমার সে পরামর্শ নহে। তুমি এখানে কবে আসিয়াছ?

শিব। এইমাত্র আসিয়াছি।

জ্যোতি। এ কয় দিন কোথায় ছিলে ?

শিব। অচেনা পথে। আসিতে আসিতে দিন কাটিয়া গেল।

জ্যোতি। বাড়ী না গিয়া এখানে আসিলে কেন ?

শির। আমারত কোন প্রয়োজন ছিল না, এখনও নাই। আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আমার আসা।

জ্যোতি। তাহাতে তোমার কি প্রয়োজন ?

শিব। ভগবানের এ খেলা, সেই খেলায় ভগবৎ ভক্তি।

জ্যোতি। ভগবান চিনিয়াছ কি ? কে শিব, কে দুর্গা, কে হরি, কে রাম—চিনিয়াছ কি ? দেখিয়াছ কি ? বেদ বেদান্তে খুঁজিয়াছ কি ?

শিব। আমি মূর্খ, যাহাকে বেদ বেদান্তে খুজিয়া পায় নাই, মূর্খ দেখিয়া হৃদয়ে বসিয়া সেই আমার সংসার ঘুচাইয়াছে।

তখন সে হৃদয় ফুলিয়া উঠিয়াছে, নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, গণ্ড রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে—চক্ষু জলে ভাসিয়াছে। শিবসুন্দর গীত ধরিলেন ;—

> "ধুয়ে অঞ্জন, সে নিরঞ্জন, পরেছি নয়নে।
> শুক শুকী উভয়ে সুখী চোকোচোকি মিলনে॥
> ভালে পেয়ে গুরুবল—ঢালিয়ে ঈক্ষণ জল,
> হয়েছে সে কার্য্য সফল—নাহি কজ্জল লোচনে॥
> নাহি করি ডাকাডাকি—ত্রিকালে দিয়েছি ফাঁকি,
> আঁখি ছাড়া নাহি রাখি—জেগে ঘুমায়ে স্বপনে॥
> যেখানে সেখানে থাকি—জলে স্থলে যা নিরখি,
> কি গগনে উড়ে পাখি—নাহি দেখি সে বিনে॥"

শশাঙ্ক বলিলেন, "এখন গান রাখ। এই বয়সে ঢের বুজরুক দেখিলাম। নৌকা লোহার শিকলে কুলুপে বন্ধ ছিল, তুমি এখানে আসিলে কিরূপে বলদেখি ? দিন দু'প্ররে কেহ দেখিতে পাইল না ?"

শিবসুন্দর হাসিতে লাগিলেন। জলসিক্ত পরিধেয় বস্ত্রখানি দেখাইয়া বলিলেন, "এই ঘরে আমার স্থান দিয়াছিলেন, আমার জন্য ত

কখন তালা খুলিয়া দেন নাই। যেরূপ করিয়া তখন আসিতাম, আজও সেইরূপ করিয়া আসিয়াছি। কেহ দেখিল কি না, তাহা মনে করিয়া দেখি নাই।"

তখন উভয়েরই চক্ষু, সিক্ত বসনের প্রতি পড়িল। জ্যোতিপ্রসাদ 'রামাকে' শীঘ্র একখানি কাপড় আনিতে বলিলেন। শশাঙ্ক আর শিব-সুন্দরের প্রতি চাহিতে পারিলেন না। স্বভাব গোপনে তিনি তখন এতই অক্ষম যে, সহসা সে স্থান হইতে বাহিরে আসিলেন। জ্যোতি-প্রসাদ, শিবসুন্দরের এ ভাবে ভাবিলেন—হরসুন্দর মানব নহে, দেবতা। শিবসুন্দর—হরসুন্দরেরই রূপান্তর।

জ্যোতিপ্রসাদ বাহিরে আসিয়া শশাঙ্ককে বলিলেন, "উহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দাও। কাজ ভাল হয় নাই।"

শ। তাও কি হয়? এখন পাঠাইলে বসন্ত, নটনারায়ণ ফেরে ফেলিতে পারে, তাহার খোঁজ রাখ কি?

জ্যোতি। তবে যাহা বুঝ—কর।

এই বলিয়া জ্যোতিপ্রসাদ চলিয়া গেলেন। শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন—জ্যোতি! অহঙ্কাররূপ চিত্ত পর্ব্বতের চূড়া হইতে ভক্তি প্রস্রবণে দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নামিয়া তাহাতে ডুব না দিলে হৃদয় মল ধৌত হয় না। না হইলে মেঘরূপ তম আবরণ, এ ভাব জাগরূক রাখিতে দিবে না।

জ্যোতিপ্রসাদ যাইতে যাইতে আপন মনে বলিলেন, "শশাঙ্ক! তোমার এ ষড়যন্ত্র আমি এত দিনে বুঝিয়াছি—তুমি বন্ধু বটে। তোমার মত বন্ধু যাহার, সে ধনী। কিন্তু দেখিব—হরসুন্দরের সহিত লৌকিক সম্বন্ধ ভিন্ন, তোমার আর কোন সম্বন্ধ আছে কি না। তাহা-তেই বুঝিব—তুমি আমার কোন বন্ধু।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। জীবসুন্দর শয্যায় যোড় হস্তে নাম স্মরণে ভগবৎ সেবার প্রার্থনায় স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। বাতায়ন রন্ধ্রগত অস্পষ্ট আলোকে হরসুন্দর তাহা দেখিয়া বলিলেন, "জীব, প্রভাত হইয়াছে উঠ। তাহাকে হৃদয়ে দেখিয়া—তাহার সেবা কর।"

জীবসুন্দর শয্যা হইতে উঠিয়া তামাক সাজিলেন। হুকাটী হরসুন্দরের হস্তে দিয়া তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে যোড় হস্তে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! গুরো! তোমার দর্শনেই তোমার ভগবৎ মূর্ত্তি দর্শন হয়, সে দর্শন দানও তোমার লীলা। যে অনুষ্ঠান, কর্ত্তাকে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে, সেই অনুষ্ঠানই—লীলা পদবাচ্য। জীব বিচ্যুত হয় বলিয়া, তাহার সে লীলা স্থানীয় অনুষ্ঠানই—ক্রিয়া পদবাচ্য। তাই লীলা দোষশূন্য। তুমি নিত্যানন্দ হইয়াও, তোমাতে যে রস অনন্ত ভাবে নিত্য প্রকটিত, সেই রস আস্বাদন হেতু, তৎ তৎ রসে যে তোমার—উদয় মূর্ত্তি, তাহাই তোমার লীলা জানি; কিন্তু তুমি একস্বরূপ ও তোমার লীলাশক্তিরূপা যোগমায়াও একস্বরূপা। অতএব কি ভাবে তোমার এ অনন্ত লীলা, আজ হৃদয় সেই প্রসঙ্গের জন্যই বড় ব্যাকুল। জানিতে চাহে—তোমার আত্মস্বরূপই বা কি? এবং সেই অচিন্ত্য স্বরূপিণী যোগমায়ারই বা স্বরূপ কি? আর কোন্ মায়ার দ্বারাই বা লোক নিত্য জগৎভোগে নিমজ্জিত।"

হরসুন্দর, জীবসুন্দরের সে ভাবে হাসিতে হাসিতে তামাক টানিতে লাগিলেন। জীবসুন্দরের জিজ্ঞাসা আর ফুরায় না, হরসুন্দর বলিলেন, "শাস্ত্রগত জ্ঞানরূপ পরোক্ষ জ্ঞানে লাভ কি? যে শক্তি প্রাপ্ত করিয়াছ, তদ্দ্বারা নাম, রূপ, গুণ, লীলা দর্শনে যে জ্ঞান, তাহাই অপরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান ক্ষণভঙ্গুর, কারণ দর্শন ভিন্ন কৃষ্ণ, বিষ্ণু, আকাশ কুসুম। দর্শন ভিন্ন নিত্য লোভের উদয় নাই, লোভ ভিন্ন রাগ ভক্তির উদয় হয় না, রাগ ভক্তি ভিন্ন অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে না,

অপরোক্ষজ্ঞান ভিন্ন প্রেমভক্তির উদয় হয় না, প্রেমভক্তি ভিন্ন ভগবৎ স্বরূপ দর্শন হয় না। অতএব পরোক্ষজ্ঞান বিস্তার করিও না। রাগভক্তিতে পরোক্ষ, অপরোক্ষে সঙ্গত হয়, কিন্তু রাগ শূন্যে পরোক্ষ—মনের কল্পনা।”

এইরূপ নানাকথার পর, জীবন্সুন্দরের আগ্রহে বলিতে লাগিলেন, “ভগবান শক্তিমৎ বিগ্রহ, সৎ—চিৎ—আনন্দ তাঁহার স্বরূপ। সে স্বরূপ অচিন্ত্য, তাঁহার মায়াও অচিন্ত্যনীয়া। এ মন, বুদ্ধি, বাক্যের সে দেশে গমন নাই। অতএব বাক্যদ্বারে তাঁহার স্বরূপ, লীলা—অব্যক্ত। কিন্তু তদ্গত ভক্তিসিদ্ধিতে তিনি ব্যক্ত ভাবেই পরিচয় দেন, ভক্তে এ কৃপা তাঁহার নিত্য, সে হেতু ভক্তের—তত্ত্ব কীর্ত্তন অঙ্গ—সাধন।

“জীবের যে রূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর—ভগবানে সে রূপ সৎ—চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ। কিন্তু জীবে যে রূপ দেহ-দেহী পৃথক্ তত্ত্ব, ভগবানে সে রূপ নহে—এক তত্ত্ব। ওই বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ।

“এ জন্য স্বরূপ নির্দ্দেশে, মায়িক শব্দে যে সকল দোষ অপরিহার্য্য, সেই দোষে তাঁহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত নানা ভেদ দর্শিলেও, তিনি তাহা হইতে অতীত।

“জীব শরীর যেমন স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণগত, বৃহৎ জড় মায়াগত ব্রহ্মাণ্ডের অণু—তেমনি সৎ-চিৎ-আনন্দময় মধ্যম স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণের, স্বরূপ শক্তির বিকাশাত্মক চিন্ময় মায়াগত চিদ্‌ভুবন।

“মধুচক্র যেমন সূর্য্যের মধ্যগত হইয়াও সূর্য্যমূল, তদ্রূপ কৃষ্ণ, চিদ্‌ভুবনের মূল। যেমন একই বৈদূর্য্য মণি—নীল, পীত, লোহিত বর্ণে দৃষ্ট, তদ্রূপ একই ভগবান সৎ—চিৎ—আনন্দ স্বরূপ। যেমন মধুচক্র শক্তি, মধুচক্রে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও, প্রভাবে সূর্য্যমণ্ডল রূপে, মধুচক্রের বাহিরে সংস্থিত, তদ্রূপ যে শক্তি ভগবানে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও প্রভাবে মণ্ডলরূপে ভগবানে সংস্থিত, তাঁহাকেই স্বরূপ শক্তি বলা হয়।

“যেমন একই ভগবান সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, তদ্রূপ একই, স্বরূপ শক্তি সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনীময়া। সদংশে—সন্ধিনী, চিদংশে—সম্বিৎ এবং আনন্দ অংশে—হ্লাদিনী। যে শক্তি যাহে ভগবান সৎস্বরূপ

হইয়াও সত্তাবিশিষ্ট রূপে প্রতিভাসিত এবং দ্রব্য, কাল, প্রকৃতি ও জীবকে সত্তাবিশিষ্ট করেন—তাহাই সন্ধিনী; যে শক্তি দ্বারে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান, জ্ঞানবিশিষ্ট রূপে প্রতিভাসিত এবং জীবকে জ্ঞানদানে স্বসামুখ্যে উন্মুখ করেন—তাহাই সম্বিৎ; এবং যে শক্তি দ্বারে ভগবান, আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও, আনন্দবিশিষ্ট ভাবে ভাসমান এবং জীবকে আনন্দ দানে স্বস্বরূপ দর্শন করাইয়া আনন্দিত করেন—তাহাই হ্লাদিনী।

"ভগবান চিদাত্মক রসস্বরূপ। রসস্বরূপের যোগহেতু শক্তিকে স্বরূপশক্তি বলা হয়। শক্তিযুক্ত এ হেতু সে স্বরূপকে, শক্তিমান বলা হয়। সেই শক্তি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের ভগ স্বরূপ, এ হেতু শক্তিমানকে ভগবান বলা হয়।

"স্বরূপশক্তি সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী ভাব সাম্যে, শক্তিমান স্বরূপে অভেদে স্থিতি করিয়াও, ভগবানের লীলায় স্বগত তিন ভাবের এক এক ভাব প্রাধান্যে, শিখা যেমন বহ্নি হইতে পৃথক ভাবে উদিত হয়, তদ্রূপ দ্বিধাভাবে, তিনটী প্রভাবে নিত্য প্রকটিত।

"সম্বিৎ প্রভাবে—বিলাসী কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞানের পরিচয়। ওই জ্ঞানের আশ্রয়—তদীয় স্বরূপপ্রকাশ মূর্ত্তি।

"হ্লাদিনী প্রভাবে—কৃষ্ণের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রেমের পরিচয়। ওই প্রেমের আশ্রয়—তদীয় মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রেমবিলাস মূর্ত্তি, স্বরূপ ইচ্ছা, জ্ঞান এবং বলময়ী শ্রীমতী রাধিকা, ও মহালক্ষ্মী।

"সন্ধিনী প্রভাবে—কৃষ্ণের লীলাইচ্ছা, জ্ঞান এবং বলময়ী মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সত্তাবিলাস মূর্ত্তি—লীলা শক্তির পরিচয়।

"আদৌ সত্ত্বের স্বরূপ—অব্যক্ত। অব্যক্ত অর্থাৎ যাহার স্বপ্রকাশে ক্ষমতা নাই। এ জন্য সত্তাশক্তিকে অব্যক্ত শক্তিও বলা হয়। স্বপ্রকাশ লীলাশক্তি দ্বারে তাহার প্রকাশ। সেই প্রকাশ দ্বিবিধ—চিৎ এবং অচিৎ বা জড়।

"যখন লীলাশক্তির স্বরূপ এবং চিন্মুখ আভাস দ্বারে অভিভূত হইয়া সত্তা প্রকাশ পান, তখন সত্তা—চিৎ, যখন লীলাশক্তি গত চিদ্বিমুখ আভাস-শক্তি দ্বারে প্রকাশ পান, তখন—অচিৎ। চিৎসত্ত্ব,

অচিৎসত্ত্বে নির্লিপ্ত ভাবে—শুদ্ধসত্ত্ব, লিপ্তভাবে—পরসত্ত্ব, এবং অচিৎ-সত্ত্বকে অপরসত্ত্ব বলা হয়। অতএব সত্ত্ব ত্রিবিধ। আবার শুদ্ধসত্ত্ব—ত্রিবিধ;—হ্লাদিনী গত, সম্বিৎগত এবং সন্ধিনী গত। এই সন্ধিনী গত সত্ত্বকে—লীলাসত্ত্ব এবং হ্লাদিনী, সম্বিৎ প্রভাব গত সত্ত্বকে—স্বরূপসত্ত্ব বলা হয়। যখন লীলার—হ্লাদিনী এবং সম্বিৎগত শুদ্ধসত্ত্বে কার্য্য—তখন তাঁহাকে মাধুর্য্য-শক্তি এবং সন্ধিনীগত শুদ্ধসত্ত্ব, পর-সত্ত্ব এবং অচিৎসত্ত্বে তাঁহার কার্য্য, তখন তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য-শক্তি বলা হয়। চিদচিৎ যুক্ত ভাবে তাঁহার স্থিতি, এজন্য তাঁহাকে যোগমায়া বলা হয়।

"যোগমায়া অচিৎ নির্লিপ্তে কেবল চিৎ কার্য্যে—চিৎ শক্তি। যোগ-মায়া অচিৎ লিপ্তে চিৎ, অচিৎ কার্য্যে—চিদচিৎরূপিণী পরা অপরাময়ী—কুণ্ডলিনী। চিৎশক্তিতে কৃষ্ণের চিৎসত্তা-বিলাসের পরিচয়। এই চিৎসত্তার আশ্রয়—এই শুদ্ধসত্ত্বরূপ বর্ত্তিতে, দীপ হইতে দীপের ন্যায় যে, কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি—তিনিই বলরাম। চিদচিৎ শক্তিতে কৃষ্ণের চিদচিৎ সত্তাবিলাসের পরিচয়। এই চিদচিৎ সত্তার আশ্রয়—বা চিদচিৎ রূপ অম্লে, দুগ্ধ স্বরূপ কৃষ্ণের, দধিরূপ পৃথক অহঙ্কারে যে, তদীয় চিদচিৎ সত্তাবিলাস মূর্ত্তি—তিনিই গোপেশ্বর।

"যোগমায়া স্বরূপশক্তিগত হ্লাদিনী যোগে—ভক্তিশক্তি, ভক্তি—শৃঙ্গার ভাবে—লীলা, সম্বিৎ যোগে জ্ঞান ভাবে—ভূ, এবং সন্ধিনী যোগে ঐশ্বর্য্যরূপা—শ্রীশক্তি। চিদচিৎ সত্তা যোগে—সর্ব্বাধার শক্তি।

"চিৎ শক্তির দ্বিবিধ অবস্থা। মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য। সন্ধিনীগত শুদ্ধসত্ত্ব অভিভূত চিৎ—ঐশ্বর্য্য শক্তি, এবং সন্ধিনীগত শুদ্ধসত্ত্ব অনভি-ভূত ও হ্লাদিনী, সম্বিৎগত শুদ্ধসত্ত্ব অভিভূত চিৎ—মাধুর্য্য শক্তি। চিৎ অভিভূত লীলাসত্ত্ব—ঐশ্বর্য্যসত্ত্ব, চিৎ অভিভূত স্বরূপসত্ত্ব—মাধুর্য্যসত্ত্ব।

"এইরূপ কুণ্ডলিনী শক্তিরও—দ্বিবিধ অবস্থা। পর এবং অপর। কারণ, আভাসের দুই বৃত্তি—চিদ্বিমুখ এবং চিন্মুখ। চিন্মুখ বৃত্তিতে আভাস—বিদ্যা, এবং চিদ্বিমুখ বৃত্তিতে আভাস—অবিদ্যা। বিদ্যা

বৃত্তিতে কুণ্ডলিনী—পরাশক্তি, এবং অবিদ্যা বৃত্তিতে কুণ্ডলিনী—অপরাশক্তি। পরাশক্তি অভিভূত সত্ব—পরসত্ব, এবং অপরা বা মায়াশক্তি অভিভূত সত্ব—অপরসত্ব। এই অপরসত্বই জড় বা অচিৎ এবং অপরসত্ব লিপ্ত যে চিৎ বা শুদ্ধসত্ব তাহাই—পরসত্ব। এই জন্য বিদ্যাকে চিন্ময় বলা হয়।

"ভগবানের লীলা-ইচ্ছাশক্তি এবং সত্তাশক্তি মিলিতভাবে প্রকৃতি স্বরূপা। অতএব প্রকৃতির দুই বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। ভগবানের লীলাইচ্ছায়, লীলা সাধিত হয়। সেই লীলা ইচ্ছাই—নিমিত্ত এবং যাহা কার্য্যে অন্বিত থাকে—তাহাই উপাদান, এ হেতু সত্তাশক্তিকে উপাদান বলা হয়।

"অতএব চিৎশক্তি, শুদ্ধসত্ব মিলিত ভাবে চিৎ প্রকৃতি। চিৎ প্রকৃতির উভয় বৃত্তিই—চিৎ, এ হেতু তাহার নিমিত্ত, উপাদান অভেদ হইলেও—উপাদান চিৎ হইলেও, লীলার সৌকর্য্যার্থে সত্তা, জড়ের ন্যায় পরিলক্ষিত হইলেও, উভয়ই এক তত্ব, এ বিধায় তাহার নিমিত্ত, উপাদান ভেদ করা যায় না।

"চিৎপ্রকৃতির ন্যায় পরাপ্রকৃতিও নিমিত্ত, উপাদানে অভেদ। কারণ পরসত্ব, অচিৎ বা ত্রিগুণা নহে। না হইলেও তাহা সগুণা অর্থাৎ ত্রিগুণে লিপ্তা। এ হেতু পরাপ্রকৃতির—চিৎপ্রকৃতি হইতে—ভেদ কল্পনা। নচেৎ নির্লিপ্তভাবে—ইনিই চিৎশক্তি।

"অপরাপ্রকৃতিই নিমিত্ত, উপাদানে ভেদ। ইহাকেই মায়া প্রকৃতি বলা হয়। মায়ার দুই বৃত্তি—অবিদ্যা এবং অপরসত্ব। অবিদ্যা নিমিত্ত এবং অপরসত্বই উপাদান। এই অপরসত্বই সাংখ্যোক্ত—প্রধান, শঙ্করাচার্য্যের—অজ্ঞান।

"পরসত্বময়ী বিদ্যাই—মুক্তিদায়িনী, অপরসত্বময়ী অবিদ্যাই—বন্ধকারিণী।

"যাহার দ্বারা পরিমাণ হয়—তাহাকেই মায়া বলা হয়। ভগবানের শক্তির দ্বারাই ভগবানের পরিমাণ, এ হেতু শক্তি মাত্রকেই মায়া বলা হয়। বিদ্যাকে দৈবী বা বৈষ্ণবী মায়া এবং অবিদ্যাকে আসুরী মায়া বলা হয়।

"যোগমায়া মাধুর্য্যসত্ত্বে—মন্ত্রদুর্গা। ঐশ্বর্য্যসত্ত্বে—মহাদুর্গা। পরসত্ত্বে—দুর্গা। অপরসত্ত্বে—ছায়াদুর্গা, মহামায়া বা যোগনিদ্রা।

"সময়ে সময়ে শাস্ত্রে চিৎশক্তিকে আত্মমায়া এবং কুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবমায়া বলা হয়, কারণ ভগবানের আত্মলীলায় চিৎশক্তির কার্য্য এবং জীবলীলায় কুণ্ডলিনার কার্য্য; এবং সত্ত্বাশক্তিকে গুণমায়া বলা হয়। অতএব গুণমায়া দ্বিবিধ—চিৎ ও অচিৎ।

"অতএব দুর্গা—কার্য্যবশতঃ চিৎ, পরা, জীব ও মায়া রূপিণী হইলেও, স্বরূপত কৃষ্ণের লীলাইচ্ছাশক্তি, শ্রী-ভূ-লীলা রূপা যোগমায়া। এহেতু দুর্গায় রাধায় ভেদ দেখিতে নাই। এই জন্যই নারদ পঞ্চরাত্রে, দুর্গার রাধিকা অভিমান। এ হেতু দুর্গাকে, নারায়ণী, কৃষ্ণা, চিন্ময়ী, আবার চিদচিৎ রূপা পরা অপরাময়ী কুণ্ডলিনীও বলা হয়। কারণ চিৎপ্রকৃতিতে পরসত্ত্ব, ঐশ্বর্য্যসত্ত্ব, মাধুর্য্যসত্ত্ব এই তিন ও অর্দ্ধ চিৎ বৃত্তি, এই সার্দ্ধ ত্রিকুণ্ডলে, এবং কুণ্ডলিনী প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন, বা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন, বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন ও অর্দ্ধ আভাস, এই সার্দ্ধ ত্রিকুণ্ডলে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় ইনি নিত্যস্থিতা।

"আমি পূর্ব্বে স্বরূপশক্তির স্বরূপ বর্ণনায়,—যাঁর স্পর্শে লৌহ সোণা হয়, কাঁচা তিনি শ্রেষ্ঠ নয়, পরশে পরশ হয়—যাঁর ক্রমে, তাঁরে রাধা কয়—এই রূপ যে বলিয়াছি, তাহার কারণ—অচিৎ নির্লিপ্তে চিৎ, স্বরূপ শক্তির অভেদ পরিণতি, এজন্য চিৎশক্তিকে স্বরূপশক্তিই বলা হয়। অচিৎলিপ্তে চিৎশক্তিই পরাশক্তি নামে অভিধেয়। জীবশক্তি তাঁহার ভেদাভেদ পরিণতি, এবং অপরা বা মায়া তাঁহার ভেদ পরিণতি। এই অভেদ, ভেদাভেদ, ভেদ পরিণতি তাঁহার যে স্বরূপ হইতে, সেই স্বরূপকে তাঁহার লীলারূপ এবং যে স্বরূপ সেই লীলাস্বরূপের আশ্রয়, তাহাই তাঁহার স্বরূপ। ঐ স্বরূপরূপের আশ্রয়—ভগবান স্বয়ংরূপে কৃষ্ণ। এবং তাঁহার লীলাস্বরূপের অনন্তরূপে কৃষ্ণের অনন্ত বিলাসরূপ। অতএব যোগমায়ারূপিণী লীলা, তাঁহার স্বরূপরূপ রাধার অভেদ, কারণ লীলা হেতু স্বরূপেরই এ লীলারূপ। স্বরূপশক্তি রাধিকা স্পর্শে জীব, স্পর্শমণি রূপা গোপীদেহ লাভ করে,

এবং লীলারূপা যোগমায়া স্পর্শে লৌহরূপা জীব, চিদঙ্গরূপ স্বর্ণ হয়। কিন্তু জড়রূপা লৌহ স্পর্শমণির আদর বুঝে না, এজন্য সে অন্ধতায় স্পর্শমণির সন্ধান পায় না। স্বর্ণ হইলে সে, স্পর্শমণির সন্ধান পায়—আদর বুঝে। যোগমায়াই পরাশক্তিরূপে ভগবৎ সাধনভক্তি, চিৎশক্তিরূপা সাধ্যভক্তির সম্বন্ধ সূত্ররূপা। অতএব যোগমায়াই গুরুরূপিণী। বলরাম, গোপেশ্বর—যোগমায়ার সৃষ্টিশক্তিতে সৃষ্টি কার্য্যে ঈশ্বর হইয়াও, এই ভক্তি-সূত্রে, চৈত্যরূপে কৃষ্ণের লীলা প্রকাশরূপ—জগৎগুরু। এই প্রকাশ রূপে কৃষ্ণ—অভেদ। সে হেতু যিনি, এই প্রকাশরূপে অভেদ—তিনিই মহান্ত। অতএব গুরু, কৃষ্ণ—অভেদ। মহান্তই—দীক্ষাগুরু, যিনি একের দীক্ষাগুরু, তিনিই অপরের শিক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং কৃষ্ণ—অভেদ। মহান্ত যেমন পরা, অপরাশক্তি যুক্ত, শিবও তদ্রূপ কুণ্ডলিনী শক্তিযুক্ত, এহেতু শিবকেও—মহান্তগুরু বলা হয়। বিষ্ণুর মায়া সম্বন্ধ না থাকায়, বিষ্ণুই—চৈত্যগুরু।

"কৃষ্ণের সন্ধিনীপ্রভাবে সূর্য্যস্বরূপা পরাশক্তির যে কিরণরূপা ভেদাভেদ শক্তির উদয়, তাহাই প্রজাপতি ব্রহ্মারূপী জীবশক্তি। ইনি সশক্তিক—এ হেতু তাঁহাকেই সাবিত্রী শক্তি বলা হয়। কিরণ যেমন সূর্য্যের অপেক্ষায় স্থিত, জীবশক্তি তদ্রূপ বিধায়—পরাশক্তি জীবাশ্রয় স্বরূপা। এই জীবশক্তি, কুণ্ডলিনীর পরা, অপরা মধ্যগত—তটস্বরূপা। জীবশক্তিগত সত্ব, পরাসত্ব হইলেও কিরণসত্ব হেতু উভয়ের গ্রাসযোগ্য। এই তটস্থ স্বভাবে জীবের প্রকট, এ হেতু জীব দ্বিবিধ। এক নিত্য-মুক্ত, এক নিত্যবদ্ধ।

"অনন্ত চিৎগুণবিশিষ্ট ভগবানের জীবশক্তিগত চিৎ-কণ—জীব। জীবস্বরূপে সেই অনন্ত গুণের পঞ্চাশ গুণ—কণ-স্বরূপে দৃষ্ট। তন্মধ্যে যে স্বাধীনত্ব গুণ, সেই গুণে—প্রকট কালে যে জীব, কুণ্ডলিনীর অপরসত্ব তুচ্ছ করতঃ, পরসত্ব বরণ করে—তিনিই নিত্যমুক্ত। যিনি অপরসত্ব বরণ করেন—তিনিই নিত্যবদ্ধ। এই স্বাধীনত্বরূপ পূর্ব্ব সূত্রে জীবের—মায়া দ্বারে প্রাক্তন সূত্রের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপা স্বাধীনত্ব—অপর সত্বের অবিদ্যা-জ্ঞান প্রতিভাসে—কৃষ্ণবিস্মরণরূপা অবিদ্যারূপা হয়,

হইলেই তদ্দ্বারায় যে কার্য্য, তাহাই প্রাক্তন রূপে উদিত হওয়ায়, মায়া তাঁহাকে কারণশরীরে বদ্ধ করেন, তৎপরে কারণশরীরের পরিণতিতে জীব—সূক্ষ্ম, স্থূলে বদ্ধ হয়।

"এই নিত্য বদ্ধ জীব—দ্বিবিধ। এক অন্তর্ম্মুখ, এক বহির্ম্মুখ। বহির্ম্মুখ জীবের শ্রেণী অনন্ত। অর্থাৎ অপরসত্বগত দেশই বহির্ম্মুখ দেশ, সেই বহির্ম্মুখ-অবিদ্যাজ্ঞানে তাহার স্থিতিও অনন্ত প্রকার। পরসত্বই অন্তর্মুখ দেশ, তদ্গত বিদ্যায় অন্তর্মুখ জীব—দ্বিবিধ। এক সাধক, এক সিদ্ধ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তিতে ভক্তিদ্বারে—স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ জড়-বিবিক্ত স্বরূপ প্রাপ্তি। স্বরূপ সিদ্ধিতে প্রাক্তন ক্ষয়ে, সূক্ষ্মশরীরের ধ্বংস, সে ধ্বংসে—বস্তুসিদ্ধি। বস্তুসিদ্ধিতে জীব—নিত্যমুক্ত জীবের ন্যায় ভগবৎ পার্ষদ। ভগবৎ পার্ষদ চারিবিধঃ—নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতি, অজাতরতি। বৈধ এবং রাগ মার্গভেদে এই, চারি চারি প্রকার। নিত্যসিদ্ধ পারিষদগণ—দাস, সখা, গুরু, কান্তা ভেদে চারি প্রকার। সাধনসিদ্ধ, জাতরতি, অজাতরতি সাধকও ঐ রূপ চারিভাবে ভাবি। ভক্তির তিন অবস্থাঃ—সাধন, ভাব, প্রেম। জীবের স্বভাবগত পঞ্চাশ গুণের অন্তর্গত অণু ভক্তিগুণ, যখন যোগনিদ্রার নিদ্রাভঙ্গে, পরাশক্তিদ্বারে ইন্দ্রিয়ে প্রকটিত হয়, তখন তাহাকেই সাধনভক্তি বলা যায়। নাম স্মরণে শ্রদ্ধাই উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণ করতঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব নামে পরিচিত। অনর্থ নিবৃত্তিতে ভাবই—রতি। সাধনভক্তিতে রতির উদয়, রতি গাঢ়ভাবে প্রেম। শ্রদ্ধার অধিকারী ত্রিবিধ;—উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ।

ভগবদ্ বাক্য :—

"শাস্ত্রযুক্তে শুনি পুন দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহ ভক্ত হইবে উত্তম॥"

উত্তমাধিকারের লক্ষণ যথা :—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে॥
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায় করি (দিক) দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য সার সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্রী, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

* "নিষ্ঠায়—অধিকারী ত্রিবিধ ;—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত, নিরপেক্ষ স্বনিষ্ঠ—নিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ভক্ত ; পরিনিষ্ঠিত—নিষ্ঠা সহকারে লোকশিক্ষার্থ তাদৃশ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী। নিষ্ঠা সত্বেও তাদৃশ অনুষ্ঠানে—অপেক্ষা শূন্য ভক্ত্যধিকারীর নাম—নিরপেক্ষ ভক্ত। ঐ তিন ভক্তের আবার প্রবৃত্ত, সাধক ও সিদ্ধ এই তিনটি অবস্থা।

"চিজ্জগতে অচিৎসত্বার প্রকট নাই। এ হেতু দুর্গা, বৃন্দাবনে অচিৎপ্রকটয়িত্রী ঈশ্বরী অভিমান শূন্যে—গোপীভাবে থাকিয়া, সৃষ্টিলীলায় বিরজায় বিষ্ণুশক্তি রমা, এবং ঈশ্বরী অভিমানে পৃথকভাবে শম্ভুশক্তি উমা রূপে লীলাময়ী। ইনিই দক্ষকন্যা সতী। ইনিই মুক্তের মুক্তি, বদ্ধের মায়া, ভক্তের ভক্তিশক্তি। ইনিই ভগবৎ প্রিয়া নারায়ণী। ইনিই ব্রহ্মার ভারতী, রুদ্রের রুদ্রাণী, সর্ব্বদেবের দেবলক্ষ্মী, এবং সর্ব্বদেবের তেজে ঈশ্বরী অভিমানে অবতীর্ণা দুর্গা। লীলা হেতু এই শক্তি, শিবে প্রদত্ত বলিয়া ইনি উমা, শিবা, মহেশ্বরী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধা। অতএব যিনি বৈষ্ণব অভিমানে ইহাকে রাধা হইতে ভিন্ন দেখেন, তিনি বৈষ্ণব নামধারী হইলেও—অবৈষ্ণব। কারণ জীব, যে শক্তি কৃপায় বৈষ্ণব হইবেন, সেই শক্তির অভেদস্বরূপ না লাভ

করিলে, রাধা স্বরূপের সন্ধান হয় না। না হইলে—এক স্বরূপ শক্তিরই যে এ লীলারূপ—লীলারূপেরই স্বরূপ যে স্বরূপশক্তি—তাহা দৃষ্টি হয় না।

"বলদেব—স্বরূপে চিজ্জগতে কৃষ্ণের আত্মলীলার সহায় থাকিয়া সৃষ্টি-লীলায়—কারণশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষিরোদকশায়ী এবং শেষ, এই চারি রূপে প্রকটিত। মাধুর্য্যে—চিল্লীলায় গোপেশ্বর, অচিৎ অপ্রকট অভাবে, ঈশ্বর অভিমান শূন্যে গোপীভাবে বৃন্দাবনে বৃন্দা এবং দধিরূপ পৃথক অহঙ্কার বীজ স্বরূপে—বৃন্দাবন দ্বারী—পরমশিব। ঐশ্বর্য্যে মহা-বৈকুণ্ঠে—সদাশিব। সৃষ্টিতে ইনিই শ্রীশিব, শম্ভু, রুদ্র এবং প্রধানে—শিবলিঙ্গ, এই চারি রূপে প্রকটিত।

"এ হেতু শাস্ত্র, মন্ত্রদুর্গা এবং বলরামে অভেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে, দুর্গার ঈশ্বরীশক্তি ভাবে, তাঁহার যে ভেদভাব, তাহা কেবল কৃষ্ণের লীলা নিমিত্তই, তাঁহার স্বরূপগত ভাব নহে। ইহাঁর জ্ঞান ভিন্ন, জীবের সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। এই জন্যই ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,চিৎ, অচিৎ বিবিক্ত মদীয় স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানকে—বিজ্ঞান বলা হয়। সেই বিজ্ঞানের সহিত আমার চিৎ, অচিৎ বিশিষ্ট স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান তোমায় বলিব, যাহা জানিলে সমগ্র আমায় জানিবে। ব্রহ্মাণ্ডে—কাত্যায়নী, পৌর্ণমাসী ইহাঁরই নামান্তর, এই জন্য সাধন সিদ্ধে গোপীদের ইহাঁর পূজায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল। যে বৈষ্ণব ইহাঁকে জড় জ্ঞানে তুচ্ছ করেন, তাঁহার ভগবৎ বাক্যে ভক্তির অভাব, সে হেতু ইহাঁর স্বরূপ নির্দ্ধারণে অক্ষম। স্বরূপে ইনি জড়া নহেন, কৃষ্ণের লীলা হেতু ইনি জড় প্রকাশে জড়ে স্থিতি করিলেও—পরম বৈষ্ণবী। ইনিই বিদ্যা, অবিদ্যারূপে ঈশ্বরীভাবে জীবকে জড়ে বদ্ধ করেন—আবার জড় হইতে মুক্তি দেন। আবার ইনিই স্বরূপহ্লাদিনী যোগে, ভক্তিরূপিণী আহ্লাদিনী শক্তিরূপে, কৃষ্ণভক্তি দানে মাতার ন্যায় সাধনে, লালনপালনে জীবকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসে অধিকার দেন। জড় ইহাঁর অঙ্গ নহে, জড় প্রকটমিত্রী মাত্র। জড়চক্ষে ইহাঁকে জড়ই দেখিতে হয়। সেই জড়চক্ষে ইনি জায়া দুর্গা-রূপিণী ঈশ্বরীশক্তি। ইনিই চিদ্‌বিমুখ ভেদ আজ্ঞাসে ত্রিগুণপ্রদর্শনী

মায়া—মূলপ্রকৃতি। তাহাতে যোগনিদ্রার—যোগনিদ্রা। ইনিই আত্মমায়া-রূপে চিন্তামণি প্রকটয়িত্রী—জড়মূলপ্রকৃতিরও—মূলপ্রকৃতি। ত্রিগুণ জড়জগৎ উপাদান মাত্র, ইনিই আধাররূপা। যে সাধক কার্যভেদে স্বরূপশক্তিকে ভেদ দেখেন, তিনি স্বরূপকৃপা লাভ করিতে পারেন না। যত দিন না জীব, ইহাঁর কৃপায়, ইহাঁর স্বরূপ ভাব ধারণ করিতে পারে, তত দিন তাবে হ্লাদিনীর কৃপা হয় না। কৃষ্ণ মন্ত্রে যোগনিদ্রার জাগ্রত ভাবকেই শক্তিসঞ্চার বলা হয়। এ জন্য শক্তিসঞ্চারকে দ্বিতীয় জন্ম বা কুণ্ডলিনীসঞ্চার বলা হয়। এই কুণ্ডলিনীর হ্লাদিনী ভাবকে হ্লাদিনীসঞ্চার বা তৃতীয় জন্ম বলে। কুণ্ডলিনী সাধন জ্ঞান মিশ্রা সাধনভক্তি ক্রম, হ্লাদিনা—অহৈতুকী। কুণ্ডলিনী জ্ঞানমিশ্রা হেতু ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিদাত্রী—সে হেতু ভক্ত, ভক্তিযোগে তাঁহার হ্লাদিনা মূর্ত্তিরই অনুসরণ করেন।

"চিজ্জগৎ অসৃজ্য। বলদেবের ইচ্ছায় প্রকটাপ্রকট ভাবে নিত্য। এই যোগমায়াই সে প্রকটাপ্রকটের শক্তিস্বরূপা। যোগ-মায়া দ্বারেই চিৎপ্রকৃতির মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য ভাব। যাহা বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট—তাহাই ঐশ্বর্য্য, এবং যাহা বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াও তৎ আবরণে সামান্য নরভাবে দৃষ্ট—তাহাই মাধুর্য্য।

"এই শুদ্ধসত্ত্বরূপা মাধুর্য্য প্রকৃতিই—হ্লাদিনীপ্রভাবে কৃষ্ণের মাধুর্য্য কামবীজ শ্বেতদ্বীপ—সম্বিৎ প্রভাবে তদ্গত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়—সন্ধিনী প্রভাবে চিৎ-ভূত মাধুর্য্য চিন্তামণি এবং তদ্গত বৃন্দাবন ও কালিন্দী নদী। এই কালিন্দী নদীই ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের—ভেদ রেখা।

"কালিন্দী পারে শুদ্ধসত্ত্বগত ঐশ্বর্য্যপ্রকৃতিই হ্লাদিনীপ্রভাবে ঐশ্বর্য্য কামবীজ বসুদেব তত্ত্বরূপ—মথুরা। মহাবৈকুণ্ঠপর এই শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন, মথুরাই গোলোক বা কৃষ্ণলোক নামে খ্যাত। মথুরা—সম্বিৎ প্রভাবে তদ্গত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়—সন্ধিনী প্রভাবে চিৎভূত ঐশ্বর্য্য চিন্তামণি এবং তদ্গত দ্বারকারূপ মহাবৈকুণ্ঠ। ঐশ্বর্য্যে কৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যবিলাস, সে হেতু মহাবৈকুণ্ঠ অনন্ত এবং তন্মধ্যে দ্বারকারূপ মহাবৈকুণ্ঠই প্রধান।

"শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ—স্বয়ংরূপে, মথুরায়—বাসুদেবরূপে, দ্বারকায়—নারায়ণরূপে এবং অন্য অন্য মহাবৈকুণ্ঠে রাম, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপে—নিত্য লীলাময়। রাধা—ঐশ্বর্য্যে বিম্ব, প্রতিবিম্বভাবে বাসুদেব, নারায়ণের—লীলালক্ষ্মী, স্বরস্বতী। অতএব রাধাই, সর্ব্বলক্ষ্মী, সর্ব্বস্বরস্বতী—কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপিণী।

"বৃন্দাবন লীলাময় কৃষ্ণ—আবার মথুরাগত চতুর্ব্যূহে নিত্য লীলাময়। মথুরা—কৃষ্ণের বসুদেব ব্যূহ। তদ্গত অহঙ্কার মূলসঙ্কর্ষণ ব্যূহ। বুদ্ধি, মনরূপ—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহ। এই বসুদেব, মূলসঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ রূপ আদি চতুর্ব্যূহই—মহাবৈকুণ্ঠরূপ দ্বারকায় উচ্ছলিত রূপে—দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। তাহাতে বসুদেব ব্যূহই—নারায়ণ ব্যূহ, মূলসঙ্কর্ষণ ব্যূহই—মহাসঙ্কর্ষণ ব্যূহ এবং তদ্গত বুদ্ধি, মন—প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ। বাসুদেব, বলদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহ রূপ তত্ত্ব অধিষ্ঠাতা হইয়াও লীলাহেতু, এক এক বিগ্রহে নিত্য বিরাজিত।

সূর্য্য যেমন বহির্ম্মণ্ডলে নির্ব্বিশেষ, তদ্রূপ গোলোকগত মহাবৈকুণ্ঠের বহির্ম্মণ্ডলও নির্ব্বিশেষ জ্যোতিস্বরূপ। বিরজা পারে ব্রহ্মাণ্ড এই জ্যোতির্দ্বারেই ওতপ্রোত ভাবে মণ্ডিত। এ হেতু ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়। গোলক, মহাবৈকুণ্ঠই ভগবৎ তনু, ওই জ্যোতি ওই তনুরই আভা। এই আভাই—শাস্ত্রে ব্রহ্ম শব্দে প্রসিদ্ধ। মায়াবাদী ভক্তি অভাবে উহা ভেদ করত ভগবৎ বিগ্রহ দর্শনে অক্ষম, এ হেতু উহাকেই শেষতত্ত্ব স্থির করত, ঈশ্বর বিগ্রহেও মায়িক সম্বন্ধ দেখে এবং অবতার বিগ্রহকে মায়িক বলে। জীবের গঠনেও মায়া সম্বন্ধ দেখিয়া মায়ামুক্তে জীবের স্বতন্ত্র স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না, এ হেতু জীবের ব্রহ্মলয়ই পুরুষার্থ মনে করে।

"অতএব আমরা যে অনন্ত বৈচিত্র, নিত্য চিজ্জগতে ও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত, তাহারাই এক এক বৈচিত্রে ভগবানের অনন্ত লীলা-স্বরূপ, নচেৎ স্বয়ংরূপে তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ ভগবান কৃষ্ণ। স্বয়ংরূপ, এবং লীলারূপে ভেদ এই যে, যে রূপ—কোন রূপকে অপেক্ষা না করিয়া

নিত্য প্রকটিত—সেই রূপই তাঁহার—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ এই স্বয়ংরূপের অপেক্ষায় যে রূপ, তাহাই তাঁহার—লীলারূপ।

"এই আমি তোমায় কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ, লীলাগতস্বরূপ এবং যোগমায়া শক্তির উল্লেখ করিলাম। মাধুর্য্যে স্বয়ংরূপে তিনি—পূর্ণতম, ঐশ্বর্য্যে মথুরায় তিনি লীলারূপে—পূর্ণতর, এবং দ্বারকা ও মহাবৈকুণ্ঠগত অন্য প্রদেশে লীলারূপে—পূর্ণ। অতএব স্বয়ংরূপে কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী—পূর্ণতর, পূর্ণ তাঁহার অংশ স্বরূপ। এই অংশ স্বরূপ কৃষ্ণ—জীবাত্মার পরম আত্মা—পরমাত্মা। অতএব একমাত্র কৃষ্ণই ভগবান, পরমাত্মা তাহার অংশ বা কলা এবং ব্রহ্ম তাঁহার তনুভা। অংশ এবং তনুভা তাঁহারই পরিকর, এ হেতু সপরিকর কৃষ্ণই ভজনীয়—সেব্য। কাহার সেব্য—কাহার ভজনীয়? জীবের—কারণ জীব তাঁহারই ভেদাভেদ শক্তি বিশেষ।

"শক্তি, শক্তিমানের অভেদ বুদ্ধিতে—নিত্য অভেদ, এবং শক্তিমান হইতে শক্তির পৃথক বুদ্ধিতে—নিত্য ভেদ। এইরূপ এক অখণ্ড তত্ত্ব যুগপৎ বিপরীত ভাব সমন্বয়ে, এক অখণ্ড শক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত। মায়িক বুদ্ধি ইহা ধারণ করিতে না পারায় দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ গর্ত্তে বিবাদ শেষ করিতে পারে না। ইহাই বেদান্তসম্মত অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।

"তোমার আর একটী প্রশ্ন, কোন্ মায়ার দ্বারায় জীব বদ্ধ। যে মায়ার দ্বারায় জীব বদ্ধ—সেই মায়ার দ্বারাই জীব মুক্ত। জীবহেতু—সে জন্য জীবমায়ার উল্লেখে অন্য দিন তাঁহার উল্লেখ করিব।"

এ দিকে বেলাও হইয়াছে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। যোগমায়া আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতেছেন। জীবসুন্দর তাহা শুনিয়াও হরসুন্দরের মুখপানে তাকাইয়া আছেন। সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। হরসুন্দর বলিলেন—"বেলা অনেক হইয়াছে দেখিতেছি, উঠ, উঠ, দ্বার খুল।"

বলিতে পার—যে কথা তুলিলে, লোক অন্য কথা তুলিয়া তাহা চাপা দিতে চায়, যাহা অবিদ্যার কুহকে গন্ধ, আকাশ-কুসুম, কেন জীবসুন্দর তাহার জন্যই এত লালাইত? আর কোন্ মায়ারই বা এ খেলা।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বার খুলিয়া জীবসুন্দর দেখিলেন—যোগমায়া সম্মুখে। জীবসুন্দর জিজ্ঞাসিলেন, "কোন প্রয়োজন আছে কি?" যোগমায়া কোন উত্তর দিলেন না, কেবল অঞ্চল দিয়া একবার চক্ষু মুছিলেন। তাহা দেখিয়া জীবসুন্দরের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "যোগা! তুই ধন্যা! তোর এ বয়সে আমি মুক্তা ফেলিয়া ধুলীকণা কুড়াইয়া ছলাম।"

হরসুন্দর বলিলেন, "হইয়াছে কি?"

তখন চিন্ময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "কথাত শুনিবে না, তবে যাহা হয় করুক।"

হরসুন্দর বলিলেন, "কি—হইয়াছে কি?"

চি। হইবে আর কি—কবে ছেলেবেলায় খেলা করিতে করিতে কি হইয়াছিল, আর তুমি কি বলিয়াছিলে, এখন তাহাই ধরিয়া বসিয়াছে, বলে—"আমায় শিব ঠাকুর দাও।"

হরসুন্দর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "চিন্ময়ী! সে সত্য কথা। তুমিই তাহার মূল, তুমিই শিবঠাকুরের গল্প করিয়াছিলে, তাই শুনিয়া ও অম্বাকে শিবঠাকুর দেয় নাই; আমি বলাতে দিয়াছিল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, দুর্গার মত হইলে শিবঠাকুর দিব, ও—সে দাবী করিতে পারে।"

"করিতে পারেত এখন দাও। আমায় যে কিছুতেই ছাড়ে না।" এই কথা বলিয়া চিন্ময়ী হাসিতে লাগিলেন।

হর। আমি বলিয়াছিলাম, দুর্গার মত হইলে—শিব দিব।

চিন্ময়ী, যোগমায়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "শুনিলে?—আমি কি করিব বল?"

স্ত্রী স্বভাব সুলভ লজ্জায় লজ্জিত হইয়া যোগমায়া, হরসুন্দরের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া, যোগমায়াকে দেখিয়া বলিলেন, "আয় ভাই! তোর সঙ্গেই আমার বেশ মিলে।" তদুত্তরে যোগমায়া বলিলেন, "কি রকম?"

বি। তোরও থাকিতে নাই—আমারও থাকিতে নাই।

যো। তোমাদের—ও ইচ্ছা, আমারত তাহা নহে।

বি। নহে কেন? যদি ইচ্ছা না হইত,—যদি তাহাতেই ইচ্ছা থাকিত, তবে তাহার জন্য না কাঁদিয়া, কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? কোন ইচ্ছাটি সত্য, এখন ভাবিয়া বল দেখি।

যোগমায়া হটাৎ এ কথায় উত্তর দিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "আমি স্বামী হইতেই সংসারের নশ্বরতা বুঝিতে পারিয়াছি, যখন স্বামী আমার এ নশ্বরতা ভাল বাসেন না, তখন আমারও ভাল বাসিতে নাই। নাই বটে—কিন্তু, আমার সে শক্তি কই? তাই তোমাদের নিকট সে শক্তি ভিক্ষা করি। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, ভালবাসাই বৈরাগ্যের মূল। দুই দিনের ভালবাসায় যে মুগ্ধ, সে স্বার্থশূন্য ভালবাসার মর্ম্ম বুঝে নাই। যদি বুঝিত—তবে তাহার মুগ্ধতা আসিত কি? কারণ—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, ছায়ার ন্যায় সঙ্গী। সে থাকিতে—ভালবাসা অনিত্য। ভালবাসায়—অনিত্য ধারণা কিন্তু প্রেমের স্বভাব নহে। সে জন্য যেখানে প্রেম, সে—এ অনিত্যধারণায় মুগ্ধ হয় না। কাযেই তাহাতে যে অনুরাগ—তাহা শিথিল হয়, হইলে তাহাতে বিরক্তি জন্মে, জন্মিলে তাহার স্মৃতি দূরগত হয়—তাহাই বৈরাগ্য। তবে তাঁহার এ বৈরাগ্যে আমার দুঃখ কি? সুখ এই—তিনি প্রেমিক না হইলেও প্রেমের প্রার্থী। প্রেম নিত্য। প্রেমলাভে—তিনিও নিত্য। যে নিত্য, আমি নিত্য হইলে সেও আমার নিকট নিত্য। সেই নিত্য প্রেমের জন্য আজ তিনি ভিখারী। ইহার অধিক আর সুখের বিষয় কি?"

বি। যদি স্বামী ভাল বাসিত, তাহা হইলে তুই কি করিতিস্?

যো। তাহা হইলে তুমি কি করিতে?

"বেশ উত্তর দিয়াছিস"—এই বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যো। হাসিলে চলিবে না। আমার যে কিছুই ভাল লাগে না। তোমাদের জন্য আমি সব কাজ করিব, তোমাদের—সংসারে কিছুই

করিতে হইবে না, যাহাতে মা আমার প্রতি সদয় হন, তাহা করিতে হইবে। আমি যে মার কথায় উত্তর করিতে পারি না।

যোগমায়ার মুখের ভাব দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজের এক দিন মনে পড়িল। অমনি চক্ষে দুই এক বিন্দু জল দেখা দিল, যে ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করিয়াছে, সে ভিন্ন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে পারে না। তিনি যোগমায়ার হস্ত ধরিয়া হরিপ্রিয়ার নিকট লইয়া গেলেন।

হরিপ্রিয়া তখন হরসুন্দরের জন্য একখানি আসন প্রস্তুত করিতে ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দিদি! আর খাটিয়া খাটিয়া মরিতে হইবে না, যোগা ঘুসস্বরূপ আমাদের সকল কাজ করিবে। এ ঘুস লইয়া যোগমায়ার জন্য একটা কাজ করিতে পারিবে কি?"

হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকাইলেনও না। এক মনে কাজ করিতে করিতে বলিলেন, "আমাদের শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবারূপ খাটুনি অমূল্য, সে খাটুনি বাড়িলেই সুখী। মূল্যের সহিত অমূল্যের বিনিময় হয় কি? যোগার বুদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে, আর তুমিও উহার সহিত পাগল হইবে—না? লোকে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবায় পূণ্য লাভ করে, আমরা সেই সেবায় কৃতকৃতার্থ হই, তুমি তাহা—ধারণ করিতে না পারিয়া পাগলী হইয়া দাঁড়াইয়াছ, আবার আমি যোগাকে পাগলী করিতে মাকে ধরিব? তবে বনে যাইলেইত হয়, সংসার লইয়া ধর্ম্ম কেন? এই জন্যই বনে যাহা হয়, সংসারে তাহা হয় না, সংসারে যাহা হয়—বনে তাহা হয় না। সংসার লইয়া ধর্ম্ম, এখন সংসার কর। সংসারকে বজায় রাখিয়া যদি অন্তরকে সংসার শূন্য করিতে পার, তবে বনে যাহা হয় না,—সংসারে তাহা হইবে। যদি না পার, সংসারে যাহা হয় না, তার জন্য যোগার বনে যাওয়াই ভাল।"

সে কথায় কেহ উত্তর করিলেন না। যোগমায়া এবার পিত্রালয়ে আসিয়া সুস্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি যাহা চান, সে কথায় কেহ কান দেন না। অন্যবার এমন কিছু দেখেন নাই। তখন বরং যে সকল কথা উঠিত—এখন তাহাও উঠে না। যোগমায়া ইহার ভাব

কিছুই বুঝিতে পারেন না। হরিপ্রিয়ার এবম্বিধ ভাবে যোগমায়া—একদিকে হরসুন্দর মূর্ত্তি, অন্য দিকে দেবোপম—নরনারায়ণের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যেন উভয়কেই বলিলেন,—তবে আমি দাঁড়াই কোথা? আমার জন্য কি তিল মাত্র স্থান নাই? তখন চিন্ময়ী আসিয়া উপস্থিত, তাঁহাকে দেখিয়া উভয়েই নীরব হইলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একা—নরনারায়ণ—একা। বনে—নির্জ্জনে—কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় মায়া—যোগমায়া। তিনি একা—একা।

কে কাহার—তিনি কাহার, কে তাঁহার। কেন পাপ, কেন পুণ্য। কেন ধর্ম্ম, কেন অধর্ম্ম। কিসের জন্য—কাহার জন্য। কে আমি—কেন আমি। কেন বা এসেছি, কেন বা যাইব। কোথায় এসেছি, কোথায় যাইব। নরনারায়ণ দেখেন—আসিয়াছেন একা, যাইবেন একা—তিনি একা। তবে কিসের মায়া—যোগমায়া? কিসের বা ধর্ম্ম, সেও ত মায়া। যাহার বীজে ভুল, তাহার পল্লবে ভুল, তাহার ফলেও ভুল।

ভুল, ভুল—সব ভুল। সে ভুল এমনি ভুল, আপনাকে আপনি ভুল। আর না যোগমায়া—আর মায়া দেখাইও না। তোমার দেখা ত সামান্য নহে, কেবল ক্রন্দনে দেখা। কিন্তু—তুমি কে? এই আছি—এই নাই। এই আছ, এই নাই,—তবে তুমি কে? যোগমায়া—তুমিই মায়া। তোমার মায়াতেই জগৎ বাঁধা।

তুমি এক, তোমার অনন্ত ফণা। এক এক ফণায়, তুমি অনন্ত জীবের—অনন্ত মায়া। প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে—প্রতি ঘরে ঘরে—সেই এক এক ফণাই তোমার মহিমা বিস্তার করে। তুমি অনন্ত রূপিণী, অনন্ত তোমার মায়া। তোমার স্নেহ, মান, ভালবাসা—সেও মায়া।

কিসের ভালবাসা? কই ভালবাসা? এই আছে, এই নাই—এই ভাব, এই বিভাব, তবে—কিসের ভালবাসা?

আমি শত্রু। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী,—আমি শত্রু। মাত! দশ

মাস, দশ দিন উদরে স্থান দিয়াছিলে, শিশু ভাবিয়া পালন করিয়াছিলে, আপনার ভাবিয়া আপন করিয়াছিলে, এখন তাহার ফলভোগ কর, বুঝিতে থাক—যাহার কেবল প্রতীতি, অস্তিত্ব নাই—তাহাই মায়া। মায়ার এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিলেই দুঃখ—না ভাঙ্গিলেই সুখ।

আমি কি? আমার ধর্ম্ম কি? পিতাকে কাঁদাইয়া, মাকে কাঁদাইয়া, ভাই বন্ধুকে কাঁদাইয়া—যোগমায়াকে কাঁদাইয়া—আমার ধর্ম্ম কোথায়? তাহারা কাঁদিতে জানে, কাঁদিয়াছে—আমি যে কাহারও জন্য কাঁদি নাই, তবে আমার জন্য কে কাঁদিবে। তাঁহারা তাঁহাদের জন্যই কাঁদিয়াছেন, আমিও আমার জন্য কাঁদিয়াছি। তবে ভগবন্! তুমি আমার জন্য কাঁদিবে কেন? আমি ত তোমার জন্য এক দিনও কাঁদি নাই। কই—তোমার জন্য ত একবারও ক্রন্দন আসিল না? আসিবে কি? যদি আসে তবে সন্ন্যাসী যে তাহাকেও মায়া বলেন। হরি! হরি! সে যদি মায়া হয়, বকুল তলার সেই ভাব, সেও যদি মায়া হয়, বকুল তলার সেই আনন্দ, সেও যদি মায়া হয়, তবে নির্ম্মায়ায় আর কাজ নাই। আমি আর কিছু চাহি না—চাহি তাহাই। ব্রহ্ম চাহি না, নির্ব্বাণ চাহি না—চাহি তাহাই। কিন্তু সন্ন্যাসী কেন তাহা বলেন না, তাহা যদি ব্রহ্ম না হয়, নির্ব্বাণ না হয়—তবে অপর ব্রহ্ম—অপর নির্ব্বাণ আমি চাহি না।

এইরূপে নরনারায়ণের মন, সেই লোকশূন্য ভীষণ অরণ্যে কল্পনাগত নানা মূর্ত্তি লইয়া সংসার পাতিয়াছে। নরনারায়ণ এখন তাহাদের লইয়াই ব্যস্ত। সহসা সেই মূর্ত্তি মধ্যে—সন্ন্যাসী সম্মুখে। নরনারায়ণ অনেকক্ষণ স্থিরভাবে তাহা দেখিলেন। সে ভাবে সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে যাহা অনন্ত দিন পশিয়া আছে, তাহা ফেলিতে এইরূপই লাগিয়া থাকে—আবার না ফেলিলেও লাগিয়া থাকে—ইহাই মনের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি সুখ। নিবৃত্তিতে এইরূপেই মন নিরুদ্ধ হয়, তবে তাহা সাধনসাধ্য।"

এখন সন্ন্যাসী আর এ আশ্রমে থাকেন না। এক বেলার পথে,—দূরে, তাঁহার আশ্রম। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"একালা থাকিতে আর ভয় করে কি?" নরনারায়ণ উত্তর করিলেন না।

স। সাধনের কুশল?

নরনারায়ণ তাহারও উত্তর করিলেন না। কতকগুলি ফল এক স্থানে পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ও কি করিয়াছ? সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না। উহা সংসারীর ধর্ম্ম, সঞ্চয়—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। উহা ফেলিয়া দাও।"

নরনারায়ণ তাহা জানিতেন না—তাহা নহে। তবে মন বলিয়াছিল, ফল অনুসন্ধানে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই রাখিয়াছিলেন। নরনারায়ণ সেগুলি ফেলিয়া দিলেন।

স। তোমার অবস্থায় জানা যাইতেছে, আর তোমার খাদ্যের জন্য অধিক দিন ব্যস্ত হইতে হইবে না। প্রথম প্রথম প্রাণায়ামের জন্য দুগ্ধ, ঘৃতের প্রয়োজন হয়। ঈড়া, পিঙ্গলার শুদ্ধিতে, পরে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। এই ঈড়া, পিঙ্গলার কাল অনুসারেই সাধনের কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। প্রাণায়ামের দ্বিতীয় কল্পে—ঘর্ম্ম, তৃতীয় কল্পে—দুর্দ্দুর গতি, তুমি সে অবস্থায় আরোহণ করিয়াছ। অতএব এখন সাবধানে মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর।

"ঈশ্বরোপাসনায় মনকে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা কর। নচেৎ দেবতা বা প্রকৃতিগত উপাসনা ফলে, ভবপ্রত্যয়রূপ সিদ্ধিতে, ভোগক্ষয়ে পুনর্ব্বার সুষুপ্তিভঙ্গে জাগ্রতের ন্যায় সংসারে নীত হইবে। তাহাতে মুক্তিরূপ আত্মদর্শন ঘটিবে না।

"অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বরে একাগ্রতাই কৈবল্যের বা মোক্ষের এক মাত্র উপায়। যোগফলের প্রতি চিত্ত প্রসন্নতাই শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধায় উৎসাহ বৃদ্ধি, সে বৃদ্ধিতে অনুভূত পদার্থের অবিস্মরণ, অনন্য চিত্তে অবিস্মরণই—ধ্যান। ধ্যানই প্রকৃত একাগ্রতা। একাগ্রতায় প্রজ্ঞার উদয়, প্রজ্ঞায় স্বরূপ সাক্ষাৎকার। যদি এইরূপে সোপান ক্রমে সোপানে পদক্ষেপ হয়, তবেই সম্প্রজ্ঞাত যোগে কৈবল্য লাভ, নচেৎ স্বর্গাদি লাভে—ভব প্রত্যয় মাত্র। ভব—অর্থাৎ অবিদ্যা, প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ।

"সংস্কার বা সম্বেগ তীব্রকর—সমাধির জন্য ভাবিতে হইবে না। মনবৃত্তি বা সংস্কার, সকলের সমান নহে। মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র

হিসাবে, শ্রদ্ধা তাহাতে স্থান পায়। এ বিধায় সিদ্ধি কাহার শীঘ্র, কাহার অনতিশীঘ্র, কাহার বিলম্বে লাভ হয়। অতএব ঈশ্বরে মননিবেশ কর। ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ রূপ ভক্তি যোগে—তাঁহার ধ্যান কর।

"সেই ঈশ্বর কি বস্তু? ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, বদ্ধ, মুক্ত যাবৎ আত্মা হইতে পৃথক স্বতন্ত্র ভাবে যিনি নিত্য—তিনিই ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ—তাঁহার সম দ্বিতীয় নাই। তিনি আদি সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মাদি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, তাঁহার শক্তিতেই ব্রহ্মাদির সৃষ্টিশক্তি। তিনিই প্রণব "ও"। প্রণব—তাঁহারই বোধক শব্দ। প্রণবের জপ এবং অর্থ ধ্যানই—উপাসনা। এই উপাসনায়—আত্ম কৈবল্যের উদয় হয়। যে উদয়ে—ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন, এবং বক্ষমান ব্যাধি প্রভৃতির অন্তরায়, অর্থাৎ যাহাতে চিত্তে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহা দূর হয়।

"সেই অন্তরায় কি কি? ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতিত্ব। দুঃখ, দৌর্ম্মণস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস, এগুলিও সমাধির বিঘ্ন। উপাসনায় এগুলিও তিরোহিত হয়।

"বিঘ্ন দূর করণার্থে একতত্ত্ব অভ্যাস করিবে। যে ভাবেই তোমার মন স্থির হয়, তাহাকেই একতত্ত্ব বোধে—তাহাতেই একাগ্র হইবে। অতএব ইষ্টমূর্ত্তি, সাধুমূর্ত্তি, ইহাই ধ্যানের বিষয়।

"সচ্ছ কাচ খণ্ডকে, যে বর্ণ সন্নিধানে লইয়া যাইবে, সে সেই বর্ণেই রঞ্জিত হয়। চিত্ত যখন এতাদৃশ সচ্ছ হইবে যে, আর কোনদিকে সে বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয় না, তখন জানিবে যে, তোমার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে; অর্থাৎ সেই বৃত্তিশূন্য চিত্ত, সচ্ছ কাচ খণ্ডের ন্যায় অবলম্বন গত ভাবলাভে সক্ষম। তখন আর অন্য সাধনের প্রয়োজন হয় না।

"শব্দ, অর্থ, জ্ঞানে, যখন সাধকের পৃথক পৃথক উপলব্ধি—তখনই সবিতর্ক সমাধি। ইহাই বেদান্ত অনুযায়ী সবিকল্প সমাধির ন্যায়। কারণ তাহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতার পৃথক উপলব্ধি। এই তিনের

সমন্বয়ে যে একটী পৃথক স্বরূপের উপলব্ধি, তাহাই নির্ব্বিতর্ক এবং বেদান্ত অনুযায়ী জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতার সমন্বয়ে নির্ব্বিকল্পের অনুরূপ।

"সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাধির ভাব্য বিষয় স্থূলভূত। যদি তাহা সূক্ষ্ম ভূতে হয়—তাহা হইলে তাহাকেই সবিকার ও নির্ব্বিকার বলা হয়। এই নির্ব্বিকার অবস্থায় যে প্রজ্ঞার উদয়—তাহাই ঋতম্ভরা। ঋত শব্দে সত্য—যাহা সত্যে ভরা—তাহাই ঋতম্ভরা। ইহাই নির্ব্বিকল্প।

"এ প্রজ্ঞার উদয়ে পূর্ব্ব উদিত রজ, তম দূষিত বিরোধী প্রজ্ঞার তিরোভাব হয়। সে তিরোভাবে সমাধি প্রজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকে। ক্রমে অভ্যাসে তাহাও নিরুদ্ধ হয়। নিরুদ্ধ হইয়াও ছায়ারূপে কিছু কাল থাকে। যখন তাহাও থাকে না, চিত্ত একেবারে বিষয়শূন্য, তখন আর কোন কর্ত্তব্যই থাকে না, ইহাই চিত্তগতির সমাপ্তি।

"ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যখন ইহাও নিরুদ্ধ হয়, তখনই নির্বীজ সমাধি। চিত্ত, বৃত্তিময়ী হইয়া আত্মায় যুক্ত হইয়াছিল, বৃত্তিশূন্য হওয়ায় নিজ জন্মভূমি প্রকৃতি আশ্রয় করিল, আত্মা প্রকৃতি অতীত হইয়া স্ব স্বরূপ দেখিল। চিত্ত বৃত্তিই—সুখ, দুঃখ, জন্মাদির কারণ, চিত্ত শূন্যে—আর সুখ, দুঃখ, জন্মাদি কোথায়?

"বৎস দিব্যানন্দ! দেখিতেছি—তুমি সবিতর্ক অবস্থা অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিতর্ক অবস্থায় স্থির হইতে পারিতেছ না, সাধন সমুদ্র বিশেষ, নানা বিভীষিকাময়, দেখিও যেন সে বিভীষিকায়, পরাঙ্মুখ না হইতে হয়।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

থানাতল্লাসিতে মোকর্দ্দমা বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিল। এ মোকর্দ্দমায় হরসুন্দরের ইচ্ছা ছিল না। বসন্তেরও ইচ্ছা ছিল না। নটনারায়ণের চেষ্টায় বসন্ত উদ্‌যোগী মাত্র। নচেৎ ফলাফলে যাহা হইবে, মোক্তার বসন্ত—তাহা পূর্ব্বেই জানিতেন। ঘটিলও তাহাই। এখন ভয়—পাছে জ্যোতিঃপ্রসাদ উল্টা দাবী করেন। ভয়ের কথাই—জ্যোতিঃপ্রসাদ জয়ী হইলে, এ সুবিধা ছাড়িবেনই বা কেন?

কয়দিন নটনারায়ণ, হরসুন্দরের সহিত দেখা করেন নাই। পাছে হরসুন্দর মোকর্দ্দমায় নিরস্ত হইতে বলেন। কিন্তু যিনি যাহা করেন—হরসুন্দর কোন আপত্তি করেন না। তাঁহার মনের ভাব—তাঁহাকে জানাইয়া নিরস্ত হন। সে শুনিল কি না—সে বিষয়ে তাহার লক্ষ্য থাকে না। এ মোকর্দ্দমায় নটনারায়ণকে অগ্রসর হইতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নটনারায়ণ তাঁহার কথা শুনিলেন কই? না শুনুন—তাহাতেও হরসুন্দরের কোন আপত্তি নাই।

মোকর্দ্দমার এ অবস্থায় নটনারায়ণ, হরসুন্দরের সহিত দেখা করিলেন। দেখা করিয়া কিন্তু সে কথা উত্থাপন করিতে ভরসা হইতেছে না।

নানা কথার পর নটনারায়ণ, বলিলেন,—"মোকর্দ্দমার অবস্থা ত এইরূপ। কিছুই করিতে পারা গেল না। কোন কার্য্যই হইল না। তাহার পর যেরূপ বুঝিতেছি এবং শুনিতেছি, জ্যোতিঃপ্রসাদ খরচা এবং মানহানির জন্য মোকর্দ্দমা তুলিবে। অবশ্য এ সুবিধা তিনি ছাড়িবেন কেন? কিন্তু আমরা তাহা হইলে ধনে প্রাণে মারা যাইব—এখন কর্ত্তব্য কি?

হর। কর্ত্তব্য—ভগবানের নিকট অহংকর্ত্তা অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করুন; যাহা হয়, তাহাতেই দেখিবেন—কি অদ্ভুত ঘটনায় তাঁহার দুষ্টের শাসন, শিষ্টের পালন কার্য্য নিত্য সংসাধিত হইতেছে।

নট। এ কথায় সংসার চলে না।

হর। জন্ম জন্ম সংসার করিয়া আসিলে, কিন্তু,—সংসারে তুষ্ট হইতে

পার নাই। তবে সে সংসারে আর কেন? অনন্তকাল সংসার, ঘাত প্রতিঘাতে ভালমন্দ দেখাইয়া আসিতেছে, সে ঘাত প্রতিঘাতে কয়টা লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে? আপনআপন প্রবৃত্তি অনুসারেই ত মানুষ নিত্য ধাবিত। সঙ্গের গুণ পরীক্ষিত বটে, কিন্তু জাতি স্বভাবেই ফল ধরে। কাকের বাসায় কোকিলের স্বরে, কোকিল-শাবকেরই স্বভাববোল ফুটে—কাকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

নটনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মন তত সুস্থির নহে। হরসুন্দর আবার বলিলেন,—"মোকর্দ্দমা কখন করি নাই, সে বুদ্ধিও নাই। যে যাহা করে—সে তাহা বুঝে ভাল। আমি কি আপনার প্রয়োজনের—সুবুদ্ধি দিতে পারিব? আমারও তাহা বোধ হয় না।"

তখন জীবসুন্দর আসিয়া বসিলেন। জীবসুন্দর, নটনারায়ণকে বলিলেন, "কা'ল আবার মোকর্দ্দমার দিন ছিল না?"

নট। হাঁ—সে হইয়া গিয়াছে।

জী। কমলদাদার মুখে সমস্ত আমরা শুনিয়াছি। তিনি কা'ল আদালতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ত আপনার দেখা হইয়াছিল?

নট। হাঁ—তিনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তোমারও সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। দেখ, তোমাদের জন্যই আমার এ উদ্‌যোগ। এ কার্য্য আমার নহে—তোমাদের। তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা। কিন্তু পিতার ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছা পর্য্যবসিত হইল, আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র থাকিয়া এই মনঃ-কষ্ট আনিল। আমি এসকল জানি, কিন্তু—জানিলে কি হইবে? কাকের বাসায় কাকশাবকের কোকিলের স্বরে বোল ফুটে না। ফুটিলও না—ফুটিবেও না—তাহা জানি। পারিব, কি না পারিব, তাহা জানি না; আজ হইতে সংসারে গা ঢালিব; জ্যোতিঃপ্রসাদের যাহা ইচ্ছা, তিনি করুন, সেদিকে আর তাকাইব না, যদি তাকাইবার শক্তি পাই, তবে যাহার প্রতি তাকাইলে সকল দিকে তাকান হয়, তাহার দিকেই তাকাইতে মনকে বলিব। মানুষ—কর্ম্ম ভিন্ন থাকিতে পারে না। তাহার প্রতি তাকাইতে যে কর্ম্ম—সেই কর্ম্মই যেন আমার কর্ম্ম হয়।

আমি ভাবিয়া ছিলাম এ মোকর্দ্দমাও সেই কর্ম্ম ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। যদি হইত—তাহা হইলে তোমরা আমার সহিত যোগ দিতে। যদি হইত—তাহা হইলে মোকর্দ্দমার এই হারে, তোমাদের মত আমার মন স্থির থাকিত। আমার বুঝা উচিত ছিল যে, বৈবাহিক হৃদয় অপেক্ষা শিবসুন্দরের ব্যথা আমার হৃদয়ে অধিক লাগিতে পারে না। ইহাই আমার অহংকর্ত্তা অভিমান। এই অভিমানই আমার কার্য্য।

নটনারায়ণ সেদিন আর অধিকক্ষণ বসিলেন না। নিজের প্রতি বড়ই ঘৃণা জন্মিল। অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে বিদায় লইলেন।

অনেক বেলা হইয়াছে। চিন্ময়ী আহারের জন্য জীবসুন্দরকে ডাকিলেন। হরসুন্দর আহারে বসিবেন,—আসনে উপবিষ্ট,—সম্মুখেই চিন্ময়ী বসিয়া আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া থালায় অন্ন লইয়া আসিতেছেন। আসিতে আসিতে কি এক সাধন-গত রসে, তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, তিনি আর হরসুন্দরের আসনপ্রতি চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু যেন আর জগৎ দর্শন করে না। যেমন হরসুন্দরের সম্মুখে অন্ন ধরিবেন—অমনি হস্ত হইতে থালা স্খলিত হইয়া মহাশব্দে ভূতলে পতিত হইল।

হরসুন্দর, বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া চিন্ময়ীকে বলিলেন, "গৃহিণি! বাড়ীশুদ্ধ পাগল করিলে, সব পাগল লইয়া সংসার করিবে কিরূপে? আগে বৈধীসেবা। বৈধীসেবা ভিন্ন প্রেমসেবার মাধুর্য্য খুলে কি?"

তখন গৃহিণী তাড়াতাড়ী সে স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, "মা! দুইদিকে নজর চাই, পাগল হইলে চলিবে না—এ সংসারীর ধর্ম্ম, উদাসীনের নহে, তাহা ত জান। গিয়াছে—গিয়াছে, আবার অন্ন লইয়া আইস। কিন্তু ধারণ করা চাই, নচেৎ সংসারে কি কাপড় ফেলিয়া নাচা চলে।"

অপ্রস্তুত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আবার অন্ন আনিতে গেলেন, চিন্ময়ী বলিলেন, "সুকৃতি বলে ফল ফলে—আমি পাগল করিবার কে?

তোমার মহিমা কে বুঝিবে? কে বুঝিতে পারে? তাই আজ আমি বুঝিয়া কাজ করিব। যাহা করাইতেছ, যন্ত্র স্বরূপ আমি তাহাই করিতেছি।”

হর। সে সত্য কথা, কিন্তু কৃষ্ণ চিন্ময়রূপে নিত্য, অলেপক; কে তাঁহাকে কবে মানুষ ভিন্ন ধরিতে পারিয়াছে? সে আচার্য্য রূপে গুরু। গুরুশিক্ষায় লোক মানুষ হয়। গৃহিণি! এত পরকালের ধর্ম্ম নহে, মানুষ ভিন্ন বর্ত্তমান ধর্ম্ম কোথায়? থুঁতি ভিন্ন পুথিতে কে তাহাকে কবে ধরিয়াছে? সত্য তাহারি এ খেলা, কিন্তু যে হৃদয়ে বসিয়া তাহার এ খেলা, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই কথা। অবলম্বন ভিন্ন সে চিন্ময় রূপত—আকাশ কুসুম। মানুষ যাহা বহু বহু জন্মে সাধ্য সাধনায় লাভ করিতে পারে না, কাহার কৃপায় ইহাদের সে লাভ? তুমি পাস কাটাইলে, বৌমা যোগা তোমায় ছাড়িবে কেন? ধন্য ইহাদের সুকৃতি—ধন্য ইহাদের ভক্তি! তোমাদের লইয়াই আমি ধন্য, তোমাদের কৃপাতেই আমি নিত্য তাহার সেবায় ব্রতী! এও তাহার কৃপা, চিন্ময়ি! তাহার অকৃপা কোথায়? সে আছে বলিয়াই—আমি আছি, সে আছে বলিয়াই—আমার আমিত্ব, চিন্ময়ি! তাহার অকৃপা কোথায়?

শুনিতে শুনিতে চিন্ময়ীর চক্ষে জলধারা পড়িল। বলিলেন, “সে তাহারি কৃপায় ঠাকুর। দাসী তাহার ছায়া মাত্র; ছায়ার কায়া সেই সে যেমনি নাচায়—ছায়া তেমনি নাচে। যে কায়া দেখে নাই, সেই ছায়ার গুণ দেখে। ছায়ার মান বাড়াইবার জন্য অলেপক থাকিয়া তাহার এ খেলা। কায়ার মান কায়াই বুঝে, ছায়া কি বুঝিবে ঠাকুর! সে কৃপাময়, যাহা বুঝায়—তাহাই বুঝি, ছায়ার অহং অভিমান কোথায়!”

হরসুন্দর ধীরপ্রশান্ত ভাবে বলিলেন, “দেখ দেখ, ছোট বৌমা আবার কি করিতেছেন, তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে, তিনি হয় ত ব্যথা পাইয়াছেন।”

চি। না না! আমি মারিলে যাহারা সুখী হয়, তাহারা আমার মনের ভাব দেখে, কথা বর্ণ দেখে না। এইরূপ করিয়াই ত বড় বৌমাকে এখন মানুষের মত করিতে পারিয়াছি, নচেৎ তোমার ভাবে

উহারা সংসার ধর্ম্ম শিকায় তুলে। এখন এই দুটাকে মানুষ করিতে পারিলে হয়।

তখন হরিপ্রিয়া অন্ন লইয়া হরসুন্দরের সম্মুখে ধরিলেন। তিনি আহার করিতে করিতে বলিলেন, "হা—আবার যোগাকে পাগল করিবার যোগাড়ে আছ। ছেলে মানুষ সব—উহাদের কি এমন মিষ্টি মুখ করাইতে আছে? বৈধ সাধনে রাখিতে হয়। তা তুমি ত বুঝ না। নিজের যাহা ভাল লাগে—তাহাই সকলকে খাওয়াইতে চাও। যে মৃগের নাভিতে মৃগনাভি হয়, সে কি কখন সুস্থির থাকিতে পারে? উহাদের অপরাধ কি?"

চি। তাহার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, সে কি আর তাহার অদর্শন ব্যথা সহ্য করিতে পারে? যে তাহাকে না দেখিতে পাইয়া সত্য ব্যাকুল, তাহার নাম কীর্ত্তনে কি—সে না দেখা দিয়া থাকিতে পারে? তবে বালকের চক্ষু—মোয়ায় ভোলে, তাই এত অধীর আনন্দ।

হরিপ্রিয়া অন্ন দিয়া রন্ধন গৃহে দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হরিপ্রিয়া বলিলেন, "ছি ছি! ভাবিতেছিস কি? আমিও একদিন এইরূপ ছিলাম, তাই বলিয়া কি ওই রূপ-চিরদিন থাকিতে হইবে? বয়স গুণে লোক স্বামিপ্রেমে অধীর হয়, কিন্তু কুড়ি ছাড়াইলেই বুড়ি! বুড়ির প্রেমই প্রেম, তাহা বুঝত? কি আনন্দ পাইয়াছ? গাঢ় হইতে দাও, সেবা ধর্ম্মে দিনের পর দিনে রসের উদয় হউক, তবে ত যাহা বলিয়া কথা—তাই, নচেৎ ইহাতেই মাতিলে কি হইবে? যে কখন চিনি খায় নাই, তাহার চিনি সুখাদ্য বটে, কিন্তু তাহা দুগ্ধ পাক যোগে আরও সুখাদ্য। আমরা স্ত্রীলোক, কি বুঝিব, এইরূপে বুঝ না কেন? তোমায় এত বলি, তবুত তুমি বুঝিতে চাহ না। যদি তুমি ভাই আমাদের কথা না শুন, তবে আমরা তোমার কোন কথা শুনিব না।"

বি। দিদি! আমি কি করিব, আমার ত ইচ্ছা নহে, কিন্তু যে শক্তি হৃদয়ে একদিন সঞ্চার করাইয়া দিয়াছ, সে সময় অসময় বুঝে কই? তোমাদের মুখ দেখিলেই প্রকাশ পায়। নচেৎ আমার চেষ্টায়

অনেক সময় দেখিয়াছি, সাধ্য সাধনায় কুলায় না, তবে আমার উপর বিরক্ত হইবে কেন ?

যোগমায়া পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। হরিপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে তাহার গুরুদত্ত নাম স্মরণে জাগিল। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া উভয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অন্তর মনে নাম চিন্তা করিতে করিতে যখনই শুনিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতেছেন যে, আমার সাধ্য সাধনায় যাহা কুলায় না, তোমাদের মুখ দেখিলেই তাহার উদয় হয়, অমনি তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দনে বাহিরের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেন রুদ্ধ হইয়া গেল! তিনি স্থানুর ন্যায় হইয়া গেলেন, আর তাঁহার আধার হইতে মূর্দ্ধা অবধি কি এক শক্তি আনন্দ ফুৎকারে হৃদয় ভাসাইতে লাগিল। সে অনন্ত আনন্দ সলিলে সন্তরণে তিনি কাতর, তিনি সে সন্তরণ রাগ-ভরে, মৃত্যু-ভয়ে বারেক বহির্মুখ হইলেও, আবার সে আনন্দ-স্রোত তাঁহাকে অন্তর্মুখে লইয়া যাইতে ছাড়িতেছে না। তখন তিনি ফোঁপাইতে লাগিলেন। ক্রমে বাহিরের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল, বুদ্ধি যেন দূর হইতে হৃদয়ের সন্নিকট হইল, আধ নিদ্রা—আধ জাগরণে তিনি শুনিলেন, "চিন্ময়ী বলিতেছেন, এত বেলা হইল, খাওয়া দাওয়া নাই, নাওয়া নাই—একি রকম? তোমাদের লইয়া ঘর করি কিরূপে?—ছাড়িয়া দাও, এখনও বাসন কয় খানা পড়িয়া আছে, উঠ, শীঘ্র বাসন কয় খানা মাজিয়া দাও।"

কিন্তু বহু চেষ্টাতেও যোগমায়া সে হৃদয়-বেগ চাপিতে পারিতেছেন না। এখনও হৃদয়ে স্বপ্নবৎ যেন তাহাই দেখিতেছেন। আর হৃদয় হইতে যেন সেই আনন্দ বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া মুখে আসিয়া মিশিতেছে।

হরিপ্রিয়া হাসিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া আছেন—উভয়ের চক্ষে ধারা বহিতেছে। চিন্ময়ী বলিলেন, "তবে আর তোমরা আমাদিগকে সংসারে থাকিতে দিবে না, তোমরা ওই রূপে নাচিতে থাক, তোমাদের লইয়া বনে যাই, এরূপে সংসারকে জানাইলে, সংসার ভাণ ধরিতে ছাড়িবে কি ? বে-দরদি সম্পর্কে সত্য বস্তু উড়িয়া

যাইবে, ভাণই থাকিয়া যাইবে। সংসার লইয়া ধর্ম্ম, কিন্তু মা! সংসারকে জানিতে দিলে ধর্ম্ম লাভ হইবার নহে। সংসাররূপে মায়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে।”

তখন গৃহিণীর ভয়ে যে যাহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। যোগমায়া বাসন মাজিতে বসিলেন, কিন্তু দূরে সে আনন্দ বুদ্ বুদ্ শব্দ উকি মারিতে ছাড়িল না। তাঁহার দৃষ্টি সেই হৃদয় পরিথায় রহিল, হস্ত কেবল চিরাভ্যস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

গৃহিণী পুনরপি হরসুন্দরের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হরসুন্দর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি আহার করিতেছেন বটে, কখন কি খাইতেছেন, তাহার ঠিক নাই, তিনি জল খাইতে গিয়া, ভুলিয়া অন্নে জল মাখিলেন, তাহাই হাস্য বদনে উদরসাৎ করিতেছেন!

গৃহিণী বলিলেন “ওঁকি করিলে? ভাতে জল ঢালিলে কেন?”

হরসুন্দর বলিলেন, “গৃহিণি! দেখ দেখ—বনের পাখী কেমন তাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। দেখ জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, ভাষাহীন অবোধ স্ত্রীলোক, হৃদয় আনন্দে অব্যক্ত ভাষায় কেমন সুরলয়ে তাহার মহিমা গাহিতেছে। ধন্য তাহার মহিমা! যাহার—অনন্তকাল যোগ সমাধিতে অন্ত না পাইয়া যোগী, ঋষি—সমাধিতে সমাধিপ্রাপ্ত, ভক্তি-যোগে সে শক্তি সঞ্চারে, দুই দিনের শাবক আজ কি সুন্দর সুর ধরিয়াছে ধন্য তাহার লীলা—ধন্য তাহার ভক্তিশক্তি! এ শক্তি জগতে কৃপা না করিলে, কাহার সাধ্য ইহার বিরূপ শক্তি অবিদ্যাকে জয় করে। জগতে সেই ধন্য, যাহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারে—ভক্তির সঞ্চার হয়।

এই ধর্ম্ম ভূতের, ভুতুড়ে জীবের জন্মসিদ্ধ—সনাতন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন আর শশাঙ্ক "সাগরতলীতে" যাইতে চাহেন না। পূর্ব্বে জ্যোতিঃপ্রসাদ যাইতে চাহিতেন না, শশাঙ্কই আগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ মনে মনে বলিলেন—শশাঙ্ক! এখন কিছু বলিতেছি না, যদি ঈশ্বর দিন দেন, তবে এ ব্যথা খুলিব, দেখাইব—তোমার কৃপায় জ্যোতিঃপ্রসাদ তোমার রূপের মাধুর্য্যে লালায়িত হইতে শিখিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "শশাঙ্ক! তবে তুমি 'সাগরতলী' যাইবে না?"

শ। নিত্য 'সাগরতলী' যাইলে, এখনও সন্দেহ করিতে পারে। বসন্ত—মোক্তার, আবার কি ফেসাত বাধাইতে পারে না?

মনে মনে বলিলেন, "হরসুন্দর! তুমি ধন্য! ধন্য তোমার দয়া! ধন্য তোমার হৃদয়! তুমি ধন্য না হইলে, তোমার সহবাসে লোকে ধন্য হইতে পারিত কি? এমন না হইলে কি শশাঙ্কের এ পাষাণ হৃদয় দ্রব হয়? শশাঙ্ক যে শুষ্ক, বহুদিনের শুষ্ক দারুখণ্ড। এখানে বাটালির কোপ বসে না, ফাটিয়া যায়, ভক্তি ভিন্ন কি এ শুষ্ক দারুখণ্ড গঠনের উপযুক্ত হয়?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ সে কথা না শুনিয়া জোর করিয়া শশাঙ্ককে 'সাগর তলীতে' লইয়া গেলেন। উভয়েই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শিবসুন্দর হুঁকাটি হাতে করিয়া আপনা আপনি মৃদুমন্দ হাসিতেছেন। আর মধ্যে মধ্যে ঠোঁট দুইখানি নড়িতেছে, যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন এবং চক্ষের ভাবও তদ্রূপ। উভয়কে দেখিয়া শিব সুন্দর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "তুমি যে এ ঘরে?"

শি। আপনি ত সেই দিন হইতে এই ঘরে স্থান দিয়াছেন। কই আর কেহ ত অন্য স্থানে যাইতে বলেন নাই। তবে আমায় যদি বলিয়া থাকেন, আমি শুনিতে পাই নাই।

জ্যোতিঃপ্রসাদ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "না না এই খানেই থাকুন। আমি বিদ্রূপ করিতেছিলাম।"

শি। এ স্থান আমার পক্ষে সুখকর নহে। যদি বলেন, অন্য গৃহে থকিলে হয়।

জ্যো। কেন?

শি। এ ঘরে আমার বড় সঙ্কোচে সঙ্কোচে থাকিতে হয়। আমাদের তামাক খাওয়া, গুল ফেলা অভ্যাস। এ সকল জিনিসের মর্ম্ম আমরা বুঝি না। যেখানে পূর্ব্বে আমায় রাখিয়াছিলেন, সে আমার পক্ষে গারদ নহে, ইহাই আমার গারদ।

এবার জ্যোতিঃপ্রসাদ, শশাঙ্ক উভয়েই ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইলেন। শিবসুন্দরের মুখ প্রতি তাকাইতে, শশাঙ্কের যেন চক্ষে জল আসিল। জ্যোতিঃপ্রসাদ, শশাঙ্কের সে মুখভঙ্গী দেখিয়া, তাহা বুঝিলেন। ভাবিলেন—তোমার ভিতরে এক—বাহিরে এক। তুমি উপরে মানুষ—ভিতরে দেবতা। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদকে আর ঢাকিতে পারিতেছ না—এক দিন তোমাকে দিয়াই এ রহস্য প্রকাশ করিবে।

এদিক, ওদিক করিয়া শশাঙ্ক আর সেখানে রহিলেন না, কাছারিতে গেলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ, শিবসুন্দরকে বলিলেন, "আমরা যখন গৃহে প্রবেশ করি, তখন তুমি কি করিতেছিলে?"

শি। কি করিব? কিছুই ত নহে। তামাক খাইতেছিলাম, তাহা ত দেখিয়াছেন।

জ্যো। না—সত্য বলিতে হইবে।

শি। কিছু করিতে দেখিয়াছেন কি?

জ্যো। বাহিরে কিছু কর নাই—কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শিবসুন্দর এ কথায় একটু হাসিলেন মাত্র—কোন উত্তর করিলেন না, একটী গীত ধরিলেন। কে জানে কেন, শিবসুন্দরের গলা জ্যোতিঃপ্রসাদের এখন বড় ভাল লাগে। জ্যোতিঃপ্রসাদ সঙ্গীতের মর্ম্ম কিছুই বুঝেন নাই, অথচ হা করিয়া শুনিতেছেন। যতই শুনিতেছেন, সঙ্গীতের অর্থের দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, ততই তিনি ভক্তিতে যেন আর্দ্র হইতেছেন। এখন যেন শিবসুন্দরকে নূতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ

করিয়াছেন, কিন্তু উপরে সে ভাব কিছুই প্রকাশ করেন না, কারণ শশাঙ্ক, তাঁহার সে ভাব স্থির রাখিতে দেন না। শিবসুন্দর সঙ্গীত বন্ধ করিলে, জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহা নাই বলিলেন, আমার আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে। সে দিন যখন পুলিস অনুসন্ধানে আসিল, তখন আপনি কোথায় ?"

শি। অশ্বত্থ গাছের উপরে। তাহার কিছু অগ্রেই আমি আসিয়াছিলাম।

জ্যো। আপনি প্রকাশ না হইয়া লুকাইলেন কেন ?

শি। নহিলে আপনি দোষী হন।

জ্যো। আমি কি দোষী নহি ?

শি। কৃষ্ণ জানেন—আপনি দোষী কি—না, আমাদের চক্ষে আপনি দোষী বটে, কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি, কৃষ্ণ দোষীকে দণ্ড না দিয়া নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেন। মানুষ ভ্রান্ত বলিয়া মানুষের সে বোধ, এবং দোষী, নির্দ্দোষী নির্ব্বাচনও ভ্রান্তিময়। দোষী হইলে, কৃষ্ণই আপনাকে দণ্ড দিবেন বলিয়া, আমি মানুষের বিচার প্রার্থনা করি নাই—সেই জন্য লুকাইয়াছিলাম।

জ্যো। আমি দোষী সাব্যস্ত হইলে, আপনাদেরই ত ভাল। আমি আপনাদের শত্রু।

শি। আপনি আমাদের শত্রু মনে করিয়া, আমাদের শত্রু হইয়াছেন, কিন্তু আমরা ত আপনাকে শত্রু মনে করি নাই, সে জন্য আমি শত্রুর কাজ করিতে পারি নাই।

জ্যো। কেন ? আমি যখন সত্য সত্যই শত্রুতা করিয়াছি, তখন শত্রু মনে করেন না কেন ?

শি। মন—মনে করিতে চায়। কিন্তু মন ছাড়া আর একজন আমার বন্ধু আছে, সে কাহার শত্রু নহে, এবং কেহই তাহার শত্রু নহে। আমার মন, তাহাকেই বড় ভালবাসে। ভালবাসিলে, ভালবাসার ভাব ধরিতে ইচ্ছা করে, তাই মন তাহার ভাবে, তোমায় শত্রু মনে করিতে পারে নাই।

জ্যো। কে—সে?

শি। সে তোমারও বন্ধু। তুমি তাহাকে চেন না, সে তোমাকে চেনে।

জ্যো। সে কোথা থাকে?

শি। তোমার আমার সকল হৃদয়েই থাকে।

এতক্ষণে জ্যোতিঃপ্রসাদ বুঝিলেন, বলিলেন "সংসারে যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, আমি তাহাদের ভণ্ড মনে করিতাম। ভাবিতাম—যাহারা বনবাসী, তাহারাই সাধু। এখন জানিতেছি—সংসারেও সাধুর অভাব নাই, চক্ষু থাকিলে দেখা যায়। তবে সংসারী সাধুকে ধরিবার যো নাই, আবার যাহারা বাহির সর্ব্বস্ব—তাহারা ভণ্ড।"

শি। ও কথা ছাড়িয়া দিন। আজ যাহা বুঝিতেছেন—কা'ল তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, আবার নূতন বুঝিবেন। যতদিন না এমন বুঝিবেন—যে বুঝা, নিত্য দিনের মত সত্য, ততদিন এ বুঝা বুঝির উপর নির্ভর করিবেন না। এই নির্ভরেই মানুষ অহঙ্কারী হয়, ধর্ম্ম করিতে গিয়াও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়।

জ্যোতিঃপ্রসাদ যতই শিবসুন্দরের বাক্য শুনিতেছেন, ততই তাঁহার শশাঙ্কের উপর দৃঢ়তা জন্মিতেছে। হরসুন্দরের উপর তাহার যে ভাব, যেন তাহা একবারে হৃদয় হইতে ধুইয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিতেছেন না। ভাবিলেন,—শশাঙ্ক! দেখিব হরসুন্দরের প্রতি তোমার প্রেম—কত সুন্দর।

তখন হরসুন্দরের জন্য তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন—অজ্ঞ আমি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে। বুঝিয়াছি—আমার জন্ম জন্ম অপরাধের জন্যই ঈশ্বরের এ খেলা, কিন্তু মন ত তাহাতে প্রবোধ মানিতেছে না। তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, ইহাতে কি তোমার দয়া হইবে? একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি তুমি সত্য হও, তবে আমার হৃদয় বুঝিবে। শক্র হইয়া আমি তোমায় শত্রুপুরীতে ডাকাইয়া পাঠাইব, দেখিব—তুমি আসিয়া দর্শন দাও কি না।

তখন শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ নিজের ভাব তখন গোপন রাখিতে ভুলিলেন। শশাঙ্কের পদস্পর্শে প্রণাম করিলেন। শশাঙ্ক বিনা বাক্যব্যয়ে তদ্রূপ প্রণাম করিলেন, বলিলেন, "তুমি যে আমায় প্রণাম করিলে?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ তখন ভিন্ন স্থুর ধরিলেন, বলিলেন,—"তুমি একটা পাগল ধরিয়া আনিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদকে বানর বানাইবার চেষ্টা করিতেছ? তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই, কিন্তু তাহা হইবে না; যাহা প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা করা চাই। তাহার আয়োজন কর।"

শশাঙ্ক এত বুদ্ধি ধরিয়াও জ্যোতিঃপ্রসাদের এ ভাব ধরিতে পারিলেন না। তাঁহার সেই খড়ম পেটার প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মনে মনে বলিলেন—ঠাকুর! আবার এ মূর্ত্তি কেন?

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দিব্যানন্দের আর সে পূর্ব্ব ভাব নাই। এখন তিনি যেন অনেকটা দূরে। চিন্তা বেগ আর বাহ্য বিষয়ে তত অগ্রসর হয় না। নন্দিগ্রাম যেন অস্পষ্ট—দূরে, কেবল তাহার ছায়া যেন স্বপ্নবৎ দৃষ্ট। ভোজন পানেও স্পৃহা নাই। সামান্য আয়াসে যাহা মিলে—তাহাই যথেষ্ট। ভাল মন্দের বিচার নাই। দেহ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু, মন যেন সাত্বিক ভাবে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ। একাসনে সর্ব্বদাই উপবিষ্ট। নিদ্রা নাই বলিলেই হয়। চারিদিকে আকাশে গগনভেদী বৃক্ষের মাথা, আর ভূতলে হিংস্র পশুর হুঙ্কার—কিন্তু ভয়ে ভয় নাই, লক্ষ্যে লক্ষ্য নাই। গুরুদেব পূর্ণানন্দ সম্মুখে। সম্মুখে দিব্যানন্দ যোগাসনে। পূর্ণানন্দ বলিতেছেন, "যোগ কি—তাহার সাধন ব্যাপার—বলিয়াছি, আজ তাহার ফলাফল ব্যক্ত করিব।

"অশান্ত চিত্তকে দেশ বিশেষে বিক্ষেপ শূন্য করিয়া শান্ত রাখার নাম—ধারণা। অতএব যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম—ধারণার পূর্ব্ব

"দেশ বিশেষে অর্থাৎ ধারণীয় পদার্থে, যদি চিত্ত একতান হয়, তবেই তাহা—ধ্যান আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

"যখন সেই ধ্যান, আত্মশূন্য ভাবে কেবল ধেয় বস্তুকেই স্বপ্রকাশকরে —তাহাই সমাধি। অর্থাৎ তখন জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় একস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

"ধ্যান, ধারণা, সমাধি রূপ তিনটী মানস ব্যাপার একীভূত করিয়া যদি কোন অবলম্বনে সংযোগ করা হয়, তবেই তাহা—সংযম আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

"সংযম জয়ে যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহাই—প্রজ্ঞা-লোক। সোপান ক্রমে সংযমের সাধন। অর্থাৎ প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম অবলম্বন গ্রহণীয়, নচেৎ স্থূলে জয়ী না হইয়া সূক্ষ্মে আরোহণে পদভ্রষ্ট হইতে হয়।

"যম, নিয়মাদি যোগাঙ্গ—বহিরঙ্গ। সংযমই অন্তরঙ্গ সাধন। সেই জন্যই ক্রিয়া যোগে ইহার উল্লেখ করি নাই। কারণ ইহা—ফল-স্বরূপ।

"যম, নিয়মাদি যোগাঙ্গ যেমন সংযমের বহিরঙ্গ, তেমনি সংযম নির্বীজ সমাধির—বহিরঙ্গ। কারণ নির্বীজ সমাধির যাহা অন্তরঙ্গ, তাহা সংযমকেও নিরুদ্ধ করিয়া আপনি নিরোধ প্রাপ্ত হয়।

"নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিরোধ পরিণামে নীত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব পরি-ণামের নাম—নিরোধ, আর চাঞ্চল্যাদি চিত্তের রাজসিক পরিণামের নাম —ব্যুত্থান। যখন ব্যুত্থান পরিণামে অভিভূত হওয়ায় চিত্ত, কেবল নিরোধ পরিণামে স্থিত, তাদৃশ তুষ্ণীম্ভাব প্রাপ্তির নাম—নিরোধ পরিণাম।

"নিরোধ পরিণামে, চিত্ত দৃঢ়সংস্কারভাবে বিক্ষেপশূন্য হওয়ায় শান্ত হয়। চিত্ত যদি বিক্ষেপশূন্য একাগ্রতায় উজ্জ্বল হয়, তাহাকেই— সমাধি পরিণাম বলে। কারণ সর্ব্বার্থতা অর্থাৎ নানা বিষয় গ্রহণ, চিত্তের বিক্ষেপ ধর্ম্ম এবং একতত্ত্ব অভ্যাসই—একাগ্রতা।

একতত্ত্ব অভ্যাসে যদি সমান দুই বৃত্তির পরপর ক্রমে অস্তুদয় ও উদয় ঘটে অর্থাৎ যে বৃত্তিতে চিত্ত বিক্ষেপশূন্য, যদি তাহার অস্তুদয়ে, এমন বৃত্তির উদয় হয়, যাহাতে সেই বিক্ষেপশূন্য অবস্থাই বর্ত্তমান থাকে, তাহাই একাগ্রতা পরিণাম।

"প্রত্যেক ভূতেন্দ্রিয়ে যে—ধর্ম্ম, লক্ষণ, অবস্থা রূপ পরিণাম বর্ত্তমান, তাহা উপরিউক্ত চিত্তপরিণাম দ্বারা বুঝা যায়।

"যাহা—ধর্ম্মকে ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম্মী। ধর্ম্মীর যে ধর্ম্ম, কার্য্যশেষে অস্তমিত—তাহাই শান্তি। যে ধর্ম্ম ভবিষ্যৎ কার্য্য-কারণ-রূপা—তাহাই অব্যপদেশ্য। যে ধর্ম্ম ভবিষ্যৎ কালকে পরিত্যাগ করতঃ বর্ত্তমানে বর্ত্তমান—তাহাই উদিতা। এই তিন ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপাতী—ধর্ম্মী।

"পরিণামান্যত্ব রূপ কার্য্যের, ক্রমান্যত্বই কারণ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যে এক পরিণাম হইতে অন্য পরিণাম হয়, তাহাই ক্রমান্যত্ব, এবং সেই সেই অবস্থাই—পরিণামান্যত্ব।

"ভূতেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, লক্ষণ, অবস্থায়, সংযমে তাহার পূর্ব্ব ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

"শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহারা এক একটী স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও, লোকে ব্যবহার কালে পৃথক করিয়া ব্যবহার করে না বলিয়াই, তাহাদের শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বড়ই সঙ্কীর্ণ। কিন্তু যোগী, সে সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া যদি তাহার প্রতি সংযম করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণিমাত্রের উচ্চারিত শব্দের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন।

"সংযম প্রভাবে বাসনারূপ সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে পূর্ব্ব-জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

"মুখগত ভাব ভঙ্গী বা তৎসঙ্গী অন্য লক্ষণাদি দেখিয়া পরচিত্ত অনুমান করতঃ তাহাতে সংযম করিলে, তাহার বিশেষ অর্থাৎ সে চিত্ত কিরূপ—অবগত হওয়া যায়।

"এইরূপে পর-চিত্ত জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমান চিত্ত-ভাবনা ধৃত হয় না। বর্ত্তমান ভাবনা ধৃত করিতে, বর্ত্তমানে কি ভাবি-তেছে, তাহার প্রতি সংযম আবশ্যক।

"শরীরের রূপে সংযম প্রয়োগ করিলে, রূপ গ্রাহ্য শক্তি স্তম্ভিত, এবং চাক্ষুষ আলোকের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহার ছেদ হয়। অর্থাৎ প্রতি শরীরেই রূপ বা রং আছে এবং চক্ষে সাত্ত্বিক আলোক আছে, দ্রষ্টা বা দৃশ্য উভয়ের নৈকট্যে দর্শন কার্য্য চলিতেছে; কিন্তু যদি যোগী

নিজ শরীরস্থ রূপ এবং চক্ষুর সাত্ত্বিক আলোকের প্রতি সংযম প্রয়োগে তাহা স্তম্ভিত এবং অসংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে দ্রষ্টার দর্শন কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপে যোগীর অন্তর্দ্ধান শক্তি জন্মে।

"এইরূপ শব্দ তন্মাত্র অবলম্বনক্রমে, শব্দাদি অন্তর্দ্ধানশক্তি সিদ্ধ হয়, অতএব তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"পূর্ব্বজন্মগত কর্ম্ম, দুই প্রকারে শরীরে অবস্থিতি করে। এক সোপক্রম, অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ হইতেছে, আর নিরুপক্রম, অর্থাৎ যাহা কারণ ভাবে আছে। এই দুই কর্ম্মে সংযম প্রয়োগ করিলে, মৃত্যু বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ কোথায় কোন কালে কি ভাবে মরণ হইবে, তাহা জানিতে পারেন। যদি কোন যোগী সাধন ক্ষুণ্ণতায় সম্যক অবগত হইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অরিষ্ট জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ লক্ষণের দ্বারায় তাহা অবগত হইতে পারেন।

"মৈত্রী, করুণা, মুদিতারূপ মনোভাব বিশেষের প্রতি সংযম প্রয়োগে তদ্গত বললাভ হয়। এইরূপ বলে বলীয়ান হইতে পারিলে, প্রাণিমাত্রের সুখ-দাতা সুহৃৎ হইতে পারা যায়, এবং জীবের দুঃখ দূর করা যায়।

"এইরূপ হস্তিবলের প্রতি সংযম প্রয়োগে অর্থাৎ যে কোন বলের অবলম্বনে সংযম প্রয়োগে তদ্গত শক্তি লাভ হয়। শরীর বলশূন্য— চিত্ত-বলই শরীরের বল।

"চিদাকাশস্থিত পূর্ব্বোক্ত বিশোক জ্যোতিঃ বা সত্ত্বগুণ প্রকাশকে যদি সংযম-প্রভাবে সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট পদার্থে নীত করা যায়, তাহা হইলে সে সমস্তই প্রত্যক্ষ হয়। ইহাই দিব্যচক্ষুর বহির্মুখ দর্শন।

"ঐরূপে সুষুম্না নাড়ী দ্বারে সূর্য্যে সংযম প্রয়োগে, ভুবনগত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয়।

"ঐরূপ চন্দ্রে চিত্ত সংযমে নক্ষত্রের সন্নিবেশ এবং ধ্রুবতারায় চিত্ত সংযমে তাহাদের গতি জানা যায়।

"নাভি চক্রে চিত্তসংযমে কায়ব্যূহ অর্থাৎ শারীরিক সংস্থান জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রাণ বায়ুর সঙ্ঘর্ষণে কণ্ঠ কূপেই ক্ষুধা, তৃষ্ণার অনুভব হয়।

যদি সেই কণ্ঠ কূপে সংযম প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর চিত্তের বিক্ষেপ আনিতে পারে না।

"হৃদয়ে কূর্ম্ম নাড়ী। তাহাতে চিত্ত সংযমে শরীর ও মনের স্থিরতা জন্মে।

"মূর্দ্ধস্থিত তেজে সংযম প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষের দর্শন হয়।

"যে জ্ঞান সংসার নিবারক—তাহাই তারক। প্রাতিভ—তারক জ্ঞানের নামান্তর মাত্র। ইহাই প্রসংখ্যানের পূর্ব্বরূপ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন প্রভার উদয় এবং তাহাতে জগৎ-দৃষ্টি, তেমনি যোগীর প্রসংখ্যানের পূর্ব্বে যে প্রতিভার উদয় হয়, তাহাতে চিত্ত সংযমে সমস্তই অবগত হওয়া যায়।

"হৃৎপদ্মে চিত্ত সংযমে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়।

"বুদ্ধি ও আত্মা—ভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু অস্মিতায় একতত্ত্ব রূপে প্রতীত হওয়ায়, আত্মায় যে সুখ, দুঃখ—তাহা আরোপিত। অতএব চিৎ-ছায়া মাত্র অবলম্বনে সংযম করিলে পুরুষের স্বীয়স্বরূপে জ্ঞান জন্মে।

"পূর্ব্বোক্ত পুরুষ সংযমে যোগীর দিব্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অনুভব হয়।

"কিন্তু এ সকল সমাধির বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক; কারণ যদি ইহাতে চিত্ত মুগ্ধ হয়, তাহার ফলে আর মোক্ষদায়ক সমাধি দৃঢ় হইতে পারে না। কারণ মুক্তিই উদ্দেশ্য। তবে দিব্য শব্দাদি জ্ঞান যে এক প্রকার সিদ্ধি, তাহা বলিতে হইবে।

"যাহার দ্বারায় চিত্ত এই শরীরে বদ্ধ, তাহা বিদূরিত হইলে এবং চিত্ত নাড়ীসমূহে কিরূপে লিপ্ত—তাহা জানিলে, চিত্তকে পরশরীরেও প্রবিষ্ট করা যায়। কারণ চিত্ত সর্ব্বগামী, কেবল কর্ম্ম-বন্ধনেই সে বদ্ধ। চিত্ত পরশরীরে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন প্রধান মক্ষিকা গমন করিলে অন্য অন্য মক্ষিকা তাহার সহিত গমন করে—তেমনি ইন্দ্রিয়গণও গমনাগমন করে। অতএব যে রূপ আত্মশরীরে ভোগ হয়, যোগী—সে রূপ পরশরীরও ভোগ করিতে পারেন। পরশরীর-প্রবেশে যোগীর

আত্মশরীর মৃতবৎ থাকে। ইহার দ্বারা মরণে, যে জীবের মৃত্যু হয় না—তাহা বুঝা যায়, এবং মরণে যে মুক্তিলাভ হয় না—তাহাও নিশ্চয় হয়। কারণ, শরীরগত জীব, স্থূলশরীর ত্যাগে, সূক্ষ্মশরীরে অন্ত আশ্রয় লইলেই স্থূলের যে মৃত লক্ষণ—তাহাকেই আমরা মরণ কহি। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম শরীরে জীব মরিল না এবং এই সূক্ষ্মশরীরী, যখন এই প্রকৃতি ত্যাগ করিতে পারিল না অর্থাৎ অন্য দেহ আশ্রয় করিল, তখন আর মুক্তি কোথায়? এই জন্যই এ সকল সিদ্ধি সমাধির বিঘ্ন।

"কর্ণ হইতে মূর্দ্ধা অবধি উদান বায়ুর স্থান। এই উদান বায়ুতে সংযমে ঊর্দ্ধগমন সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পঙ্ক বা কণ্টক তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না, তিনি তাহার উপর ভাসিতে থাকেন এবং উৎক্রান্তি বা মরণও তাঁহার অধীন হয়।

"নাভিদেশস্থ সমান বায়ুতে সংযম করিলে চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নিও তাঁহাকে দুঃখ দিতে পারে না, কারণ তাহাতে যোগীর শরীরে অগ্নি তুল্য তেজ জন্মে। বহিরগ্নি সে তেজ অপেক্ষা দহনশীল নহে।

"দেহস্থিত আকাশতত্ত্বে যে ইন্দ্রিয়—তাহাই শ্রোত্র বা কর্ণ। এই কর্ণ যন্ত্রের সহিত বহিরাকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে দিব্য শ্রোত্র উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ তাহাতে সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট শব্দও শ্রুত হয়। এইরূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুর, চক্ষুর সহিত তেজের, রসনার সহিত স্নেহের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত পৃথিবীর যে সম্বন্ধ, তাহাতে সংযমে বিবিধ স্পর্শাদি অনুভব করা যায়।

"এইরূপে শরীরস্থ আকাশ ও বহিরাকাশের গূঢ় সম্বন্ধে সংযম করিলে—শরীর লঘু হয়, তাহাতে আকাশে গমনাগমন করিতে পারা যায়।

"বাহ্য বিষয়ে অকল্পিতা বৃত্তিতে চিত্তের যে স্থিতি, তাহাকে মহাবিদেহ বলে। তাহাতে সংযম করিলে, সত্ত্বগুণের আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং যোগী সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন।

"পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকটীরই পঞ্চবিধ অবস্থা আছে। প্রত্যেক ভূতের এই পাঁচ পাঁচটী অবস্থার প্রতি সংযম করিলে, ভূত জয়

হয় অর্থাৎ ভূত সকল যোগীর বশীভূত হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী মহাভূত। ইহাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম, স্বরূপ, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব। স্থূল অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতাবস্থা। স্বরূপ অর্থাৎ ক্ষিতির কঠিনত্ব, অপের স্নেহত্ব, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর বহনশীলতা, ব্যোমের সর্ব্বব্যাপকত্ব। সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাণু এবং তন্মাত্রা। অন্বয়িত্ব অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে আবৃত। অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ ভোগ প্রদান সামর্থ সম্পন্ন।

"পূর্ব্বরূপে ভূত-সকল জয় করিতে পারিলে যোগীর অণিমাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হয় এবং কায়-সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্মের অবিনাশ হয়। অণিমা অর্থাৎ অণু প্রায় হইবার শক্তি। লঘিমা অর্থাৎ গুরুভার হইয়াও অতি লঘু হইবার শক্তি। মহিমা অর্থাৎ ক্ষুদ্র থাকিয়াও বৃহৎ হইবার শক্তি। প্রাপ্তি অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে দূরস্থকে নিকটস্থ করিবার শক্তি। প্রাকাম্য অর্থাৎ সকল ইচ্ছা ধারণের শক্তি। বশিত্ব অর্থাৎ যাহাতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ বশ হয় এরূপ শক্তি ধারণের শক্তি। ঈশিত্ব অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব শক্তি। কামাবসায়িত্ব অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ ভৌতিক পদার্থের শক্তি পরিবর্ত্তন করাইয়া দিবার শক্তি। ইহাকেই অষ্ট ঐশ্বর্য্য বলে। ভূতের স্থূলরূপ জয়ে অণিমা, লঘিমা. মহিমা, প্রাপ্তি, স্বরূপ জয়ে—প্রাকাম্য, সূক্ষ্মরূপ জয়ে—বশিত্ব, অন্বয়রূপ জয়ে—ঈশিত্ব; অর্থবত্ত্বরূপ জয়ে—কামাবসায়িত্বরূপ মহাসিদ্ধি লাভ হয়।

"এই অষ্টমহাসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটী সিদ্ধি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ কায়সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্মের অব্যাঘাত।

"রূপ, লাবণ্য, বলযুক্ত বজ্রবৎ যে শরীরের দৃঢ়তা ইত্যাদি শারীরিক গুণ বিশেষের নাম কায়সম্পৎ।

"দেহগত রূপ, মূর্ত্তি ও অন্যান্য ধর্ম্ম সকল, যদি অবিনশ্বর তুল্য হয়, তবে তাহাকে কায়িক ধর্ম্মের অব্যাঘাত বলা যায়।

"ইন্দ্রিয়গণেরও পঞ্চবিধ অবস্থা। যথা:—গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। এই সকল অবস্থা জয়ে ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হয়।

গ্রহণ অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ইহারা প্রত্যেকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ হইতে আপন আপন বিষয় গ্রহণ করে। স্বরূপ অর্থাৎ কার্য্যদ্বারে ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ। অস্মিতা অর্থাৎ অহঙ্কার। অন্বয় অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তমঃ যুক্ততাতে প্রকাশ প্রবৃত্তি ও স্থিতি। অর্থবত্ব অর্থাৎ ভোগ, মোক্ষ সাধন, শক্তিযুক্ততা।

"এইরূপে ইন্দ্রিয় জয়ে মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় শরীরেরও গতিশক্তি জন্মে এবং বিকরণ ভাব অর্থাৎ স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছ ভাবে পরিচালন করিতে পারা যায়। প্রধান জয় অর্থাৎ প্রকৃতি তখন বশীভূত হন। ইহাকেই শাস্ত্রান্তরে মধুপ্রতিকা সিদ্ধি বলে। অর্থাৎ একটী ইন্দ্রিয় জয়ে সেই ইন্দ্রিয়গত সমস্ত বিষয়ই জ্ঞাত হওয়া যায়।

"বুদ্ধিগত সত্ব এবং পুরুষ—আত্মা, এই দুয়ের পার্থক্য জ্ঞানে সংযম করিলে যোগী সর্ব্ব বিষয়ে প্রভুত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। যদি এ সকল সিদ্ধিতেও যোগীর বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে মূলকারণ অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায় এবং কৈবল্য লাভ হয়।

"যোগীর এই অবস্থায় দেবতারা উপনিমন্ত্রণ করেন অর্থাৎ নানা উপঢৌকনে তাঁহাদের প্রবৃত্তি আনয়নে চেষ্টা করেন। অতএব তাঁহাদের হিতার্থ এই সাবধান বাক্য যে, তাঁহারা যেন দেবতাগণের উপনিমন্ত্রণে আসক্ত অর্থাৎ ইচ্ছাবন্ত বা বিস্মিত না হন। তাহা হইলে যোগভ্রষ্ট হইতে হয়।

"ক্ষণ অর্থাৎ কাল এবং ক্রম তাহার মুহূর্ত্ত, দণ্ড, প্রহর, দিবারাত্র এবং গতি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। ইহাতে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞান জন্মে। তাহা হইলে আর দেবতার প্রলোভনে মুগ্ধ হইতে হয় না।

জাতি, লক্ষণ, দেশ দ্বারা পদার্থের ভিন্নতা জানা যায়। কিন্তু যে স্থানে দুই বা ততোধিক বস্তু সমান জাতীয় ও সম লক্ষণাক্রান্ত ভাবে একত্র থাকে, সে স্থলে তাহাদের পার্থক্য সহজে উপলব্ধি হয় না। এ রূপ স্থলে বিবেকজ জ্ঞানে ঘন ও ক্রমের প্রতি সংযমে তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধি

হয়। অর্থাৎ ইঁহাতেই পুরুষ প্রকৃতির ভেদ দর্শন হয়। জাতি অর্থাৎ গো, মহিষ ইত্যাদি। লক্ষণ অর্থাৎ শ্বেত, পীত, রক্ত ইত্যাদি; দেশ, অর্থাৎ কালচক্ষু, ভগ্নপাদ ইত্যাদি।

"বিবেকজ-জ্ঞান যোগীকে ভবসংসার হইতে তারণ করে বলিয়া তাহাকে "তারক" বলা হয়। এই জ্ঞানে সর্ব্ববিষয় অর্থাৎ তত্ত্ব সকল, সর্ব্বথাবিষয় অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়ের অবস্থা, পরিণাম, স্থিতি, এবং তাহার অক্রম যোগী দেখিতে পান। অতএব বিবেকজ-জ্ঞানে যোগীর কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না।

"এই বিবেকজ-জ্ঞানের ফল কি? বুদ্ধিতত্ত্বের এবং পুরুষের সম্যক শোধনে কৈবল্য বা মোক্ষ। তখন বুদ্ধিনিষ্ঠ রজঃ ও তমঃ মূলোৎপাটনে দূর হয়, যাহাতে চিত্ত একেবারে বৃত্তিশূন্য হয়। ইহাকেই সত্ত্ব-শুদ্ধি বলে। এই সত্ত্ব-শুদ্ধিতে নিত্যশুদ্ধ আত্মার, আরোপিত ভোগ-জ্ঞানের লোপ হয়। আত্মার সেই ভাবই—আত্মশুদ্ধি। এই উভয় শুদ্ধিতেই—কৈবল্য। ইহাই মহামুনি পতঞ্জলির বিভূতিপাদ বর্ণনা।"

তখন দিব্যানন্দ প্রকৃষ্টরূপে বুঝিবার নিমিত্ত নানা প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ণানন্দ তাহা বিশদরূপে বুঝাইতে লাগিলেন। পরে পূর্ণানন্দ সেস্থান হইতে বিদায় লইলে, দিব্যানন্দ যোগাসনে যোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণ দেবীগ্রাম হইতে বাটী পঁহুছিয়া দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিতেছেন বটে, কিন্তু সেইদিন হইতে তাঁহার মন যেন সর্ব্ববিষয়েই অনুরাগশূন্য। মোকদ্দমার ভবিষ্যৎ চিন্তা আর তাঁহার হৃদয়ে যে নাই—তাহা নহে, কিন্তু—মনের যেন সে অনুরাগ আর নাই।

ভাগবত তাঁহার বড় প্রিয়। আজ সে ভাগবতেও আর সে অনুরাগ নাই। কুহকে যেমন কাষ্ঠের পুত্তলি নাচে, তাঁহার দৈনন্দিন ক্রিয়াও সেইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নটনারায়ণ বিষ্ণু-পূজার জন্ম বিষ্ণু-গৃহে প্রবেশ করিলেন। আসনে বসিলেন। চিরাভ্যস্ত পূজাপদ্ধতিতে আজ যেন ভ্রম হইতেছে, মন্ত্র যেন বিষ্ণুর স্থূলরূপেই পর্য্যবসিত হইতেছে। তাঁহার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। গদ্‌গদ কণ্ঠে জোড় হস্তে বলিতে লাগিলেন,—"হৃদয়-দেব! জ্ঞানাবধি তোমার পূজায় যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, আজ সেই প্রীতি তোমার চিন্ময় মূর্ত্তির অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানরূপে, একদিকে যেমন সংসারানুরাগ দূর করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি হৃদয়কে তোমার চরণপদ্মে উৎসর্গ করিতে পারিতেছে না। কেন প্রভু! স্থূল, সূক্ষ্মরূপ, তোমার মায়াগত হইলেও, সেই স্থূল-সূক্ষ্মে তোমার যে চিন্ময়রূপ তাহাত মায়াগত নহে? যাহারা তোমার সেই চিন্ময়রূপের ভিখারী, তাহাদের মধ্যে আর এ স্থূল, সূক্ষ্মরূপের ব্যবধান কেন? মায়া অনন্ত হইলেও সে তোমারই মায়া। তোমাকে আবরণ করিতে না পারিলেও, ক্ষুদ্র আমি, আমায় সে স্থূল, সূক্ষ্মে আবরণ করতঃ তোমার চিন্ময় রূপের সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত রাখিয়াছে।

"তোমার স্থূল, সূক্ষ্মরূপ, তোমারি মায়ার খেলা। তুমি সে খেলার আশ্রয় মাত্র, কিন্তু জীব তাহাতে অস্মিতায় স্বরূপ ভ্রমে বিরূপ; সেই বিরূপ চক্ষে তোমার সে চিন্ময়রূপ দর্শনে অক্ষম। সে হেতু তোমার অচিন্তনীয় মায়াগত বুদ্ধিতে অহংবোদ্ধা হইয়া জীব ন্যায়, বৈশেষিকে জড়প্রকৃতি সমালোচনায়, জড় হইতে পৃথক তত্ত্ব যে আত্মা, তাহা নির্দ্ধারণ করত, পূর্ব্বমীমাংসা সিদ্ধ যে তোমার অপূর্ব্বরূপ, তাহারই আবর্ত্তনে সুখ, দুঃখ স্রোতে পাপপুণ্য স্বার্থপরতায় তোমার পূজা করে। তোমার জন্ম তোমার পূজা করিতে পারে না। না পারায় তোমার অবিদ্যাগত ক্লেশের ঘাত প্রতিঘাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির আশায়, প্রকৃতিকে কেবল জড়তত্ত্ব ধারণায়, পুরুষ-অহঙ্কারে নিরীশ্বর সাংখ্যজ্ঞানে, পুরুষ প্রকৃতি বিবেকে, যখন দেখে যে মায়ারূপ প্রকৃতি—কেবল জড়া নহে এবং জীব, পুরুষ হইলেও, মায়ারূপ প্রকৃতি, জীবরূপ পুরুষের প্রকৃতি নহে, কারণ তুমিই তাহার আশ্রয় এবং জীবেরও আশ্রয় তুমি, অতএব জীবও প্রকৃতি বিশেষ, কেবল চিৎ, অচিৎ ভেদে

জীব, পুরুষ পদবাচ্য, তখন বুঝে—অহং পুরুষবুদ্ধিতে যে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির আশা, সে কেবল মনের কল্পনা মাত্র। কারণ যে জীব প্রকৃত্যাত্মক হইয়াও, যুক্তিবলে পুরুষ অভিমানে মত্ত, সেই জীবই প্রকৃতি-জালে বদ্ধ। কারণ যাহার আশ্রয়ে জীবের অস্তিত্ব—সত্ব, তাহারই আশ্রয়ে মায়া—জীব-মুগ্ধকারিণী জগন্মোহিনী, তাঁহার কৃপা ভিন্ন জীব কখনই মায়াতীত হইতে পারে না। তাই সেশ্বর সাংখ্য জ্ঞানে, তোমার সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বময়, মায়াশক্তি প্রচুর পরমাত্মা জ্ঞানে, তোমার স্থূলরূপ ধারণায়, তোমাতেই আত্ম-লয়ে যে মায়া-বিমুক্তি, তাহার নির্দ্ধারণে অষ্টাঙ্গযোগ-জ্ঞানে, ভক্তিতেও বীতরাগে, কেবল চিন্মাত্র স্বরূপে তোমার সাযুজ্যেও তোমার চিন্ময় বিগ্রহ দর্শনে কৃতার্থ হইতে না পারিয়া, ধর্ম্ম-মেঘের উদয়ে তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেহবা তাহা হইতে তোমার অঙ্গ-প্রভারূপ ব্রহ্মে উচ্ছলিত হইয়া শুদ্ধ-জ্ঞান রূপ ভক্তির অভাবে, একীভূত ভাবে, জীবব্রহ্মে অভেদ দর্শনে অদ্বৈত মার্গে তোমার দাস্তে কৃতার্থ হইতে পারে না। ষড়ঙ্গ-যোগী জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি-যোগে স্বদেহে প্রাদেশ পরিমিত শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র সমন্বিত তোমার সূক্ষ্মরূপ পদ্মে পদ্মে ধারণায় মূর্দ্ধা ভেদে মায়াতীতে তোমার মায়াধিষ্ঠিত চিৎস্বরূপ দর্শনে কৃতার্থে তোমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সে সাযুজ্যে কচিৎ কোন জীবের ভক্তি, জ্ঞান শূন্যে অহৈতুকী রূপে নির্ম্মল হওয়ায়, সে তোমার ভক্তি প্রবাহে উন্নীত হইয়া তুরীয় রূপদর্শনে কৃতার্থ হয়। আবার কোন কোন ধর্ম্মমেঘ-প্রসুপ্ত, বা জীবব্রহ্ম অভেদাত্মক জীবও কালে তোমার শুদ্ধাভক্তি আশ্রয়ে, তোমার স্বরূপ চিদানন্দ বিগ্রহের ভিকারী হইয়া কৃতার্থ হয়।

"তাই বলি প্রভু! সর্ব্বোপরি তোমার কৃপাই বলবান। কারণ—যে যতটুকু তোমার কৃপা লাভ করে, সে ততটুকু তোমার মুক্তি কামনা-রূপ আবর্ত্ত হইতে দূরে থাকিতে পারে। তোমার পূর্ণ কৃপাতেই সে মুক্তিকামনাশূন্য হয়; হইলে—যোগ, জ্ঞান মার্গে আর তাহার লক্ষ্য থাকে না। তুমিই তাহার লক্ষ্য হওয়ায়, সে তোমার অহৈতুকী ভক্তি লাভ করে। সে ভক্তিতে মায়া-বিমুক্তি সহজেই হয়। কারণ, তুমি

সচ্চিদানন্দ রসস্বরূপ, সে রসের আস্বাদনে আর কে মায়ারসে বিমুগ্ধ থাকিতে পারে? ভগবন! তুমিই বেদব্যাস রূপে উত্তরমীমাংসা রূপ বেদান্তে, সে তত্ত্ব উল্লেখ করিয়া দর্শনরূপ জ্ঞান বাগুরা হইতে বিমুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছ। আবার তুমিই ভাগবতে তাহা বিস্তার করত ভাগবতের রসাস্বাদনে সুগম হইয়াছ। তাই ধন্য আমি প্রভু! তোমার কৃপাতেই আমি সে তত্ত্বের উদ্দেশ পাইয়াছি, কিন্তু দেব! এ পরোক্ষজ্ঞানে আর হৃদয় প্রবোধ মানিতেছে না। আমায় সেই অহৈতুকী ভক্তিচক্ষু দাও, একবার তোমার সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিগ্রহ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। তুমি জগতে জগতে, দেশে দেশে, গৃহে গৃহে, গৃহদেবতা। মহান্তরূপে বাহিরে, চেত্যরূপে অন্তরে, আমার হৃদয় মন্দিরে—আর কিছু চাহি না প্রভু, একবার দাঁড়াও, তুমি ত সর্ব্ব ভূতেই বিদ্যমান, তাহা পরোক্ষজ্ঞানে জানি, একবার অপরোক্ষে সে দর্শন দাও। কায নাই আমার বেদ, বেদান্তে, ষড়্‌দর্শনে—তন্ত্র, পুরাণে, তুমিই শাস্ত্র-যোনি, তোমার সাক্ষাৎ কৃপা ভিন্ন, যে শাস্ত্র শুষ্কফুলে তোমার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে পারে না, আবার সেই শাস্ত্র তোমার ভক্তমুখে অপূর্ব্ব রসের অবতারণা করে, অতএব তোমার কৃপাই সর্ব্বোপরি বলবান—"সর্ব্বোপরি হয় তোর আজ্ঞা বলবান", ভক্তিই সেই আজ্ঞার মর্ম্ম বিস্তার করে, তুমিই সেই ভক্তিদাতা, অতএব তুমিই সত্য, তুমিই ধন্য—তাই তোমায় কোটি কোটি প্রণাম করি।

এই ভাবে তাঁহার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে বহুক্ষণ কাটিল। তিনি আর উঠেন না। দেবেন্দ্র তাঁহাকে অনুসন্ধান করতঃ বিষ্ণুগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। নটনারায়ণের এ ভাবে তাঁহারও মন কিছু বিচলিত হইল। তাহাতে নটনারায়ণের সহিত তাঁহার বাক্যালাপে ইচ্ছা হইল, সে ইচ্ছা এত প্রবল হইল যে, তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া ডাকিলেন, "দাদা!" নটনারায়ণ সে শব্দে উঠিয়া বসিয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন মাত্র। দেবেন্দ্র দেখিলেন—তাঁহার চক্ষে ধারা, তিনি কথা কহিবার উপযুক্ত এখন হয়েন নাই। অনেকক্ষণ স্থির, গম্ভীর থাকিয়া নটনারায়ণ বলিলেন,—"ভাই আসিয়াছ?"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "রামহরি দাদা কার্য্য উপলক্ষে নন্দিগ্রামে আসিয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আপনার জন্য অনেকটা অপেক্ষা করিয়া উঠিলেন, বলিয়া গেলেন—"হরসুন্দর বাবু আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

জানি না কেন, এ সংবাদে নটনারায়ণের চক্ষে আবার জল বহিল। তিনি আবার বিষ্ণু প্রতি মুখ ফিরাইলেন, আবার যোড় হস্তে বলিলেন, "প্রভো! জড় ব্যবধানে তুমি জড়-মূর্ত্তি, ব্যবধানশূন্য চিন্ময়-চক্ষে তুমি চিন্ময়। তুমি অন্তরে বাহিরে, ঘটে, মঠে—তুমি নন্দীগ্রামে, দেবীগ্রামে। তুমি গ্রামে গ্রামে—তোমায় নমস্কার। হরসুন্দর অনেক দিন এরূপ ডাকিয়াছে, কিন্তু—আজ হরসুন্দর ডাকে নাই, তুমিই ডাকিয়াছ, তাই তোমায় কোটি কোটি প্রণাম করি।"

তখন উভয়েই বহির্গৃহে আসিয়া বসিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। নটনারায়ণের মুখ দর্শনে দেবেন্দ্রের চিন্তা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। তিনি নটনারায়ণকে দেখিতেছেন বটে, কিন্তু কি দেখিতেছেন—সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে নাই।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণের এবংবিধ অবস্থায় বসন্তেরও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি হেতু নটনারায়ণের এ ভাব, বসন্ত তাহা বুঝেন নাই। সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিতে বুঝিয়াছেন যে, নটনারায়ণ আর অর্থব্যয়ে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। হরসুন্দর, জীবসুন্দরকে ত তিনি মনুষ্য মধ্যেই গণ্য করেন না, সেজন্য তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কোন সমালোচনা নাই, কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিতেন এবং নটনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন।

এইরূপে মোকদ্দমা ত স্থগিত হইল। কিন্তু তাহাতেও জ্যোতিঃপ্রসাদের মন বড় ভাল নহে। মন যেন উৎসাহহীন। সে মন যেন আর নাই। শশাঙ্ক একটা জমির বন্দোবস্তের জন্য কি করা হইবে,

জিজ্ঞাসায় আসিয়াছেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ যেন শুনিয়াও শুনেন নাই। কোন উত্তর দিতে পারিতেছেন না। একবার একরূপ উত্তর দিতে যান, অমনি হৃদয়ে কে যেন তাহাতে বাধা দেয়. আবার সে যেন সরিয়া যায়, বক্তব্য বলিতে যান—কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারেন না।

শশাঙ্ক বলিলেন,—"এটা অনেক দিন হইতে পড়িয়া আছে, আর ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। বিশেষ 'শঙ্কর' এই জমি হইতেই অনেক আয় করিল, কোটা বাড়ী করিল, তবে জমিদারকে ফাঁকি দেওয়া, তাহার মৎলব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "যাহা হয় করিয়া দাও, আমায় আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমি ত তোমার উপরেই সমস্ত ভার দিয়াছি।"

শ। আপনার কিছু কি অসুখ করিয়াছে ? আজ কয়দিন এরূপ চিন্তিত দেখিতেছি কেন ?

শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের ভাব দেখিয়াই আজ কয়দিন হইতেই বুঝিয়াছেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে, কিন্তু কোন কথা প্রকাশ করেন নাই।

জ্যোতিঃপ্রসাদ একটু হাসিলেন, বলিলেন—"না অসুখ হয় নাই, তবে শিবসুন্দরকে এবার দেখিয়া অবধি আমার মন যেন কিছু ভিন্ন রূপ হইতেছে, কি জানি এর ভাব কিছু আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

শ। শিবসুন্দরকে ত আপনি এর পূর্ব্বে অনেক বার দেখিয়াছেন ?

জ্যো। তা দেখিয়াছি; তখন কই এরূপ ত হয় নাই। এখনও উহার পাগলের মত কথাবার্ত্তায় কিছু বুঝিতে পারি না, তবে ভাব দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে; দেখ এত কষ্ট দিয়াও উহার মুখে দুঃখের চিহ্ন আনিতে পারিলাম না। হরসুন্দর সন্তান বিরহেও সমসুখী। তবেই বলিতে হয়—ইহারা ভণ্ড নহে, ভণ্ড হইলে এরূপ হইত না।

শ। আপনার যদি এ ভাব হয়, তবে আর আমি আপনার কায করিতে পারিব না। কারণ এ বুড়া বয়সে হাতে করিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা আর ভাঙ্গিতে পারিব না। আপনার এ ভাবে সব নষ্ট হইবে দেখিতেছি।

জ্যোতিঃপ্রসাদ একটু হাসিলেন, বলিলেন—"তোমার পরামর্শ ভিন্ন পূর্ব্বে অনেক কাজ করিয়াছি; কিন্তু এখন আর করি কি? তুমি আমার ডান হাত, তোমার এ কথা সাজে কি? তুমি আমায় ভালবাস, সত্য ভালবাস, তাহা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, তাই এ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি। আমিও তোমার জন্য প্রাণ অবধি দিতে পারি। আমি এমন মনে করি না যে, আমি প্রভু, তুমি ভৃত্য। আমার এখন মনে হয়, তুমি আমার ভ্রাতা। বিষয় পৈতৃক, যেমন আমার—তোমারও তেমনি। তবে তুমি কাহার কায ছাড়িবে?"

বলিতে বলিতে জ্যোতিঃপ্রসাদের চক্ষে জল আসিল। শশাঙ্ক দেখিলেন—জ্যোতিঃপ্রসাদের এরূপ ভাবে অশ্রুবর্ষণ জীবনের মধ্যে—এই প্রথম।

জ্যোতিঃপ্রসাদ আবার বলিতে লাগিলেন,—"শশাঙ্ক! আমার সব মনে আছে। অনেক দিনের কথা—যখন আমি বেশ্যাসক্ত ছিলাম, তখন তুমি ভৃত্যভাবে আমায় কিছু বলিতে পারিতে না; কিন্তু এখন জানিতেছি, আমার বেশ্যা ত্যাগ, সে কেবল তোমারই ষড়যন্ত্রের খেলা। সে ষড়যন্ত্র ভিন্ন আমার ক্ষমতায় বেশ্যাত্যাগ কখনই হইত না। সে জন্য, অনেক দিন, তুমি ভৎর্সনা খাইয়াছ; কিন্তু তাহাতে অন্তরে বিরক্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হও নাই। সে দিনের কথা মনে করিলেও হাসি পায়,—তোমায় ভক্তি হয়। মদ ছাড়াইবার জন্য ঘরের পয়সা খরচ করিয়া বন্ধুদের বাড়ী মদ পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছ, বাবুর সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, এখন বাবুর সহিত দেখা করিবেন না। তাহারা ঘরে মদ পাইয়া আমার সহিত দেখা করিত না। তাহা আমি তখন জানিতাম না। কুজনের সঙ্গ কম হওয়াতে, তোমার সঙ্গে আমার সে মদের নেসা কমিল এখন আর তাহাতে ইচ্ছাও হয় না। এইরূপে কত দিকে তুমি আমায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছ—কত বলিব। আমি—যে আমি ছিলাম, এখন আর—সে আমি নাই। শিবসুন্দরকে দেখিয়া—যে আমি এখন আছি—এ আমি থাকিতেও আর ইচ্ছা নাই। ইহা কি দোষের শশাঙ্ক? তুমি যদি দোষের বল—তবে 'শঙ্করের'

নামে পাঁচশত টাকার দাবী দিয়া নালিস কর। যদি তাহা দোষের না বল, তবে উহাকে বল—যাহা সে দিতে পারে দিক, হৃষ্টমনে তুমি তাহাই লও।”

জ্যোতিঃপ্রসাদের এবংবিধ ভাবে শশাঙ্কের হৃদয় যেন শীতল হইয়া গেল; কিন্তু তিনি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—“সে সব কথা এখন থাক। বিষয় রক্ষা করা চাই। বিষয় দৃষ্টি ভুলিলেই যে ধর্ম্ম হয়—তাহা নহে। কি প্রতিজ্ঞা আছে, মনে আছে কি? প্রতিজ্ঞা পূরণে যে অক্ষম, সে পুরুষ নহে। এই তাহার সময় আসিয়াছে, এখন মানহানির মোকদ্দমা তুলিতে হইবে। জ্যোতিঃপ্রসাদের কি মূল্য নাই—যে তাহার সহিত এ রহস্য?”

মনে মনে বলিলেন,—জ্যোতিঃপ্রসাদ! এখনও সে সময় আসে নাই। শ্মশানবৈরাগ্য কতক্ষণ? তুমি যাহার জন্য এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া যে প্রীতি পাইতেছ, আমি তাহারই জন্য সর্ব্বদা অশ্রুপাত করিতে ব্যস্ত।

জ্যোতিঃপ্রসাদ, শশাঙ্কের এ ভাব হৃদয়ে বিচার করিলেন। বুঝিলেন, ইহা শশাঙ্কের হৃদ্‌গত নহে—পরীক্ষা। সে জন্য তিনিও ভাব পরিবর্ত্তন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—শশাঙ্ক! দেখিব হরসুন্দরের প্রতি তোমার আকর্ষণ—কোন্ আকর্ষণ। দেখিব—সংসারে হরসুন্দর যাহা সহ্য করিতে পারে, তুমি তাহাই পার কি—না। বলিলেন, “শশাঙ্ক! জ্যোতিঃপ্রসাদ কখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই, আজ ভঙ্গ করিবে? যদি করিবে—তবে শশাঙ্ক তাহার পার্শ্বে কেন?”

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ শশাঙ্কের মুখ গম্ভীর। অমার অন্ধকারে অন্ধকার। জ্যোতিঃপ্রসাদ সম্মুখে বসিয়া আছেন, আর হাসিতেছেন। মনে মনে বলিতেছেন,—আজ দেখিব, তোমার দৌড় কত দূর! বলিলেন,—"শশাঙ্ক! উত্তর দিতেছ না কেন?"

শ। কি উত্তর দিব? আমি আপনার জন্য যত দূর পারি, এত দিন তাহা করিয়া আসিতেছি, এখন দেখিতেছি,—ইহার অধিক আর আমি পারি না। যদি ইহাতে আপনার আমায় ভাল না লাগে, আমি বিদায় লইতে চাহি,—আমায় অবসর দিন। তথাচ আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না।

জ্যো। কেন? এ প্রতিজ্ঞার কথাত প্রথমে তোমায় বলা হইয়াছে। জানত—জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা কখন ভঙ্গ হইবার নহে।

হরসুন্দরের মাথায় সুপারি বসাইয়া কাষ্ঠপাদুকা প্রহার, ইহা স্মরণ করিতেও শশাঙ্কের হৃদয় কম্পিত হয়। এতদিন কার্য্য স্রোতে যাহার জন্য গা ঢালিয়া ছিলেন, তাহার ফল যে ইহাই দাঁড়াইবে, শশাঙ্ক তাহা ধারণায় আনিতে পারেন নাই; কিন্তু এখন জ্যোতিঃপ্রসাদের এ ভাবে শশাঙ্কের বুদ্ধি হত হইয়াছে, বুদ্ধির সে তীক্ষ্ণতা আর নাই, যাহাতে তিনি জ্যোতিঃপ্রসাদের অন্তমর্ম্ম বুঝিয়া স্থির থাকিবেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "আপনার এ কল্পনার প্রথম হইতেই আমি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছি, এখনও করিতেছি। যাহা আমি করিতে পারিব না, তাহা আপনাকে করিতে বলিতেও পারিব না; আপনি এ বুদ্ধি ত্যাগ করুন। আমি বয়সে বৃদ্ধ হইয়া জোড় হস্তে বলিতেছি—আপনি এ বুদ্ধি ত্যাগ করুন। ইহাতে সংসার ধর্ম্মের অমঙ্গল ত হইবেই, বিশেষ ইষ্টধর্ম্মে অপরাধী হইতে হইবে, সে অপরাধ, কৃপা ভিন্ন শত শত জন্মের কর্ম্ম ভোগেও খণ্ডন হইবার নহে, অতএব আপনি ইহাতে ক্ষান্ত হউন।"

জ্যো। জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা শশাঙ্কের দ্বারা ভঙ্গ হইবে?

এই কি শশাঙ্কের প্রভুভক্তি? এই কি শশাঙ্কের ভালবাসা? ছি! শশাঙ্ক! এতদিন তুমি আমাকে বুদ্ধির খেলায় বুঝিতে দাও নাই; কিন্তু এখন দেখিতেছি—জ্যোতিঃপ্রসাদের চক্ষু তাহা ভেদ করত, তোমার অন্তররূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। ধিক্ তোমায়, আমি চিরদিন তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছি—আর তোমার বক্তৃতা আমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি,—এই আমার শেষ জিজ্ঞাসা জানিও—যাহা বলিতেছি, তাহা করিবে কি না?

শ। না, আপনি জমিদার সব পারেন,—তাহা জানি; তথাচ বলিতেছি—না। আমি প্রাণ অবধি দিব—তথাচ এ কার্য্য করিতে পারিব না। প্রাণ অবধি দিব, তথাচ হরসুন্দরের গাত্র, কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিব না। প্রাণ অবধি দিব—তথাচ আপনাকে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে দিব না।

জ্যো। তুমি আমার প্রভু নহ—ভৃত্য। এখনও আমার ভৃত্য, যখন মাহিনা খাইবে না—তখন আসিয়া বলিও।

শশাঙ্ক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; বলিলেন,—"কি বলিব, আপনাকে ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই পাছে আপনার দ্বারা আপনার কোন অমঙ্গল হয়, যাহার দ্বারাই হউক, কোন রূপে হরসুন্দরের বেদনা লাগে, তবে তাহা দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিবারণের চেষ্টা করিতে পারিব; তাই এখনও দাঁড়াইয়া আছি। নচেৎ হৃদয় খুলিয়া দিয়া দেখাইলে, যদি দেখিতে পারিতেন, তবে দেখাইতাম—শশাঙ্কের এ যন্ত্রণা অপেক্ষা—মরণ-যন্ত্রণা শতগুণে সুখকর কি না।"

জ্যো। আমি এখন যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে আর বক্তৃতার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে যে ভাবে আমি আপনার সহিত এতদিন ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, আর তাহাতে আমি লিপ্ত থাকিতে চাহি না। আমি এরূপ লোককে আর ভৃত্য বলিয়া বোধ করিতে চাহি না। জ্যোতিঃপ্রসাদ এরূপ লোককে আর ভৃত্য-ভাবে রাখিতে ইচ্ছা করে না। আমা অপেক্ষা যাহার হরসুন্দর বড়, সে আমার ভৃত্যের

উপযুক্ত নহে। এখনও বল তুমি হরসুন্দরের—কি জ্যোতিঃপ্রসাদের।

শ। আমার মুখের কথা শুনিয়া কি বুঝিবে? যাহা এতদিন বলি নাই—যদি শুনিতে হয়—শোন। হরসুন্দর আমার প্রাণ অপেক্ষাও বড়; তুমি যেমন জমীদারি লইয়া অহঙ্কারে আপনা ভুলিয়াছ, আমি তেমনই তোমায় লইয়া অহঙ্কারে আপনা ভুলিয়াছি। ভুলিয়াছি বলিয়াই কি সে আমায় ফেলিয়াছে? আমি তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু সে আমায় নিত্য দেখিতেছে। যদি না দেখিত, তবে এ আমি থাকিতাম না। আমি প্রাণের জন্য সব লইতে পারি—লইনাই কি? কিন্তু যে আমার প্রাণের প্রাণ, তাহার জন্য সব ফেলিতে পারি। তুমি তাহার মাথায় আজ সুপারি বসাইয়া খড়ম মারিতে চাহ? সেত তাহার মাথা নহে,—আমারই মাথা। কারণ তাহার লাগে না,—আমার লাগে। লাগে বলিয়াই—প্রাণ দিব, আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত—আমিই করিব। জ্যোতিঃপ্রসাদ! এখনও তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ভৃত্য; কিন্তু জানিও—এ কার্য্যকালে, আমি তোমার শত্রু—তাই আমি তোমার ভৃত্যপদে, এখনই জবাব লইতে চাহি।

জ্যো। এ বুড়া বয়সে আর চাকুরী পাইবে? খাইবে কি? তুমিত নিমকহারাম নও, তাহা ত আমি জানি। হইলে—চুরির পয়সা থাকিত—চলিত।

শ। হরসুন্দরের দাসত্ব ভিন্ন আর কাহারও দাসত্ব করিব না; আজ হইতে সংসারের দাসত্ব—হরসুন্দরই ঘুচাইল।

জ্যো। যে আপনি খাইতে পায় না, তাহার দাসত্বে কি পেট ভরিবে?

শ। সে কথায় আর কাজ নাই, আর সে কথা তুলিয়া আমায় ব্যথা দিও না। জগৎ যাহার ঐশ্বর্য্য—সে ভিখারী; জগৎ যাহার অহঙ্কার—সে নিরহঙ্কার, জগৎ যাহার রাজত্ব—সে জগতে শূন্য; সে কথা আর তুলিও না। তাহার ইচ্ছা না হইলে, আমার অহঙ্কারে, সে ভাব আনিতে গেলে এইরূপই হয়। যাহা হইবার নহে—তাহা হয় না,

তাই হইল না। সে তাহার দোষ নহে, এখন দেখিতেছি—আমিই সর্ব্বদোষে দোষী। সে নিষ্কলঙ্ক, আমিই তাহাতে কলঙ্ক লাগাই; লাগাইয়া—আমিই কলঙ্কিত হই।

সহসা জ্যোতিঃপ্রসাদ সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। আবার পর ক্ষণেই আসিয়া বসিলেন; বলিলেন,—"তবে তুমি খাতা আজ হইতেই বুঝাইতে চেষ্টা কর, আজ হইতে অন্য লোক তোমার স্থানে বাহাল হইবে।"

শ। আমি বর্ত্তমান, খাতা বর্ত্তমান; যাহা বুঝিয়া লইবার—বুঝিয়া লউন। আজ হইতে আর আমায় পাইবেন না। আমার খাতা, এক ঘণ্টায় লোকে বুঝিবে।

জ্যো। তোমার সহিত আমি হিসাব মিটাইব না, জন্মের মত তোমায় ঋণী করিয়া রাখিব, মরিবার সময় খাতা পোড়াইব।

"তবে আমি আজ হইতে বিদায় হইলাম।" এই বলিয়া শশাঙ্ক চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে পুনরায় বলিলেন, "তোমায় বড় ভালবাসি, তাই আবার বলিতেছি—হরসুন্দরের দেহ, ক্রোধের বশে স্পর্শ করিও না; যদি আমায় কখন ভালবাসিয়া থাক, তবে আমার আর কোন ভিক্ষা নাই—আমায় এই ভিক্ষা দাও। তোমার অমঙ্গল আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

জ্যো। যদি হরসুন্দরে এত ভালবাসা, তবে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলে কেন?

শ। তোমার জন্য। জানিয়া রাখ—যদি শশাঙ্ক বিশ্বাসী হয়—বিশ্বাস কর—সে তোমার জন্য। কেন?—সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। যদি জানাইতে পারিতাম, তাহা হইলে যে আনন্দ উঠিত, মুখের কথায় আর সে আনন্দ উঠিবে না। এখন যাহা উঠিবে, তাহা হৃদয়ভেদী দুঃখ-প্রস্রবণ। সে দুঃখের সহানুভূতির কেহ নাই। তবে আর এখন সে কথা তোলা কেন?

এই বলিয়া শশাঙ্ক গমনে অগ্রসর, জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "তবে সত্য সত্যই কি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে—আমায় ত্যাগ করিলে?"

শ। হরসুন্দরের জন্য তোমায় কেন? এখন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, পরিবার, জগৎ, ত্যাগ করিতে পারি। হরসুন্দরকে ভুলিয়া আর কাহারও জন্ম তোমায় ভুলিতে পারি নাই। আজ হরসুন্দর হৃদয়ে জাগিয়া তোমাকেও পরিত্যাগ করাইল।

শশাঙ্ক চলিয়া গেলে জোড় হস্তে জ্যোতিঃপ্রসাদ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—ধন্য তুমি শশাঙ্ক! তুমি ধন্য। এমন না হইলে, কেহ গুরু হইতে পারে না, তুমি গুরুর উপযুক্ত। যে যেরূপে যাইতে পারে, যে গুরু সেই রূপেই লইয়া যাইতে পারেন, সেই—গুরুর উপযুক্ত। আমি এতদিনে জানিতে পারিলাম,—তুমি ভিন্ন জগতে আর আমার, আপনার কেহ নাই, যে আমার জন্য প্রাণের প্রাণকে ব্যথা দিয়া নিজে সে ব্যথা ভোগ করিয়াছে সেই সত্য ব্যথার ব্যথী। সেই সত্য আপনার। আপনার বলিতে সেই—সত্য। এখন আশী-র্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম এমনি তোমার ব্যথায় আমি ব্যথিত হইতে পারি। যিনি হৃদয়ের গুরু, আর তাঁহার সঙ্গে ভৃত্য সম্বন্ধ সাজে কি? আমি যেন ইহাতে অপরাধী না হই—ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি দুর্ব্বল বলিয়াই তোমার এ খেলা—এমনই খেলায় নিতা, যেন তোমার কৃপাপাত্র হইতে পারি।

ভাবিতে ভাবিতে জ্যোতিঃপ্রসাদের চক্ষু, জলে ভাসিতে লাগিল। আর যেন তিনি নিজভাব গোপন রাখিতে পারেন না। ইচ্ছা হইতেছে যেন—এখনিই ছুটিয়া গিয়া শশাঙ্কের পদতলে পড়েন। কিন্তু এখনই প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইয়াছে কি?

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণের বহিঃকক্ষ নিস্তব্ধ। নটনারায়ণ ও দেবেন্দ্র বাক্‌শূন্য। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবেন্দ্র সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, "আমার শাস্ত্র পড়া সামান্য; সে জন্য আপনার অনেক কথা বুঝিতে পারি না। এক জন ভগবান আছেন—আশৈশব সে বিশ্বাস আছে মাত্র; কিন্তু কেহ দেখে নাই, আমিও দেখি নাই। শুনিতে পাই—ভগবানের আরাধনায় অহঙ্কার নষ্ট হয়, স্বভাব নষ্ট হয়; কিন্তু সংসারের বৈষ্ণব তান্ত্রিক দেখিয়া সে ধারণা আমার নাই। আমার হৃদয়, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যেরূপ হয়, তাঁহারা যে তাহা হইতে অতীত, তাহা তাঁহাদের কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; এজন্য শ্রদ্ধা জন্মে না। তাহার পর তাঁহারা যে সাধনে ব্রতী, তাহার অবস্থার ভেদ দেখি না; আজ যিনি বৈষ্ণব হইলেন, তাহার সহিত, যিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণব হইয়াছেন, তুলনায় এক। কারণ উভয়েই শাস্ত্রের পরোক্ষবাদের বশীভূত; অপরোক্ষবাদের কথা কাহারও নিকট শুনি নাই শুনিতে পাই—বৈষ্ণবের ভক্তিই সাধন—ভক্তিই সাধ্য; কিন্তু দেখিতে পাই—ঝোলা মালা লইয়া যাঁহারা সম্প্রদায় মধ্যে একটু মাথাধরা হইয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান চর্চ্চাতেই দিন কাটান। তাঁহাদের মুখ দেখিলে জ্ঞানেরই বৃদ্ধি হয়, কথায় কতকগুলা কল্পনাই বাড়ে। বলিতে পারেন যে, তুমি তাঁহাদের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না। অবশ্যই পারি না, কারণ শাস্ত্র যে সাধুসঙ্গমের এত মহিমা গাহিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ গুণেই আমার এই ভ্রম দাঁড়াইতেছে। অতএব ও কথা সাজিবে না। আমি যে কেবল বৈষ্ণব পক্ষেই বলিতেছি—তাহা নহে, এখন সকল সম্প্রদায়ই এইরূপ। আপনি বৈষ্ণব জানি, সে জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই কথা বলিতেছি, দোষ লইবেন না; নিন্দা আমার উদ্দেশ্য নহে। শুনিতে পাই, বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভগবৎ-প্রেমই প্রয়োজন; এ ভাব অতি সুন্দর। সংসারেত তাহার ছায়া দেখিতে পাই; কিন্তু যদি এ সংসার তাহারই ছায়া হয়, তাহা

হইলে ত এ সংসারে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর প্রেমের উদয় হয় না। যদি কোন বালক সঙ্গদোষে সে ভাবে পরিবর্তিত হইতে যায়, প্রবীণেরা তাহাকে প্রেম আখ্যা দেন না, এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে শিক্ষা দেন। যাহারা সেরূপ শিক্ষা না পায়, বা লয়; দেখা যায়, তাহারা সংসারে যাহাকে প্রেম বলে, তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু দেখিতে পাই—ঝোলা মালা লইলেই তিনি কথায় প্রেমিক হন। মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে না করিতেই প্রেমের উদয় হয়। জানিতে চাই—সে প্রেম কাহার বা কিসের? জানিতে চাই—আজ যাহার সহিত ভগবৎ-প্রেমে ডুবু ডুবু, কাল তাহার সহিত—'হাইকোর্ট', কোন্ প্রেমের লক্ষণ। আজ যে প্রেম গুরুকে, কৃষ্ণের প্রকাশরূপ দেখাইল, কাল সেই গুরু শিষ্য, হাকিমরূপ কৃষ্ণের আদালতে কেন? ইহাত বিরল নহে। মাথাধরা শাস্ত্রপণ্ডিতেই ইহা ব্যক্ত। কার্য্যে পরিণত হইলেই দশ জনে জানে; না জানিলেই তিনি প্রেমিক। অন্ধের এ জ্ঞান নিত্য হইলেও,চক্ষুষ্মান মুখ দেখিয়াই তাহা চিনেন। প্রেম কাহারও মুখে লেখা থাকেনা, ব্যবহারেই জানা যায়; ইহাঁরাই কিন্তু প্রেমের গুরু। কাণে ফুঁ পাড়িয়াই ইহাঁরা গুরু, গরুর জাতি সেই ফুঁতেই গরু—এ বড় রহস্যের খেলা। ইহাদের কথায় বুঝা যায়, বাঙ্গলা ভাষা যেমন বেওয়ারিশ, ভক্তিও তেমনি বেওয়ারিশ—এত বেওয়ারিশ যে, সেজন্য অনেক গুলি উপধর্ম্মের সৃষ্টি এবং অপরিবর্ত্তিত বেশ্যাও সেবাদাসী। সংসার যেমন পঞ্চবর্ষীয় শিশুর প্রেমনাটকে প্রতিদ্বন্দী হয়, তদ্রূপ আমার মনে হয়, যদি প্রকৃত বৈষ্ণব থাকিতেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এ প্রমাদ ঘটিত না, বা ভক্তির দোহাই দিয়া কেবল পরোক্ষ জ্ঞানবাদের বৃদ্ধি করা হইত না।

"আমি ধর্ম্ম নিন্দা করিতেছিনা; সাধারণ সম্প্রদায়ের অবস্থা বলিতেছি মাত্র। বলিতে পারেন যে, সাধারণ এরূপ হইলেও, যে ভক্তিমান নাই—তাহা নহে। আমিও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে দেখিয়াছি—বিষ্ঠার দুই পিটই সমান। কারণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গত দোষ না থাকিলেও স্বভাবগত দোষ পূর্ণ ভাবেই বর্ত্তমান; সে

দোষে ভক্তি দাঁড়াইতে পারে কি? প্রতিষ্ঠা যে হেয়, তাঁহারাই সেই সব আলোচনায়, প্রতিষ্ঠার আশায় ফিরেন, ইহার অপেক্ষা আত্মবঞ্চকতা আর কি হইতে পারে? ইন্দ্রিয় গত সুখ লোভে ভক্তি দূরগত হয়—আর মান, অহংকার, অর্থলোভে দূরগত হয় না কি? অতএব কাহাকে ফেলিব, কাহাকে মাথায় করিব?

"ইহাঁরা বৈষ্ণব চিনেন, ঝোলা মালা দেখিয়া—অথচ মুখে চিন্ময় চক্ষুর উল্লেখ সর্ব্বদা। ইহাঁরা মুখে বলেন, শালগ্রাম মূর্ত্তি চিন্ময়; কিন্তু চক্ষু বুঁজিলে অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না।

"আপনার মুখেও আজ সেই চিন্ময় মূর্ত্তির উল্লেখ শুনিলাম; যদি সর্ব্ব-ঘটে চিন্ময় মূর্ত্তি, তবে বিশেষ শিলা মূর্ত্তিতে প্রয়োজন কি?"

এতক্ষণ নটনারায়ণ দেবেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু মন্দ হাসিতে ছিলেন, আর শুনিতে ছিলেন। এবার তিনি হাসিতে হাসিতে দেবেন্দ্রের মুখ খানি চাপিয়া ধরিলেন,—বলিলেন, "দেবেন্দ্র! স্থির হও, স্থির হও, যাহা বলিতেছ, এক দিকে সকলই সত্য। ভগবানকে যে দেখিয়াছে, সেই দেখিয়াছে—অন্যে দেখে নাই। যে দেখিয়াছে, সে এরূপ দেখিয়াছে যে, জিহ্বায় অব্যক্ত। যে দেখিয়াছে – তাহার স্বভাব নষ্ট হইয়াছে; যাহার স্বভাব নষ্ট হইয়াছে, তাহার কার্য্য যে দেখিতে চাহে, তাহার স্বভাবও নষ্ট হয়, শ্রদ্ধা জন্মে। ভক্তির তারতম্যে তাঁহাদের অবস্থা ভেদও লক্ষ্য হয় এবং তাঁহারা স্বরূপ চক্ষে অপরোক্ষেই কার্য্য করেন, তাঁহারা পুঁথির বশীভূত নহেন, তাঁহারা ঝোলামালার অপেক্ষা না করিলেও শাস্ত্র মর্য্যাদা হেতু বা নিম্নাধিকারীর জন্য ঝোলামালা লইতেও পারেন—বা না লইতেও পারেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে অভক্তের বুদ্ধি বিদ্যা ক্ষীণ হয়, সমালোচনা চলে না।

"এ সংসার, সে সংসারের ছায়া বটে, শাস্ত্র তাহাই বলেন। এ সংসারে যেমন বয়স বৃদ্ধির জন্য খাদ্য এবং প্রেম স্বতন্ত্র বস্তু, সে সংসারেও তদ্রূপ। তবে এ সংসারে যেমন বেশ্যালয়ে বয়স বৃদ্ধির খাদ্যের অভাব, তদ্রূপ ভাক্ত সম্প্রদায়ে অভাব, তাহাও নিত্য; তাহার জন্য দুঃখ কি? যেমন বেশ্যাসক্ত হৃদয়, প্রেম শূন্য হইলেও বাহ্যে প্রেমেরই আড়ম্বর এবং

তদ্গত প্রেমেরই কলহ, তদ্রূপ ভক্ত ধর্ম্মীর সে নিত্য স্বভাব, তাহাতেই বা দুঃখ কি ?

"শুদ্ধভক্ত যে নাই—তাহা নহে। তবে নাই বলিলে যাহাদের সহ্য হয় না, তাহারাও তাহাই। যাহাদের সে তাত লাগে না, তাহারা আছে বলিয়া মাৎ করিতেও চাহে না। অতএব বিষ্ঠার দুই পিট সমান হইলেও শর্করার অভাব সংসারে নাই। ঝোলামালা দেখিয়া—মহাজনী গীত শুনিয়া—চৈতন্যের খোল বলিয়া তাহাদের প্রেমের উদয় হয় না, ভাগবত দেখিয়াই তাঁহারা কৃতার্থ হন। এজন্য তাঁহাদের প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্য নাই। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড পারে, ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ডগত প্রতিজীবে, বিষ্ণুপদ দেখেন। শালগ্রামশিলা, মথুরা, বৃন্দাবন, জগন্নাথ তীর্থের অপেক্ষা রাখেন না, আবার শালগ্রাম শিলায়, মথুরা, বৃন্দাবন, জগন্নাথ তীর্থে সেই এককেই দেখেন। কৃষ্ণ যেথানে—তাঁহাদের বৃন্দাবনও সেখানে। তাঁহারা চর্ম্ম চক্ষের বিষ্ণু দেখেন না। তাঁহারা জড়ের নিকট চিন্ময় চক্ষুর উল্লেখ করেন না। তাই তাহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না। পণ্ডিত যেমন চাষার নিকট মূর্খের ন্যায় এবং মূর্খ যেমন চাষার নিকট পণ্ডিতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সংসারে তেমনি তাঁহারা সাধারণ; সাধারণ বলিয়াই হরসুন্দর সাধারণ।

"দেবেন্দ্র! যথন সাধারণ চিনিতেছ, তখন সাধারণ হইতে পৃথক থাকিতে উন্মুখ হও না কেন ? যে দৃষ্টিতে সাধারণকে দৃষ্টি করিতেছ, তাহাই সাধারণ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে তুমিও সাধারণ। তবে তোমা অপেক্ষা সাধারণ দোষী নহে। ভগবদ্ভক্তি কাহারও অপেক্ষা করেন না, গুরুকৃপাতেই সিদ্ধি। অন্য দৃষ্টির প্রয়োজন কি ?"

দে। সেত সত্যই, তবে না বলিলে—না দেখিলে, সাধারণ বড়ই মাথা খাইতে বসে।

নটনারায়ণ একটু হাসিলেন; বলিলেন—"তাহা কি তুমি রক্ষা করিবে ? এ ভ্রম তোমার আজও আছে ?"

দে। না, তাহা নহে। ঈশ্বরই কর্ত্তা, তবে তিনি অবলম্বন দিয়াই করেন।

নট। ভাল, ভাল—ভাল কথাই বলিয়াছ, তাই আমি বলি—তুমি এই ভিক্ষা কর, যেন আমরা সে অবলম্বন না হই, যাঁহাদের সে ইচ্ছা আছে—তাঁহারা সে অবলম্বন হউন। আমরা যেন তিনি যে অবলম্বন দিয়া প্রেমমাধুরী প্রকাশ করেন—সেই অবলম্বন হইতে পারি। তাঁহার সংসারে ত সকল রকমই আছে। ইহা উত্তম নহে কি?

দেবেন্দ্র আর কোন উত্তর করিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "আপনার কথায় আজ আমার শ্রদ্ধা জন্মিল। আপনি পূর্ব্বেও ভক্তির উল্লেখ করিতেন, কিন্তু সে মুখের ছবি—আর এ মুখের ছবি—স্বতন্ত্র। বুঝিলাম, আপনি নরনারায়ণ অপেক্ষাও অগ্রসর—আমিই পশ্চাতে রহিলাম।"

নট। যদি ভক্তিমূর্ত্তি দেখিতে চাও, হরসুন্দরকে দেখিও—আমায় কি দেখিতেছ? আমিও তোমার মত ভ্রান্ত। আমি যাহা বলিলাম, তাহা শাস্ত্র দৃষ্টে বলি নাই—হরসুন্দরকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি, সেই দৃষ্টিতেই বলিলাম। বলিতেছি বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি—এখনও হরসুন্দরকে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই সাক্ষাৎ সেবা ভুলিয়া মোকদ্দমার সেবায় ব্যস্ত, কিন্তু সে যে মোকদ্দমা হইতে অতীত হইয়া বসিয়া আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল কি? পারিলে কি আজও তাহার জন্ম কাঁদিতে হয়?

এই বলিয়া নটনারায়ণ স্থির হইলেন। দেবেন্দ্রও আর কোন উত্তর করিলেন না। অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপনি অবশ্য আজ দেবীগ্রামে যাইবেন, আমিও আপনার সহিত যাইতে ইচ্ছা করি, আমায় সঙ্গে লইবেন।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূমি-শয্যায় দুইজন সন্ন্যাসীর কথোপকথন চলিতেছে। দূরে—দিব্যানন্দ যোগাসনে ধ্যানে মগ্ন।

প্রথম সন্ন্যাসী আমাদের দিব্যানন্দ-গুরু—পূর্ণানন্দ। দ্বিতীয়টী পাঠকের নিকট পরিচিত নহেন। ইনি পূর্ণানন্দের বাল্যবন্ধু। ইহাঁর যোগাশ্রমগত নাম—অচ্যুতানন্দ। উভয়েই যথা সময়ে সংসারে বিরক্ত হইয়া যোগে ব্রতী, প্রভেদ এই—পূর্ণানন্দ অষ্টাঙ্গ যোগে, এবং অচ্যুতানন্দ ষড়ঙ্গ যোগে-যোগী।

ক্রিয়ার প্রভেদ বশতঃ, ইহাঁদের উদ্দেশ্য এক হইলেও, ইহাঁরা একপন্থী নহেন। তীর্থ পর্য্যটনে বা সময়ে সময়ে, ইহাঁদের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। অদ্য বহু দিন পরে সাক্ষাৎ। উভয়েই যোগসম্পন্ন।

দিব্যানন্দ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। পূর্ণানন্দ বলিলেন, "আপনি ইহাতে আশ্চর্য্য হইতেছেন কেন? পূর্ব্ব-সাধনা থাকিলে সিদ্ধি—সমাধি প্রাপ্তি, অতি সত্বরেই হইতে পারে। সে জন্য দিব্যানন্দের এ সৌভাগ্য।"

অচ্যু। আমি বড় সুখী হইয়াছি। এরূপ সাধক সহজে মিলে না, এত অল্প কালে সিদ্ধি—ভাবিলেও আনন্দ হয়।

এখন দিব্যানন্দ,—নির্ম্মল, নিশ্চেষ্ট, শান্ত, বিকল্পশূন্য। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই—কেবল যোগে যোগারূঢ়।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিব্যানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইল, ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত হইল। সে উন্মীলনে সম্মুখে—দূরে—পূর্ণানন্দকে দেখিয়া মৃদু মন্দ হাস্তে আসিয়া গুরুদেবের চরণ ধূলি লইলেন। পূর্ণানন্দ বলিলেন, "আসন পরিগ্রহ কর।"

তখন নানা কথার পর, সাধনগত ধর্ম্মমেঘের কথা উঠিল। ধর্ম্মমেঘের উদয়েই যে আত্মা গুণশূন্য ভাবে, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইয়া কেবল চিন্মাত্র স্বরূপে স্থিত হন, এবং তাহাই যে মুক্তির স্বরূপ—পূর্ণানন্দের এ উল্লেখে, অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "অষ্টাঙ্গ যোগের এ কথা বটে, কিন্তু তাহা

অষ্টাঙ্গ যোগে হয় কৈ? আত্মা, ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্মমেঘের উদয়ে সে তাহাতে একীভূত হওয়ায়, তাহার স্বরূপ প্রকাশ কোথায়? স্বরূপ প্রকাশ ভিন্ন ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। এজন্য পতঞ্জলি পূর্ব্বসূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াও, কৈবল্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই। কারণ পতঞ্জলির কৈবল্য নির্দ্দেশই উদ্দেশ্য।"

এইরূপ নানা কথায় উভয়েই একাগ্রচিত্তে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শেষ পূর্ণানন্দ বলিলেন, "আমি দেখিতেছি—আপনি অষ্টাঙ্গ যোগে ব্রতী না হইয়াও, অষ্টাঙ্গযোগের ক্রিয়া যোগে প্রবীণ। আমি ষড়ঙ্গ যোগের বিষয় অনবগত, আপনি যাহা বলিতেছেন, আপনি ষড়ঙ্গ যোগের ক্রম নির্দ্দেশ করিলে—তাহা বুঝিতে বিশদ হয়।"

অচ্যু। অষ্টাঙ্গযোগের যম, নিয়মাদি ষড়ঙ্গ যোগেও পালনীয়। অতএব সে সকলের উল্লেখ অনাবশ্যক। ধারণা সম্বন্ধে—অষ্টাঙ্গযোগীর—স্থূল বৈরাজ ধারণা—ষড়ঙ্গ যোগীর সূক্ষ্ম (হৃদয়ান্তঃবর্ত্তী প্রাদেশ পরিমিত যে পুরুষ)—ধারণা। সেই পুরুষের চারি হস্ত। সেই চারি হস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-সমন্বিত।

"যতদিন পর্য্যন্ত এই পরাপর, বিশ্বেশ্বর অন্তর্য্যামী শ্রীহরিতে ভক্তি-যোগ সঞ্জাত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া আবশ্যক; পরে স্থূলরূপ—পরে এ সূক্ষ্মরূপ ধারণায় অধিকার।

"ষড়ঙ্গযোগী—পুণ্য তীর্থ বা উত্তরায়ণাদি কালের আদৌ কামনা করিবেন না। কারণ ঈড়াই প্রবৃত্তি মার্গ এবং পিঙ্গলাই নিবৃত্তি মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গকেই উত্তরায়ণ বলা হয়। এজন্য দেহত্যাগ-কালে নিবৃত্তি মার্গেই পুনরাগমন নিষেধ হয়।

"ষড়ঙ্গযোগে বুদ্ধিদ্বারা মনকে জয় করতঃ সেই বুদ্ধিকে জীবে এবং সেই জীবকে জীবস্বরূপে এবং সেই জীবস্বরূপকে, ভগবানে সমর্পণ করিবে।

"উক্ত অবস্থায় সত্ব, রজঃ, তমঃ, অহং, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতিও আর তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। সেই সাধন ক্রম এই:—

"নিজ পাদমূলদ্বারা গুহ্য দেশস্থিত মূলাধার-পদ্ম-নিরোধে,

স্বাধিষ্ঠানে আনয়ন করতঃ, নাভিদেশে মণিপুর চক্রে স্থিত বায়ুতে, হৃদয়ে অনাহত চক্রে উত্তোলন করিয়া. তথা হইতে উদান বায়ুর যোগে, ঐ বায়ুকে কণ্ঠগত বিশুদ্ধাখ্য চক্রে উত্তোলন করতঃ জিতবুদ্ধি হইয়া ধীরে ধীরে নিজ তালুগত বিশুদ্ধ চক্রেই স্থিত করাইবেন। অনন্তর নবদ্বার রোধ করতঃ, তাহা আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিবেন, এইরূপে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করতঃ, দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে বর্জ্জন করিবেন। ইহাই সদ্যোমুক্তি-ক্রম। কিন্তু যদি ষড়ঙ্গযোগীর অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য এবং ব্রহ্মলোক ইত্যাদি স্থানগত সুখভোগে বিরক্তি না জন্মে, তাহা হইলে দেহত্যাগ কালে ইন্দ্রিয় সমূহ ও প্রাণকে পরিত্যাগ না করিয়া, উহাদের সহিতই ব্রহ্মলোক ইত্যাদি ভোগ করিতে পারেন। পরে আকাশমার্গে—সুষুম্নারূপ ব্রহ্মপদ দিয়া অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্ত ভাবে ঊর্দ্ধস্থিত নারায়ণাধিষ্ঠিত জ্যোতিশ্চক্রে অর্থাৎ আদিত্যাদি ধ্রুবঃ লোকে গমন করেন। অনন্তর বিষ্ণুচক্র অতিক্রম করতঃ নির্ম্মল লিঙ্গ-শরীর দ্বারা মহর্ল্লোকে গমন করেন। যাহা—ভৃগু প্রভৃতি মহাজ্ঞানীর স্থান; পরে কল্পান্তে অনন্তদেব-অনলে বিশ্ব তাপিত হইলে দুই পরার্দ্ধ কল্পস্থায়ী ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তথায় শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, ভয় নাই।

"পরে ব্রহ্মলোক হইতে বিশেষে গমন করেন, অর্থাৎ বিশেষ পদ বাচ্য যে, পৃথিবীর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমরূপ আবরণ, তাহা আবেশে, তাহা অতিক্রম করতঃ পরে পঞ্চেন্দ্রিয় আলোচনায় লিঙ্গ শরীর অতিক্রমে, উপাধির অবসান হইলে পর, আনন্দময় ভাবে শুদ্ধানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। অতএব আর তাঁহাকে সংসারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহাই ক্রমমুক্তি-ক্রম।

"তখন সেই পরমাত্ম-সহবাসে তাঁহার ভক্তিযোগ সঞ্জাত হয়। কিন্তু অষ্টাঙ্গযোগী ভক্তিকে আবরণ করায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে, নির্ব্বিশেষে স্ব-স্বরূপ বা ভগবৎ—স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষে জ্ঞানযোগী ব্রহ্মে, এবং অষ্টাঙ্গযোগী পরমাত্মায় মায়াশক্তিস্বরূপে লীন

হয়েন, সেই জন্যই বলিতেছিলাম—অষ্টাঙ্গ যোগের—পরমাত্মা নির্ব্বাণই —ফল স্বরূপ। 'ষড়ঙ্গযোগীর—স্বরূপে, পরমাত্মাই সাধ্য।”

পূর্ণা। তাহাত বুঝিলাম। ফল কথাত একই হইতেছে দেখিতেছি; কারণ তখন আত্মার সেই চিন্মাত্র স্বরূপেই অবস্থান। ভগবান পতঞ্জলি যে তাহাই বলেন নাই, তাহার নির্দ্দেশ কি?

অচ্যু। এই স্বরূপ আত্মার তিন অবস্থা। সাযুজ্যই পতঞ্জলির নির্দ্দেশ। সাযুজ্যে স্ব স্বরূপে স্থিতি অসম্ভব। সালোক্য, সারূপ্যেই সম্ভব। এই সালোক্য, সারূপ্যে সে জন্য ভক্তির আভাস দেখা যায়। যদি সালোক্য, সারূপ্য পতঞ্জলির অভিমত হইত, তাহা হইলে ভক্তির আবরণের উপদেশ থাকিত না। কাম্য ফলানুসন্ধি ভক্তিরত কথাই নাই। যিনি এই ব্রহ্ম—পরমাত্মা নির্ব্বাণে এবং পরমাত্ম্য,ব্রহ্ম সালোক্য সারূপ্যে বীতরাগ—তিনিই ভক্তিযোগে অধিকারী, সে জন্য আমি এখন ভক্তিই প্রার্থনা করি। অতএব আত্মার দ্বিবিধ নির্ব্বাণ—ব্রহ্মনির্ব্বাণ এবং পরমাত্মনির্ব্বাণ। পরমাত্মসালোক্য ইত্যাদিতে কুণ্ডলিনীগত সুধা পানে জীব স্ব সুখে স্থিত, এবং ভগবৎসেবা এই তিন অবস্থা। শুনিয়াছি —ভক্তিযোগে চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শনে সে লোকও অতিক্রমিত হইয়া চিল্লোকে ভগবৎ সেবার অধিকার পায়।

অচ্যুতানন্দের কথায়, দিব্যানন্দের পূর্ব্ব-ভাব হৃদয়ে জাগিল। আবার সেই বকুলতলার দৃশ্য মনে পড়িল। সে দৃশ্যে আগন্তুক কৃপায় সে হৃদয়গত আনন্দ যেন হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল, কিন্তু জাগিল না। পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দের কথায়, নানা কথার পর দিব্যানন্দকে বলিতে লাগিলেন;—“এক্ষণে সেই চরম-ফল মুক্তির কথা বলিব। পূর্ব্বে যে সকল সিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি, এবং সে সাধনে তুমি যে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা জন্মাদি নানা ক্রমে ঘটে। অনেক জন্ম গত হওয়ায় সমাধির কোন ক্ষতি হয় না।

“শাস্ত্রে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে যোগিগণ জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির দ্বারা বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিয়া-

ছিলেন, কিন্তু সে সিদ্ধির মূল কারণ—সমাধি, এবং অন্যান্য গুলি তাহার উত্তেজক বলিয়াই বোধ হয়।

"ধরিয়া লও—পূর্ব্বজন্মে সমাধি আরম্ভ হইয়া বিঘ্ন পাইয়াছিল, ইহজন্মে নিমিত্তকারণ ক্রমে তাহার সিদ্ধি লাভ। দেখ—কোন কোন যোগীর জন্মমাত্রেই সিদ্ধিলাভ। কপিল ও বামদেব তাহার লক্ষ্য স্থল। ঔষধাদি রসায়ন দ্বারায় সিদ্ধি শুনা যায়—মাণ্ডব্যঋষি তাহার লক্ষ্য স্থল। কেহ কেহ মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়াছেন, কেহ বা তপস্যা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিশ্বামিত্র তাহার লক্ষ্য স্থল। বিশেষ যুক্তি-চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে সমাধি যে সকলের মূল কারণ, ও অন্য চারিটী যে তাহার উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সেজন্য পূর্ব্বজন্মে সাধনে অগ্রসর থাকিলেও, ইহজন্মে সিদ্ধিলাভে সমাধি সাধনের আবশ্যক।

"প্রকৃত্যাপূরণ অর্থাৎ প্রকৃতির আপূরণ হেতু, এক জাতীয় দেহের পরিণামে অন্য জাতীয় দেহ প্রাপ্তি; নন্দীশ্বর ইহার লক্ষ্যস্থল। ইহ জন্মেই তিনি দেব-দেহ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নিমিত্ত কারণ—ধর্ম্মাদি নহে। যেমন কৃষক, এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে জল বহনে অশক্ত হইলে, মধ্যের আল কাটিয়া জল সংযোগ করে, তদ্রূপ আবরণ রূপ প্রকৃতির ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, উহা আপনিই সাধিত হয়।

"অস্মিতা হইতেই তাঁহারা বহুচিত্ত উৎপাদন করেন। ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, প্রকৃতি তাঁহার বাধ্য হওয়ায়, প্রকৃতি আপনি পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তেমনি ইচ্ছানুসারে যোগী মূল চিত্ত হইতে দেহান্তরে গতি ও স্থিতি করিতে পারেন।

"স্ফুলিঙ্গরূপ চিত্ত বিভিন্নাংশে স্থিতি করিলেও মূল চিত্তেই তাহা নিয়ন্ত্রিতও তাহাতে যোগীর ইচ্ছানুরূপ ভোগ নিষ্পত্তি হয়। যেমন স্বদেহস্থিত জ্ঞান, কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহাতে অন্যথা ঘটে না।

"পাঁচ প্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিসিদ্ধ চিত্তই আশয় শূন্য। কারণ সমাধি বা ধ্যানজ চিত্তে কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মবীজ থাকে না। সমাধিসিদ্ধ

চিত্তে, অবশিষ্ট কর্ম্মভোগের নিমিত্ত বাসনা থাকে মাত্র, যে বাসনায় ভিন্ন দেহ ধারণ করার প্রয়োজন হয়। এইজন্য সমাধিসিদ্ধ,মুক্তিলাভ করেন।

"অযোগী—শুক্ল, কৃষ্ণ, ও শুক্লকৃষ্ণ এই ত্রিবিধ কর্ম্মে—কর্ম্মী। শুক্ল অর্থাৎ যাগাদি শুভফলদ, কৃষ্ণ অর্থাৎ হিংসাদি অশুভ ফলদ, শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ শুভাশুভ ফলদ। কিন্তু যোগীর কর্ম্ম নিষ্কামে সাধিত হওয়ায়, ইহার বিপরীত। সুতরাং যোগী কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়েন না।

"উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের বিপাকে, তাহারই গুণফল রূপ বাসনা সকল অভিব্যক্ত হইতে থাকে, অবশিষ্ট অনুবাসনা সকল অব্যক্ত থাকে।

"জাতি, দেশ, কাল ব্যবধান সত্ত্বেও, চিত্তস্থ কল্পনা সকল নিরন্তর ভাবে প্রকাশ পায়। কারণ সংস্কার হইতেই স্মৃতির উদয়, অবস্থার ভেদ মাত্র, নচেৎ সংস্কার বা স্মৃতি একই বস্তু। যখনই স্মৃতি হইবে, তখনই তাহার পূর্ব্বেই সংস্কার থাকা অনুমিত হইবে। কারণ.সংস্কার হইতে স্মৃতি স্মৃতি হইতে কর্ম্ম, কর্ম্মে সুখদুঃখ ভোগ, ভোগে পুনরায় কর্ম্ম, তাহাতে আবার স্মৃতি, সংস্কার হইতে থাকে।

"বাসনার আদি না থাকায়, তাহার প্রথম বাসনা স্থির হয় না। কারণ আশিষের নিত্যতা হেতু, বাসনার অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। সুখ হউক, দুঃখ যেন না হয়, ইত্যাদি প্রার্থনা সূচক ভাব, জীবমাত্রেই বর্ত্তমান থাকায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং জন্ম ও মরণ— প্রবাহের ন্যায় অনাদি এবং তাহার কারণরূপ বাসনাও অনাদি।

"হেতু, ফল, আশ্রয়, অবলম্বন ক্রমে বাসনা সঞ্চিত হয়, যদি সেই হেতু প্রকৃতির অভাব হয়, তাহা হইলে বাসনারও অভাব হইতে পারে।

"চিত্ত একই। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে চিত্তের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তবে চিত্তের নানা প্রকার ধর্ম্ম থাকাতে নানা প্রকার বাসনার উৎপত্তি। এক হইতেছে—এক যাইতেছে। ফলতঃ মধ্যভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ স্বরূপ হইয়া নানা দিকে বাসনা গতি করা হেতু, কার্য্য-কারণ ভাবে তাহাদিগের নানাপ্রকার তত্তৎ ফল প্রাপ্তি হয়। সুতরাং নানা প্রকার ধর্ম্ম হইতেছে। ঘট "নাই"—"হইবে"—"আছে" —ইহা কেবল ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন বিশেষ।

"সেই সকল বস্তু—ব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও গুণ স্বভাবান্বিত। মৃত্তিকার পরিণামে—ঘট, ঘটের পরিণাম সেই—মৃত্তিকা; অতএব বস্তুতত্ত্বে এক। ধর্ম্মী মৃত্তিকার—যে ঘটাবস্থাটী নিহিত ছিল, উপায় বলে তাহা ব্যক্ত হইল। এইরূপ বিচারের দ্বারায় নির্ণীত হয় যে, আশ্রয় দ্রব্যটী এক ও স্থায়ী। আশ্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে আবির্ভাব ও তিরোভাব দৃষ্ট হয় মাত্র। অতএব কোন বস্তুরই সম্পূর্ণ নুতন উৎপত্তি ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে না। এ বিধায় চিত্তও এক ও স্থায়ী। ব্যক্তই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক—সমস্তই গুণময়, কারণ সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণের বিকার বা পরিণাম। কোন গুণই পৃথক পৃথক পরিণত হইতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের উত্তেজক বা নিস্তেজক হইয়াই পরিণামিত হয়। ইহার ইতর বিশেষে, বিবিধ ধর্ম্মে প্রকাশ পায়, বহুরূপে প্রকাশ পাইলেও বস্তুতত্ত্বে এক।

"বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়, উভয়ের ভিন্নতা, সকল স্থলেই দৃষ্ট। সমান বস্তুতে চিত্তের বিভিন্ন বাসনা প্রযুক্ত, গুণভেদে বিবিধপন্থা বা ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রকাশ পায়। যথা :—এক স্ত্রীতে কামুকের সুখজ্ঞান, সপত্নীর দুঃখ জ্ঞান, এবং সন্ন্যাসীর ঘৃণা।

"এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হইলেও, বস্তুর পার্থক্য নাই, কেবল গুণের পৃথকত্ব মাত্র। যদি বল, তবে চিত্ত—বস্তু তত্ত্বে এক কিরূপে? পৃথক পৃথক পুরুষ-সন্নিধানে চিত্তের পৃথকত্ব। অর্থাৎ তাহাতে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সকল প্রকাশ পায়। জ্ঞানের প্রকাশকত্ব হেতু, তাহার গ্রহণ স্বভাব সর্ব্ব স্থানে এক, অর্থাৎ সকলেই স্ত্রী প্রকৃতি দেখিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, তবে ধর্ম্ম বিশেষে বিশেষ ভাবের উদয় হইতেছে মাত্র। চিত্তদর্পণে বস্তু প্রতিবিম্বিত হইলেই—জ্ঞাত, প্রতিবিম্বিত না হইলেই—অজ্ঞাত।

"দর্পণরূপ চিত্ত—প্রকাশক বটে, কিন্তু তাহাকে যিনি প্রকাশ করিতেছেন, তিনিই চিত্তের প্রভু। তিনিই আত্মা—অবিনাশী। সেই জন্যই তিনি সর্ব্বকালিক জ্ঞাতা। কারণ তিনি ভিন্ন দর্পণের প্রকাশে ক্ষমতা নাই।

"কারণ দর্পণ ও দৃশ্য—স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টার যোগে তিনি

প্রকাশক মাত্র। আত্মাই তাহাকে প্রকাশ করেন, কারণ ও পর-প্রকাশক। এক কালে চিত্ত ও বিষয়ের অবধারণ হয় না, অর্থাৎ উভয় যে ভিন্ন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু অভিন্ন নহে—বিভিন্ন। প্রভেদ না থাকিলে—দ্রষ্টার সহিত চিত্তের ভিন্নতা না থাকিলে—কোন ক্রমেই একসময়ে এইটী জ্ঞেয় এবং এইটী তদ্বিষয়ক জ্ঞান, বা আমার চিত্ত, এরূপ ভিন্নতাবোধক অনুভব—হইত না।

"এক বুদ্ধিকে অন্য বুদ্ধির প্রকাশক বলিলে, বুদ্ধি বোধের প্রতি অতিব্যাপ্তি দোষ ও স্মৃতিসঙ্কর দোষ আরোপ করা হইবে। কারণ যে বুদ্ধির দ্বারা অন্য বুদ্ধির প্রকাশ, সে বুদ্ধির যিনি প্রকাশক, তাঁহারও প্রকাশক থাকিবে, এইরূপে ক্রমে অনন্ত বুদ্ধি থাকা কল্পনা করিতে হয়। তাহাতে বস্তুজ্ঞান সমাপ্ত হয় না।

"চিৎশক্তিরূপ পুরুষ—নির্ব্বিকার। তিনি প্রকৃতি-প্রসূত বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে, বুদ্ধি তাহাতে চিদ্রূপা হইয়া স্বীয় স্বরূপ জ্ঞাত হয় অর্থাৎ আপনাকে বুদ্ধি বলিয়া জানিতে পারে।

"দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ—দৃশ্য অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে যদি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হন, তাহা হইলে সে বুদ্ধি তখন সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ করিতে পারে। অসংখ্য বাসনা-গত চিত্ত, স্বীয় স্বামী দ্রষ্টা-পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষের কারণ, অর্থাৎ পুরুষের নিমিত্ত ব্যতীত—নিজের নিমিত্ত চিত্ত কিছুই করেন না।

"চিত্ত যখন আত্মভাবিত হইয়া আপনার ও পুরুষের বিষয়াবশেষ দর্শন করেন, তখন তাঁহার আর কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিছুই থাকে না। কারণ তখন আর তাহার স্বরূপ থাকে না। কেবল নাম মাত্র সত্তা থাকে। সুতরাং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া মোক্ষ ভাগী হন, তাহাতে কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি হওয়ায়, চিত্ত তখন বিবেকনিষ্ঠ হয়, এবং কৈবল্যের পূর্ব্ব লক্ষণ ধারণ করে। তখনও সমাধিগত যোগীর চিত্তে, সময়ে সময়ে পূর্ব্ব সংস্কার প্রভাবে, অহং মম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় উদয় হইতে থাকে। অতএব যখনই তাহার উদয়, তখনই তাহাকে বিলীন করা উচিত। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সকল বিঘ্ন চিত্তের

বৃত্তি ক্ষীণ হইলেও সংস্কার বশতঃ উদয় হইতে পারে, সেই সাবধানের জন্য এ উল্লেখ।

"এইরূপ পূর্ব্বে যে, অবিদ্যাদি ক্লেশ পঞ্চ বিনাশের উপায় বলা হইয়াছে, সেই উপায়েই তাহাদিগকে নিরঙ্কুর করিতে হইবে। এক বার যদি তাহাদিগকে নিরঙ্কুর করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোনরূপ পরিণাম বা বিকার জন্মিবে না। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত করিতে পারিলেই চিত্ত আপনার উৎপত্তি স্থান প্রকৃতিতে প্রলীন হইবে, সুতরাং আত্মা প্রকৃতি শূন্যে—কেবল হন।

"তখন প্রসংখ্যানের উদয় হয়, সে উদয়ে যদি যোগী লুব্ধ না হন, তাঁহারই বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতেই ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি জন্মে। প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে, যখন প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্য জ্ঞান উদয় হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক অবান্তর ফলও উদয় দেখা যায়। সেই ফলই—প্রসংখ্যান, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বা সর্ব্ব-বিজ্ঞানাদি সামর্থ। যদি যোগী ইহাতেও বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলেই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা হইল। তাহাতেই চিত্তের সকল কার্য্য সকল এবং আকাঙ্ক্ষার শেষ হইল। ইহাতেই ধর্ম্ম মেঘের উদয় হয়। তাহা হইতেই সমস্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ, ও তজ্জাত কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়।

"তখন জ্ঞান আবরণশূন্য হইয়া পড়ে, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হওয়ায় যোগী সর্ব্বজ্ঞ হন।

"সে অবস্থায় ক্লেশ, কর্ম্ম সকল নিবৃত্ত হয়। কারণ গুণ সকল কৃতার্থ হইয়া আর কর্ম্মমূলে দণ্ডায়মান হয় না। কারণ পুরুষের ভোগ মোক্ষের জন্যই তাহাদের এই পরিণাম; পুরুষ যখন এই অবস্থায় নীত, তখন তাহাদের পরিণাম সমাপ্ত হইতে থাকে, আর পরিণাম হয় না, এবং প্রকাশ রহিত হয়।

"ক্ষণ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মকাল, তাহার প্রতিযোগী ক্ষণ অর্থাৎ তৎপরক্ষণ, এবং ক্রমশঃ দণ্ড, প্রহর, দিবা, রাত্র, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর। কাল সমূহে বস্তু সকল মহাভূত হইতে যে ক্রমে প্রকাশ

পাইতে থাকে, তাহাতে যে পরিণামের উত্তরোত্তর পরিণাম অনুভূত হয়, তাহাই ক্রম। মৃত্তিকা হইতে ঘট, ঘট হইতে মৃত্তিকা—ইহাই পরিণাম, এ পরিণামের শেষ নাই। যখন গুণ সকল এই পরিণাম সমাপ্ত করে, তখন যোগী কৈবল্য লাভ করেন। অযোগীর নিকট গুণ নিত্যপরিণামী হওয়ায়, অযোগী সংসার ভ্রমণে মুক্তি পায় না।

"গুণ বা প্রকৃতি যখন পুরুষার্থত্যাগী হন, অর্থাৎ আত্মার নিকটে আর অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত না হইয়া প্রকাশরহিত হন, তখন পুরুষ বা আত্মা নির্গুণ হন। সেজন্য তখন, সে আত্ম-চৈতন্য আর প্রকৃতি গত নহে। নির্ব্বিকার—কেবল ভাবে, স্বীয় চিন্মাত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন। ইহাই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের অভিমত। তুমি যে অবস্থায় নীত, চিত্তের পূর্ব্ব-সংস্কারে পুনরপি চিত্ত বিকৃত না হয়, এবং প্রসংখ্যানে মুগ্ধ না হও—সেই জন্যই আমার এ উল্লেখ।"

দিব্যানন্দ বলিলেন, "অবশ্য সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। —কিন্তু তাহার পর?"

পূর্ণ। তাহার পর আর নাই। আত্মা প্রকৃতি-লয়ে চিন্মাত্র স্বরূপে স্থিত—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা একীভূত—তখন আর—তাহার পর—কে জিজ্ঞাসা করিবে? আত্মা তখন পরমাত্মস্বরূপে সংস্থিত—একীভূত।

দিব্যানন্দ অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "আছে—আমি একদিন তাহা ভোগ করিয়াছি। যখন ভোগ করিয়াছি, তখন নাই বলিতে পারিব না। এ কথা আমি আপনার নিকট পূর্ব্বেও অনেকবার উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমার সে অবস্থা নহে, সেজন্য আপনি সে কথায় কান দেন না—ইহাই ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি—তাহাই সাধ্য। বিশেষ—যোগী অচ্যুতানন্দ তাহাই বলিতেছেন। কারণ পতঞ্জলি, কৈবল্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবৎ-দর্শনের কোন উল্লেখই করেন নাই। তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন—সেই কার্য্যই নিষ্পন্ন করিয়াছেন। সেজন্য তিনি ভ্রান্ত নহেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়মর্ম্ম না উপলব্ধি করিতে পারিলে, নিজেই ভ্রান্ত

হইতে হইবে। কারণ যুক্তিগত দর্শন শাস্ত্রে, তুরীয় স্বরূপের উল্লেখ হইতে পারে না। সেজন্য ভগবানের দর্শন-গ্রাহ্য ঈশ্বর স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, ইহাই আমার বোধ।”

অচ্যুতানন্দ বলিলেন, “বৎস দিব্যানন্দ! উত্তম বলিয়াছ, কোন দর্শনকারই ভ্রান্ত নহেন। যিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিতে বসিয়াছেন, তিনি সেই পথের যথাযথ বর্ণনে, তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। আত্মার প্রবৃত্তি ও সুকৃতি গুণে, যথাযথ পথই অবলম্বিত হয়। হইলে—তাহাতে মুক্তি, মুক্তের ভগবদ্‌ভজন বা নির্ব্বাণ ইচ্ছাধীন—ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এখন নির্ব্বাণ মুখে অগ্রসর হইব না। কারণ, কপিল ত্রিগুণামায়া অতিক্রম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, পতঞ্জলের বা শঙ্করাচার্য্যের উপদেশে দেখা যায়, তাঁহারা জড়া ত্রিগুণামায়ার নিমিত্ত-রূপিণী মহামায়া অতিক্রম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য ইঁহাদের দর্শনের উদ্দেশ্য ও সাধন একই। তবে শঙ্করের ব্রহ্মে এবং পতঞ্জলির পরমাত্মায়—নির্ব্বাণ উপদেশ—এই প্রভেদ। শঙ্কর, তুরীয়ব্রহ্মের সত্বাধিষ্ঠানকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর শব্দে অভিহিত করেন, পতঞ্জলি—ঈশ্বর হইতে ব্রহ্মের কোন ভেদ করেন নাই। কপিল—বদ্ধজীবকে সে অনধিকার চর্চ্চায় যাইতে না দিয়া, কেবল আত্মতত্ত্বে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, এবং সত্যই যে—জীব যখন এই সামান্য জ্ঞানে ভগবৎ সেবায় উন্মুখ হয়, তখন মুক্তজ্ঞানে তাহার স্বতই সে ভাব ফুটিবে। প্রথমে সে চর্চ্চায় কোন ফল নাই। এজন্য কপিলের নির্ব্বাণ উক্তি নাই। মীমাংসক জৈমিনিও কপিলের মতে মত দিয়া অপূর্ব্ব উল্লেখে জীবকে কর্ম্ম পথের পথিক করতঃ, কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ করিয়া আত্ম-দর্শনে উন্মুখ করিয়া দেন। আর কণাদ বা গৌতম উভয়ে তাঁহাদের ন্যায় ও বৈশেষিকে জড় হইতে যে জীব স্বতন্ত্র, তাহা বিশেষরূপে জীবকে উপদেশ দেন। অতএব কোন দর্শনই জীবের পক্ষে অমঙ্গলকর নহে। জন্মের পর জন্মে যাহার যে অবস্থা, সে তাহাতেই রত হয়। ইহাই জীবের অধিকার। তাহার পর ভগবান্ ব্যাস ভক্তিমার্গের কথা উল্লেখে, পঞ্চদর্শনের সমালোচনায় ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশে

পরাশক্তির উল্লেখ করেন। নচেৎ আমার মত অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া, কপিল মূর্খ ছিলেন দেখাইবার জন্য,ব্যাসের সে বেদান্ত আলোচনা নহে। অতএব ষড়দর্শনই এক দর্শন—ছয়, সোপান মাত্র। বেদান্তই সর্ব্বোচ্চ সোপান, কারণ ভগবদ্দর্শন ভিন্ন ভগবদ্ভক্তির উল্লেখ হইতে পারে না। বেদান্ত—ভক্তি উল্লেখেই পরমাত্মার সৎ, চিৎ, আনন্দ—জড় বিবিক্ত তুরীয় স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। অতএব কোন দর্শনকারই অজ্ঞ নহেন। ভগবানের লীলা হেতু, ভগবদাবেশে তাঁহাদের এ কার্য্য। স্বরূপে তাহারা সকলেই এক।

পূর্ণ। অন্যের মুখ হইতে এরূপ কথা নির্গত হইলে, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতাম না। তাহা যে অবিদ্যার খেলা, তাহাও স্থির করিতাম, কিন্তু অদ্য তোমার বা দিব্যানন্দের মুখ হইতে বাহির হইতেছে. এজন্য তাহা ভাবিবার বিষয়।

তখন নানা কথা উঠিল। নানা বিচারে অচ্যুতানন্দ ও দিব্যানন্দ চিদ্‌বৈচিত্রের নিত্যতা প্রদর্শন করতঃ, তাহা যে অবিদ্যাগত নহে, এবং সমাধিরও পর অবস্থা, তাহা প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। কারণ শিবসুন্দরের নিকট দিব্যানন্দের অনেক কথা শুনা ছিল এবং অচ্যুতানন্দ ষড়ঙ্গ যোগে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অতিক্রমে, এখন শুদ্ধ ভক্তির জন্য লালায়িত, সেজন্য তাঁহার ভক্তিশাস্ত্র অজ্ঞাত নহে।

পূর্ণানন্দ স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "দিব্যানন্দ! তুমি যে ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করিতেছ, তাহা সত্য, আমরা তাহা স্বীকার করি, তিনি মায়াজিত বটেন, কিন্তু মায়াতীত কিরূপে হইবেন, মায়া যে তাঁহারই শক্তি।"

দিব্যা। অবিদ্যা তাঁহার সাক্ষাৎ শক্তি নহে। তাঁহার স্বগত স্বরূপশক্তির প্রভাব মাত্র। সেই প্রভাবে জড়মায়া ত্রিগুণের প্রকট। ত্রিগুণে ভগবান স্ব-স্বরূপে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত—কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের যে বিলাস বিগ্রহ—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হেতু মায়া শক্তিতে অধিষ্ঠিত, আপনি তাঁহাকেই বোধ হয় শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণু স্বরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনি পরমেশ্বর হইয়াও মায়ায় ঈশ্বর

রূপে অধিষ্ঠিত। তিনি অংশ, অংশী ভগবানই—মায়াতীত তুরীয় কৃষ্ণ, এজন্য কৃষ্ণই—ভজনীয়।

অচ্যু। তবে বিষ্ণু—ভজনীয় নহেন কেন?

দিব্যা। বিষ্ণুই ভজনীয়, বিষ্ণুই—কৃষ্ণ। বিষ্ণুর তুরীয় স্বরূপই কৃষ্ণ, এজন্য কৃষ্ণই ভজনীয়।

তখন অচ্যুতানন্দ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। পূর্ণানন্দ বলিলেন, "ভাবিবার বিষয় বটে, ইহাই বৈষ্ণব মত। ভাই অচ্যুতানন্দ! চিন্তা করিতে থাক, পরে এ বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন।"

যে কথা শুনিয়া পূর্ণানন্দ ভাবিবার বিষয় মনে করিলেন, তাহা যদি কোন স্থানে উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে আজি কালি এরূপ লঘুচিত্ত মানব যে, সে স্থানে তাঁহারা অবিদ্যার খেলাই প্রদর্শন করেন বা করান। কিন্তু পূর্ণানন্দ যোগী, অহঙ্কারশূন্য, রাত্র্যন্ধ উলূকের ন্যায়, কেবল পড়ুয়া পণ্ডিত নহেন, মুক্তিকামী হইলেও ভুক্তিকামী নহেন, এবং কর্ম্মজ্ঞানশূন্য, অহংবিদ্যাবাগীশও নহেন, বা শাস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আহার বিহারে নিশ্চিন্ত নহেন, সে হেতু তাঁহার সে দৃষ্টি পড়িল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ছল ছল নেত্রে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতী তখন নাতি লইয়া আদর করিতে-ছিলেন। শশাঙ্কের মুখ দেখিয়া প্রভাবতী নাতিকে বলিলেন :—

কোথায় রাম রাজা হবে ভেবেছিল মনে।
রামের হল বনবাস অহঙ্কারের গুণে॥

কি বলিস্ ভাই! মুখ দেখিয়াও কি বুঝিতে পারিস্ না।

নাতি বলিল, "ঐ—ঠা—হা।"

শশাঙ্ক কথা কহিলেন না। প্রভাবতী নাতিকে শশাঙ্কের কোলে দিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "রামা কোথায় গেল?"

প্র। রামা কি এ মান ভাঙ্গাইতে পারে? এ যে সজ্ঞানের মান, ডেকে ডেকে প্রেম।

শ। কি তামাসা কর? কাহারও মরে ছেলে, কেউ হরি হরি বলে।

প্র। অমনি কি—কেউ বলতে যায়?
ভাব দেখে শুনে বলতে হয়॥
এখন দেখে বনবাস।
কাটলো ভালবাসা ফাঁশ॥
অভিমানে পুরুষসিংহ মুখে বসন ঢাকে।
পায়ে ধরে প্রভাবতী—মান ভাঙ্গাবার পাকে॥
শুনতে হল বাউরা থানা, প্রভুভক্ত খেলা।
প্রভু সে সোণার গৌরাঙ্গ, ভক্ত কাঠের চেলা॥
কিল খেয়ে কিল চুরি করে, সেয়ানা বলি তারে।
বুদ্ধি মোটা সোণার গৌরাঙ্গ চেলার জন্য মরে॥

শ। আর কাজ নাই, ভিরকুট বীজের গুণে বড় রস বাড়িয়াছে—এই বার তা গেল। এখন রস কত গড়ায়—তা দেখা যাবে।

এই বলিয়া শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের সকল কথা বিবৃত করিলেন। শেষ, যখন হরসুন্দরের মাথায় খড়ম মারিবার কথা উঠিল, তখন শশাঙ্ক, আর চক্ষুর জল অবরোধ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহা প্রভাবতীকে দেখাইবার ইচ্ছা ছিল না।

প্র। ভাল হল রাজ্য গেল হ'ল সর্ব্বনাশ।
বন-পশু বনে গিয়া করুক উল্লাস॥
নদীর মর্ম্ম বুঝে—সাঁতার দেয়, সেইত নাগর।
এক টানেতে তলিয়ে পড়ে, পশু আর বানর॥
তাদের জন্য ধরা থানা—প্রেমের বন্যা নয়।
নাগর আমার তাতে প'ড়ে হাবুডুবু খায়॥

জানতে হবে নদীর খেলা, জোয়ার ভাটা তাঁর।
জোয়ারেতে উজান চলে—বুঝা কিছু ভার॥
যে মান চিনেছে, সেই বুঝেছে পায় ধরা কাণ।
যে জন মানকে দেখে রাগের খেলা সে বড় অজ্ঞান॥
জোয়ার ভাটায় প্রেম কি টলে, যদি প্রেমিক হয়।
প্রেমিক বুঝে প্রেমের খেলা, অপ্রেমিকে নয়॥
তাই বলতে হ'ল খুলে খালে, উজান বুঝি নদী।
অহঙ্কারকে টেনে ফেলে বইতে নিরবধি॥
এখন দেখ গিয়ে স্বচ্ছ হয়ে—অহঙ্কারকে ফেলে।
তার উজান বেগে কেন ভেসে, এলে এখান চলে॥

শ। সত্য বলিয়াছ প্রভা! আমার এ কার্য্যে অহঙ্কার ছিল। তাই তার এ খেলা। আমি অহঙ্কারে, সে অহঙ্কার তখন ধরিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম—আমার চেষ্টা কৌশলেই জ্যোতিঃপ্রসাদ, হরসুন্দরকে চিনিবে। আমার দ্বারায় জ্যোতিঃপ্রসাদের উপকার হইবে। তাই সে আমার অহঙ্কার চ্যুত করিয়া দেখাইল—মানুষ উপকার করিবার,—তাহাকে চিনাইবার—কেহই নহে। তাহার কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না, তবে আমরা তাহার অবলম্বন মাত্র। প্রভা! আমার দোষেই জ্যোতিঃপ্রসাদ আর অগ্রসর হইতে পারিল না। আমি অহঙ্কাররূপে মাঝে দাঁড়াইয়া তাহার চক্ষু আবরিত করিলাম। নচেৎ জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিল, আমিই দেখিতে দিই নাই।

এবার প্রভাবতী হাস্য আরম্ভ করিলেন। বলিলেন :—

"নাগর রসিক বড় নাগরী মহলে।
পুরুষ সমাজে মুখ কিছু নাহি বলে॥

এটাও কি বুঝিলে না ছাই! যে, যে জ্যোতিঃপ্রসাদ এত ভালবাসে, তোমার জন্য জীবন দেয়, তুমি যার জন্য জীবন দাও. সে কি একটা সামান্য কথায় তোমায় বিদায় দিতে পারে? বিশেষ তার কথা গুলিতে যে, দ্বিভাব প্রকাশ করিতেছে, ইহাও কি ধরিতে পারিলে না? সে

তোমায় কি ফেলিয়াছে—না আজ হইতে মাথায় লইয়াছে? এখন তোমায় দেখাইতেছে যে, তুমি যেমন চা'লে চল, সে তেমনি তোমার চেলা হইল।"

শ। না প্রভা! তা নহে। জ্যোতিঃপ্রসাদের কি এমন দিন হইবে? তা হইলে যে আমার অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমার এমন দিন কি হইবে?

প্র। আমি বলিতেছি জ্যোতিঃপ্রসাদ তোমায় বিদায় দেয় নাই। সে পরীক্ষার জন্য এ খেলা খেলিয়াছে। এ বিদায়ে যাহার পরীক্ষা, সে কখন হরসুন্দরের মাথায় খড়ম তুলিতে পারে? তুলিতে পারে না বলিয়াই ত তোমায় পরীক্ষায় দেখিতেছে।

পুরুষ নারীর বড় জ্ঞানের কৃপায়।
পুরুষের চেয়ে নারী প্রেমের কথায়॥
পুরুষ জ্ঞানের অঙ্গ নারী সে প্রেমের।
উভয় চক্ষেতে দেখ ঘুচে যাবে ফের॥
ভাটা সে জ্ঞানের খেলা প্রেমেতে উজান।
জ্ঞানচক্ষু নাহি পারে ধরিতে এ কাণ॥

শশাঙ্ক প্রভাবতীর মুখ পানে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কিছু পরে বলিলেন, "তা হইতে পারে, হউক; সেও ত তাহারি খেলা, তাহার খেলাও সুন্দর। সে সুন্দর, তাহার খেলাও সুন্দর। সেই সুন্দর তাকাইয়া আমিও সুন্দর হইব। তাহার অপেক্ষা আর আনন্দ কি? আর কোন দিকে তাকাইবার প্রয়োজন কি?

এই বলিয়া শশাঙ্ক দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিলেন। পরে দেবী-গ্রামাভিমুখে বাহির হইলেন।

হরসুন্দরই তাঁহার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে তিনি যেন আজ নূতন। দেহ যেন জন্ম জন্ম মলিন আবরণে ভারগ্রস্ত ছিল, তাহা যেন স্খলিত হইয়া গেল। দেহের সে জড়তা আর নাই। ইন্দ্রিয়ে তিনি যেন বদ্ধ নহেন, জড় যেন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিরণমণ্ডল যেন সূর্য্য-মণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট। দেবীগ্রামের পথ যেন হিরন্ময়। তিনি পথি-

মধ্যে যোড়হস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া আপনাকে আপনি বলিলেন, শশাঙ্ক!

"স্বভাব ছাড়িতে'নারে—ভাবের দোহাই দেয়।
স্বভাব ছাড়িয়া ভজে, ভক্তি তার পায়॥"

স্বভাব নষ্ট না হইলে, নামের স্বরূপ লক্ষ্য হয় না, না লক্ষ্য হইলে, ভক্তির উদয় হয় না। বিনা ভক্তিতে স্বভাবে বৈরাগ্য জন্মে না, না জন্মিলে—কেবল দোহাই দিয়া দিন কাটাইলে—কি সে চিন্ময় স্বরূপে দৃষ্টি পড়ে? দৃষ্টি ভিন্ন কি রতির উদয় হয়? বিনা রতিতে কি প্রেম জন্মে? এত পরকেলে ধর্ম্ম নহে? বর্ত্তমানে বর্ত্তমান দেখিয়া, কোটি কোটি জন্মের অপরাধ খণ্ডন কর।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে হরসুন্দর বহির্গৃহে বসিলে, জীবসুন্দর তামাক সাজিতে বসিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব উত্থিত, হরসুন্দরের তাহা অজ্ঞাত নহে। তিনি তাহার লালিত্য বৃদ্ধির জন্য বলিলেন, "জীব! তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিলে, লোকে যাহা খাইতে পারে, তাহার অধিক ভোজনে রোগের সৃষ্টি হয়। তোমরা শক্তিসঞ্চারে অবিদ্যারূপা ত্রিগুণধারিণী মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ বটে, কিন্তু জাগ্রৎরূপা মহাবিদ্যা—মহাকুহকিনীর হস্তে পড়িয়াছ! তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে, পরাবিদ্যা-রূপা প্রেমময়ীর কৃপায়, মাধুর্য্যময়ীর প্রজা হওয়া যায় না। যতদিন না সে দিন আসিবে, ততদিন সাবধান—এ সাধন-আনন্দ রসে বিভোর হইলে, সে দৃষ্টি চলিবে না; না চলিলে—বস্তু সিদ্ধি ঘটিবে না। কুণ্ডলিনীর নিদ্রিত ভাবই—যোগনিদ্রা। মায়া—নিদ্রিত কুণ্ডলিনীরই নামান্তর। কুণ্ডলিনী সঞ্চারে যতদিন না তাঁহার পরাবিদ্যা স্বরূপ দর্শন হয়, ততদিন তাঁহার জাগরণেও তন্দ্রাকাল। এজন্য

তিনি মহাকুহকিনী-স্বরূপা, কারণ তিনি সগুণা যোগরূপিণী। যদি তন্দ্রাকালে কখন ভ্রমে তাঁহার সেই সগুণা যোগস্বরূপে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার পরাস্বরূপ লাভে বঞ্চিত হইবে। সগুণ সাধনানন্দরূপ সুধা খাইয়া সুধা-খাওয়া অসুর হইবে মাত্র, ভক্ত হইতে পারিবে না। জীব! ভক্তি যতক্ষণ অহৈতুকী না হইতেছে, ততক্ষণ অন্তর্মুখ, বহির্মুখ দশায়, জীবের পদে পদে অপরাধ সঙ্ঘটন-সম্ভাবনা।"

জীবসুন্দর তামাক সাজিয়া দিয়া বসিলেন, বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না, আমি তোমাকেই জানি। তুমিই পরা, তুমিই অপরা—তাই আমি বারবার তোমায় প্রণাম করি। তুমি মারিলে কে আমায় রক্ষা করিবে? তুমি রাখিলে কে আমায় মারে? তুমিই আমার অপরা গুরু—পিতা, তুমিই আমার পরা গুরু—মহান্ত। আবার তুমিই আমার চক্ষুঃ-অধিষ্ঠিত অধিদৈব রূপ রসমঞ্জরী—চৈত্য গুরু। তোমার কৃপা থাকিলে কে আমায় কৃষ্ণ দর্শনে বঞ্চিত করিবে?"

বলিতে বলিতে জীবসুন্দর ভক্তিজলে অঙ্গ ভাসাইলেন। সেরূপ দেখিয়া হরসুন্দরের চক্ষেও ভক্তিবারি বহিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না। পরে জীবসুন্দর বলিলেন, "বাটীর মেয়েদের ভাব দেখিয়া আজ আমি বড়ই সুখী হইয়াছি, কিন্তু প্রভো! ঐরূপ ভাবে হৃদয় আজও গলিল না কেন? আমার এ ভক্তিহীন পাষাণ হৃদয়ে, তাহার যখন দিব্য অধিষ্ঠান দেখি, তাহার অধিষ্ঠানে যে সুখ—তাহা ভোগ করিবার সময় পাই না, মনে হয়—আমার হৃদয়াসন পাষাণসম হওয়ায়, তাহাতে তাহার কতই না জানি ব্যথা লাগে। সে ভক্তবৎসল, তাই সে, সে ব্যথা উপেক্ষা করিয়াও অধিষ্ঠিত।"

হরসুন্দর সে ভাবে হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বাবা! যে ভক্তিতে কৃষ্ণ বশ, তাহা অহৈতুকী; জীবের অনুভক্তি জ্ঞানকর্ম্মে আবৃত; সেই আবরণ উন্মোচনের জন্যই সাধন; ভক্তিসাধনে ভক্তিই সেবনীয়। সে সেবায় আহারে যেমন দুর্ব্বলতা নষ্ট, এবং শ্রীবৃদ্ধি, তদ্রূপ জ্ঞান, কর্ম্মের পরাভব এবং অহৈতুকী ভক্তির উদয়। অপরাধশূন্য হইয়া নামে ভক্তি কর, হৃদয় গলিল কি না—সে লক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। সে লক্ষ্যে কর্ম্ম,

জ্ঞানেরই বৃদ্ধি হইবে, ভক্তি অহৈতুকী হইবে না। কারণ জ্ঞান, কর্ম্ম দূরীকরণে যে ভক্তিসাধন, তাহা সাধনভক্তি, হেতুশূন্য ভাবে যে ভক্তি-সাধন, তাহাই অহৈতুকী—সাধ্য-ভক্তি।”

আবার অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না, পরে জীবসুন্দর বলিলেন, “সে দিন যোগমায়া আসায় কথা ভঙ্গ হইল, আজ আমি লীলা-স্বরূপের বিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি, এবং জানিতে চাই-- কুণ্ডলিনীর কোন রূপকে কুহকিনী শব্দে নির্দ্দেশ করা হইল?”

হরসুন্দর বলিলেন, “বাবা! দুই দিক রক্ষা করা চাই, পাগল হইলে চলিবে না। চুর ফকির—পূর গৃহস্থ হওয়া চাই, উদাসীন, নিরপেক্ষ হইলে, তাহার ধর্ম্ম-সংসার রক্ষা হয় কৈ? উদাসীনতায় কেবল আত্ম-মঙ্গলই হয়; কিন্তু জগৎ জীব যে কেহই তাহার পর নহে। যখন তাহার পর নহে, তখন তোমার আমার কাহারও পর নহে। যে তাহার মহিমা না জানিয়া—তাহাকে পর করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে, তাহার মহিমা জানাইয়া আপন করাই পরিনিষ্ঠিতের সাধন, এ সাধনা তাহারই সেবা। অতএব ধর্ম্মের সংসার বজায় করিতে যে সংসার দৃষ্টি, তাহা ফেলিলে চলিবে না—সে দৃষ্টি যেন থাকে। কিন্তু যতদিন তোমার আত্ম পর জ্ঞান থাকিবে, অর্থাৎ তুমি যাহাকে পর—অজ্ঞান দেখ, তাহাকে ভগবান যেরূপে দেখেন—যতদিন সেইরূপে না দেখিবে, ততদিন তোমার স্বনিষ্ঠ অবস্থা, স্বনিষ্ঠ অবস্থায় পরিনিষ্ঠিতের কার্য্যে, কাহারও মঙ্গল হয় না, নিজের মাথা নিজেই খাওয়া হয়, অন্যের মাথা ত সে নিজেই খাইয়া রাখিয়াছে! তুমি আর নূতন করিয়া কি খাইবে? তবে সঙ্গে সঙ্গে স্বনিষ্ঠের মাথা খাইতে পার। কিন্তু যদি অহৈতুকী ভক্তি তোমার আশ্রয় হয়, তাহা হইলে এ অনর্থের সম্ভাবনা নাই। তাহাও যেন তোমার ভক্তির সাধন হয়। আমায় যাহা বলিতে বলিতেছ—তাহা বলিতেছি;—

“পূর্ব্বে আমি তোমায় স্বয়ং-রূপ এবং লীলা-স্বরূপের ভেদ বলিয়াছি, স্বয়ং-রূপ একমাত্র, এবং লীলা-রূপ অনন্ত; তন্মধ্যে মুখ্যলীলা-স্বরূপগুলি বলিব—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-রূপ পরতত্ত্ব, সেই স্বয়ং-রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

ষড়ৈশ্বর্য্য যথা ;—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য, এবং সমগ্র যশ। সমগ্র স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে কৃষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম স্বরূপ, অর্থাৎ যেথানে যে স্বরূপ ঐশ্বর্য্য, তাহা ব্রহ্মের অংশ মাত্র। সমগ্র লীলা-ঐশ্বর্য্যে কৃষ্ণ—বলরাম স্বরূপ, অর্থাৎ যেথানে যে লীলা-ঐশ্বর্য্য, তাহা বলরামের চারি পাদ বিভূতির অংশ মাত্র। সেই চারি পাদ বিভূতি যথা ; মাধুর্য্য পরাগত—অভয়, ঐশ্বর্য্য পরাগত—ক্ষেম ; কুণ্ডলিনী পরাগত—অমৃত এবং অপরাগত—জড় ; অর্থাৎ গোলোক, মহাবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, এবং ব্রহ্মাণ্ড। সমগ্র বীর্য্যে কৃষ্ণ—মণি মন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব বিশিষ্ঠ পুরুষ স্বরূপ ; সেই পুরুষ, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশ—অবতার সকল এবং বিভিন্নাংশ, জীব, অর্থাৎ যেথানে যে স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ, তাহা ঐ পুরুষ স্বরূপের অংশ মাত্র। সমগ্র-শ্রীতে তিনি—নারী প্রভাব স্বরূপা। সেই নারীও স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশে পরাস্বরূপা, এবং বিভিন্নাংশে অপরা স্বরূপা ; অর্থাৎ যেথানে যে নারীর অংশ, তাহা সেই নারীপ্রভাবের অংশ মাত্র। সমগ্র জ্ঞানে—তিনি নারায়ণ স্বরূপ, অর্থাৎ যেথানে যে জ্ঞান, তাহা নারায়ণের অংশ মাত্র। সমগ্র বৈরাগ্যে তিনি—গোপেশ্বর স্বরূপ, অর্থাৎ যেথানে যে বৈরাগ্য, তাহা গোপেশ্বরের অংশ মাত্র। সমগ্র যশস্বরূপে তিনি—গুণময়, সেই গুণ দ্বিবিধ, চিৎ এবং অচিৎ, অর্থাৎ যেথানে যে চিৎ বা অচিৎ, তাহা সেই গুণময় স্বরূপের অংশ মাত্র। এই ষড়ৈশ্বর্য্যময় স্বয়ং-রূপেই তিনি, স্বরূপ বিগ্রহ নন্দ-নন্দন—কৃষ্ণ, লীলারূপে তিনি বসুদেব নন্দন—বাসুদেব। সে হেতু সেই স্বরূপ বিগ্রহের স্বরূপ প্রকাশ মূর্ত্তি সকলও স্বয়ংরূপই, কারণ স্বরূপপ্রকাশ মূর্ত্তিতে প্রায়ই মূল রূপের—গুণ, লীলা বা আকারগত কোন ভেদ থাকে না। এই প্রকাশ দ্বিবিধ, স্বরূপ এবং লীলা ; স্বরূপ যথা ;—রাসে এবং মহিষী বিবাহাদিতে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে আকারগত ভেদও দৃষ্ট হয়, যেমন দেবকী নন্দনের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। লীলা যথা ;—আচার্য্য বা গুরু রূপ।

"যেরূপ স্বয়ং-রূপে অভিন্ন হইয়াও লীলায় আকারগত ভেদে

ভিন্ন রূপে দৃষ্ট—তাহাই তদেকাত্ম। তদেকাত্ম দ্বিবিধ—বিলাস এবং স্বাংশ। যেরূপ—স্বয়ং রূপের তুল্য শক্তিধারী—তাহাই বিলাস, যথা ;—বলদেব, বা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ। যাহাতে তদপেক্ষা ন্যূন শক্তির বিলাস, তাহাই স্বাংশ, যথা ;—মৎস্য, কূর্ম্ম ইত্যাদি।

"অনন্ত শক্তিমান স্বয়ং রূপের, একটী মাত্র শক্তির যাহাতে সঞ্চার, তাহাকে আবেশ বলা হয়। এই আবেশ আবার দ্বিবিধ—ভগবদাবেশ, ও শক্তি-আবেশ। ভগবদাবিষ্ট জীবের—ভগবদভিমান, ভগবৎ শক্ত্যাবিষ্ট জীবের—তদ্দাস-অভিমান, যথা ;—ব্যাসদেব, ঋষভদেব ইত্যাদি আবেশ অবতার।

"জীবলীলা হেতু, স্বরূপবৈভবের, মায়া বৈভবে প্রকটনের নাম—অবতার। এই অবতার ত্রিবিধ ;—পুরুষাবতার, গুণাবতার এবং লীলাবতার। পুরুষাবতার তিনটী ;—মায়া ঈক্ষণ কর্ত্তা সর্ব্বান্তর্য্যামী মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই—প্রথম পুরুষ, ইনি মহাবৈকুণ্ঠগত, মহাসংকর্ষণের অংশ—তুরীয় সংকর্ষণ। মায়া ঈক্ষণে মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত। সমষ্টি বিরাটের অন্তর্য্যামী ব্রহ্মার স্রষ্টা, গর্ভোদকশায়ী পুরুষই—দ্বিতীয় পুরুষ, ইনি মহবৈকুণ্ঠগত প্রদ্যুম্নের অংশ। প্রতি জীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষই, পরমাত্মরূপী—তৃতীয় পুরুষ, ইনি মহাবৈকুণ্ঠগত অনিরুদ্ধের অংশ।

"এইরূপ গুণাবতার তিনটী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্র। পালন হেতু ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষই—ব্রহ্মাণ্ডগত সত্ত্ব গুণের আশ্রয় স্বরূপে—বিষ্ণু। যে পুণ্যময় জীব গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি কমল হইতে ব্যেষ্টি-সৃষ্টি হেতু রজোগুণে ভাবিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ইহাকেই জীবকোটি ব্রহ্মা বলা হয়। ব্রহ্মাতে সৃষ্টি শক্তি সঞ্চারিত বলিয়া, তাঁহাকে আবেশ অবতারও বলা হয়। আবেশ অবতারে রজঃ গুণের যোগ হেতু, তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত সাম্য স্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে কালে বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মত্ব স্বীকার করেন, সে কালে আর এ ভেদ স্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতা-পক্ষেই, এইরূপে ভেদ এবং অভেদ জানিতে হইবে। আব্রহ্ম স্তম্ব অবধি ব্রহ্মার

স্থূলদেহ, ঐ স্থূল দেহকেও ব্রহ্মা বলা যায়। ঐ স্থূল দেহের মধ্যে, গর্ভোদকশায়ীর দক্ষিণাঙ্গ সমুত্থিত যে সূক্ষ্ম জীবশক্তিরূপ ব্রহ্মা, তাঁহাকেই প্রজাপতি ব্রহ্মা বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিশেষ অর্থাৎ বিলাস মূর্ত্তি বা কায়ব্যূহরূপ, মহা বৈকুণ্ঠগত পৃথক অহঙ্কার শূন্য সদাশিব অংশ শ্রীশিব, সৃষ্টি লীলায় পৃথক অহঙ্কারে—শম্ভু; গর্ভোদকশায়ীর কূর্চ্চ প্রদেশ হইতে সংহার হেতু তমোগুণে ভাবিত হইয়া শম্ভুর যে সংহার মূর্ত্তির উদয়, তিনিই রুদ্র। কোন কোন কল্পে যোগ্য জীবও রুদ্র পদ প্রাপ্ত হয়। অতএব সদাশিব অংশই—ঈশ্বরকোটি এবং জীবাংশই জীবকোটি শিব। ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা এবং শিব—বিষ্ণুরই অপরমূর্ত্তি বশতঃ বিষ্ণুতে স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও, লীলা হেতু পৃথক অহঙ্কারে —ভেদ। লীলা হেতু এ ভেদ, সে হেতু জীবের তাহা দ্রষ্টব্য না হইলেও, স্বরূপরূপ বিষ্ণুই ভজনীয়, কারণ তাঁহাদের স্বরূপ রূপই—বিষ্ণুরূপ। এবং তাঁহাদের লীলারূপ ভক্ত-তুল্য সেবনায়। কারণ পৃথক বুদ্ধিতে ভগবানই —ভক্তস্বরূপ।

"কল্পে কল্পে এক এক লীলার্থে ভগবানের যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ—তাহাকেই লীলাবতার বলা যায়। যথা; মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন, ব্যাস ইত্যাদি। যে যে মন্বন্তরে তাঁহাদের আবির্ভাব, তাঁহাদের সেই সেই মন্বন্তর অবতার বলা যায়।

"যে মন্বন্তর অবতার, মন্বন্তরের যুগ বিশেষ উপাসনা বিশেষের প্রচার করেন, তাঁহাদিগকেই যুগাবতার বলা হয়। যুগাবতার চারি যুগে—চারি। সত্যে—শুক্ল, ত্রেতায়—রক্ত, দ্বাপরে—শ্যাম, কলিতে—কৃষ্ণ। যুগাবতার—আবেশ, বৈভব, প্রাভব, পরাবস্থ ভেদে—চারি। পরাবস্থই সর্ব্ব শক্তি পূর্ণ, বৈভব তদপেক্ষা ন্যূন, প্রাভব তদপেক্ষা ন্যূন, এবং আবেশ একমাত্র শক্তি বিশিষ্ট। আবেশ যথা; চতুঃসন, নারদ ইত্যাদি। প্রাভব যথা; মোহিনী, হংস, ব্যাস ইত্যাদি। বৈভব যথা; মৎস্য, নরনারায়ণ, বলভদ্র ইত্যাদি, এবং নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ পরাবস্থ।

"যে লীলা-স্বরূপের উল্লেখ করিলাম, সেই লীলা দ্বিবিধ:—প্রকট,

অপ্রকট। প্রপঞ্চের অগোচর যে অনন্ত প্রকাশে নিত্য দেবলীলা—তাহাকেই অপ্রকট লীলা বলা যায়। আর প্রপঞ্চে একই প্রকাশে তাহার যে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমিক নরলীলা—তাহাকেই প্রকট লীলা বলা যায়। জীব এই লীলা-মাহাত্মেই নিত্য লীলার অধিকার পায়।

"জীবের অবস্থা ত্রিবিধ :—বদ্ধ, সাধক ও সিদ্ধ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, লীলা-সত্বের স্বরূপ অব্যক্ত; চিৎ এবং তদাভাস গত বিদ্যা, অবিদ্যা দ্বারে তাহার প্রকাশ। অবিদ্যা দ্বারে সত্ব—অপর, বিদ্যা দ্বারে সত্ব—পর, এবং চিৎ দ্বারে সত্ব—শুদ্ধ স্বরূপে প্রকাশিত। অবিদ্যানিষ্ঠ বদ্ধ জীব-চক্ষে সত্ব—অপর, বিদ্যা নিষ্ঠ সাধক জীব-চক্ষে সত্ব—পর, এবং চিন্নিষ্ট মুক্ত জীব চক্ষে সত্ব—শুদ্ধ। সত্বের এই তিন রূপে অনাদি প্রকাশ হেতু, সত্বের স্বরূপ অব্যক্ত হইলেও, তাহা চিৎ স্বরূপে অবিনশ্বর। এ হেতু চিৎসত্বকে অনাদি অবিনশ্বর বলা হয়। কারণ অচিৎকে কখন কখন চিৎস্বরূপে নীত হইতে শোনা যায়—কিন্তু চিৎ কখন অচিৎ হয় না। এ হেতু সিদ্ধের পতন নাই, কারণ সিদ্ধ, চিদঙ্গ বিগ্রহ। মুক্তের পতন আছে, কারণ—কৈবল্যে বা ব্রহ্ম নির্ব্বাণে চিদচিৎ স্বরূপ, এ হেতু জীব যেরূপে বদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপে আবার বদ্ধযোগ্য; কিন্তু ইহা কেবল বদ্ধ জীব পক্ষে; কারণ ভগবান—বদ্ধ, সাধক, সিদ্ধের—আশ্রয় স্বরূপে নিত্য স্বরূপ সত্বময়। এ হেতু তিনি এ তিন অবস্থা অতীত পুরুষ।

"সম্বন্ধতত্ব বর্ণনে গোলোক, মহাবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ড, বোধ সৌকর্য্যার্থে যেরূপ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত, ভগবান বা সিদ্ধপক্ষে তাহা নহে। এক লীলাসত্বই জীবের পৃথক পৃথক অবস্থায় পৃথক পৃথক স্বরূপে দৃষ্ট। এ হেতু জগৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগৎ। ভগবান এই অনন্ত স্বরূপে নিত্য, এ হেতু তাঁহার অনন্ত স্বরূপের নিত্যত্ব—চিরনিত্য। এ হেতু মায়া, কখন কখন চিৎ পরিণামে, বা নিত্য স্বগত বিশেষাবিশেষ পরিণামে নশ্বর হইলেও, অনাদি অনন্ত জীবের ত্রিবিধ অবস্থার নিত্যত্ব হেতু—অনাদি। কারণ চিদচিৎ উভয়বিধ অনাদি অনন্ত সত্বে প্রকটিত জীবও, অনাদি এবং অনন্ত। সে প্রবাহের আদিও নাই—অন্তও নাই।

এ হেতু জীবকে অনাদি অর্থাৎ নিত্যমুক্ত, নিত্য বদ্ধ বলা হয়। এ হেতু মায়া—অনাদি নশ্বর।

"অতএব স্বরূপগত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই—সেই অনন্তবৈকুণ্ঠ, অনন্ত বৈকুণ্ঠই—সেই অনন্ত মহাবৈকুণ্ঠ, অনন্ত মহাবৈকুণ্ঠই—সেই মাধুর্য্যময় একস্বরূপ অবিচিন্তিত ভগবানের আনন্তের পরিচয়। লীলা ভাবে তাহাই এক এক মহাবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ড। এবং জীবের অবস্থা বিশেষে তাহাই ভেদ, ভেদাভেদ, অভেদ ভাবে দৃষ্ট। সেই অভেদ ভাবে যে নিত্য লীলা—তাহা ভেদ ভাবে দর্শিত হয় না; এ হেতু তাহাকে অপ্রকট লীলা বলা হয়।

"চিদচিৎ-রূপিণী কুণ্ডলিনীগত পর, অপর সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পর, অপর পৃষ্ঠগত আহ্নিক এবং বার্ষিক গতিতে ক্রমিক চিল্লোক প্রদক্ষিণে, যখন যে ব্রহ্মাণ্ডের পর পৃষ্ঠ, সেই চিল্লোকের সম্মুখীন হয়, তাহাতে সেই চিল্লোকের ভেদাভেদ ভাবে যে, নিত্য লীলার প্রকট,—তাহাকেই প্রকট লীলা বলা হয়। এ হেতু অপ্রকট লীলা নিত্য অর্থাৎ আদি অন্ত হীন, এবং প্রকট লীলা আদি, অন্তময় হইয়াও—নিত্য। অতএব প্রকট এবং অপ্রকট লীলা অভেদ, এবং গোলোক, গোকুল অভেদ, কেবল জীবের অবস্থা ক্রমে, তাহার ভেদাভেদ। এ হেতু ভগবান বা তাহার পরিকরবর্গের বিগ্রহ মায়াগত নহে; কারণ কামলরোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষেই, দেহ বা ব্রহ্মাণ্ড হরিদ্রাবর্ণ দেখায়, নীরোগ চক্ষে তাহা যেমন শুভ্রবর্ণ, তেমনি ভগবান বা তাঁহার ভক্ত-চক্ষে, সে সমস্তই—চিৎ। এ হেতু কৃষ্ণের বৃন্দাবনান্যত্রে বিহার নাই। কারণ সে স্বরূপসত্ত্ব-বিগ্রহ-চক্ষে সমস্তই স্বরূপ সত্ত্ব। স্বরূপ সত্ত্বই—বৃন্দাবন।

"জীব-চক্ষে মায়া-দর্পণে সেই অপ্রকট লীলার প্রকট হেতু, মায়া অনুকরণেই সে লীলা প্রকটিত। সে হেতু এই ভেদ যে, অপ্রকট লীলায় যুগপৎ অনন্ত প্রকাশে সে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরময়ী নিত্য লীলার প্রকট—আর প্রকট লীলায় একই প্রকাশে ক্রমিক সে অনন্ত লীলার পরিচয়। এইরূপে ক্রমিক যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে, যে লীলার প্রকট হয়, তখন সে ব্রহ্মাণ্ডের লোক সেই সেই লীলা দর্শনে সক্ষম হয়। দর্পণ

প্রতিফলিত চিত্র যেমন স্বরূপগত হইয়াও, দর্পণ-ধর্ম্মে স্বরূপ বিলক্ষণেই স্বরূপ প্রকাশ করে, অর্থাৎ স্বরূপের দক্ষিণাঙ্গকে বামে, এবং বামাঙ্গকে দক্ষিণে দৃষ্ট করায়, তদ্রূপ. অচিৎ, চিদ্বিমুখ ধর্ম্মেই—যেমন কোন দ্রব্যকে জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিত করিলে তাহা ভঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অচিতের চিৎ হইতে যে বিশেষ ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মে প্রকট লীলার যে, ধাম হইতে ধামান্তরে গমনাগমন বা অসুর সংহারাদি—তাহা মায়া বিশেষ ধর্ম্মেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"এইরূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৃন্দাবন অথবা দ্বারকার অভ্যুদয়। অতএব যাহা নিত্য—তাহা নিত্যই। কেবল জীব চক্ষেই নিত্যানিত্য ভাবে লীলাচক্র ঘূর্ণিত, এবং গোলোক, গোকুলের ক্রমিক চিৎস্থ, ভৌমস্থ। অতএব ভগবান বা তাঁহার পরিকরবর্গ নিত্য বস্তু। জীবে কৃপাহেতু মায়া অনুকরণে তাঁহার জন্মাদি লীলা দৃষ্ট হইলেও, সপরিকর ভগবান কৃষ্ণ—অনাদি নশ্বর মায়াতীত। যেমন কামল-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি শুভ্র, নীল, পীত বর্ণকেও, হরিদ্রা বর্ণেই দৃষ্টি করে, তদ্রূপ মায়ারোগগ্রস্ত ব্যক্তি, স্বপরিকর ভগবৎ-চিদঙ্গ বিগ্রহকেও, মায়াগত সূক্ষ্ম, স্থূল গত বিবেচনা করে।

"জীবের যেরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড-স্থিত বিষ্ণুরও ত্রিবিধ বিরাট শরীর কল্পনা। জীব অবিদ্যায় অস্মিতাভাবে উপাধি লিঙ্গে বদ্ধ। আকাশ গত ধূলিকণা যেমন আকাশকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণু—স্বরূপ বিগ্রহেই বর্ত্তমান। কিন্তু ভ্রান্ত জীব যেমন আকাশকে ধূলিময় মনে করে, তদ্রূপ তাঁহার বিরাট দেহ কল্পনা করে। যোগমায়া-সাহায্যে ভগবানের জন্মাদি লীলা, মায়ার অনুকরণেই হইয়া থাকে; কারণ তাঁহার বিভুরূপে জীব, তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে পারে না, ভক্তি, মান্যেই ভেদভাবে দূরে অবস্থিতি করে। সে ভক্তি মান্য তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর—সামান্য। যাহা অসামান্য—তাহাই প্রেমভক্তি। সেই প্রেমভক্তি, ভেদ ভাবে উদয় হয় না। সেজন্য ভগবান নররূপে অভেদভাবে নরলোকে উদয় হন। অতএব তাঁহার ও তাঁহার পরিকরের সে নররূপও

চিদঙ্গ-বিগ্রহ। সে বিগ্রহে দেহ দেহী, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত কোনরূপ ভেদ নাই। অতএব সে স্বরূপ সর্ব্বাতীত। কাঁচপোকা আক্রমণে যেমন তেলাপোকা কাঁচপোকায় পরিণত হয়, তদ্রূপ অন্তর্ম্মুখ জীবের মনোবুদ্ধিরূপ সূক্ষ্মদেহও বিদ্যায় চিদঙ্গ স্বরূপে নীত হয়। কিন্তু অবিদ্যা-চক্ষু তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এবং তাহাও মায়ার অনুকরণে স্থিত; এ বিধায় তদ্‌গত কার্য্যও মায়াগত বলিয়াই অবিদ্যায় প্রতিভাসিত হয়। স্বরূপ-সিদ্ধিতে স্থূলদেহ বসনের স্বরূপ প্রাক্তন ভোগের অপেক্ষায় থাকে মাত্র। তখন তাহাতে ভক্তের আর দেহবুদ্ধি থাকে না—এহেতু তাহাকে বসন স্বরূপে উল্লেখ করা হইল। স্থূলদেহে অস্মিতা হেতু, যে মন, বুদ্ধি তাহার স্বরূপ হইতে পৃথক সূক্ষ্মদেহরূপে ছিল, তাহা চিৎভাবে চিৎকণ জীবে একীভূত হওয়ায়, তাহাকেই সূক্ষ্ম দেহের ধ্বংস বলা হয়। কারণ তখন অঙ্গ-অঙ্গিভেদ আর থাকে না। এইরূপ সাধন সিদ্ধে ভক্ত দেহও চিদঙ্গস্বরূপ। কোন কোন সময়ে ভগবানের ইচ্ছায় বিদ্যায় সাধনক্রমে, ব্যষ্টি অচিৎ দেহও, চিৎস্বরূপে নীত হইতে শুনা যায়। শাস্ত্রে এজন্য মায়াকে অনাদি নশ্বর বলা হয়। তবে তাহা সাধারণ নহে—বিরল। এজন্য ভগবৎ-স্বরূপে এবং সাধনসিদ্ধ ভক্ত-স্বরূপে প্রভেদ এই যে, ভগবৎ-স্বরূপে অচিৎরূপ বসন থাকে না—কিন্তু ভক্তস্বরূপে মাতালের বসন স্বরূপ ভোগাবসান অবধি সংস্কার দেহ থাকে। থাকিলেও তাহা বসনের স্বরূপ, এহেতু তাহাকে দেহস্বরূপে গণ্য করা হয় না। স্বরূপসিদ্ধ দেহের ভোগাবসানের কাল অবধি, অন্তর, বহির্ম্মুখ গতি থাকে, ভোগাবসানে বহির্ম্মুখ গতির নিবৃত্তিতেই বস্তুসিদ্ধ ভাবের উদয় হয়।”

তখন কমলাকান্ত আসিয়া বসিলেন। হরসুন্দর বলিলেন, “আজ আহারে এত বিলম্ব কেন?”

ক। গুরুদেব আসিয়াছিলেন, তাই একটু বিলম্ব হইল। সে কথা থাক, কি কথা হইতেছিল—আমি আসায় বন্ধ হইল কেন?

হ। কথা আর কি—জীব জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তাই দুই একটা কথা হইতেছিল।

ক। না—না, আমি তোমাদের ভাব বড় বুঝিতে পারি না। তুমি এত বড় পণ্ডিত হইয়া এরূপ কুন ব্যাঙ মত কেন থাক, বুঝিতে পারি না। এইরূপে থাকিলেই কি ধর্ম্ম হয়—নচেৎ হয় না? দশ জনকে উপদেশ দাও, পাঁচ খানা শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ কর—তাহা নহে, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই দেখি। তাহাও না হোক, সংসারের উন্নতিই কর—তাহাও নহে, সে দিকে দৃষ্টিই নাই। এ দিকে পেট চলা ভার। এ কিরূপ—আমরা প্রতিবেশী, তুমি পণ্ডিত হইলেও তোমার ভালর জন্যই বলিতে হয়। ধার্ম্মিক বা কিসে বলিব—কই ধর্ম্ম কর্ম্মত কিছুই করিতে দেখি না। তবে আমরা বুঝি—না—বুঝি, তোমার ভাব খানি বেশ, ভাল—কি বুঝিয়াছ বল দেখি?

হরসুন্দর হাসিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবসুন্দরও মনে মনে হাসিলেন।

ক। হাসিলে চলিবে না। বল দেখি—বড়টী গেল, তাহার খোঁজ খবর লইলে কি? আবার জীবটীকে কোন কাজ কর্ম্মে দিতেছ না, সংসার চলিবে কি প্রকারে? আমার এই জন্যই বলা।

হর। যাহা বলিতেছেন, সকলি সত্য। আমাকে পণ্ডিত বলা বৃথা। আমার এমন কি বিদ্যা আছে, যাহা অপরকে জ্ঞান দিবে। সকলেরই দেখিতে পাই—কিছু কিছু জ্ঞান আছে, তাহাদের জ্ঞান আমার ভাল বোধ হয় না, আবার আমার জ্ঞান তাহাদের ভাল বোধ হয় না। যে যাহা চায় না, তাহাকে তাহা দিতে গিয়া ব্যথিত করিতে ইচ্ছা করি না—তাই আমি কোথাও যাই না। এরূপে—ধর্ম্ম হয়, কি—না হয়, তাহা আমি জানি না। কিসে হয়, তাহারও কিছু ঠিক করিতে পারি নাই। সেজন্য জ্ঞানের দ্বারায় আর জানিতে ইচ্ছা নাই—কৃপাই আমার লক্ষ্য। তবে আমি আর লোককে কি উপদেশ দিব বল দেখি। বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার দ্বারায় আর সংসারের কি উপকার হইতে পারে? বুড়া হইয়াছি, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব মনে করি—কিন্তু মনের আর তাহাতে প্রবৃত্তি

নাই। যাহাদের সুকৃতি আছে, তাহারা ধর্ম্মের অধিকারী—আমি সেজন্য কৃপার পাত্র। জীবকে আমি বসিয়া থাকিতে বলি না, আমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমি করি—সে কারণ আপনার সুখের জন্য, উহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্যে আমি অগ্রসর হইতে পারি না। যদি বলেন, উহার ভালর জন্যই আমার করা উচিত, তাহাও আর আমার ভাল বোধ হয় না। কারণ উহার বয়স হইয়াছে, উহারা সংসার বুঝিয়াছে, আর আমি কেন উহাদের জন্য ব্যস্ত হইব? দেখুন, বুড়া হইয়াছি, এখন আমার যাহার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত, তাহার জন্যই ব্যস্ত হইতে পারি না, তবে অন্যের জন্য ব্যস্ত হইব কি?

তখন নানা কথা উঠিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কমলাকান্ত, কথাপ্রসঙ্গে সংসার-কল্যাণের নিমিত্ত, কোন সময়ে হরসুন্দরকে নানা নিন্দাবাদ ও কোন সময়ে মানদ, অমানী অভিধানে নানা উপদেশ দিলেন।

কমলাকান্ত চলিয়া গেলে জীবসুন্দর, আবার পূর্ব্ব কথা পাড়িলেন। গৃহে কেহ যে আসিয়াছিলেন, বা পূর্ব্ব কথা ভঙ্গে অন্য কথা উঠিয়াছিল, হরসুন্দর বা জীবসুন্দরের হৃদয় দেখিলে তাহা বোধ হয় না।

হরসুন্দর বলিলেন, "জীব! পূর্ব্বে স্বরূপ শক্তির স্বরূপ, এবং লীলা—লীলার চিৎ এবং কুণ্ডলিনী স্বরূপের বর্ণন করিয়াছি। চিৎ যেমন মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্যে—ভেদ, কুণ্ডলিনী তেমনি পর এবং অপর রূপে—ভেদ। চিৎ যেমন স্বরূপসত্ত্বে—মাধুর্য্য, এবং চিৎ লীলাসত্ত্বে—ঐশ্বর্য্য শক্তি, কুণ্ডলিনী তেমনি স্বরূপসত্ত্বে—পর বা পরাশক্তি, এবং অচিৎ লীলাসত্ত্বে অপর বা অপরা শক্তি। লীলারূপে যোগমায়া চিদ্রূপে যেমন মাধুর্য্য, এবং ঐশ্বর্য্যে সত্ত্বাবিলাস মূর্ত্তি মন্ত্রদুর্গা ও মহাদুর্গা, তেমনি চিদচিৎ কুণ্ডলিনী রূপে, পর ও অপর সত্ত্বাবিলাস মূর্ত্তি দুর্গা ও ছায়াদুর্গা।

মন্ত্রদুর্গা ও মহাদুর্গার আশ্রয় যেমন—শ্রীমতী রাধিকা, ও মহালক্ষ্মী, তেমনি দুর্গা ও ছায়াদুর্গার আশ্রয়—মন্ত্রদুর্গা ও মহাদুর্গা।

"মন্ত্রদুর্গা এবং মহাদুর্গা যেমন সত্তা অহঙ্কারে রাধিকা, ও মহা লক্ষ্মীতে —ভেদ, অহঙ্কার শূন্যে—অভেদ, তেমনি দুর্গা ও ছায়াদুর্গা সত্তা অহঙ্কারে মন্ত্রদুর্গা ও মহাদুর্গায়—ভেদ, অহঙ্কার শূন্যে—অভেদ। স্পর্শমণি হইতে যেমন স্পর্শমণির উদ্ভব বা কায়া হইতে ছায়ার উদ্ভব, তদ্রূপ মন্ত্রদুর্গা ঐশ্বর্য্য লীলা হেতু ছায়া রূপে পৃথক হইয়া চিৎ লীলাসত্ত্বে—মহাদুর্গা, এবং দুর্গা—ছায়া রূপে পৃথক ভাবে—ছায়াদুর্গা। চিৎএর ছায়া —চিৎ, ছায়া উপমা মাত্র, অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির, লীলা মূর্ত্তিকে —লীলা এবং লীলার লীলামূর্ত্তিকে—ছায়া বলা হইয়াছে। ছায়া শব্দে আমাদের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ, এতদিন ছায়াকে বস্তু বলিতে অনেকে সন্দিহান হইতেন, এখন ফটোগ্রাফ সৃষ্টিতে, তাহা তবুও বস্তু মধ্যে গণ্য। ছায়া এবং কায়া অভেদ, কায়ার লীলাবিলাস বা কায়ব্যূহ মাত্র। যেমন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের, লীলাবিলাস মূর্ত্তি, বলদেব—গোপেশ্বর, তেমনই রাধিকার লীলা-লীলাবিলাস মূর্ত্তি—মন্ত্র দুর্গা ও চিদচিৎ লীলা বিলাস মূর্ত্তি—দুর্গা। রাধার যেমন লীলা বিলাস—মন্ত্রদুর্গা, মন্ত্রদুর্গার তেমনি—মহাদুর্গা, এবং দুর্গার তেমনি—ছায়াদুর্গা। লীলা হেতু রাধিকার এ লীলা মূর্ত্তি, এহেতু মন্ত্রদুর্গা, দুর্গা—রাধিকায় অভেদ। এ হেতু মহাদুর্গা, ছায়াদুর্গা—মন্ত্রদুর্গা, মহাদুর্গায় অভেদ। কারণ, মন্ত্রদুর্গা ও দুর্গার লীলা অহংকারে, ও মহাদুর্গা, ছায়াদুর্গার যে সত্তা অহংকারে ভেদ ভাব, তাহা কেবল লীলা হেতু, নচেৎ স্বরূপে অভেদ। কারণ লীলাশক্তি, জীবশক্তিগত জীবের ন্যায় তটস্থা নহে—নিত্য মুক্ত। এহেতু ভগবান মায়া নির্দ্দেশে ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন যে, আমায় অবলম্বন করিয়া আমার বাহিরে আমার যে শক্তির স্থিতি, তাহাই আমার মায়া। সেই মায়া দ্বিবিধ;—এক ইচ্ছা, এক সত্তা। ইচ্ছাকে নিমিত্ত এবং সত্তাকে উপাদান বলা হয়। সত্তা দ্বিবিধ;—চিৎ, অচিৎ। ইচ্ছা নিত্য চিন্ময়ী —এজন্য চিৎ সত্তায়—তাহাকে ভেদ করা যায় না। অচিৎ সত্তায়, তিনি নিমিত্ত ভাবে ভেদ, এ হেতু ইচ্ছাকে ছায়া এবং অচিৎকে তম

নির্দ্দেশ করতঃ দ্বিবিধ প্রকারে পরিচয় দিয়াছেন। আভাস এই ছায়ারই বৃত্তি, এহেতু ছায়া এবং আভাসের একই পর্য্যায়। ছায়া যেমন কায়াতেই অবলম্বিত থাকে, সে রূপ মহাদুর্গা এবং ছায়াদুর্গা, মন্ত্রদুর্গা এবং দুর্গায় অবলম্বিত।

"যখন সূর্য্য ঠিক কায়ার মাথার উপর, তখন যেমন ছায়া, কায়ার বাহিরে দৃষ্ট হয় না, সূর্য্যের একটু ইতর বিশেষে ছায়ারও ইতর বিশেষে বাহিরে প্রকাশ, লীলাশক্তি যোগমায়ার যে অবস্থায় ছায়া, কায়া মধ্যেই স্থিত, তাহাই চিৎ শক্তি—মন্ত্রদুর্গা, যে অবস্থায় ছায়ার, কায়ার বাহিরে প্রকাশ—তাহাই পরাশক্তি দুর্গা। লীলা হেতু যোগমায়ার এ দ্বিবিধ স্বরূপই নিত্য।

"দুর্গা হইতে ছায়ামায়ার প্রকট, সেই ছায়ামায়াই অচিৎ প্রকটয়ত্রী হেতু, অচিৎ লিপ্তা। দুর্গা অবলম্বনেই তাঁহার স্থিতি, এ হেতু দুর্গাকে পরাশক্তি বলা হয়। লীলা হেতু মন্ত্রদুর্গা হইতে যে ছায়ার প্রকট, তাঁহাকেই—মহাদুর্গা, এবং দুর্গা হইতে যে ছায়ার প্রকট, তাহাকেই—ছায়া দুর্গা বা ছায়ামায়া বলা হয়। ছায়া যেমন কায়া হইতে ভূমিতে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ মহাদুর্গা চিৎ লীলাসত্বে, ছায়াদুর্গা অচিৎ লীলা সত্বে প্রতিফলিত। সত্বে প্রতিফলন হেতু, ছায়ার দুইটী অহঙ্কার; একটী স্বরূপ এবং একটী সত্ব। স্বরূপ অহঙ্কারে তিনি স্বরূপে—অভেদ, সে কারণ কায়ার ইচ্ছাতেই তাঁহার ইচ্ছা এবং স্বরূপে সত্ব অহঙ্কার না থাকায়, তাঁহাতেও সে অহঙ্কার স্থান পায় না। সত্ব অহঙ্কারে তিনি—ভেদ, কারণ স্বরূপে সে অহঙ্কার নাই। এ বিধায় মহাদুর্গা বা ছায়া দুর্গা স্বরূপে, মন্ত্রদুর্গা বা দুর্গায়—অভেদ, এবং সত্ব অহঙ্কারে—ভেদ। ছায়াদুর্গা স্বরূপ অহঙ্কারে পরাশক্তিগত বিদ্যা বৃত্তিতে—অচিৎ গুণে নির্গুণ, এবং স্বগুণ ভাবে দ্বিবিধ। নির্গুণ ভাবে পরবিদ্যা, সগুণ ভাবে বিদ্যাবৃত্তিতে—মহাবিদ্যা, অবিদ্যা বৃত্তিতে—যোগনিদ্রা, এবং অপরসত্বে—প্রধান রূপা ত্রিগুণা প্রকৃতিশক্তি।

"পরবিদ্যা স্বরূপ, ছায়াগত হইলেও, সে ছায়া নির্গুণে স্বরূপেরই বাহ্য রূপ রূপে, স্বরূপেই অবস্থিতি করে, এ হেতু তাঁহাকে ছায়া পর্য্যায়ে

নির্দ্দেশ করা হয় না। কারণ তমেই ছায়া, স্বগুণে ভেদ ভাবে থাকে, এবং স্বরূপে যে সৌন্দর্য্যরূপ ছায়ার বিকাশ, তাহা অভেদ ভাবেই থাকে, তবে বর্ণনায় ভেদ মাত্র।

"দ্বিতীয়ের দ্বারা অভিভূত অবস্থাই নিদ্রা, দ্বিতীয়কে অভিভূত করিয়া স্ব প্রকাশ ভাবকে জাগ্রৎ বলা হয়। সগুণ ভাবে বিদ্যাবৃত্তিতে ছায়া দুর্গাস্বরূপ অহঙ্কারে ভগবৎ জীবলীলা ইচ্ছাশক্তি রূপে—মহাবিদ্যা। অবিদ্যা এবং ত্রিগুণ প্রতিভাস অহঙ্কারে—যোগনিদ্রা। নিদ্রা বৃত্তি অবিদ্যায় আবৃত ভাবে, অবিদ্যা অহঙ্কারে তাঁহার স্বরূপঅহঙ্কার নিদ্রিত ভাবে থাকে, এইজন্য তাঁহাকে যোগনিদ্রা বলা হয়। জীব যেমন নিদ্রায় তম আবরণে জড়স্বরূপা হইলেও, তত্বত সে চিৎই থাকে—যেরূপ জড় হয় না, তদ্রূপ যোগনিদ্রা ত্রৈগুণ্য না হইয়াও ত্রিগুণ প্রতিভাসে চিৎকার্য্যে জড়া, এ হেতু শাস্ত্র তাঁহাকে জড়া বলেন। অচিৎ লিপ্তা সগুণাবশতঃ ইনি জড় কার্য্যে ভগবৎ চেষ্টারূপা কালশক্তি ও জড়া প্রকৃতির শক্তিরূপা স্বভাবশক্তি। এ হেতু ত্রিগুণের ন্যায় জড়া না হইলেও, পরাশক্তি হইতে ভেদ ভাবে অবস্থিতি করেন। এজন্য ইহাঁকে অপরাশক্তি বলা হয়। এই অপরাশক্তিকেই বহিরঙ্গা মায়া, জীবশক্তিকে তটস্থা মায়া এবং পরা বা চিৎশক্তিকে অন্তরঙ্গা মায়া বলা হয়।

"যখন যোগনিদ্রা জড়া অবিদ্যায় অভিভূত, তখন যোগনিদ্রা অবিদ্যারূপিণী কাম্যফলদায়িনী জড় অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া বা নিদ্রিত কুণ্ডলিনী। ইনিই ভগবৎ কালশক্তি। যখন ত্রিগুণে যোগনিদ্রা অভিভূত, তখন লৌহ যেমন অগ্নি-যোগে অগ্নি-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ অচিৎ ঐ স্বভাবশক্তি লাভে জগৎ কারণ প্রকৃতিশক্তি।

সাধারণ যাহাকে মায়া বলেন, সে মায়া যোগনিদ্রারই নামান্তর। মায়া শব্দে ঈশ্বর শক্তি মাত্রকেই বুঝায়, সে জন্য নির্দ্দেশ হেতু, এক এক বিশেষণে তাহাকে বিশেষিত করা হয়। যে মায়া উপাদানশক্তিরূপে—তাঁহাকে স্বভাব, যে মায়া অহংতত্ত্ব রূপা—তাঁহাকে অবিদ্যা, যে মায়া মহত্তত্ত্বরূপা—তাঁহাকে মহামায়া; মহত্তত্ত্ব, অবিদ্যা এবং উপাদান প্রধানের সমাহার—এ হেতু যোগ নিদ্রা বা মায়ায় দুইবৃত্তি অবিদ্যা

এবং প্রধান। যে মায়া অবিদ্যা অহঙ্কারে মহত্তত্ত্ব প্রসবিনী—তাঁহাকে যোগনিদ্রা; যে মায়া বিদ্যা হইতেও মহান, অবিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপা —তাঁহাকে মহাবিদ্যা, যে মায়া মহাবিদ্যা হইতেও পর—তাঁহাকে পরবিদ্যা; যে মায়া পরবিদ্যার স্বরূপ—তাঁহাকে পরাশক্তি; যে মায়া অচিৎ নির্লিপ্ত, তাঁহাকে চিৎশক্তি বা চিন্মায়া বলা হয়। অতএব এক শক্তিই বদ্ধজীবের অবস্থা ভেদে নানা ভাবে লক্ষিত। চিৎ চক্ষে চিৎ-স্বরূপেই লক্ষিত হয়। কারণ লীলা বা ইচ্ছা শক্তি, নিত্য চিৎস্বরূপা। লীলা হেতু জড়াবরণ ইত্যাদি। সে হেতু জড় চক্ষে—জড়স্বরূপা। ছায়াদুর্গা যেমন পরবিদ্যারূপে জাগ্রৎ, মহাবিদ্যারূপে স্বপ্নবৎ—জাগ্রত, নিদ্রিত এবং যোগনিদ্রা রূপে নিদ্রিত—তেমনি বদ্ধজীবেরও তিন অবস্থা।

"চিৎসত্ত্ব যেমন চিৎ অহঙ্কারে জাগ্রত, এবং চিৎ অহঙ্কার যেমন চিৎ সত্ত্বে নিদ্রিত, তেমনি অগ্নিরূপা অচিৎ অহঙ্কারে, লৌহস্বরূপ অচিৎ সত্ত্ব অগ্নিস্বরূপে জাগ্রত, এবং অচিৎ অহঙ্কার, অচিৎ সত্ত্ব আবরণে, অগ্নি যেমন ভস্মে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ নিদ্রিত। অচিৎ অহঙ্কারকে অগ্নির স্বরূপ বলিবার কারণ এই যে, অহংতত্ত্ব অবিদ্যার পরিণতি এবং পঞ্চভূত গত স্থূল—অচিৎসত্ত্ব পরিণতি। অহংতত্ত্ব আভাস গত, আভাস চিৎগত, এহেতু অহংতত্ত্ব জড় পক্ষে অগ্নিস্বরূপ। অতএব বৈকুণ্ঠের যেমন জাগ্রৎ, নিদ্রিত ভাব, ব্রহ্মাণ্ডের তেমনি জাগ্রত, নদ্রিত ভাব।

"চিৎ সত্ত্বের যেমন চিৎ অহঙ্কার অবিভূতে জাগ্রত ভাব, এবং চিৎ অহঙ্কারের চিৎসত্ত্বে অবিভূতে নিদ্রিত ভাব, এবং সেই নিদ্রা ভাবের হ্লাদিনী, সম্বিৎ, সন্ধিনী প্রভাবে তাহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুপ্ত ভাব, তেমনি প্রধানের সত্ত্ব, রজঃ, তমের প্রাধান্যে তিনটী অবস্থা। সত্ত্বপ্রাধান্যে জাগ্রৎ, রজঃ প্রাধান্যে স্বপ্নবৎ, এবং তমঃ প্রাধান্যে নিদ্রিত।

"ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি দশায়, জীব অস্মিতায় নিদ্রিতভাবে বদ্ধ; কাম্য পূজায় তন্ত্র, মন্ত্রে ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের অবিদ্যা অহংতত্ত্বের উদয়ে, জীবের যে অবিদ্যাগত সত্ত্বে জাগরণ,

তদগত চক্ষে, জড় অধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার সাক্ষাতে ভুক্তি, সিদ্ধি লাভ। মহামায়ারূপে ইনি নিত্য—কাম্যদানে জীবকে জগজ্জালে বদ্ধ করতঃ নানা যোনি ভ্রমণ করান।

"এইরূপ পরবিদ্যারূপিণী কুণ্ডলিনী সঞ্চারে, পরাশক্তিতে পরবিদ্যার স্থিতির ন্যায়, পরবিদ্যায়, পরবিদ্যার বাহ্যস্বরূপে, মহাবিদ্যা উদিত হইয়া, মহা মহা জড়াতীত ঐশ্বর্য্যে, জীবকে অহৈতুকী ভক্তিতে বঞ্চিত করেন। এইজন্য পরবিদ্যার নির্ব্বিশেষ বৃত্তি এবং মহাবিদ্যাকে—মহাকুহকিনী বলা হয়। কারণ ত্রিগুণধারিণী অবিদ্যাময়ী মহামায়া হইতেও—ইহাঁদের মায়া মহান। এইজন্যই বলিতেছিলাম—সাবধান! ইহাঁদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে, জ্ঞানে মায়া বাগুরা ভেদ—সে কেবল মনের কল্পনা। কারণ পরবিদ্যা যেমন একদিকে চিজ্জগতের প্রতিভাসে, স্ববিশেষ, তেমনি আর দিকে চিজ্জগৎ-বহির্ম্মণ্ডল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিভাসে—নির্ব্বিশেষ। সেইরূপ মহাবিদ্যা—একদিকে অবিদ্যা-জাগ্রৎ, অনন্ত জড়বিলাসময়ী কালরূপা কালীর সত্ব, রজঃ, তমঃ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এবং স্বগত যোগনিদ্রা ভাবে যে দশবিধ মূর্ত্তি—স্বরূপ অহঙ্কারে তৎপ্রতিভাসে স্বগুণ ভাবে—কালী, তারা, ইত্যাদি দশমহা-বিদ্যারূপে অতি স্থূল, আর দিকে অতি সূক্ষ্ম পরমাত্ম-প্রতিভাসে অতি সূক্ষ্ম। ইনি স্থূলরূপে মহা মহা ঐশ্বর্য্যে ভুক্তি, সিদ্ধিদানে বা দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মরূপে জীবকে কৈবল্য দানে, সাধনে ভক্তিযোগ-সাধককেও অহৈতুকী ভক্তিতে বঞ্চিত করতঃ অট্ট অট্ট হাসে নৃত্য করেন। কিন্তু যিনি শিব ভাবে, সেই মহা মহা ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা কৈবল্য রূপ মুক্তি-বৈরাগ্যে কৃষ্ণভক্তিতেই স্থিতি করেন, শিবে অভেদ বশতঃ মহাবিদ্যা তাঁহাকে স্ববাগুরা হইতে মুক্তিদান, এবং পরবিদ্যার নির্ব্বিশেষ অতিক্রমে, স্ববিশেষ ভক্তিদানে ভগবদ্দর্শনে উন্মুখ করাইয়া কৃতার্থ করেন। তখন জীব দেখিতে পায়, সিদ্ধজীব যেমন বহির্ম্মুখে অবিদ্যা দ্বারে কার্য্য করিয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত ভাবে—চিৎ স্বরূপা, তদ্রূপ মহাবিদ্যাও জড় দ্বারে কার্য্য করিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে—চিৎস্বরূপা। মুক্ত জীবের সে কার্য্য যেমন অবিদ্যা গত চক্ষে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ চিৎ

স্বরূপের জড় কার্য্য, জড়ের কার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। সেই জড় চক্ষে কৃষ্ণ বিমুখ জীবই তাঁহাকে মহাবিদ্যা দেখে, নচেৎ ভক্ত-চক্ষে তিনি —পরবিদ্যা। যাদু শিক্ষকের নিকট যাদুকর, যেমন যাদু দেখাইতে কুণ্ঠিত হয়, দেখাইলেও যেমন তাহাতে নূতনত্ব কিছুই থাকে না, সেরূপ মহাবিদ্যা ভগবৎ বা ভক্ত পক্ষে অবিদ্যারূপে কুণ্ঠিত থাকিয়া, পরবিদ্যা রূপেই স্থিতি করেন, কারণ ঈশ্বর শক্তি যুগপৎ সর্ব্ব-মূর্ত্তিতেই নিত্য স্থিত।

"স্বরূপ শক্তিতে যেমন ভগবৎস্বরূপ, মাধুর্য্য শক্তিতে গোলোকস্বরূপ, ঐশ্বর্য্য শক্তিতে মহাবৈকুণ্ঠ, তদ্রূপ কুণ্ডলিনী গত শক্তিতে—বিষ্ণু লোক, পরাশক্তিতে—শ্রীশিবলোক। শ্রীশিবলোক, বিষ্ণুলোকেরই বহির্ম্মণ্ডল। এজন্য তাহার বিষ্ণুলোক মধ্যেই গণনা। পরবিদ্যায় এবং মহাবিদ্যায়—শিব বা শম্ভুলোক। মহাবিদ্যায় এবং যোগ নিদ্রায়—ব্রহ্মলোক। এ হেতু শিব সগুণ, নির্গুণে নিত্য জাগ্রৎ, ব্রহ্মার জাগ্রৎ নিদ্রিত ভাব। বৈকুণ্ঠ—বিষ্ণুলোকেরই নামান্তর। কৃষ্ণের যেমন গোলোক, মহাবৈকুণ্ঠে খেলা, বিষ্ণুর তেমনি শিবলোক, ব্রহ্মলোকে খেলা। কৃষ্ণ যেমন মাধুর্য্যে নন্দনন্দন, ঐশ্বর্য্যে বসুদেব-নন্দন, বিষ্ণু তেমনি শিবলোকে গর্ভোদকশায়ী, ব্রহ্মলোকে ক্ষীরোদকশায়ী। নন্দনন্দন এবং গোলোকে যেমন লীলা হেতু ভেদ, বসুদেব নন্দন এবং দ্বারকায় যেমন লীলা হেতু ভেদ, তেমনি গর্ভোদকশায়ী ও গর্ভোদক, এবং ক্ষীরোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকে ভেদ। কৃষ্ণই যেমন নন্দনন্দন এবং বসুদেবনন্দন, দ্বিতীয় ব্যূহগত অংশ—মহাবিষ্ণুই তেমনি গর্ভোদক, ক্ষীরোদক—বিষ্ণু। কৃষ্ণ এবং শ্বেতদ্বীপ যেমন লীলাহেতু ভেদ, তদ্রূপ মহাবিষ্ণু এবং কারণার্ণবে ভেদ। চিল্লীলায় বলদেব যেমন—মূল সংকর্ষণ এবং উচ্ছলিত ভাবে লীলাসত্বে—মহাসংকর্ষণ, জড় লীলায় তেমনই শিব—শম্ভু এবং জড়সত্বে শম্ভুই—লিঙ্গরূপী। ঘটের প্রকাশে যেমন ঘটাকাশের প্রকাশ, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রকটে—গোলোক, মহাবৈকুণ্ঠের ন্যায় নিত্য, অসৃজ্য—বৈকুণ্ঠের প্রকাশ।

"অতএব উপাসনা ভেদে এক কুণ্ডলিনী—রমারূপা চিৎশক্তি, উমারূপা পরাশক্তি, ছায়াদুর্গা গত পরবিদ্যা, মহাবিদ্যা, যোগনিদ্রা,

মহামায়া রূপিনী। মহাবিদ্যা যেমন যোগনিদ্রা দ্বারে জীবকে অপর ত্রিগুণ সত্ত্বে প্রকট করেন, তেমনই পরবিদ্যা, পরাশক্তি দ্বারে জীবকে পরসত্ত্বে প্রকট করেন। সে প্রকটে জীব পরাশক্তিতে চিল্লোক দর্শন করে। পরাশক্তি দ্বারে চিৎ সত্ত্বে প্রকটে, জীব চিল্লোকে স্থিত হয়। এইজন্য পরবিদ্যার সঞ্চারকে কুণ্ডলিনী সঞ্চার বলা হয়। যখন ভক্তি সিদ্ধিতে চিৎ শক্তির সঞ্চার, তখনই হ্লাদিনী সঞ্চার বলা হয়। যেমন যৌবনে প্রেমের সঞ্চার, তেমনই পরাশক্তিতে যৌবনে হ্লাদিনী সঞ্চার। কুণ্ডলিনী সঞ্চারকেই—দ্বিতীয় জন্ম, এবং হ্লাদিনী সঞ্চারকেই—তৃতীয় জন্ম বলা হয়। দ্বিতীয় জন্মে মহাবিদ্যা জয়ে—স্বরূপ-সিদ্ধি, তৃতীয় জন্মে, প্রেমে—বস্তু-সিদ্ধি।

"এই জন্যই সাধু বলেন ঃ—

"প্রথম জনম মাতা পিতার ঔরসে।
দ্বিতীয় জনম সিদ্ধ কৃষ্ণনাম রসে॥
তৃতীয় জনম তার বস্তু সিদ্ধি ভাব।
হ্লাদিনী কৃপায় যবে প্রেম ভাব লাভ॥"

অথবা ঃ—

"মানুষ মানুষ, ত্রিবিধ মানুষ
মানুষ বাছিয়া লহ।
অযোনিজ, স্বযোনিজ,
সংস্কারজ কেহ॥"

"পরবিদ্যা দ্বারে পরাশক্তিতে, চিৎসত্ত্বে জন্ম—অযোনিজ, মহাবিদ্যা দ্বারে পরবিদ্যাতে, পরসত্ত্বে জন্ম—স্বযোনিজ, কারণ কুণ্ডলিনীই ভগবানের স্থাবর, জঙ্গম যোনি স্বরূপা। মহাবিদ্যা দ্বারে যোগ নিদ্রাতে, অপরসত্ত্বে জন্মই—সংস্কারজ।

"অতএব মহাবিদ্যাই জড়-ঐশ্বর্য্য শক্তিস্বরূপিণী। ইহাঁরই—এই ব্রহ্মাণ্ড খেলা। কুণ্ডলিনী সঞ্চারে এই মহাবিদ্যা রূপা মহাকুহকিনীর হস্ত হইতে না এড়াইতে পারিলে—পরারূপিণী হ্লাদিনীর সন্ধান হয় না।

"এই চিৎ অহঙ্কারময়ী কুণ্ডলিনী রূপা পরবিদ্যা অতি স্বচ্ছ। ইহাতে

গোলোক, মহাবৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগত—কারণ, গর্ভোদক, ক্ষীরোদক নামক —বৈকুণ্ঠ, শিবলোক ও ব্রহ্মলোকের যে আভাস, সেই প্রতিভাসে ইনি তৎ তৎ শক্তি স্বরূপিণী, এইজন্য ইনি সর্ব্বতেজে তেজোময়ী। কৃষ্ণতেজে —রাধিকা স্বরূপা, নারায়ণ তেজে—মহালক্ষ্মী স্বরূপা, বিষ্ণু তেজে—রমা স্বরূপা, শ্রীশিব তেজে—উমা স্বরূপা, শম্ভুতেজে ইনিই স্বগুণে—মহাবিদ্যা। প্রজাপতি ব্রহ্মায়—সাবিত্রী ইত্যাদি অনন্তরূপিণী। সপ্ত প্রতিভাসে ইনি ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত শক্তিরূপা হইয়া ব্যষ্টি ভাবে প্রতি দেহে চিৎকুণ্ডলিনী স্বরূপে, সপ্ত পদ্মে বিরাজিত। কারণ শক্তি যুগপৎ সর্ব্ব রূপেই নিত্য। মহাবিদ্যাগত সেই সপ্ত পদ্ম, যে সূত্র নালে বিরাজিত, তাহাকেই সুষুম্না নাড়ী বলে। এই সুষুম্না নাড়ী অধঃ ঊর্দ্ধ ভাবে মূলদেশ হইতে সহস্রারে লম্বমানা। এই মূলপদ্মকে—মূলাধার, দ্বিতীয় পদ্মকে—স্বাধিষ্ঠান, তৃতীয় পদ্মকে—মণিপুর, চতুর্থ পদ্মকে—অনাহত, পঞ্চম পদ্মকে—বিশুদ্ধাখ্য, ষষ্ঠ পদ্মকে—দ্বিদল, এবং সপ্তম পদ্মকে—সহস্রার বলা হয়। সপ্তম পদ্মই এই ষট পদ্মের আশ্রয় স্বরূপ, এ হেতু ষট পদ্মেরই গণনা। সুষুম্না নাড়ী যোগনিদ্রাগত, এ হেতু তাহা অপরসত্ত্ব গত হইলেও, তদ্‌গত নির্লিপ্ত প্রতিভাস—পরসত্ত্ব গত। ভক্তি-মার্গে পরাশক্তিতে এই সহস্রারে গোলোক লীলার অভ্যুদয়। জ্ঞান-যোগ-মার্গে সহস্রারে ইনিই মহাবিদ্যারূপে কৈবল্যদায়িনী—চিৎকুণ্ডলিনী। ষটচক্র, এই ষটপদ্মেরই নামান্তর। এই ষটপদ্মের বা চক্রের ভক্তিমিশ্র জ্ঞানগত সমাধি যোগকে—ষড়ঙ্গ যোগ বলা হয়। মহাবিদ্যা সেই এক এক চক্রে, এক এক যোগিনী রূপে, এবং শম্ভু এক এক ভৈরব রূপে, অণিমাদি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। কিন্তু ভক্তিরূপিণী পরবিদ্যায়, অচিৎ সম্বন্ধ না থাকায়—তিনি নির্গুণা। এইরূপে পিঙ্গলায় বিদ্যা, এবং ঈড়ায় অবিদ্যার স্থিতি। পিঙ্গলা এবং ঈড়া, এই সুষুম্না আলিঙ্গনে পদ্মে পদ্মে আকৃষ্টা। এইজন্যই সুষুম্নাকে অনাময় ব্রহ্মদ্বার বলা হয়। এই অনাময় দ্বার মধ্যে মহাবিদ্যাই বিশাখ্যা এবং বিশাখ্যা মধ্যে পরবিদ্যাই বিচিত্রা। অতএব বিশাখ্যা এবং বিচিত্রা জ্যোতিষ্মতী নাড়ী। সুষুম্না, অগ্নিস্বরূপা, পিঙ্গলাই তাহার জ্যোতিঃ, সূর্য্যস্বরূপা এবং ঈড়া সেই তেজ

বহনে চন্দ্রস্বরূপা। বিদ্যাই—পিঙ্গলা রূপে নিবৃত্তি মার্গ, অবিদ্যাই—ঈড়া রূপে প্রবৃত্তিমার্গ।

"কুণ্ডলিনীই বাক্য অধিষ্ঠাত্রী শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপা। এজন্য শব্দ ব্রহ্ম সগুণে ও নির্গুণে স্থূল, সূক্ষ্মে দ্বিবিধ।

"সূক্ষ্ম—স্বরূপ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনে চতুর্ব্বিধ। যথা ঃ—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। নির্গুণা পরাবিদ্যাস্বরূপে, যাহাতে শব্দ ব্রহ্মের সমাধি, অর্থাৎ যাহাতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনের লয়—তাহাই ব্রহ্মরূপা পরা। যাহাতে শব্দ ব্রহ্মের উদয়, অর্থাৎ মহাবিদ্যায় সগুণ ধ্বনি স্বরূপে, তাহার প্রাণে যে অভিব্যক্তি—তাহাই পশ্যন্তী, যোগনিদ্রায় তাহার প্রণব রূপে মনে যে অভিব্যক্তি,—তাহাই মধ্যমা, এবং মহামায়ায় কণ্ঠে 'ক, খ' রূপে যে শব্দ পরিণতি—তাহাই বৈখরী।

"এই শব্দ দ্বারে জীব, জ্ঞান মার্গে শব্দের চতুর্ব্বিধ স্থিতির, নির্গুণ ভাব সঙ্গে, নির্গুণে ষটচক্র ভেদে, অনাময়ত্ব লাভ করে। কিন্তু ভক্তি-যোগে এ ষটচক্র বা ষড়ঙ্গ যোগের প্রয়োজন হয় না। কারণ কৃষ্ণ মন্ত্রে পরাবিদ্যার সঞ্চারে, সে অনাময়দ্বার—বা ষটচক্র আপনিই ভেদ হইয়া যায়। হইলে—সেই পদ্মগত প্রতিভাসে তাহার যে সাধন, তাহা অহৈতুকী। জড়, পদ্মগত নহে। এই চিৎ প্রতিভাস—পদ্মগত, পদ্ম,—ইন্দ্রিয় গত, এহেতু সেই ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলা হয়। এ হেতু সাধন ভক্তিও নির্গুণা।

"জীব যেমন চিৎকণ হইয়াও, অবিদ্যার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে—জাগ্রৎ, স্বপ্নবৎ, নিদ্রিত—তদ্রূপ জড়ে, মহাবিদ্যার তিনটী অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রতিভাসে জীবের যেমন এতিন ভাব, নচেৎ জীবের এ তিন ভাব যেমন স্বরূপগত নহে, মহাবিদ্যার তদ্রূপ এ ভাব স্বরূপগত নহে। স্বরূপে তিনি পরারূপিণী হইয়াও লীলা হেতু তাঁহার এ তিন ভাব। জীবেরও এ তিন অবস্থা সেইরূপ হইলেও, জীব পরাভাবে নীত হইতে পারে না—ইহাই তাহার বদ্ধতা। মুক্ত অবস্থায় ভোগাবসান হেতু, যখন সে কখন অন্তর্ম্মুখে কখন বহির্ম্মুখে অবস্থিতি করে, তখন যেমন তাহাকে সিদ্ধ মধ্যে গণনা করা হয়, তেমনি

মহাবিদ্যা নিত্যা সিদ্ধশক্তি মধ্যে গণ্যা। এজন্য সিদ্ধবিদ্যা—মহাবিদ্যারই নামান্তর। বস্তু সিদ্ধিতে ভগবৎপার্ষদ অবস্থায়—জীব যেমন ভগবৎ স্বরূপেই বদ্ধ জীব চক্ষে লক্ষিত—তদ্রূপ মহাবিদ্যা, স্বরূপে গোপী ভাবে, ঈশ্বরী শক্তি রূপে মান্যা।

"বদ্ধ জীব যেমন ত্রিগুণের জাগ্রতে—জাগ্রৎ, স্বপ্নে—স্বপ্নবৎ, নিদ্রায় নিদ্রিত, কিন্তু সিদ্ধ ভক্ত যেমন এ তিন অবস্থাতেই জাগ্রৎ, তেমনি মহাবিদ্যা এ তিন অবস্থাতেই জাগ্রৎ ভাবে সত্ত্ব, রজঃ, তম অধিষ্ঠাত্রী। সিদ্ধ ভক্তের সেই অবস্থা যেমন প্রাক্তন ভোগ অপেক্ষা মাত্র, তদ্রূপ মহাবিদ্যার কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা মাত্র।

"ছায়ামায়া বা ছায়াদুর্গা যে বিদ্যা বৃত্তিতে—পরবিদ্যা—মহাবিদ্যা এবং জাগ্রৎ যোগনিদ্রা স্বরূপা—সেই বিদ্যা পঞ্চপর্ব্বা। সেই পঞ্চ পর্ব্ব যথা :—তপঃ, বৈরাগ্য, যোগ, সাঙ্খ্য বা জ্ঞান, এবং ভক্তি। বিদ্যা—পরবিদ্যার অন্তর্ম্মুখে—ভক্তিরূপা, বহির্ম্মুখে—নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপা ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যার অন্তর্ম্মুখে—বৈরাগ্যরূপা, বহির্ম্মুখে—যোগরূপা, এবং জাগ্রৎ যোগনিদ্রা বা কুণ্ডলিনী সঞ্চারে—তপোরূপিণী।

"জীব চিৎকণ। সেই চিৎকণগত অনুসন্ধিনী তাহার—অনুচৈতন্য, অনুসম্বিৎ তাহার—অনুজ্ঞান, অনুসহ্নিনী তাহার—অনুআনন্দ। এই জ্ঞানই নিদ্রিত অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যার প্রতিভাসে অবিদ্যারূপা।

"যখন বিদ্যাবৃত্তির কার্য্য আরম্ভ হয় অর্থাৎ কুণ্ডলিনী সঞ্চারে, বিদ্যার তপোবৃত্তির প্রতিভাসে তাহার জ্ঞানও—তপোময়ী হয়, বৈরাগ্য-বৃত্তি-প্রতিভাসে তাহার জ্ঞানও—বৈরাগ্যরূপা হয়। যোগ বৃত্তিতে—যোগময়ী, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে—ব্রহ্মময়ী, এবং সবিশেষ জ্ঞানরূপা গুহ্যবিদ্যা বা ভক্তি বৃত্তিতে—ভক্তি রূপিণী হয়। এই ভক্তিবিদ্যাতেই ভগবৎ সন্ধান হয়।

"এই পঞ্চ বৃত্তিতে বিদ্যা, এক এক বৃত্তি প্রাধান্যে, অনন্ত হৃদয়ে অনন্ত উপাসনা ভেদে—অনন্ত রূপিণী। শ্রেণীবদ্ধে সেই শক্তি, জ্ঞানীর—ব্রহ্ম, যোগীর—যোগ, বৈরাগীর—বৈরাগ্য, তাপসের—তপঃ এবং ভক্তের ভক্তি শক্তি। পঞ্চ উপাসনা মার্গে—শৌরের ভাস্কর শক্তি, শৈবের—শাম্ভবী শক্তি, গাণপত্যের—জ্ঞানশক্তি, বৈষ্ণবের—বৈষ্ণবী শক্তি,

শাক্তের—বিদ্যা শক্তি, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বেদমাতা—গায়ত্রী শক্তি, কুলাচারীর—কুণ্ডলিনী শক্তি ইত্যাদি।

"অঙ্গ যেমন অঙ্গী ভিন্ন ফল দিতে পারে না—তদ্রূপ ভক্তি ভিন্ন সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ ফল দিতে পারে না। এই জ্ঞান, ভক্তিতেই ত্রিবিধ যোগ নিষ্পাদ্য হয়। সেই ত্রিবিধ যোগ:—জ্ঞান, সমাধি, ভক্তি। কর্ম্ম ত্যাগই—সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মই—কর্ম্মযোগ, কর্ম্মযোগে—চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধিতে—জ্ঞানের উদয়, জ্ঞানোদয়ে—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনগত নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ—তাহাই জ্ঞানযোগ। অষ্টাঙ্গ বা ষট্‌চক্র সাধনগত যোগ-জ্ঞানে যে, চিত্ত বৃত্তির নিরোধ—তাহাই সমাধি যোগ। সাধারণতঃ এই সমাধি যোগকেই, যোগ শব্দে অভিহিত করা হয়। শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি সাধনগত সবিশেষ জ্ঞান রূপ ভক্তি সঞ্চারে, অহংকর্ত্তা অভিমান নহে আত্মা যে স্বরূপ দাস্যাহংকারের যোগ—তাহাই ভক্তিযোগ। তাহাতে চিত্ত বৃত্তির যে স্বতই নিরোধ, তাহা ভক্তিযোগের অবান্তর ফল।

"বৈরাগ্য, জ্ঞান বা সমাধিযোগ, ভক্তিযোগের সোপান নহে। ভক্তি দ্বিবিধ, রাগ এবং বৈধী। রাগ—লোভ বশতঃই উপস্থিত হয়, লোভ বৈরাগ্য বা তপের অপেক্ষা রাখে না। বৈধী—আজ্ঞা পালনেই উদিত, আজ্ঞায় ভক্তিই ভজনীয়া। তবে যে ভক্তি যোগে বৈরাগ্য এবং তপের স্থিতি, তাহা ভক্তিতে প্রত্যাহারে এবং সেবা রূপ কর্ম্মে, ভক্তির অঙ্গরূপে গণ্য।

"জীবের জ্ঞেয় দুইটী—আত্মস্বরূপ এবং ভগবৎ স্বরূপ। নিজের চক্ষু না ফুটিলে, যেমন জগৎ চক্ষু, সূর্য্যের দর্শন হয় না, তেমনি বিনা আত্মতত্ত্বে, ভগবৎ তত্ত্ব বৃথা। আবার বিনা সূর্য্যের প্রকাশে, আত্মচক্ষু ফুটিলেও, না ফোটারই সমান। চিৎকণ জীবের চিৎ চক্ষু নিত্য, যাহা নিত্য, তাহার কখন অভাব হয় না। ভগবানও নিত্য, অতএব তাঁহারও অভাব নাই। তবে যে অভাবের প্রভাব, তাহা কেবল আবরণজনিত। যেমন সূর্য্য এবং চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী মেঘে, চক্ষুই আবৃত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা মেঘে জীব অন্ধ।

"অতএব যেমন বিনা আত্মতত্বে, ভগবৎ তত্ব বৃথা, তদ্রূপ বিনা ভগবৎ তত্বে, আত্মতত্ব বৃথা। কারণ যদি ভগবানের প্রকাশ না থাকিত, তাহা হইলে ফুটন্ত চক্ষেই বা কি লাভ? সূর্য্য আছেন জানিয়াই লোক চক্ষু চিকিৎসায় অগ্রসর হয়।

"অন্ধতা রোগ কি? যে চক্ষু-মণিতে সূর্য্য প্রতিভাসিত হন, যে প্রতিভাসে জীব চক্ষুষ্মান, সেই চক্ষু-মণির বিকৃতি। জীবের স্বরূপ জ্ঞানই—সেই চক্ষুমণি। সেই জ্ঞান অবিদ্যায় বিকৃত। অতএব ভগবৎ-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট নহে। জড়গত বিধায়, তাহার স্বভাবে চক্ষুমণি যেমন বিকৃত হয়, আবার নষ্টও হয়, জীবের সে স্বরূপ জ্ঞান, চিৎ হেতু নিত্য; তবে তটস্থ হেতু বিকৃত হয়, কিন্তু নষ্ট হয় না। নষ্ট হয় না বলিয়াই সে আবার শুদ্ধ হয়। জন্ম জন্ম সুখ, দুঃখ তাড়নে মানবের প্রথম আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ। সেজন্য অন্ধতাগত সুখ, দুঃখকে বৈরাগ্য দ্বারা দূরে না রাখিলে অর্থাৎ সুখ, দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলে, চক্ষু-চিকিৎসা হয় না। এজন্য তাহাদের বৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্যগত যে তপঃ, তাহা চক্ষু চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ। এবং সেই চিকিৎসার ফল—আত্মলয়। কারণ মেঘ দূরীকরণে সূর্য্য-প্রতিবিম্বে আর মেঘ প্রতিবিম্বগত অন্ধতা থাকে না। কিন্তু সূর্য্য যেমন বহিরঙ্গে নির্ব্বিশেষ, তদ্রূপ ভগবানে তনুভা ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ হেতু, সে নির্ব্বিশেষ প্রতিবিম্বে, তাহার জ্ঞানও নির্ব্বিশেষ হওয়ায়, সে আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়াও, স্ব স্ববিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, এহেতু সে, জীবব্রহ্মে ঐক্য দেখে। এবং সে ঐক্যতায়, ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হয়। কিন্তু হইলে কি হইবে? নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে তাহার বিশেষ বোধ না থাকিলেও, সে ব্রহ্ম হইতে পারে না, যদি কখন ভগবৎ কৃপায় তাহার সে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইলে আবার বিশেষ জ্ঞান বা ভক্তিতে সে ভক্ত হয়। যোগীরও এইরূপ পরমাত্ম-প্রতিবিম্বে অন্ধতা থাকে না বটে, কিন্তু ভক্তিরূপ বিশেষ জ্ঞানের অভাবে—ভগবৎ দর্শন হয় না। সে মায়াশক্তি প্রচুর দুর্জ্জের পরমাত্ম-প্রতিবিম্বে তাহার জ্ঞানও, সেইরূপ দুর্জ্জের হওয়ায়, সে জ্ঞানে সে পরমাত্মায় লীনই মনে করে। এই

অতি সূক্ষ্ম ভেদ ভাবই—তাঁহার আত্ম, পরমাত্ম জ্ঞান; এবং এই জ্ঞানেই সে লীন মনে করিয়াও, ভগবত্ব স্বীকার করে। কিন্তু বিশেষ জ্ঞান রূপ ভক্তির অভাবে সে, দুর্জ্ঞেয় জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে না পারায়, অবিশেষেই অবস্থিত থাকে। অনুদিন সে অবস্থানে যখন তাহাতেও বীতরাগ হয়, আবার সে প্রত্যাবর্ত্তনে বিশেষ জ্ঞানরূপ ভক্তিতে আত্মস্বরূপ ও ভগবৎ প্রেম লাভ করে। জ্ঞানযোগীরও এই দশা।

"অতএব জ্ঞান বা যোগের, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি লক্ষ্য হইলেও, ভক্তি যোগ ভিন্ন, তাহারা তাহাতে সফলকাম হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান অভিধেয় মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ভক্তিই অভিধেয়। কারণ চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানই তাহার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বিশেষ জ্ঞানে ভগবৎ-রসে, অন্ধকার যেমন দীপ প্রভাবে আপনি পলায়, তদ্রূপ ভক্তির আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি লক্ষ্য না হইলেও, বিনা দুঃখ নিবৃত্তি-সাধনে—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বতঃই ঘটে।

সোপান ক্রমে দেখা যায় যে, ভক্তি অতি দুর্লভ। কারণ বৈরাগ্য, তপঃ, জ্ঞান, যোগ অতিক্রম করিতে না পারিলে, তাহা লভ্য নহে। কিন্তু পূর্ব্ব-সাধন ক্রমে যে যতটা অগ্রসর, বর্ত্তমানে সে তাহা অতিক্রমেই অগ্রসর হয়। সেই অধিকার ভেদে কেহ—জ্ঞান, কেহ—যোগ, কেহ—ভক্তির অধিকারী। যে যাহা অতিক্রম করিয়াছে, তাহার তাহাতে রুচি থাকে না; এই রুচি দেখিয়াই অধিকার জানা যায়। ভক্তি অধিকারে সে জন্য সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য রূপ মুক্তি স্থান পায় না। ভগবদ্দাস্যই তাহার সম্বন্ধ হওয়ায়, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য তাহার অবান্তর ফল হেতু, তাহাতেও সে বঞ্চিত না হইলেও, ভক্তি রসগত প্রেম মাধুর্য্যে সাযুজ্যকে তুচ্ছ বোধ করে। কারণ সাযুজ্যে যে সুখ, তাহা ভক্তিরসগত সুখের তুলনায়—গোষ্পদ তুল্য। জ্ঞান—যোগে মুক্তি, মুক্তিতে সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ রূপ মোক্ষ। সে মুক্তি, মোক্ষ—ভক্তের বিতরণীয়, সেব্য নহে। এই জন্যই সে দেশে ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কামী, নামী, ধামীর গমন নাই।

"অতএব ভগবত্তত্ত্ব অনুশীলন ভিন্ন, আত্মতত্ত্বে দুঃখ নিবৃত্তিও ঘটে না, এবং আত্মদর্শনও হয় না। আবার আত্মতত্ত্ব ভিন্ন, ভগবত্তত্ত্ব অনুশীলনেও ফল হয় না। কারণ অন্ধ যেমন লোক মুখে শুনিয়া, সূর্য্য মহিমা গানে. সূর্য্য দর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ জীব, যুক্তি জ্ঞান ছাড়িয়াও আপ্ত বাক্য বিশ্বাসে, হরির গুণ গানে হরি দর্শন করিতে পারে না। কারণ—সূর্য্যদর্শনে যে সূর্য্যে দৃঢ় বিশ্বাস—অন্ধের সে দৃঢ় বিশ্বাসের ত্রুটি থাকে। জ্ঞানের বাহাদুরিতে শাস্ত্র আলোচনায়, সে ত্রুটির খণ্ডন হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে চক্ষু চিকিৎসক রূপ গুরুর প্রয়োজন হইত না। হয় না বলিয়াই হরি—ভগবান, চিকিৎসক—গুরুরূপে, শক্তি সঞ্চারে জীবের বিকৃত জ্ঞানকে স্বভাবে আনয়ন করত—তাহাতে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হওয়ায়, সে হরি দর্শনে কৃতার্থ হয়। অর্থাৎ জাগতিক দর্শন যেমন অধিভূত, আধ্যাত্মিক এবং অধিদৈবের সংযোগ ভিন্ন ঘটে না, তদ্রূপ চিন্ময় জ্ঞানরূপ চক্ষু, তদধিষ্ঠিত দেবতা এবং অধিদৈব রূপ গুরুর সংযোগ ভিন্ন দর্শন ঘটে না। অধিদৈব যেমন সূর্য্যেরই অঙ্গ বিশেষ—প্রকাশ রূপ, তদ্রূপ গুরু—কৃষ্ণের প্রকাশ রূপ।

"অতএব সর্ব্বাগ্রে আত্মতত্ত্ব প্রয়োজন। আত্ম-দর্শন ভিন্ন, গুরু-দর্শন হয় না, না হইলে গুরুতে সে ভক্তির উদয় হয় না। গুরুতে বিশ্বাষ না জন্মিলে, ভগবানে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। কারণ গুরু কৃপায় আত্ম-দর্শন, আত্ম-দর্শনে যে স্থির বিশ্বাস, সেই স্থির বিশ্বাসে ভগবদ্দর্শন। অতএব আত্মতত্ত্ব বিহীন জীবের, সে বিশ্বাস কোথায়? ভক্তির শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন আত্ম-পুষ্টি হইবার নহে। আত্ম-পুষ্টি ভিন্ন রতির উদয় নাই। রতি ভিন্ন প্রেম আকাশ কুসুম। অতএব ভগবৎ সম্বন্ধ অনুশীলনে, গুরু ভক্তিরূপ অভিধেয় দ্বারে, প্রয়োজন রূপ ভগবৎ প্রেমের প্রাপ্তি। এহেতু গুরু ভক্তিই—অভিধেয়।

"সর্ব্বাধিপতি ভগবান, ভক্তির অধিপতি হইয়াও, ভক্তে কৃপা হেতু, ভক্তির বশ। ভক্তি-মহিমা ভক্ত অনুদিন গাহিয়াও, নিত্য নূতন গীতে ভগবানকে আকর্ষিত করেন। জ্ঞানী, জন্মে জন্মে বহু বহু সাধনে যাহা লাভ করিতে পারেন না, ভক্তিতে তাহা অনায়াস-লভ্য। আবার

জ্ঞানীর যে শেষ-ফল—সাযুজ্য, তাহা ভক্তের নিকট ভক্তি ভাবে যুগপৎ ভেদাভেদ তত্বরূপে উদিত থাকায়, ভেদ ভাবেরই প্রাধান্যে, ভক্তের পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম, তাহাও লাভ হয়। সে প্রেমের এতই মহিমা যে, সাযুজ্য সে হৃদয়ে নিমেষের জন্যও স্থান পায় না।

"জীব, অবিদ্যা আবরণে ভগবৎসেবার উপযুক্ত নহে। কুণ্ডলিনী সঞ্চারে বা যোগনিদ্রার নিদ্রা ভঙ্গে, বিদ্যার আবির্ভাবে, যেরূপ খদ্যোত তীব্র রৌদ্র গর্ভে লুক্কায়িত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা, বিদ্যাগর্ভে লুক্কায়িত হন। তখন জীবের বিদ্যা প্রতিভাসে স্বরূপগত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের প্রকাশ, সে প্রকাশে বহির্মুখে জীবের যে বিধি প্রণোদিত ভগবৎ সেবা—তাহাকেই বৈধী সেবা বলা হয়।

"রাগ সাধনে মানসগত যে চৈত্য সেবা—তাহাই রাগ সেবা, এবং প্রেম ভক্তিতে অপরোক্ষে যে সপরিকর ভগবৎসেবা—তাহাই প্রেম-সেবা।

"বৈধী সেবা ভগবৎ প্রিয়। এ সেবায় যাহার দরদ পঁহুছে নাই, তাহার প্রেম সেবা—মনের কল্পনা মাত্র। ভগবৎ স্বরূপ, মহান্ত রূপ শিক্ষা-দীক্ষা গুরু, এবং ভক্তই বৈধী সেবার আশ্রয়। মহান্তের হৃদয়ই চৈত্যের আশ্রয়, মহান্ত হৃদয়েই চৈত্যের নিত্য উদয়। কৃষ্ণ, মহান্ত বা ভক্তের নৈবেদ্যই গ্রহণ করেন, সে গ্রহণে সাধকের বৈধী সেবা সিদ্ধ হয়। কারণ সাধকে চৈত্য, নিত্য প্রতিভাসিত হন না। বারেক উদয় হইলেও, সেবা আয়োজনে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাতে সে উদয় আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ ভিন্ন সেবা, উদ্দেশে সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বস্তু, সাক্ষাৎ বস্তুর সাক্ষাৎ সেবাই প্রয়োজন। মহান্তে তাহার নিত্য উদয় হেতু, মহান্ত দ্বারেই বৈধী সেবা সিদ্ধ হয়। সে জন্য মহান্তে যে, মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম দেখিয়া চৈত্য হইতে তাঁহাকে ভিন্ন রাখিতে চাহে, সে অপরাধে পতিত হইয়া নাম-মহিমায় অজ্ঞ থাকে। কারণ চৈত্যই একাংশে মহান্তরূপী জগদ্গুরু শিব, এবং সেই জগদ্গুরু শিব-ভাবেই ভক্ত, শিবের ন্যায় একদিকে ভগবদ্ভক্ত, অন্য দিকে কনিষ্ঠের —গুরু। শিব অবতারী গোপেশ্বর যেমন রাসলীলায় বৃন্দা, তেমনি মঞ্জুরী

গত গুরুর মঞ্জরী, সেই রাসলীলার মঞ্জরী বিশেষ। অতএব বৈধী সেবার অনুশীলনেই প্রেম সেবায় অধিকার। গুরু যিনি—তিনি জানেন, এবং বলেন যে, আমি গুরু নহি, কারণ চৈত্য অংশেই তাঁহার গুরুত্ব, কিন্তু ভক্তের তিনিই গুরু, কারণ মঞ্জরীদ্বারেই কৃষ্ণ দর্শন।

"এই আমি তোমায় জীবমায়াগত, নিমিত্ত রূপিণী জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর বা যোগমায়ার যথা সংক্ষেপ উল্লেখ করিলাম, অন্য দিন তাঁহার নিদ্রিত কুণ্ডলিনী বা যোগনিদ্রা শক্তির উল্লেখে ভগবানের কাল, কর্ম্ম, স্বভাব শক্তির উল্লেখ করিব।

"শক্তিকে এরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, তাহার বিশ্লেষণে সাধন-পথ আপনিই নির্দ্দেশিত হয়, এবং তাহাতে সাধনে জীব তৎ তৎ স্বরূপের মুগ্ধতা ত্যাগ করতঃ ভক্তি-উন্মুখ হইতে পারে। কারণ ভক্তির—কৃষ্ণ নাম ভিন্ন, অন্য জ্ঞান, কর্ম্মগত—সাধন নাই। তাহাতে নাম মহিমায় যোগনিদ্রা জাগ্রৎ হইয়া জীবকে আবরণ জন্য স্বগত ক্ষেত্রে যে পথ বিস্তার করেন, তাহা জ্ঞাত না থাকিলে, জীব সে পথ মহাত্ম্যে কৃষ্ণ বিস্মরণে আর অগ্রসর হইতে পারে না।

এ কথায় জীবসুন্দর নিজ প্রতি দৃষ্টি করিলেন। সে উদ্ধত ভাব সম্বরণে জীব স্থির, শান্ত, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইলেন। জীবসুন্দর যে-কোথায় বসিয়া আছেন, তাহাই তাহার যেন জ্ঞান নাই।

এ সকল প্রসঙ্গে সাধারণ বিরক্ত। তবে জীবসুন্দরের জন্যই হরসুন্দরের এ প্রসঙ্গ। কিন্তু সংসারে জীবসুন্দর কয় জন? হরসুন্দর তাহা জানিতেন বলিয়াই, পাত্র নির্ব্বাচনে এ প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের সে জ্ঞান কোথায়? প্রতিষ্ঠার আশা না থাকিলেও, যখন লিখনবেগে গ্রন্থকার বদ্ধ, তখন ইহাও সেই মায়ার খেলা কি—না, তাহা ভগবানই জানেন, এবং সঞ্চারী ভক্তই অনুভব করিতে পারেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল। প্রদীপ আনিতে জীবসুন্দর অন্ত গৃহে গেলেন. আসিয়া দেখেন, শশাঙ্ক যোড় হস্তে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ বসিয়া আছেন। চক্ষে ধারা, অঙ্গে ঘর্ম্ম, পুলকে অঙ্গ—থর থর।

হরসুন্দর বলিলেন—"জীব! বাহদৃষ্টি ছাড়িয়া অন্তর্দৃষ্টি কর, দেখ—গ্রহণে চন্দ্রমা সূর্য্যে খাইয়া গিয়াছে—শশাঙ্ক আর দেখা যাইতেছে না। সূর্য্যই প্রতিভাত হইতেছেন। প্রণাম কর—পদধূলি গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তের তৃতীয় জন্ম, তুরীয় অবস্থা।

"এ শশাঙ্ক—তোমার শ্বশুর নহে, আমার বৈবাহিক নহে, জ্যোতিঃপ্রসাদের নায়েব নহে। ইনি আমার জীবন বন্ধু, গুরু-অঙ্গ, জীবনজীবনের অধিষ্ঠান—আসন।

"মনে থাকিতে পারে একদিন তোমায় বলিয়াছিলাম, জীব যে কি রূপে কৃষ্ণকৃপা লাভ করে, তাহা শ্রীকৃষ্ণই জানেন। ভ্রান্ত জীব তাহা বুঝে না, বুঝিবার শক্তি নাই। বুঝিতে যাইও না, কৃষ্ণকৃপা লক্ষ্য কর। ইনি কৃষ্ণসেবায় যে ফল আনিয়াছেন, সে ফল কৃষ্ণের সেবায় লাগিলে, তাহার প্রসাদ পাইও—দেখিবে কত মধুর। দেখিবে—কৃষ্ণের নিকট মূর্খ, পণ্ডিতের সমান আদর হইলেও, মূর্খ ভক্তকেই কৃষ্ণ অগ্রে স্বীকার করেন। কারণ জ্ঞানী ভক্তের যে জ্ঞান—তাহা এদেশের। সে জ্ঞানকে ভক্তি বারিতে না শুদ্ধ করাইলে শুদ্ধ জ্ঞানরূপে পরিণত হয় না। না হইলে—অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় না, না হইলে কৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না।"

ক্রমে ক্রমে শশাঙ্ক বাহ্যমুখ হইলেন। জীবসুন্দর তামাক সাজিয়া হুঁকাটী তাঁহার হস্তে দিলেন। শশাঙ্ক হুঁকাটী লইয়া জামাতা জীবসুন্দরকেই প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া জীবসুন্দর দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করতঃ, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে যান, শশাঙ্ক বাধা দিলেন।

হরসুন্দর, শশাঙ্ককে বলিলেন, "তুমি কি সংসার করিতে দিবে না? যে দেশের যে খেলা, সে দেশে তাহাই রহুক, ভগবানের ও আজ্ঞা নিত্য। তুমি কি পাগল সাজিয়া জামাতা প্রণামে, সে আজ্ঞা রদ করিতে চাও? সত্য এ ভাব তাহারি, কিন্তু এদেশে তাহারি যে আজ্ঞা, জীব তাহাই পালন করিবে।"

তখন শশাঙ্ক তামাক টানিতে টানিতে জ্যোতিঃপ্রসাদের কথা বিবৃত করিলেন। পরে পাদুকা প্রহারের কথায়, তিনি হরসুন্দরের পদ ধারণে উদ্যত হইলেন। হরসুন্দর তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "শশাঙ্ক! জগৎ যাহার ভয়ে নিত্য ক্রীড়ান্বিত, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কি সে অভয় ফিরে না? এখনও কি সে সন্দেহ?"

শশাঙ্ক বলিলেন, "ফিরে জানি বলিয়াই ত এ ব্যথা। আমিই যে তাহার অবলম্বন। কেমন করিয়া আমি তোমার গাত্রে পাদুকা প্রহার সহ্য করিব?"

হর। তবে—কি অহঙ্কার ফেলিয়া আসিলে? এও ত সেই অহঙ্কারেরই বুদ্ধি। অহং বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও। ভক্তি বুদ্ধিতে তাহার লীলা পরিদর্শন করিতে থাক। সামান্য পাদুকা প্রহারেই বা এত ভয় কি? তাহার ইচ্ছায় ডুনিয়া ডুবিলেই বা ভয় কি? তাহার আনন্দেই আনন্দ নহে কি? তাহার ইচ্ছায় পাদুকা প্রহার ভোগও ভাগ্য নহে কি? তাহার কি ইচ্ছা, সে ইচ্ছায় সে কোন সময়ে কোন লীলা প্রকাশ করে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? কোন অহঙ্কারে তাহা নির্ণয় করতঃ তাহার আনন্দ মুখ ভুলিয়া নিরানন্দ ডাকিয়া আনিতেছ?

এমন সময়ে নটনারায়ণ ও দেবেন্দ্র, হরসুন্দরের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হরসুন্দর বলিলেন, "নটনারায়ণ! আজ যে একাকী দেখিতেছি?"

নটনারায়ণ বলিলেন, "অন্য দিন একাকীই আসি, আজ দেবেন্দ্র আমার সহিত আসিয়াছে।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "ভায়া! উনি তাহা দেখিয়াছেন, যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাই দৃষ্টি কর।"

পণ্ডিত নটনারায়ণের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। এতদিন শশাঙ্কের প্রতি যে ঘৃণা ছিল, এ ইঙ্গিতে তাহাও দূরীভূত হইল, তৎস্থানে বিশুদ্ধ ভক্তিতে তাঁহাকে বসাইয়া বলিলেন, "ভাই শশাঙ্ক! আমি জ্ঞান হারাইয়াছি—আমায় ধর। বুঝিলাম এ দেশের বন্ধু—বন্ধু নহে—তুমিই বন্ধু। যখন বন্ধুর কাজ করিয়াছ, তখন যাহাতে বসিতে স্থান পাই তাহা কর।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "বস, বস। তাহার জন্য ভাবনা কি? আর ঘুরিতে হইবে না। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া যখন কোন খাদ্যে রুচি জন্মে নাই, তখন এখানে আসিয়াছ। সে কাহাকেও অনাহারে রাখে না, কিন্তু যাহার অন্যে কিছুমাত্র রুচি থাকে, সে তাহাকে ভক্তি পীযূষ দেয় না। যখন দেখে অনন্ত খাদ্য থাকিতেও, অনাহারে জীবন্মৃত, তখন সে ভক্তি বারিতে রুচি জন্মাইয়া চিন্ময় খাদ্য বণ্টন করে। তাই জিজ্ঞাসা—আজ কি একলা আসিয়াছ? সে শাস্ত্র-চর্চ্চা, সে মোকদ্দমার চিন্তা কোথায় রাখিয়া আসিলে?" শশাঙ্কের এবম্বিধ ভাব গ্রাহিতায় নটনারায়ণের হস্ত যোড় হইয়া গেল, গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন, "শশাঙ্ক! এতদিন তোমায় চিনিতে পারি নাই, সাধু অপরাধে অপরাধী আমি—আমায় কৃপা কর। আজ তোমার এ কি মূর্ত্তি—তুমি ত সে শশাঙ্ক নহ? সে শশাঙ্কের এ মূর্ত্তি নহে? অথবা আমার অপরাধী চক্ষু, এতদিন দর্শনে বঞ্চিত ছিল, আজ তোমার কৃপা কটাক্ষে সে অপরাধ ভস্মীভূত হওয়ায়, তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিল। ধন্য আমায়, যাহার জন্য আজ আমি ধন্য—আমি তাহাকে বার বার প্রণাম করি।"

নটনারায়ণের এ ভাবে জীবসুন্দর আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হরসুন্দর, শশাঙ্ক অস্ফুট আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্র বসিয়া বার বার সকলেরই মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার যেন বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। ভাবিতেছেন—অনেক বৈষ্ণব দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ ব্যাপার ত কোথাও দেখি নাই। ঝোলা মালা ইহাদের কাহারও দেখিতেছি না বটে, কিন্তু ইহাদের শরীরই যেন হরিনামে মণ্ডিত।

নটনারায়ণ, হরসুন্দরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আজ আমার অন্তর শীতল হইল। অনন্ত কোটি জন্ম, ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি, এ অবধি বসিতে আজ্ঞা হয় নাই। আজ সেই আজ্ঞা পাইলাম। ঘোরা নিষেধ হইল। আমি একা আসিয়াছি কি—না আসিয়াছি, অনন্ত খাদ্যে আমার অরুচি সত্য কি, না—তাহা তুমিই জান, তাহা জানিবার আমার প্রয়োজন নাই। যখন আপনিই ডাকিয়া আপনি বসিতে স্থান দিয়াছ, তখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, আমার দৃষ্টি যেন তোমাতেই থাকে, তুমি কি করিলে না করিলে, যেন সে বিচারে মন ভ্রান্ত না হয়।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। বাটী আসিয়া শশাঙ্ক আহারান্তে শয়ন করিয়া আছেন—কিন্তু নিদ্রা হইতেছে না। হরসুন্দরের কৃপায় আজ তাঁহার যে ভাব লাভ, সেই ভাবাবেশে তিনি আপ্লুত। কখন হৃদয়—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, জগৎসংসার বিস্মরণ করাইতেছে—নাম বিস্মরণ করাইয়া নামীকে লক্ষ্য করাইতেছে, কখন—ছায়ার ন্যায় সংসার হৃদয়ে প্রতিভাত হওয়ায়, নাম যেন হৃদয়ভেদী হইয়া আবার সংসার ঢাকিতেছে।

কখন নামী লক্ষ্যে শশাঙ্ক স্থাণুর ন্যায়, কখন নামে ভক্তিপ্রবাহে যোড় হস্ত। কখন শশাঙ্কের এই পঞ্চভূতময় দেহ, যেন হিরণ্ময়, কখন যেন ত্রিগুণগত সাত্ত্বিকী। সে সাত্ত্বিকী অঙ্গ যেন তাহার বসন স্বরূপ, তিনি যেন তাহাতে অলঙ্কৃত।

আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না! শয্যা হইতে উঠিলেন। নাম, রূপ, গুণ লীলায় তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আপনার নৃত্যে আপনিই কখন বিস্মৃত, কখন চমৎকৃত। স্বেদ, কম্প, পুলকে—কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন। হরি! হরি! তুমি সুন্দর, বড় সুন্দর। গোবিন্দ! তোমায় যে স্মরণ করে, ভক্তি করে, সেবা করে, ভালবাসে,

সেও সুন্দর—বড় সুন্দর। তাহার হৃদয়ে তন্ত্র নাই, পুরাণ নাই, দর্শন নাই—তাহার হৃদয়ে হেয় নাই, উপাদেয় নাই—তাহার সে সুন্দর হৃদয়ে, তুমিই সুন্দর, তাই সে বড় সুন্দর।

নৃত্য করিতে করিতে শশাঙ্ক অকস্মাৎ কাহার আকর্ষণে দেখিলেন, কে যেন সম্মুখে বসিলেন! শশাঙ্ক বলিলেন, "তুমি ত আমার সে নহ, সে যে ত্রিভঙ্গমুরারি—শ্যামসুন্দর। হরি হরি প্রভাবতী—তুমি, তুমি আমার চরণে ধরিতেছ কেন?"

প্রভাবতী ভিন্নগৃহে শয়ন করিয়া ছিলেন। শশাঙ্কের নৃত্য গীত, হাস্য, ক্রন্দন শব্দ অস্পষ্ট ভাবে প্রভাবতীর কর্ণে যাইলে, তিনি আসিয়া যাহা দেখিলেন, জগতে অনেক সুন্দর আছে, এরূপ সুন্দর কখন দেখেন নাই। তাই তিনি শশাঙ্কের চরণে ধরিয়া কাঁদিতেছেন—আর বলিতেছেন,—"হৃদয়-দেব! জন্ম জন্ম তোমায় পতি জানিয়া, দেবতা জানিয়া, তোমায় যে পূজা করিয়াছি, আজ তাহা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমায় কৃপা করিয়া তোমার সঙ্গে লহ, আমি যে তোমার সহিত, তোমার প্রভামত হইয়া সঙ্গে যাইতে পারিতেছি না—আমায় সঙ্গে লহ।"

শশাঙ্ক, প্রভাবতীর হস্ত দুইখানি ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "প্রভাবতি! তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? কাহার চরণে ধরিতেছ? যখন আমি তাহাতে ছিলাম, তখন সে আমাতে আছে দেখিয়াছিলাম; এখন আমি তোমাতে, আর তাহাকে আমাতে দেখিতেছি না। তোমাতেও তাহাকে দেখিতেছি না। প্রভাবতি! একবার তুমি তাহাতে দাঁড়াও, আমি আর একবার তোমাতে, তাহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হই।"

বলিতে বলিতে শশাঙ্কের চক্ষুরজল প্রভাবতীর মস্তকে পড়িল, সে জলে প্রভাবতীর চক্ষুরজল, শশাঙ্কের বসন সিক্ত করিল।

এবার শশাঙ্ক কাঁপিতে লাগিলেন, প্রভাবতীকে দৃষ্টি করিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রভাবতি! লও কৃষ্ণ নাম, গাও কৃষ্ণ গান, চিন্ত কৃষ্ণলীলা, দেখ—গুরু,কৃষ্ণে অভেদ, কর—গুরু, কৃষ্ণ সেবা,—আর কিছু কাজ নাই—আর কিছু কাজ নাই।"

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল। সে ডাকও এমনি সুন্দর। শশাঙ্ক আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বাহিরে আসিলেন। নিশার অন্ধকারে অস্পষ্ট মূর্ত্তি, কিন্তু শশাঙ্ক ডাকিলেন, "জ্যোতিঃপ্রসাদ!" জ্যোতিঃপ্রসাদ সম্মুখে! শশাঙ্ক বলিলেন, "কেন জ্যোতিঃপ্রসাদ এত রাত্রিতে—অন্ধকারে, একলা? আমি তোমার জমিদারি হইতে অবসর লইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকট অবসর লই নাই; বস—নিঃসঙ্কোচে বস, আমিও যাহার প্রজা, তুমি বুঝ—আর নাই বুঝ, তুমিও তাহারি প্রজা। তাহার জন্য তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ নিত্য।"

আর শশাঙ্ক বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া আসিল। জ্যোতিঃপ্রসাদ সহসা ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন। তিনি, যে বুদ্ধি লইয়া যাহা যাহা বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন, সে বুদ্ধি সহসা হারাইয়া ফেলিলেন। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাই ক্রন্দনে বলিতে লাগিলেন, "আমি যে সাধু-অপরাধী, আমি যে আপনাকে কষ্ট দিয়াছি।"

শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "জ্যোতিঃপ্রসাদ! তুমি ত কখন আমায় কষ্ট দাও নাই? মানুষ কি কেহ কখন কাহাকেও কষ্ট দেয়? নিজ নিজ কর্ম্মসূত্রে এ উহার নিকটে সুখ, দুঃখের কারণ হয় মাত্র। নচেৎ হরি বর্ত্তমানে, জীব কি জীবকে কষ্ট দিতে পারে? সূর্য্য বিনা কিরণ-কণ, কি কখন কিরণ-কণকে, আবরণ করিতে পারে?"

জ্যো। শশাঙ্ক! তুমি আমার শৈশবের—সহচর, বাল্যের—সখা, যৌবনের—মিত্র, বার্দ্ধক্যের—বন্ধু, বিষয় বুদ্ধির—পিতৃস্থানীয়, আজ হইতে তুমি—পারের কাণ্ডারী। তাই তোমায় আজ হইতে কর্ম্মে অবসর দিয়াছি। আর তুমি জ্যোতিঃপ্রসাদের ভৃত্য—শশাঙ্ক নহ। আজ হইতে তুমি জ্যোতিঃপ্রসাদের গুরু—ইষ্ট দেবতা! আজ হইতে জ্যোতিঃ-প্রসাদ তোমার পুত্র, বিষয়—দেবতার। ভৃত্য আমি, গুরু যেমন শিষ্যের অপরাধ গ্রহণ করেন না, তেমনি করিয়া গুরো! আজ আমায় কৃপা করুন।

শ। কে—জ্যোতিঃপ্রসাদ? আমি তোমার কিশোর বয়সের মুখ

দেখিয়াছিলাম, তোমার যৌবনের মলিন মূর্ত্তি দেখিতে প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল বলিয়া, তোমার মুখ অনেক দিন দেখি নাই। একটু অপেক্ষা কর, বুড়া হইয়াছি, চসমাখানি আনিয়া আবার তোমার মুখ খানি আজ একবার দেখি। হায় হায়! আমার বড়ই দুরদৃষ্ট। তোমার এ মুখ আমি এতদিন দেখিতে পাই নাই। আজ হরি কৃপা করিয়া আমার অন্তর বাহিরে। যে তোমাতে, সেই আমাতে, সেই ভূলোকে, দ্যুলোকে, চিন্ময় গোলোকে। হরসুন্দর! তুমি ধন্য, আর তোমার জন্য —আমিও ধন্য।

এই বলিয়া শশাঙ্ক বাটীর ভিতর হইতে একটী দীপ লইয়া চক্ষে চসমা খানি লাগাইলেন। তখন জ্যোতিঃপ্রসাদের মুখখানি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "জ্যোতি! সাধু-অপরাধ দৃষ্টি হইয়াছে কি? সাধু ত হরসুন্দর, কৃষ্ণের আসনই সাধু—ভক্ত। ভক্ত দর্শনে কি আর অপরাধ তিষ্ঠিতে পারে? যাও দেবীগ্রামে যাও। মন—বুদ্ধি, আপন—পর, ধর্ম্ম—অধর্ম্ম, পথিমধ্যে ফেলিয়া—একা যাও—সাধু দর্শন কর। মাটীর অপরাধ, মাটিতেই রহিয়া যাইবে, কৃষ্ণে যাহার মতি, তাহার জন্য তাহার চিন্তা কি?"

জ্যো। কিসের চিন্তা—চিন্তা কিছু নাই। আমি যেন এখন দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেছি। যাহা তখন দেখিতে পাই নাই, এখন যেন তাহা দেখিতেছি। দেখিতেছি—হরসুন্দরের কথায়, আপনার যখন ব্যথা লাগিত, পাছে আমি বুঝিতে পারি বলিয়া তাহা, হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বরণ করতঃ আমায় হাসিমুখ দেখাইতেন। সে হাসিতে তখন যাহা দেখি নাই, এখন তাহা দেখিয়া বুঝিতেছি, না জানি কত ব্যথা আমার জন্য আপনি লইয়াছেন। ধন্য আপনার ভালবাসা—ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা। সেই ভালবাসা—সেই সহিষ্ণুতা, মানুষের কতদূর হইতে পারে, তাহাই দেখিবার জন্য আপনার সহিত তখন সেরূপ ব্যবহার করিয়াছি। আর আমার যে, দেখিবার ক্ষমতা নাই—এখন বুঝিতেছি, সে ব্যথা সহ্য করিবার নহে, তাই আপনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

তখন নানা কথা উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পদব্রজে কেবল উত্তরীয় স্কন্ধে জ্যোতিঃপ্রসাদ—কোথা যাও? তোমার ত অশ্ব আছে, যান আছে, বাহক আছে, ধনী তুমি, তোমার এ ভাব কেন? জ্যোতিঃপ্রসাদ, মনের এ বিদ্রূপে একটু হাসিলেন। অমনি দূরগত তাঁহার সেই অহঙ্কার মূর্ত্তি, চকিত দৃষ্ট হইল—সেই মূর্ত্তিতে একদিন হরসুন্দরের সহিত যে আলাপ—তাহা হৃদয়ে জাগিল। তাঁহার চক্ষে ধারা বহিল। মনে হইল—যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার ভাগ্যে যাহাই থাকে থাকুক, তাহার জন্য দুঃখিত নহি—কিন্তু আমার ব্যথায় যাহাদের ব্যথা লাগে, তাহাদিগকে ব্যথা দিয়াছি—এই বড় দুঃখ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দেবীগ্রামে পঁহুছিলেন। একদিন তিনি যে আবেগে কাহারও অপেক্ষা না করিয়া হরসুন্দরের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজ আর সে আবেগ নাই। তিনি সম্মুখ দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহারও সাক্ষাৎ নাই, তিনি একাই পদচারণা করিতেছেন। কিন্তু কাহাকেও ডাকিতে ইচ্ছা হইল না। মনে হইল, যে যাহার নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত, আমার জন্য কাহাকেও ব্যস্ত করিব না।

এইরূপে দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সহসা তাহার কর্ণে হরসুন্দরের কথার স্বর বাজিল। হরসুন্দর বলিতেছেন, "জীব! দেখ দেখি দ্বারে কোন অভ্যাগত উপস্থিত কি—না। ভগবৎপ্রসাদে আতিথ্য সেবা ভিন্ন আহারে রুচি হয় না, এদিকে তোমাদের আহারও প্রস্তুত বলিতেছ।"

অপেক্ষা না করিয়া জীবসুন্দর সম্মুখ দ্বারে আসিলেন; দেখিলেন—জ্যোতিঃপ্রসাদ সম্মুখে।

জীবসুন্দর বলিলেন, "আপনি কতক্ষণ"?

জ্যো। অধিকক্ষণ নহে, আমার একটী নিবেদন আছে, শুনিবেন কি?

জীবসুন্দর আশ্চর্য্য হইলেন, জ্যোতিঃপ্রসাদের এ ভাবে তিনি কি

উত্তর দিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া জ্যোতিঃ-প্রসাদ বলিলেন, "পাছে অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়, এজন্য আমার মনটা কিছু মলিন হইয়াছিল, আপনার সাক্ষাতে আমার সে মলিনতা দূর হইল। কারণ মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারিতাম না। আপনি আপনার ঠাকুরকে একবার জানান যে, আজিকার অতিথি সেই জ্যোতিঃপ্রসাদ হইলেও, আজ তাহার সহিত কেহ নাই, সে একাকী হাজির হইয়াছে। সে আর কিছু চাহে না, একবার আপনাকে দেখিতে চাহে।"

জীবসুন্দর, হরসুন্দরকে যথাযথ জানাইলেন। হরসুন্দর আপনি আসিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদকে গৃহে লইয়া গেলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদের মনে ঝটিকা বেগের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবের উদয় হইতেছে, কিন্তু কি বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না! কি বলিতে যাইতেছিলেন, অমনি হরসুন্দর বাধা দিয়া বলিলেন, "আহার হইয়াছে কি?"

জ্যো। না, আমি প্রাতেই বাহির হইয়াছি।

হর। পাল্কি কোথায় রাখা হইয়াছে?

জ্যো। পদব্রজেই আসিয়াছি।

হর। কেন?

জ্যোতিঃপ্রসাদের মুখ আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "কেন— এ কথা কি আপনাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে? বলিতে গেলে আমি বড় বেদনা পাই, সে বেদনা কি আপনার লাগিবে না? ভাগ্যে যাহা ঘটিবে—ঘটুক, তাহার জন্য আপনাকে ব্যথিত করিব না; কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদ যে জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, আপনার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে, সে ব্যথা যে জ্যোতিঃপ্রসাদকে আজ বড় ব্যথিত করিতেছে।"

হরসুন্দর আবার সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "অন্ন প্রস্তুত। অদ্য এই খানে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। আজ আমার বহু

ভাগ্য, আজ আমার সুপ্রভাত। কে ব্যথা দিয়াছে জ্যোতিঃপ্রসাদ? যদি ব্যথা দিতে—তাহা হইলে কি আজ এ সুপ্রভাত দেখিতাম?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিতে লাগিলেন, "আমি বড় হতভাগ্য। ঈশ্বর আমাকে যথেষ্ট দিয়াছেন, আমি তাহার সদ্‌ব্যবহারে তাঁহার দিকে মুখ না করিয়া বিপরীত মুখে তাহাকে ভুলিলাম। আমি সাধু-অপরাধী, সাধুর কৃপা ভিন্ন এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তাহার জন্য দুঃখিত নহি, বিনা অপরাধ-মার্জ্জনায় সাধুর হৃদয়ে আবার ব্যথা দিতে কৌতুহল বাড়িতে পারে, সে ব্যথা হৃদয় সহ্য করিতে পারিতেছে না।"

আবার হরসুন্দর সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "অনেক বেলা হইয়াছে, আপনাদের যে, সকাল সকাল আহার অভ্যাস, উঠুন—মুখে জল দিন, একটু ঠাণ্ডা হউন, আজ আমার বহু ভাগ্য—এই নির্ম্মম দেশে, দরদীর হৃদয়ভেদী দরদের প্রস্রবণে শীতল হইলাম।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ আবার বলিতে লাগিলেন, "দেবশশাঙ্ক, আপনার প্রাণ-সম, আমি সেই দেবের কৃপায় আজ আপনার দাসত্বের জন্য ভিক্ষুক। শুনিয়াছি—নারদ, বৈষ্ণব-প্রসাদে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, যদি আমায় আজ প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিয়াছেন, আজ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।"

হরসুন্দর বলিলেন, "তোমার অপরাধ কোথায়? যে, বৈষ্ণব-প্রসাদের জন্য লালায়িত, অপরাধ তাহার শরীর ত স্পর্শ করিতে পারে না। তাহার সৌভাগ্যের কথা কি বলিব, শশাঙ্ক যাহার বন্ধু, সখা, সুহৃদ্‌, সে আমার মাথার ঠাকুর। কে তোমায় হতভাগ্য বলিবে? যাহার, সৌভাগ্যরূপ শশাঙ্ক—আশৈশব সহচররূপে থাকায়—ভগবানে মতি হইল, জন্ম জন্ম সে দুরাচার হইলেও, আমার মাথার ঠাকুর। দুরাচার—আর কি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে? এ যে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বর্ত্তমানে তাহার ভজন। কল্পনার ভজনে, জন্ম জন্মান্তরে কৃষ্ণে মতি, সে মতিতে অনর্থনাশ। যতদিন না কৃষ্ণে সত্য মতি হয়, ততদিন দুরাচার তাহার অঙ্গের আভরণস্বরূপ থাকে, তাই লোকের

সে ভ্রম। পূর্ব্বভজনে তোমার কৃষ্ণে মতি, সে মতিতে কৃষ্ণ বাঁধা বলিয়াই, শশাঙ্ককে তুমি বাঁধিয়াছিলে। কি জানি কিসের জন্য তাহা এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত ছিল, জীবের সে নিরাকরণের প্রয়োজন নাই। যদি তাহা না হইত, তবে ভক্তিগত এ দরদ উদিত হইত না, শুষ্কজ্ঞান বাধা দিত।”

জ্যো। আমি যে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তিতে অনধিকারী। আমার দ্বারা এমন কি কর্ম্ম হইতে পারে, এমন কি জ্ঞান বা ভক্তি আমি তাহাকে অর্পণ করিব যে, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন? তিনি যে সর্ব্ব কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির আশ্রয়! তাহার নিকট ত কিছুই নূতন নহে? তাই আমি তাহার শরণাপন্ন হইলাম—তাঁহার সব আছে, আমার কিছুই নাই—তাই তিনি আমাকে কৃপায় স্বীকার করুন।

হর। আজ তুমি আমাকে তৃষ্ণায় জল দিলে। ভগবান, অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া জীবের হিতার্থে কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান উপদেশের পর, এই কথাই বলিয়াছিলেন—বিধি বিহিত কর্ম্মাদিই ধর্ম্ম, ধর্ম্মে—চিত্ত-শুদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধিতে অবিদ্যারনাশে—বিদ্যারূপা জ্ঞান; বিদ্যারূপা জ্ঞান, হ্লাদিনী সঞ্চারে—ভগবৎ জ্ঞান, ভগবৎ জ্ঞানই—ভক্তি। হে অর্জ্জুন! যদি এবম্বিধ আশ্রমগত কোন ধর্ম্মেই তোমার অধিকার না হয়, তবে সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমারই শরণাপন্ন হও, আমিই তোমাকে সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা করিব। অর্থাৎ যদি আমাতে স্থিরচিত্ত হইতে পার, তাহা হইলে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গত যে জ্ঞান, ভক্তি, তাহার যে মুখ্যফল আমি, আমাতে যাহার চিত্ত-স্থির—তাহার জ্ঞান, ভক্তির সাধনে প্রয়োজন? তাই বলি—পূর্ব্ব-সাধন না থাকিলে, জীবের এ মতি সঙ্গত হয় না; অতএব পূর্ব্বগত ভক্তি সাধনে যাহার এ মতি—সেই বৈষ্ণব, সেই ভক্ত, সে আমার মাথার ঠাকুর। যে, বৈষ্ণব হইয়াও বৈষ্ণব অভিমান শূন্য—সেই আমার মাথার ঠাকুর।

পদধৌতের জন্য জীবসুন্দর, জলপাত্র হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ উঠিয়া দৈনিক কার্য্য সমাধা করিলেন।

জীবসুন্দর, হরসুন্দরকে বলিলেন, “আমাদের খাদ্য কি জ্যোতিঃ-

প্রসাদের যোগ্য? একটু অপেক্ষা করিলে রামহরি দাদার বাড়ী হইতে চাল, দালের বন্দোবস্ত করা যায়।" হরসুন্দর একটু হাসিলেন, বলিলেন, "বাবা! জ্যোতিঃপ্রসাদ তোমার বাড়ীতে অতিথি হয় নাই, যে অতিথি হইয়াছে, আর যাহার বাটীতে অতিথি হইয়াছে, তাহা হৃদয়ে দৃষ্টি করতঃ আতিথ্য সেবা কর, নচেৎ মন বিশদ রাখিতে পারিবে না। ভাল—একবার জ্যোতিঃপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাঁহার যাহা ইচ্ছা।"

জীবসুন্দর বুঝিয়াও পিতার আজ্ঞামতে জ্যোতিঃপ্রসাদকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "জীবসুন্দর! যাহা যথেষ্ট দিয়াছ, তাহাতে আর রুচি নাই, যাহা দাও নাই—আজ দিবে।"

জ্যোতিঃপ্রসাদকে আহার করাইয়া হরসুন্দর-পারিবারের আনন্দের আর সীমা নাই। সে আনন্দে শিবসুন্দরের কথা তুলিয়া কেহই ব্যস্ত হন নাই। কারণ হরসুন্দর আদৌ সে কথা তুলেন নাই।

আহারান্তে জ্যোতিঃপ্রসাদ বহির্গৃহে আসনে বসিলেন। হরসুন্দর সম্মুখে বসিয়া আছেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "আমি, দেবশশাঙ্ক এবং শিবসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া আসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা আমায় একাকী আসিতেই অনুমতি দিলেন। আর জানাইতে বলিয়াছেন যে, কাল প্রাতে তাঁহারা আপনার অপেক্ষায় থাকিবেন, আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, অনুমতি করুন।"

হর। কেন?

জ্যো। তাহা আমায় জানান নাই, এবং আমিও জানিতে চাহি নাই।

হর। তোমায় দেখিয়া একবার মায়াপুর দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। শশাঙ্কের ইচ্ছা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ বিদায় লইলেন।

বৈকালে নটনারায়ণ দেবীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। জীবসুন্দর বলিলেন, "ভালই হইল, আমি আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

নট। কেন বল দেখি?

তখন জীবসুন্দর, জ্যোতিঃপ্রসাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন. এবং হরসুন্দরের কল্য প্রাতে মায়াপুরে যাত্রার কথাও উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"আপনার কি বোধ হয়?"

এমন সময় রামহরি ইত্যাদি কয়েকটী প্রতিবাসীও উপস্থিত হইলেন। সকলেই এ বিষয়ে সন্দিহান। এ উহার কর্ণে ও উহার কর্ণে, নানা ভাব বর্ণন করিতে লাগিলেন, কিন্তু হরসুন্দরকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

নটনারায়ণ বলিলেন, "আজ আমি আর বাটী যাইব না, কাল প্রাতে আমায় সঙ্গে থাকিতে হইবে, নচেৎ প্রাণ সুস্থ থাকিবে না।"

একজন বলিলেন, "আমার ত ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ সেই শশাঙ্কের খেলা। হরসুন্দর ভায়া দেবতা, চতুরের চাতুরী ও বুদ্ধিতে ধরা বড় কঠিন।"

আর একজন বলিলেন, "ঠিক কথা বলিয়াছ ভায়া, কাজের কাজি ভিন্ন ধরে কে?"

শেষ সকলে এই পরামর্শ আঁটিলেন যে, তাঁহারা সকলেই সঙ্গে থাকিবেন, জ্যোতিঃপ্রসাদকে বিশ্বাস নাই, এবং লোক বলও সঙ্গে থাকা চাই।

নটনারায়ণ বলিলেন, "ও সকল কথা আমাদের কর্ণে শুনাইবেন না। উহাঁর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তার প্রয়োজন নাই, তবে উহাঁর সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, সেজন্য কাল মায়াপুর বেড়াইয়া আসিব।"

একজন বলিলেন, "কাল মায়াপুর বেড়াইতে যাইবার স্থান বটে। শুন নাই? কাল গ্রহণ উপলক্ষে প্রাতে বড়ই ধুম। কাল অনেক পল্লী হইতে সংকীর্ত্তন আসিয়া মায়াপুরে সম্মিলিত হইবে, এইরূপ প্রকাশ।"

সে রাত্রি কাটিল, প্রভাতে সকলেই মায়াপুরের জন্য উদ্যোগী। নটনারায়ণের এ লোক সংগ্রহে ইচ্ছা নাই। জীবসুন্দর প্রতিবাসীর ভাবে ভীত। ইহাঁদের ভাবে প্রতিবাসীরা বলিলেন, "আমরা তোমাদের সঙ্গে যাইব না। তবে হরসুন্দরকে একাকী ছাড়িয়া দিতে আমরা

রাজি নহি, যদি মরিতে হয়, সকলেই মরিব, একবার যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, শিবসুন্দরকে হারাইয়াছি, আর হরসুন্দরকে হারাইয়া দেশে বাস করিবার ইচ্ছা নাই। আমরা যে যাইতেছি—হরসুন্দর, জ্যোতিঃপ্রসাদকে—তাহা জানিতে দিব না, তোমাদের সে ভয় নাই।

তখন সকলেই মায়াপুরে যাত্রা করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক রাত্রি দেখিয়া শশাঙ্ক ও নটনারায়ণ উঠিয়া গেলেন। হরসুন্দর, জীবসুন্দরও রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে জীবসুন্দর, হরসুন্দরকে তামাক দিয়া তাঁহার সম্মুখে, নামে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। শেষ শয়নের পূর্ব্বে আবার তামাক সাজিয়া হরসুন্দরের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আজ আমি শ্বশুর মহাশয়ের ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম, বিশেষ আনন্দিতও হইলাম, কিন্তু একটা খট্‌কা আমার মনে উদয় হইতেছে।"

হরসুন্দর বলিলেন, "বলিতে পার।"

জীব। যিনি ভক্তি শক্তিতে এতদূর অগ্রসর, কই তাঁহার ভাবে ত কিছুই লক্ষিত হইল না। কাল যাহার ভক্তিশক্তির সঞ্চার হইয়াছে, যে ভক্তিশক্তিতে যোগমায়া অনেক সময়ে, স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা অবধি ভুলে, যাহার সামান্য স্ফূর্ত্তিতে আমি নিজের দেহ নিজে স্থির রাখিতে পারি না, যিনি সেই ভক্তিতে এতদূর অগ্রসর, তাঁহার এ সংসার গতি কিরূপ? কিরূপেই বা সে ভাবলাভ সম্বরিত।

হরসুন্দর একটু হাসিয়া বলিলেন :—

"যদি হই ভবসিন্ধু পার।
তবে * * ভাসাই লোকাচার॥"

সাধন ভক্তিতে এ ভাব যোগ্য। কিন্তু ভাব ভক্তিতে—

"যদি হই ভবসিন্ধু পার।
তবে মাথায় করে বই লোকাচার॥"

এই ভাবই যোগ্য। সে বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই। অবস্থায় সকলই ঘটিবে। নিরপেক্ষ ভক্তেরা সংসারে উদাসীন। ভক্ত চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। বাহ্য দেখিয়া ভক্ত চিনিতে যাইও না। যে দিন অন্তর্দৃষ্টি, ভাবে পরিপক্ক হইবে—সে দিন আর এরূপ সন্দেহ দাঁড়াইবে না। ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত ভক্তই, বহির্ম্মুখে—পুরগৃহস্থ, অন্তর্ম্মুখে—চুর ফকির। তাঁহাদের নিরপেক্ষ ভাবে বিচরণ—ইচ্ছার অধীন। তুমি, চৈতন্য ভাগবতে, শ্রীবাস চরিতে তাহা বুঝিতে পারিবে। সাধন ভক্তিতে যে উদ্ধত ভাব, তাহা ভাবভক্তিতে শান্ত হয়, সে শান্ত ভাবে যে কার্য্য, তাহা অবিদ্যা চালিত নহে। স্বরূপ সিদ্ধিতে অবিদ্যা কার্য্য থাকে বটে, কিন্তু তখন অবিদ্যা. বিদ্যার দ্বারাই চালিত। কারণ গুরুভক্তিতে, যে ভক্তি স্ফূর্ত্তি, সে স্ফূর্ত্তিতে অবিদ্যা, বিদ্যাভাবাপন্ন হয়, হইলে—অবিদ্যা-গত যে মন. তাহা সাধনকালে সময়ে সময়ে চুলের রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, সে একবারে যায় না; আবার পূর্ণ অঙ্গে জীবকে বহিরঙ্গে আনিয়া ফেলে। কারণ জীবশক্তি উল্লেখ কালে বলিয়াছি, যে জীবের এ দেহ—ঔপাধিক, স্বরূপ নহে। সেই স্বরূপকে অন্তরঙ্গ হইতে বহিরঙ্গে আনিয়া ফেলে। কিন্তু জীব তখন আত্মস্বরূপের সন্ধান পাওয়ায়, অবিদ্যা তাহার নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে। কারণ, জীব তখন বুঝিতে পারে যে, যাহা স্বরূপ-আবরক—তাহাই অবিদ্যা। অতএব অবিদ্যা অনন্ত হইয়াও, শান্ত জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকে না, এবং সে, জীবকেও আর গ্রাস করিতে পারে না। তখন অবিদ্যা তাহারই বশীভূত হইয়া মন্ত্র-শক্তির ন্যায়, তাহারই স্বগত কর্ম্ম শক্তির সহিত, তাহারই দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করে মাত্র। নিরীশ্বর, বা সেশ্বর সাংখ্য জ্ঞানে 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' করিয়া অবিদ্যার সমালোচনায় আর তাহাকে ভ্রান্ত হইতে হয় না। তোমরা কিন্তু সেইরূপ না করিতে দেখিলে, সংসারে কাহাকেও সাধু বা ভক্ত বলিয়া মনে করিতে পার না, এইজন্য তোমাদের এ ভ্রম। যখন পারনা—তখন ভক্তিতে ভক্তি লও,

জ্ঞানে ভক্তি—অহৈতুকী হয় না। না হইলে—ভাল, মন্দ বিচারে বৈষ্ণব অপরাধে পড়িবে।”

জীবসুন্দর অপ্রতিভ ভাবে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—সে সত্য, জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে চৈতন্য প্রভুর সহিত, অদ্বৈত প্রভুর অনেক ভাব, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়াই অনুমিত হয়; কিন্তু ভক্তি-চক্ষে, তাহা ভক্তিরই অঙ্গবিশেষ। তখন বলিলেন, “আপনি সে দিন অপরা মায়ার উল্লেখ করিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা, আজ তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।”

হর। সে কথা ভাল। অপরাধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভগবদ্-ভক্তি বৃদ্ধির জন্য যে, ভগবৎ-শক্তির সমালোচনা—তাহা মন্দ নহে। তবে জানিয়া রাখ—অবিদ্যা সমালোচনাই ধর্ম্ম নহে; কারণ, যদি ভগবদ্-ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই তাহার স্বরূপ জানিয়া ভগবানেই প্রীতি জন্মে; কিন্তু যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে সে সমালোচনায় কেবল অবিদ্যা জ্ঞানেরই বৃদ্ধি পায়।

“রজঃ অতিক্রমিত মহাবৈকুণ্ঠ বহির্মণ্ডলই—বিরজা নামে প্রসিদ্ধ। সৃষ্টিপর্য্যায়ে মহাবৈকুণ্ঠগত চিৎ অহঙ্কার—মহাসঙ্কর্ষণ তত্ত্বের, একাংশ—সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব, সূর্য্য স্বরূপে উদিত হইয়া স্ব অঙ্গদ্বারে যে, কুণ্ডলিনীরূপা কারণ মায়া প্রকট করেন, তাঁহাকেই জগৎ-কারণ—কারণার্ণব বলা হয়। এই কারণমায়া—চিন্ময়; শাস্ত্র বলেন—তাঁহার এক্ কণা, পতিত-পাবনী গঙ্গা।

“কুণ্ডলিনী, সঙ্কর্ষণতত্ত্ব রূপ সূর্য্যের অন্তর দৃষ্টিতে থাকায়, ছায়া হইতে নির্লিপ্ত ভাবে—রমা, সৃষ্টি হেতু ঈশ্বরী অহঙ্কারে বহির্দৃষ্টিতে ছায়া, প্রকটে—উমা। উমা—ছায়ারূপে—ছায়াদুর্গা। উমারূপে কুণ্ডলিনী—পরাশক্তি। ছায়ার নির্লিপ্ত ভাবে উমাই—চিৎ শক্তি রমা। কুণ্ডলিনী যেমন স্বগুণে, নির্গুণে উমা এবং রমা, তেমনি ছায়াদুর্গা, স্বগুণ, নির্গুণে—মহাবিদ্যা এবং পরাবিদ্যা। স্বগুণা মহাবিদ্যা আবার অবিদ্যায় যোগনিদ্রা, বা মহামায়া, এবং ত্রিগুণে প্রকৃতি বা প্রধান। অংশ ব্যূহতত্ত্ব—সঙ্কর্ষণ, রমায়—ত্রিবিধ বিষ্ণুরূপে, উমায়—সদাশিব অংশ

—শ্রী শিব রূপে অধিষ্ঠিত হইলে, সৃষ্টি ইচ্ছায় ছায়াদুর্গা ঈক্ষণে সঙ্কর্ষণ, মহাবিষ্ণু রূপে শ্রী শিব অংশ শম্ভুকে—মহাবিদ্যায় নীত করেন।

"যাহার সহিত ছায়ামায়ার সম্বন্ধ নাই—তিনিই তুরীয়। এ হেতু তুরীয় সঙ্কর্ষণ, ছায়াদুর্গা ঈক্ষণে—মায়ী, মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত। ঈক্ষণ সম্বন্ধে মায়ী হইলেও—রমা, মহাবিষ্ণুর,বা ছায়া প্রকটয়িত্রী হইলেও উমা, শ্রীশিবের—মায়া ব্যবহার না থাকায়,তুরীয় মধ্যেই গণনা। কারণ, স্বরূপ—জলে তৈলের ন্যায় অবস্থিত হেতু, জলে নির্লিপ্ত। সে হেতু শ্রীশিব, ঈশ্বর অহঙ্কার শূন্যে, কৃষ্ণ ভক্তিতেই পরম বৈষ্ণব। নিগুর্ণ শিব—শ্রীশিবেরই নামান্তর। বলদেব চিৎ শক্তির আশ্রয়, এবং গোপেশ্বর চিদচিৎ শক্তির আশ্রয় হেতু, শ্রীশিব গত উমা হইতেই ছায়া মায়ার প্রকট।

"বিষ্ণুই—পঞ্চ উপাসক গত বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা। শম্ভুই—শৈবের, মহাবিদ্যাই—শাক্তের উপাস্য দেব, দেবী। পরাবিদ্যাই—গাণপত্যের, এবং জাগ্রৎ যোগনিদ্রাই—সৌরের, জ্ঞান ও সূর্য্য স্বরূপে উপাস্য দেবতা। এ হেতু, পঞ্চ উপাসনা-মিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মগত—অহৈতুকী ভক্তি গ্রাহ্য নহে। তবে সোপান স্বরূপ, কালে পরাশক্তির সংযোগ।

"সূর্য্য যেমন মধুচক্রের অধিষ্ঠান ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ ছায়া অহঙ্কারে শম্ভু, স্বরূপ অহঙ্কার ভিন্ন কার্য্য করিতে পারেন না। এ হেতু সৃষ্টি কার্য্যে, চিৎ অহঙ্কাররূপী বিষ্ণুর, পুরুষ স্বরূপে অধিষ্ঠান মাত্র, প্রকৃতিস্বরূপ শম্ভু দ্বারে, জগৎ প্রসূত হয়। এজন্য নির্লিপ্ত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইলেও মহাবিষ্ণু—জগৎ কর্ত্তা, কারণ তাহার অধিষ্ঠান ভিন্ন, কেবল শম্ভু দ্বারে সৃষ্টি হয় না। অতএব সৃষ্টি কার্য্যে মহাবিষ্ণু—কুম্ভকার স্বরূপ, শম্ভু—যন্ত্র স্বরূপ, এবং প্রধান—মৃত্তিকা স্বরূপ। প্রধান জড়া, এবং ছায়াদুর্গা, মহাবিষ্ণুর অধিষ্ঠান ভিন্ন সৃষ্টিতে অশক্তা, এ হেতু এ দুয়ের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব অজা-গল-স্তনের ন্যায়। এই ছায়াদুর্গাই ভগবানের জড়-লীলা—ইচ্ছাশক্তি।

"পূর্ব্বে যে অবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছি, সেই অবিদ্যার—দুই বৃত্তি।

এক আবরণ, এক বিক্ষেপ। যে বৃত্তিতে স্বরূপ জ্ঞান আবরিত, —তাহাই আবরণ, এবং যে বৃত্তিতে ত্রিগুণের বিশেষাবিশেষ পরিণতি —তাহাই বিক্ষেপ। আবরণের দুই বৃত্তি—জ্ঞান, ও কর্ম্ম। এই অবিদ্যা জ্ঞানকেই ভগবানের—কাল শক্তি, এবং কর্ম্মকেই—জড়-লীলা-শক্তি বলা হয়।

"ত্রিগুণের—তিন গুণ যোগে বিক্ষেপ শক্তি, ত্রিবিধ। সত্ত্বে—স্থিতি, রজে—সৃষ্টি, এবং তমে—সংহার শক্তি।

"বিদ্যা যেমন পঞ্চপর্ব্বা, আবরণ গত জ্ঞানরূপা অবিদ্যাও তেমনি পঞ্চপর্ব্বা। পঞ্চ পর্ব্ব যথা :—তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। তম, মহত্তত্ত্বে—অবিদ্যা, মোহ, অহংতত্ত্বে—অস্মিতা, মহামোহ, সত্ত্বে—রাগ, তামিস্র, রজে—দ্বেষ, এবং অন্ধতামিস্র, তমে—অভিনিবেশ।

"অতএব আবরণগত জ্ঞানরূপা অবিদ্যাই—অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশের—ক্ষেত্র। ইহারা আবার সকল সময়ে সমান থাকে না। ইহাদের চারিটী অবস্থা। প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার। যে সময়ে যিনি, বীজ মধ্যে যেমন বৃক্ষ-শক্তি লীন ভাবে থাকে, তদ্রূপ চিত্তক্ষেত্রে থাকেন, তখন তাঁহার—প্রসুপ্তাবস্থা। যে সময়ে যিনি, সংস্কার বা বাসনা রূপে থাকেন, তখন তাঁহার—তনু অবস্থা। যে সময়ে যিনি, অন্যের প্রাবল্যে ক্ষীণ ভাবে থাকেন, তখন তাঁহার বিচ্ছিন্ন অবস্থা—যে সময়ে যিনি, কার্য্যের সহায়, তখন তাহার—উদার অবস্থা।

"এই চারি অবস্থায় পঞ্চ পর্ব্বের অবস্থান। পঞ্চ পর্ব্বের স্বরূপ যথা :—

"যাহার দ্বারায় অনিত্যকে—নিত্য, অশুচিকে—শুচি, দুঃখকে—সুখ, অনাত্ম পদার্থকে—আত্ম পদার্থের ন্যায় বোধ হয়, তাহাকেই—অবিদ্যা বলা হয়।

"যাহার দ্বারায় জীবাত্মা, বুদ্ধি তত্ত্বের সহিত একীভাবে বদ্ধ, তাহাকেই—অস্মিতা বলা হয়।

"যাহার দ্বারায় সুখের অনুবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম—রাগ।

"যাহার দ্বারায় দুঃখের অনুবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম—দ্বেষ।

"যাহার দ্বারায়, বার বার জন্ম, মৃত্যু ভোগে, জীবের চিত্তে যে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা, সেই সর্ব্ব বাসনা রূপ স্মারস্তে, জ্ঞানী বা অজ্ঞানীর, হৃদয়ে যে, তাহার স্মৃতির উদয়, তাহাকে—অভিনিবেশ বলা হয়।

"প্রধান—সাম্য ত্রিগুণের সমাহার। অপরসত্ব, অচিৎ বা প্রধানই জগৎ উপাদান প্রকৃতি। এই প্রকৃতি, নিমিত্ত মায়ায় জ্ঞান, ক্রিয়া, এবং স্বভাবে—সত্ব, রজঃ এবং তমোময়ী। এই নিত্য রজঃ, তমঃ, যুক্ত সত্বকেই—ত্রিগুণসত্ব বা অশুদ্ধ সত্ব বলা হয়।

"সত্ব—লঘু, প্রকাশস্বভাবা এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপা, রজঃ—প্রবৃত্তিময়ী, এবং তমঃ—মোহস্বরূপা।

"সৃষ্টি কালে মহাবিষ্ণু অধিষ্ঠানে যোগনিদ্রারূপা মহামায়া, ভগবানের ইচ্ছা সঙ্কল্পে, কালশক্তিদ্বারে ক্ষোভিত হইলে, ভগবান যোগনিদ্রার প্রধানরূপ জগদ্‌যোনিতে, জীবশক্তি আধান করায়, যোগনিদ্রা স্বকর্ত্তব্য পালনে, প্রধান রূপা জগৎ উপাদান প্রকৃতিকে, নিমিত্ত রূপ অবিদ্যা দ্বারে, অনন্ত মহত্তত্বে প্রকটিত করেন। এই মহত্তত্বরূপ বুদ্ধি তত্বই—ভগবানের মায়া কামবীজ। সে অনন্ত মহত্তত্বে, হিরণ্ময় জীবশক্তি রূপ বীজের, এক এক অংশের সংস্থান; এ হেতু মহত্তত্বকে হিরণ্ময় গর্ভ বা হিরণ্ময় অণ্ড বলা হয়। তাহাতে সঙ্কর্ষণ ব্যূহতত্বের প্রদ্যুম্নাংশ, এক এক অংশে গর্ভোদকশায়িরূপে প্রকাশিত হয়েন।

শাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল বলেন যে, যে যাহার সার বা মূল, সে তাহার তত্ব। যেমন ঘটের তত্ব—মৃত্তিকা, কিন্তু মৃত্তিকাও কার্য্যবিশেষ। ঘট কার্য্যের মৃত্তিকা কারণ হইলেও, সে ঘট—কারণ—মৃত্তিকারূপ কার্য্যেরও—কারণ আছে। এইরূপ কারণ পরম্পরায় যে কারণের আর কারণ পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যে কারণ, কাহারও কার্য্য রূপা নহে, তাহাকেই তত্ব বলা হয়। এ হেতু তত্ব দ্বিবিধ। এক নির্ব্বিকার—নিষ্ক্রিয়, এক সবিকার—সক্রিয়। যাহা কাহারও কার্য্য নহে, সদা এক রূপ, এবং নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় হেতু অপরিণামী, তাহাই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ব। কারণ, যে নিজে পরিণত হয় না, সে কাহারও উপাদান

বা জনক হইতে পারে না; না হইলে সে ব্রহ্মাণ্ডের জনকও হইতে পারে না। আর যাহা কাহারও কার্য্য না হইয়াও, সর্ব্ব কার্য্যের কারণ রূপে স্থিত, তাহাই সবিকার সক্রিয় তত্ত্ব। কারণ তাহা সবিকার সক্রিয় না হইলে, তাহার জগৎ কার্য্যে বিকার বা কার্য্য লক্ষিত হইত না।

কপিল এই সবিকার সক্রিয় তত্ত্বটীকে—প্রকৃতি, তাহার বিকৃতিকে—প্রকৃতি-বিকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতির বিকৃতিকে নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি এবং নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ত্বটীকে—অনুভয়রূপ বলেন। কারণ, তাহা অপরিণামী হেতু প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে।

সাঙ্খ্যের এই প্রকৃতিই কাল, কর্ম্মগত—স্বভাব শক্তি। প্রকৃতি-বিকৃতি—মহৎ,অহঙ্কার পঞ্চ তন্মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি—একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূত পাঁচটী। অনুভয় স্বরূপ—জীবাত্মা। কপিল জীবকেই আত্মা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই জন্য সাঙ্খ্যের আত্মা—বহু। বেদান্ত ভগবানকে আত্মা শব্দে উল্লেখে, এক বলিয়াছেন। এহেতু আত্মা যে দ্বিবিধ, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা—তাহা আমি জীব শক্তি উল্লেখে পূর্ব্বে বলিয়াছি। বুঝিলে স্থান বিশেষে নির্দ্দেশে কোন বিবাদ ঘটে না।

সাংখ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই স্বীকার করেন। এজন্য কপিল বলেন যে, যাহা অবিশেষ হইয়াও বিশেষের আশ্রয়, তাহাই প্রকৃতি।

সাংখ্য, প্রকৃতিকে জড়া বলেন, বলিয়াও প্রকৃতি দ্বারে জগৎ সৃষ্টির উল্লেখ করেন। জড়দ্বারে সৃষ্টি অসম্ভব হেতু,-বেদান্ত, প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। কপিল বলেন কেন? যেমন অয়স্কান্ত মণি—সন্নিধানে লৌহ ক্রিয়াবান্ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি,অনুভয় রূপ তত্ত্ব সন্নিধানে—ক্রিয়ার সৃষ্টি কর্ত্রী না হইতে পারেন কেন? লৌহ ক্রিয়াবান হইলেও যেমন জড় অয়স্কান্ত জড়ই থাকে, তদ্রূপ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় অনুভয়তত্ত্ব, নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়ই থাকে। বেদান্ত বলেন, সে ক্রিয়ার এরূপ জ্ঞানগর্ভ সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃষ্টি কৌশলে যে জ্ঞানের প্রকাশ, তাহাই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বের

সাঙ্খ্য। ভগবানের ইচ্ছা সঙ্কল্পেই সৃষ্টি, এ হেতু প্রকৃতির সৃষ্টি কর্তৃত্ব অজা-গল-স্তনের ন্যায় এবং নিস্ত্রৈগুণ্যা যোগনিদ্রাও যন্ত্রস্বরূপা মাত্র; কারণ ভগবানের ইচ্ছা সঙ্কল্পেই তদ্দ্বারে সৃষ্টি। এ হেতু একমাত্র ভগবানই সৃষ্টি কর্ত্তা মহেশ্বর।

"ভগবৎসৃষ্টি ইচ্ছায় মহত্তত্ত্ব আবার, কালদ্বারে বিকৃত হইলে, অহংতত্ত্ব রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া পড়ে। এই অনন্ত অহংতত্ত্বে সঙ্কর্ষণ ব্যূহগত অনিরুদ্ধ, গর্ভোদকশায়ী দ্বারে, ক্ষীরোদকশায়িরূপে প্রকটিত হয়েন।

"বীজ যেমন ত্বকের দ্বারায় আবৃত থাকে, তদ্রূপ মহত্তত্ত্ব, যোগ-নিদ্রায় এবং অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্বে আবৃত থাকে। অহংতত্ত্ব ত্রিবিধঃ— বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস, তামস।

"তামস অহঙ্কার বিকৃত হইলে শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। যাহাতে শব্দ ও গুণ, সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, তাহাকে—শব্দ তন্মাত্র বলে। শব্দ তন্মাত্রে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের উৎপত্তি। শব্দ তন্মাত্র ও আকাশ—তামস অহঙ্কারে আবৃত থাকে। আকাশ বিকৃত হইয়া স্পর্শ তন্মাত্রের উদয় করে, সেই স্পর্শ তন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট মরুতের সৃষ্টি। এই মরুৎ—আকাশে আবৃত থাকে। মরুৎ বিকৃত হইয়া রূপ তন্মাত্রের উদয় করে, সেই রূপতন্মাত্র হইতে রূপগুণবিশিষ্ট তেজের উৎপত্তি হয়। এই তেজ—মরুতের দ্বারায় আবৃত থাকে। তেজ বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্রের উদয় করে, সেই রসতন্মাত্র হইতে রস গুণ-বিশিষ্ট অপের উদয় হয়, এই অপ্—তেজের দ্বারায় আবৃত থাকে। অপ বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্রের উদয় করে, সেই গন্ধতন্মাত্র হইতে, গন্ধ গুণবিশিষ্ট ক্ষিতির উদয়। এই ক্ষিতি জলের দ্বারায় আবৃত থাকে। এইরূপে পঞ্চভূত এবং পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি। অতএব পঞ্চ ভূত—কারণ এবং কার্য্যগুণবিশিষ্ট। ভূতোৎপাদক তন্মাত্রের গুণের নাম—কার্য্য গুণ। যাহা হইতে তন্মাত্রের উদয়—তাহাই কারণ গুণ। আকাশ ভৌতিক কারণগুণ শূন্য। তাহার কার্য্য গুণই—শব্দ, বায়ুর কারণ গুণ —শব্দ, কার্য্যগুণ—স্পর্শ, তেজের কারণ গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, কার্য্য গুণ

—রূপ। জলের কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, কার্য্যগুণ—রস। পৃথ্বীর কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, কার্য্যগুণ—গন্ধ। এই অনুসারে আকাশের গুণ—শব্দ, বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং পৃথ্বীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ,রূপ, রস, গন্ধ।

"তন্মাত্র সকল অবিশেষ অর্থাৎ ইহারা কেহই শান্ত, ঘোর, মূঢ়, ইত্যাদি ভাব যুক্ত না হওয়ায়, পরস্পর অবিশেষ। কিন্তু পঞ্চ ভূত ক্রমান্বয়ে কারণ এবং কার্য্যগুণ বিশিষ্ট বিধায়, তাহারা শান্ত, ঘোর, মূঢ়, ইত্যাদি ভাব যুক্ত। এ হেতু তাহাদিগকে বিশেষ বলা হয়। আকাশ অবকাশে, বায়ু—শোধনে, তেজ—দহনে, জল—ক্লেদনে এবং পৃথ্বী ধারণে বিশেষ হইয়াও, পরস্পর সংযোগ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। সেজন্য ভগবান নিজ অপরা মায়া দ্বারায় পঞ্চীকরণে, অর্থাৎ প্রথম আকাশীয় পরমাণুকে দুই খণ্ড করতঃ, তাহার এক খণ্ডকে আকাশীয় পরমাণুতে রাখিয়া, অন্য খণ্ডকে আবার চারি খণ্ড করতঃ, তাহার এক এক ভাগকে বায়ু, তেজ, জল, এবং পৃথ্বী পরমাণুতে যোগ করেন। এইরূপ বায়ুর পরমাণুকে, বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ আকাশ, তেজ, জল, ও পৃথ্বী পরমাণুতে যোগ করেন। এইরূপে তেজ, জল, পৃথ্বীর পরমাণুকে বিভক্ত করতঃ, এইরূপ সংযোজনে তাহাদিগকে কার্য্যোপযুক্ত করেন। পঞ্চীকরণে, আকাশীয় পরমাণুতে আকাশের অংশ ৷৹ আনা, বায়ুর অংশ ৵৹, তেজের ৵৹, জলের ৵৹, এবং পৃথ্বীর ৵৹, একুনে ষোল আনা। এইরূপে বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী পরমাণুতেও ষোল আনা দৃষ্ট হইবে।

"মহত্তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইলে তদ্গত অবিদ্যা হইতে সাত্ত্বিক, রাজস,এবং তামস অহঙ্কারের উদয়, এবং তামস অহঙ্কার হইতে প্রধানের,ভূতস্বরূপে অভিব্যক্তি।

"সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে অন্তঃকরণ, ও ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের উদয়, রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও প্রাণ ইত্যাদির উদয়। সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বকে—কারণ শরীর, রাজস

অহংতত্ত্বকে—লিঙ্গ শরীর, এবং তামস অহংতত্ত্বকে—স্থূলশরীর বলা হয়।

"এই তিন শরীর, ঈশ্বর এবং জীবের—ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির স্থান। কারণে—জ্ঞান শক্তির, লিঙ্গে—ইচ্ছা শক্তির, এবং স্থূলে—ক্রিয়া শক্তির পরিচয়।

"জড়ত্ব হেতু, শরীর ত্রয়ের নিজের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া কিছুই নাই। কিন্তু বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া অনেকে, অভিব্যক্ত কার্য্যকে শরীরের কার্য্য মনে করিয়া দেহাত্মবাদী, বা ময়াবাদী হইয়া পড়েন।

"অবিদ্যা গত আবরণের পঞ্চ পর্ব্বে, এবং বিক্ষেপের ত্রিবিধ ভাবে, অনুজীবের অনুচিৎজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি আবৃত হওয়ায়, তাহারও জ্ঞান, এইরূপ পঞ্চ পর্ব্বময়া, এবং কর্ম্ম ত্রিভাব সমন্বিত। সে হেতু, তাহার স্বরূপ-মন,বুদ্ধির অভিব্যক্তি নাই ; কারণ ভগবানের জড়লীলা ইচ্ছা,কাল, কর্ম্মশক্তি, ত্রিগুণা না হইলেও জড়া। অর্থাৎ জড় অহঙ্কারে জড়স্বরূপা মাত্র। ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে জীবাধিষ্ঠান হেতু, জীবরূপ চিৎ যোগে, তদ্‌গত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—চিদাভাসরূপে উদিত হওয়ায়, অনুজীব তাহাতে অস্মিতায় স্বরূপ বিস্মৃত হয়। এই অস্মিতায় সূক্ষ্মশরীর রূপ প্রকৃতি যোগে, জীবের পুরুষ-বুদ্ধি। এই পুরুষ-বুদ্ধিতে, মনই—জীবের প্রকৃতি স্বরূপা। সে জন্য মনকে অনেকে জীবাত্মা মনে করেন।

"গুরুর কৃপায় যখন বিদ্যাবৃত্তির উদয়ে, ভক্তিতে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়, তখন জীব, স্বরূপ গত—মন, বুদ্ধির প্রকাশে, স্ব-স্বরূপদর্শনে, পুরুষ-বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ, শক্তিরূপে দাস অহঙ্কার প্রাপ্ত হয়।

"লিঙ্গ ও কারণ শরীরকেই সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। কারণ, কারণশরীর, লিঙ্গশরীরেরই অপরিণত অবস্থা, এবং লিঙ্গশরীরই কারণশরীরের পরিণত অবস্থা। এ পরিণত অবস্থাতেও, সে সূক্ষ্ম বিধায়, এই উভয়বিধ শরীরকেই সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। অতএব লিঙ্গ এবং কারণ, সূক্ষ্মশরীরে-রই অবস্থা ভেদ মাত্র। এবং তামস অহংতত্ত্ব গত সমষ্টি, এবং ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডই—স্থূলশরীর। অতএব সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে ঈশ্বরও জীবের, ঔপাধিক শরীর দুইটী—সূক্ষ্ম এবং স্থূল।

"আকাশ যেমন ধূলি কণায় ব্যাপৃত হইলে,ধূলিকণা আকাশকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু অজ্ঞ জীব আকাশকে ধূলিময় বিবেচনা করে, তদ্রূপ ঈশ্বরের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর কল্পনা। কিন্তু জীবের তাহা নহে। কারণ—জীব অস্মিতায় দেহিরূপে বদ্ধ।

"অন্তঃকরণের চারি বৃত্তি। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। মন—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা, বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা, অহঙ্কার—অভিমানাত্মিকা, এবং চিত্ত—অনুসন্ধানাত্মিকা, এজন্য চিত্তবৃত্তির নামান্তর—স্মৃতি। আত্মার—জ্ঞান শক্তি, বুদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ে—জ্ঞানস্বরূপে, এবং ইচ্ছাশক্তি মন—অহঙ্কার, চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারে ক্রিয়ারূপে—অভিব্যক্ত হয়।

অতএব অন্তঃকরণ বা মনই আত্মা বা জীবাত্মা নহে। জীবাত্মা অনুভয় স্বরূপ, এবং মন অবিদ্যাগত ব্যষ্টিবিলাস মাত্র। যেমন অগ্নি যোগে লৌহ অগ্নিস্বরূপ হয়, তদ্রূপ ভগবান বা জীবের অধিষ্ঠানে অবিদ্যা বৃত্তি সমষ্টি আবরণ, ভগবানের জড় লীলা মনোরূপা, ও ব্যষ্টি আবরণ বৃত্তিই, জীবের মন রূপে প্রকটিত। লৌহের অগ্নি রূপে, অগ্নি যেমন একীভূত ভাবে থাকে, তদ্রূপ অস্মিতায় জীবের মনকে, স্বরূপ জ্ঞান হইলেও উভয়ে তত্ত্বতঃ এক নহে—ভিন্ন।

"বেদান্ত পঞ্চ কোষের উল্লেখে, কারণশরীরকে—আনন্দময় কোষ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীকে—বিজ্ঞানময় কোষ; চিত্ত, মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটিকে—মনোময় কোষ, পঞ্চ প্রাণকে—প্রাণময় কোষ, এবং এই স্থূল শরীরকেই—অন্নময় কোষ বলেন।

"পঞ্চীকরণে কার্য্যোপযোগী পঞ্চভূত দ্বারে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইলে, অহংতত্ত্ব যেমন মহত্তত্ত্বের দ্বারায় আবৃত,তদ্রূপ অহংতত্ত্বের দ্বারায় ব্রহ্মাণ্ড আবৃত হয়। হইলে—গর্ভোদকশায়ী নিজ বামাঙ্গ হইতে মহা-বৈকুণ্ঠগত অনিরুদ্ধাংশ—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে, নিজ দক্ষিণাঙ্গ হইতে তদ্গত ব্যষ্টি জীব শক্তিরূপ—প্রজাপতি ব্রহ্মাকে, নিজ কূর্চ্চদেশ হইতে তদ্গত ব্যষ্টি শম্ভুরূপ—রুদ্রকে, এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা দ্বারে স্বগত নাভি নাল হইতে জীবরূপ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে প্রকটিত করেন। এই নাভি

নালই পদ্মরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন। তখন ব্যষ্টি সৃষ্টি হেতু, গর্ভো-দকশায়ী, চতুর্ম্মুখকে শক্তিসঞ্চারে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া—রজঃ-শক্তির, লয় হেতু রুদ্রকে—তমঃ শক্তির, এবং সৃষ্টি হেতু বিষ্ণুকে—সত্ত্ব শক্তির আশ্রয়রূপে অধিষ্ঠিত করিয়া, স্বয়ং পৃথ্বী ধারণে গর্ভোদকে শায়িত হন। বিষ্ণু, সঙ্কল্পমাত্রে সত্ত্বের আশ্রয় রূপে ক্ষীরোদে অবস্থিত হওয়ায়, প্রতি জীবের হৃদয়াকাশে এক এক প্রতিবিম্ব স্বরূপে প্রদীপ্ত।

"এইজন্য শাস্ত্র, দুই পক্ষী নির্দ্দেশে, দুইটী ক্ষেত্রজ্ঞের উল্লেখ করিয়া, একটীকে দ্রষ্টারূপ ফলদাতা ঈশ্বর, এবং অপরটীকে ভোক্তা রূপ জীব শব্দে অভিহিত করেন। দ্রষ্টৃরূপে তিনি কেবল সাক্ষিমাত্র, সেই সাক্ষী, প্রতি জীবের হৃদাকাশ গত ক্ষীরোদকশায়ী অনিরুদ্ধের প্রতি-বিম্ব অধিযজ্ঞ স্বরূপ।

"বিদ্যা এবং অবিদ্যায়, জীবের যেমন জাগ্রৎ এবং নিদ্রিত অবস্থা, তেমনি, সূক্ষ্মে এবং স্থূলে ব্রহ্মাণ্ডের, জাগ্রৎ, নিদ্রিত অবস্থা। যখন স্থূল—সূক্ষ্মে আবৃত—তখন জাগ্রৎ, এবং যখন সূক্ষ্ম—স্থূলে আবৃত—তখন নিদ্রিত। ব্রহ্মাণ্ড আবার যেমন ত্রিগুণের সত্ত্ব প্রাধান্যে—জাগ্রৎ, রজঃ প্রাধান্যে—স্বপ্নগত, এবং তমঃ প্রাধান্যে—নিদ্রিত.তেমনি জীবও সেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রতিভাসে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত দশাপন্ন। কিন্তু মুক্ত জীবের অন্তর্ম্মুখ গতি থাকায়—সে নিত্য জাগ্রৎ। এ স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে, তাঁহার এ জ্ঞানের অন্যথা হইলেও, স্বরূপ জ্ঞানের অন্যথা হয় না। বদ্ধজীবের সে গতি না থাকায়, নিদ্রায় তম আবৃতে ধনশূন্য ব্যক্তি যেমন আপনাকে শূন্য মনে করে, তদ্রূপ শূন্যভাবে থাকে।

"জাগ্রতে জীব—স্থূলশরীরে, স্বপ্নে—লিঙ্গশরীরে, নিদ্রায়—কারণ শরীরে উপহিত। কিন্তু কারণও অপরাগত, সে হেতু জীব—স্থূল, লিঙ্গ, আবরণ ভেদ করিয়াও, আত্ম এবং ভগবৎ দর্শন করিতে পারে না। স্থূল, লিঙ্গ গত ঐশ্বর্য্য হারাইয়া জীব সুষুপ্তিতে, বিষয় শূন্য হইলে, যেরূপ জীব নিজেকেই নিজে শূন্য বোধ করে, তদ্রূপ শূন্যভাবে অবস্থিতি করে মাত্র। তবে কারণশরীর গত সত্ত্ব-ভাবে সে সুখমগ্ন থাকে। এই জন্যই কারণশরীরকে আনন্দময় বলা হয়। কিন্তু সে আনন্দও

অবিদ্যাগত, অবিদ্যাগত বলিয়াই অবিদ্যা আবার তাহাকে আনিয়া বিষয় কূপে নিক্ষেপ করে।

"মেঘ যেমন জীব-চক্ষুকে আবরণ করে বলিয়াই, সে সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, কিন্তু মেঘ সূর্য্যকে আবরণ করিতে না পারায়, সূর্য্য সর্ব্বদ্রষ্টা, সেরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণে জীব বদ্ধ বলিয়াই ভগবদ্দর্শনে অক্ষম। কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণে উপহিত ভগবান—সর্ব্বদ্রষ্টা। অতএব ভগবান স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ গত--জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, তাহার অতীত। স্বরূপ-সিদ্ধি বা জীবন্মুক্তে স্বরূপ, জীব দেহে, এইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অতীতভাবে বিচরণ করেন। কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—ঔপাধিক শরীরের ধর্ম্ম, জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। অন্তর্ম্মুখে বস্তু-সিদ্ধিতে ঔপাধিক শরীর না থাকায়—ঔপাধিক ধর্ম্ম তাহাতে লক্ষিত হয় না।

"নিরীশ্বর সাংখ্য মতে পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞান, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্তরূপ চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বই প্রাকৃত, এবং জীব চৈতন্যই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সেশ্বর সাংখ্য, এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকারে, ঈশ্বরকে ষড়বিংশতি তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"জীব, এই চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বগত স্থূল, সূক্ষ্ম দেহে বদ্ধভাবে নানা অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া, যখন মানবদেহ পায়, পাইয়া—আবার যখন ভগবন্নিষ্ঠায় অবিদ্যা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সে পরার উদ্দেশ পায়, পাইলে—পরা-সঙ্গ লাভে, অপর-সঙ্গ দূর হয়। অতএব তত্ত্ব—সংখ্যায় পাঁচটী যথা:—ভগবান, জীব, কাল, কর্ম্ম এবং স্বভাব বা প্রকৃতি। ভগবানেরই এ চারিটী শক্তি—এবং জীব ভিন্ন অপর তিনটীই জড়া—তবে কাল ও কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যা নহে—প্রকৃতিই ত্রিগুণা।

"আবার কেহ কেহ চিৎ, জীব, মায়া—কেহ কেহ চিৎ, অচিৎ—এইরূপ বিভাগে সর্ব্ব তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন। যিনি যে ভাবে করেন—তাহাই উত্তম, ইহাতে কোন বিবাদ নাই।

"ভগবান, জীব ও প্রকৃতির বর্ণনে—কাল, কর্ম্মের স্বরূপ উল্লেখ মাত্র করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্ম্ম দ্বিবিধ—সমষ্টি এবং ব্যষ্টি। অবিদ্যার বিক্ষেপ বৃত্তিই সমষ্টি কর্ম্ম এবং তাহার আশ্রয়—ভগবান। অনুজীবের স্বগত চিৎ ক্রিয়া শক্তিই—অবিদ্যা প্রতিভাসে—ব্যষ্টি কর্ম্ম-শক্তি। সমষ্টি—ব্যষ্টির নিয়ামক, এবং ব্যষ্টি—সমষ্টির, নিয়ম্য। এজন্য জীব-কর্ম্ম—সমষ্টি কর্ম্মের অধীন। অধীন বলিয়াই জীব, সমষ্টি কর্ম্মের নিয়ম বহির্ভূতে, কর্ম্মে বদ্ধ হয়। ব্যষ্টি কর্ম্মের মূল—কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির মূল—বাসনা। বাসনাই কর্ম্ম-বীজ-রূপা। এই কর্ম্ম-বীজের আশ্রয়—ভগবল্লীলা শক্তি।

"ঈশ্বর, দ্বিবিধ কর্ম্মেরই সাক্ষী, এবং আশ্রয় স্বরূপ—এজন্য ঈশ্বর কর্ম্মাতীত। এইরূপ ঈশ্বর, ত্রৈগুণ্য শূন্য চেষ্টারূপ কালেরও আশ্রয় হেতু, তিনি কালাতীত।

"কাল, ব্যাপ্তির পরিমাণ করে, এবং উপাদান—আধাররূপা প্রকৃতি, স্থিতির পরিমাণ করে। উপাদানই, ঈশ্বর ও জীবের চিদচিৎ শক্তির অভিব্যক্তির—আধার তত্ত্ব। কাল এবং কর্ম্ম ঐ অভিব্যক্তির সহায়। অতএব কেহই অবস্তু নহে। ভগবানের জীব, জড় লীলা যেমন অনাদি, তেমনি—কাল, কর্ম্ম শক্তিও অনাদি।

"এই জৈব বাসনা রূপ—কর্ম্মবীজ আকর্ষণে জীব যাহা করে, তাহাই জীবের কর্ম্ম। জীব গত কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি—স্মরণ থাকিতে পারে।

"এই আমি তোমায় যথা সংক্ষেপে সম্বন্ধ-জ্ঞানের উল্লেখ করিলাম। এ উল্লেখে সাধন পথও নির্দ্দেশিত হইল। সেই সাধন পথে অগ্রসর হইবার জন্য, সম্বন্ধ-জ্ঞানে যাহা কর্ত্তব্য—পরে সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্বন্ধ সূত্ররূপা অভিধেয় তত্ত্ব—ভক্তির উল্লেখ করিব।"

কথায় কথায় রাত্রি পোহাইয়া গেল। তখন উভয়ের চমক ভাঙ্গিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা কেবল শাস্ত্র পাঠে পণ্ডিত, তাঁহারা যেরূপ পরের দোহাই দিয়া তর্কে মজবুত, প্রকৃত সাধক যাঁহারা, তাঁহারা শুষ্ক তর্ককে সেরূপ প্রশ্রয় দেন না; আপ্ত বাক্যে সাধনাবস্থায় দৃষ্টভাবে—তাহার সমন্বয় করিয়া লয়েন।

বিষয়ী যেরূপ শুষ্ক তর্কে অহংকার বাড়াইয়া, আবার সেই অহংকারেই—বিষয়ে মুগ্ধ হন, প্রকৃত সাধক—আপ্ত বাক্যে হৃদয়গত দোষ দৃষ্টে, তাহা পরিহারে দোষ হইতে দূরেই অগ্রসর হন।

পূর্ণানন্দ—অচ্যুতানন্দ ও দিব্যানন্দের সে কথা তুচ্ছ করিতে পারেন নাই। কারণ, যে কখন মিষ্ট খায় নাই—তাহার অনেক বিষয়ে মিষ্ট ভ্রম হইতে পারে—কিন্তু মিষ্টভোজীর সে ভ্রম অসম্ভব। দিব্যানন্দ এখন যোগী, বিশেষ সম্পন্ন অবস্থাতেই এখন উপনীত। মিষ্ট যেরূপ তারতম্যে প্রভেদ, ভগবৎ স্বরূপও, সে তারতম্যে প্রভেদ, বৈষ্ণব শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করেন। অতএব দিব্যানন্দের কথা তুচ্ছ নহে।

যদি পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ বিষয়ীর ন্যায় অহংকারে ডুবিয়া শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া—কেবল তাহার দোহাই দিয়া অহংকার বৃদ্ধিই ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তুচ্ছ হইতে পারিত বটে, কিন্তু পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দের সে অহঙ্কার আর নাই,—তবে কে তুচ্ছ করিবে?

দিব্যানন্দ বলিলেন,—"তাহা হইলে হইল কি? আমি প্রকৃতিলয়ে চিৎস্বরূপে নীত হইলাম বটে, সে স্বরূপে প্রকৃতির লেশ থাকিল না বটে—কিন্তু সেই চিৎস্বরূপ, যে মহান্ ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত, তাহার যদি অপর সম্বন্ধ থাকে, তবে যেরূপে জীবের মায়া সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল—সেইরূপে আবার যে সম্বন্ধ না ঘটিতে পারে, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত কোথায়? বৈষ্ণব শাস্ত্র ভিন্ন ইহার উপদেশ অন্য শাস্ত্র দেন না। যদি বলেন, সেই মহান্ ঈশ্বরের কৃপা বশতঃই জীবের আর প্রকৃতি সঙ্গ হয় না, তাহা হইলে, তাঁহার এরূপ শক্তি আছে—যেশক্তিতে তিনি—মায়াতে অধিষ্ঠিত

থাকিয়াও, মায়াতে নির্লিপ্ত ; যে শক্তি কৃপায় জীবেরও সে অবস্থা হয়। এবং যদি মায়া তাঁহারই শক্তি হয়, তাহা হইলে তিনি মায়া হইতে মহান্। অতএব সেই মহান্, যে অংশে মায়া মধ্যে অধিষ্ঠিত, সেই অংশই তাঁহার ঈশ্বর পদবাচ্য, এবং মায়া অতীত অংশই—তুরীয়। এই তুরীয় পদে মায়ার অধিকার নাই। জীব যদি তাঁহার কৃপায়, সে তুরীয় পদে নীত হয়, তাহা হইলে আর তাহার পুনরাবৃত্তির ভয় নাই, কারণ সে তুরীয় পদ নিত্য মায়াতীত। অতএব এই তুরীয় পদই জীবের লক্ষ্য —ভজনীয়।

যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ ঘর্ষণে শব্দই উত্থিত হয়, কিন্তু অগ্নির প্রকাশ হয় না, এবং শুষ্ককাষ্ঠ অগ্নি প্রকাশে অগ্নির স্বরূপ হয়, তদ্রূপ যোগমার্গে শুষ্ক, জলরূপ মায়া ব্যতিরেক হৃদয়—পূর্ণানন্দ বা অচ্যুতানন্দ কোনরূপ শব্দ না তুলিয়াই—সেই ভাবমর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"কথা সত্য! পতঞ্জলি তপো মার্গে, ঈশ্বর প্রণিধান উল্লেখ করিয়া কৈবল্যে, ঈশ্বর সত্তার কোন উল্লেখই করেন নাই। ইহা ভাবিবার বিষয় বটে যে, নিরোধে ভগবৎ-সত্তা অভাবে, ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি হয় না—কি চিন্মাত্রস্বরূপ; চিৎস্থানে একীভূত হওয়ায়, স্বগত সত্তার অভাব হেতু, ভগবৎ-সত্তার অনুপলব্ধি। নিরীশ্বর সাংখ্য—কিন্তু ভগবৎ-সত্তার উল্লেখই করেন নাই।"

দিব্যা। এখন বুঝিতেছি, চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিত আত্মার—আত্মানন্দ অপেক্ষা, যে এক দিব্যানন্দ আছে, তাহার সংবাদ আত্মানন্দে নাই। নাই বলিয়া—সে দিব্যানন্দে যে ভগবদ্দর্শন, তাহাও নাই। নাই বলিয়া—সেই ভগবৎ-উপলব্ধিতে যে পরানন্দ, তাহাও নাই। নাই বলিয়া—সেই পরানন্দে যে নিত্য চিৎ লীলা বৈচিত্র, তাহারও উপলব্ধি নাই। নাই বলিয়া—তাহা অতি নীরস, শুষ্ক, উগ্র—চিৎ-কণ মাত্র। শুষ্কতা হেতু, সে জড়ে আর্দ্র হইতে চাহিয়াছিল – কিন্তু জড়ে আর্দ্র হইয়া দেখিল যে. তাহাতে আর্দ্রতা সুখ আছে বটে, কিন্তু তদ্গত দুঃখ তুলনায়, সে আর্দ্রতায় সুখ নাই। এহেতু সে পুনরপি মায়া ব্যতিরেক আত্মানন্দ ভাবেই অগ্রসর। যতদিন তাহার মায়া বিরক্তভাব—বৈরাগ্য থাকিবে;

ততদিন আর সে মায়া স্পর্শ করিবে না বটে, কিন্তু আত্মানন্দে অনুদিন গতে স্বগত উগ্রভাবে, যখন অসহ্য উগ্র হইবে, তখন আবার মায়া-জনিত দুঃখ ভুলিবে—মায়া বরণ করিবে—এহেতু এ মুক্তিতে পুনরাবৃত্তের ভয় আছে। কারণ, ভক্তির উদয় না হইলে, কেবল শুষ্ক যে মুক্তি, তাহা নিত্য নহে।

পূ। কেন?

দি। কারণ যোগনিদ্রা স্বরূপ—ত্রিগুণ অতীত হইয়াও ভগবৎ স্বরূপের আবরণ। সেই আবরণ গত জীবের যে শরীর—সেই শরীরই কারণ শরীর সেজন্য কারণ শরীর ধ্বংসেও—ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন হয় না। এজন্য কারণ শরীর পরিত্যাগেও—জীবের অহং ব্রহ্মজ্ঞান। ভক্তিতে সেই যোগনিদ্রা জাগরিত হইয়া সে আবরণ ভাব ত্যাগে—প্রকাশ-স্বভাবা হইয়া ভগবদ্দর্শন করান। সেজন্য দেখিতেছি—ইহাও তুচ্ছ। যদি ভক্তির উদয়ে যোগনিদ্রার স্বরূপ যোগমায়াগত স্বরূপের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সে স্বরূপের আর পতন নাই—কারণ তাহা ভগবৎ-প্রকাশস্বরূপা, সে প্রকাশে সে ভগবৎ-আনন্দে—মায়ার প্রবেশের অধিকার নাই।

"সুকৃতিবলে বলী হইয়াও—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী—ফল লক্ষ্যে বদ্ধ। কিন্তু যদি সেই সুকৃতি, ভগবৎ-স্বরূপের উদ্দেশ্য লয় এবং ফল-লক্ষ্য রূপ জ্ঞান মল ধুইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে সে ধৌতে, ভগবৎ-স্বরূপে এবং জীবে যে স্বাভাবিকী অহৈতুকী ভক্তি আকর্ষণ—তাহা আর কাহার দ্বারা আবৃত থাকিবে?

"যদি কাষ্ঠ আর্দ্র না থাকে—আর যদি শুষ্ক কাষ্ঠের দ্বারায় ঘর্ষণ পায়, তবে জ্বলিতে কতক্ষণ? এখন পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ যোগ সম্পন্নে ভক্তি দ্বারে ত্রিগুণজলে অনার্দ্র, তাহাতে ভক্তি স্বাভাবিকী ভগবৎ-প্রকাশিকা। দিব্যানন্দের ভগবদ্দাস্য-প্রসঙ্গ-রূপ ঘর্ষণে, পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ মুমুক্ষুরূপ জ্ঞানমলকে ভস্মীভূত করিয়া উদ্দীপ্ত হইল বটে, কিন্তু ছানি আবৃত চক্ষু—ছানির দূরীকরণ মাত্রেই যেমন রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না—তদ্রূপ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটিল না। না ঘটিলেও ছানি

দূরীকরণে যে প্রভা চক্ষুকে উদ্‌ভাসিত করে—তাহাতে সূর্য্যে শ্রদ্ধা জন্মে—বিশ্বাস হয়। এই বিশ্বাসই সূর্য্যদর্শনের মূল। এই বিশ্বাসই চিৎপুষ্টিতে শুদ্ধ বা পরাভক্তি স্বরূপ।”

পূর্ণানন্দ বলিলেন,—“বৎস! তুমি পিতার কার্য্য করিলে। সুখের পর দুঃখ অপরিহার্য্য বিধায়, লোকে অবিদ্যাগত সুখ ত্যাগ করতঃ আত্মানন্দে উপনীত হয়, কিন্তু ভগবদ্ ভক্তিতে যে সুখ, সে পক্ষে আত্মানন্দ যে এত হেয়—যত দিন তাহার না উপলব্ধি, ততদিন সে সেই আত্মানন্দেই বিভোর থাকিবে। কারণ অবিদ্যা গত সুখ দুঃখে সে পীড়িত, দুঃখ অতীত সুখের মুখ সে কখনই দেখে নাই, সে জন্য তাহার দুঃখগত—সুখ, দুঃখে—মুক্তিই লক্ষ্য থাকিবে। কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় যেদিন ভক্তি আকর্ষণে সে, দাস্য রসে রসিক হইবে, সে দিন আর সে জীবব্রহ্মে এক দেখিবে না—কারণ তাহার সে দাস্যভাব স্বতঃই তাহাকে পৃথক রাখিবে। ভক্তিই সে প্রেমানন্দের মূল। কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমার এ বিশ্বাস জন্মে নাই— তবে, তোমার কথায় এই মাসাবধিকাল আমি বৈষ্ণব শাস্ত্র বিচারে ভক্তির মহিমা, পূর্ব্বে ওই ওই শাস্ত্রেই খুঁজিয়া পাই নাই—এখন তাহা পাইতেছি, তাহারও অন্য কোন কারণ দেখি না—ভগবৎ-কৃপাই মূল। ভগবান তোমার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিলেন—অতএব তুমি ধন্য।

“যাহারা কেবল অবিদ্যাগত সুখ, দুঃখে বিরক্ত, পরমাত্মস্বরূপ যাহাদের অজ্ঞাত—তাহারা সুখস্বরূপ আত্মাকে, প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত করুক, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করুক। সে নিবৃত্তিতে মায়া ব্যতিরেক সুখে মগ্ন হওয়ায়, ভক্তি-চক্ষু আবরণে জীবব্রহ্মে সমন্বয়ে, যাহার দিন কাটাইবার, সে দূরে থাকুক, এখন আমাদের আর সে চিন্তা নাই,— অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান শূন্য হওয়ায়, ভক্তিই আমাদের সাধ্য, এবং ভক্তিই তাহার সাধন হউক।”

এই বলিয়া পূর্ণানন্দ,অচ্যুতানন্দের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন— অচ্যুতানন্দের চক্ষে ধারা। তাহা দেখিয়া পূর্ণানন্দের চক্ষেও ধারা

বহিল, তাহা দেখিয়া দিব্যানন্দ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। পূর্ণানন্দের—এই প্রথম ভক্তি-অশ্রু।

দিব্যানন্দ মুদিতচক্ষে যোড় হস্তে বলিলেন,—"আগন্তুক, পথিক, দেবতা, গুরো! তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য, সত্য বলিয়া—যাহা সত্য বলিয়াছিলে, তাহা সত্য ঘটিল। বলিয়াছিলে—"এভাব অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, আবার হারাইবে। ভোগাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার এ ভাবের উদয় হইবে, তখন আমায় চিনিবে, এখন আমায় দেখিবে, কিন্তু চিনিতে পারিবে না—তাই দেখিয়াও একদিন চিনিতে পারি নাই, এতদিন পরে বুঝি সেই ভোগাবসানের কাল আসিল। না আসিলে আবার হৃদয়ে সে ব্যথার উদয় দেখিতেছি কেন? না উদয় দেখিলে কাহার আলোকে সে অন্ধকারে তোমার সেরূপ না দেখিয়াও, আজ সেরূপ চিনিতেছি? প্রভো! আর সন্দেহ নাই, বিচার নাই, মুক্তির প্রয়োজন নাই, সুখ, দুঃখে—সুখ, দুঃখ নাই, অন্যে—লক্ষ্য নাই। সন্দেহে, বিচারে মুক্তি প্রয়োজনে, সুখ, দুঃখে বীতরাগে, তোমাতে লক্ষ্য ছিল না। আজ তোমার লক্ষ্যে, সেসব লক্ষ্য দূর হইয়াছে, আপন পর ঘুচিয়াছে, বন্ধ মোক্ষ এক হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান, অজ্ঞান শুখাইয়াছে, সকলেই তোমার মহিমা গাহিতেছে। তুমিত বলিয়াছ প্রভো! আবার আমায় চিনিবে, আবার আমায় দেখিবে? চিনাও প্রভো! তখন একদিন চিনিব ভাবিয়া সে চিত্ত স্থির ছিল—এচিত্ত যে স্থির থকেনা।"

অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "তিনি কে?" তখন দিব্যানন্দ তাঁহার শৈশবের পীড়ার সংবাদ হইতে, বকুলতলার আগন্তুকের মহিমা অবধি, কীর্ত্তন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পূর্ণানন্দ বলিলেন, "যাহা এতদিন শুনিয়াও শুনি নাই, আজ তাহা শুনিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না।" অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "দিব্যানন্দ! তবে যে তুমি বলিলে, "তাই দেখিয়াও এতদিন চিনিতে পারি নাই, না দেখিয়াও আজ সেরূপ চিনিলাম।"

তখন দিব্যানন্দ, হরসুন্দরের বিষয় উল্লেখে, তাঁহার বিরাহ এবং

শিবসুন্দরের ধর্ম্মগত ভাব বর্ণনায় বলিলেন, "এক্ষন আর আমার সন্দেহ নাই। তিনি সত্য, তাঁহার কথা সত্য বলিয়াই আমার, এ যোগ ধর্ম্মরূপ সত্য পালনে—কর্ম্ম ভোগের অবসান।"

পূর্ণানন্দ বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না। আমারই বুঝিতে ভুল হইয়াছিল। যে জন্য আমি বুঝিতে না পারিয়া তোমায় যোগ-যুক্ত করি, সেই জন্যই হরসুন্দর তোমায় ভক্তিমার্গে নীত করেন। কারণ তোমার ভোগাবসানের ত্রুটি ছিল, পাছে ভোগে আবার বিভ্রান্ত হও। তোমার সে অবস্থা হরসুন্দরই চিনিয়াছিলেন, আমিই বুঝিতে ভুল করিয়া তোমার দিন সংক্ষেপ করিলাম।"

আবার বলিলেন, "না তাহা নহে, আমায় কৃপা করিবার জন্যই তাঁহারা এ খেলা। আজ শুষ্ক যোগমার্গ অতিক্রমে, ভগবন্নামে কৃতার্থ হইলাম।"

অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "দিব্যানন্দ! তোমাকে, বয়সে বালক বলিতে হইবে, কিন্তু দেখিতেছি, তোমার শিক্ষা সর্ব্বশাস্ত্রেই, নচেৎ এ মীমাংসা হইতে পারে না। কাহার নিকট তুমি শিক্ষা করিয়াছিলে?"

তখন দিব্যানন্দ শিক্ষার কথায়—পূর্ব্ব পণ্ডিত এবং নটনারায়ণের কথা উল্লেখে, জ্ঞান গুরু—জ্ঞানানন্দের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমার ধর্ম্ম শাস্ত্রই পাঠ্য ছিল, আমি কখন খেলা বা অন্য পুস্তক পাঠ করি নাই। দিনের কোন ক্ষণ বিনা শাস্ত্র চর্চ্চায় যাইতে দিই নাই, এখন দেখিতেছি সে ক্ষমতা আমার নহে, তাহা যাঁহার—তাঁহার কৃপাতেই যাহা, তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি। তাঁহার কৃপাতেই আমি শুদ্ধা ভক্তির অনুসন্ধান পাইয়া এক্ষণে, তাঁহার কৃপাতেই ভোগা-বসানে, তাহার ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।" পূর্ণানন্দের মন, বিশুদ্ধ হইতে চায়—আর যেন গুরু শিষ্য ভাব নাই, তিনিও যেন এখন ভক্তিমার্গে বিচরিত।

দিব্যানন্দ, পূর্ণানন্দকে বলিলেন, "যখন প্রয়োজন ছিল, তখন দিয়াছিলেন—লইয়াছিলাম ওসব, এখন আর আমার সেসব কিছুরই প্রয়োজন নাই। এ যোগ ধর্ম্মের জ্ঞানরূপ মল, তদ্গত সংযমে যে

অনন্ত বিভূতি, সে বিভূতিমূল—যে বৈরাগ্যরূপ অহঙ্কার, আর আমার তাহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যাহার বস্তু, আজ—তাহাকেই সমর্পণ করিয়া, আজ—হরসুন্দরেই আত্মসমর্পণ করতঃ, যে অহঙ্কারকে মাথায় করিয়া, হরসুন্দরের সংসার ত্যাগ করিয়াছি—আবার সেই অহঙ্কারকে ফেলিয়া, হরসুন্দরের সংসার মাথায় করিতে যাত্রা করিব। লোকে জানিবে আমি ভ্রষ্ট, বস্তুতঃ আমি সাধারণ জ্ঞান গত যে ধর্ম্ম, হরসুন্দরের মাধুর্য্যে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইতে চাই ; কারণ, অসাধারণের ধর্ম্ম—মুক্তি, আমি আর মুক্তিপ্রার্থী নহি।"

তখন পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দকে বলিলেন, "আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব। দিব্যানন্দ বলিলেন, "ইহাও তাহারি মহিমা।"

অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "আজ বুঝিলাম—তাঁহার মহিমা, তিনিই বিস্তারে, জীবকে কৃতার্থ করেন। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কেবল আপন মহিমায় আপনার মস্তক চর্ব্বণ করে। আজ জীব গত—কর্ম্মবল, জ্ঞানবল, যোগবল, দূরে নিক্ষেপ করিলাম, যেন তাঁহার মহিমায় ভক্তি-চক্ষু ফুটে।"

তখন জ্ঞানানন্দের কথা উঠিল। অচ্যুতানন্দ ও পূর্ণানন্দ উভয়েই বলিলেন, "জ্ঞানানন্দ আমাদের বিশেষ পরিচিত। তিনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি অদ্বৈতবাদী, শঙ্কর-মতানুলম্বী। পন্থাভেদে সাধন ভিন্ন হইলেও, তাঁহাকে আমরা ভিন্ন মনে করি না। কিন্তু যে জন্য আমরা তাহাকে ইদানীং ভিন্ন মনে করিতাম, আমাদেরও সে ভ্রম অপনোদনের এখন সময় আসিল। তিনি ভক্ত হইয়াও আমাদের মত অভক্তের নিকট, ভ্রষ্ট ভাবেই দৃষ্ট হইতেন, আজ তাহাকে প্রণাম করি।'

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্যোতিঃপ্রসাদ শশাঙ্ককে যথাযথ জানাইলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "জ্যোতিঃপ্রসাদ! ভক্তের প্রতিজ্ঞা সে নিত্যকাল পূরণ করে। কা'ল গ্রহণ, ব্রাহ্মণকে দান করিবার উপযুক্ত সময়। যদি কিছু ইচ্ছা থাকে, আয়োজন করিতে পার।"

ইতি পূর্ব্বেই শিবসুন্দরকে সাগরতলী হইতে আনান হয়, শশাঙ্ক ও শিবসুন্দরের আদেশেই জ্যোতিঃপ্রসাদ, দেবীগ্রামে উপস্থিত হন। নচেৎ সহসা তাঁহার, সে বল কুলায় নাই। লজ্জা ভয়ে, মন উদ্বেলিত হইয়াছিল।

জ্যোতিঃপ্রসাদ, শশাঙ্ককে বলিলেন, "ঠাকুর! কি করিতে হইবে—না হইবে, তাহা চিরকালই আপনি জানেন, আমি নাম মাত্র, আজ আমায় কেন সে ভার দেন।"

শ। তুমি যেরূপ, সে জ্যোতিঃপ্রসাদ আর নাই—তেমনি শশাঙ্কও, আর সে শশাঙ্ক নাই। বিষয়চিন্তা হইতে আমায় এখন অব্যাহতি দাও।

জ্যো। বিষয় এখন আর আমার নহে—আপনার। আমি আপনাকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিষয় হইতে অব্যাহতি লইয়াছি। আর আমায় বিষয় দিবেন না। যথেষ্ট দিয়াছেন—এখন আপনার বিষয় আপনি ফিরাইয়া লউন।

শশাঙ্ক চক্ষু মুছিলেন, বলিলেন, "জ্যোতিঃ! এ ভাব রাখা বড় কঠিন। সংসারে ফল্গু বৈরাগ্যের অভাব নাই। সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। যদি তাহা না হইত, তবে ভগবানের মায়া অচিন্তনীয়া দুর্ব্বিজ্ঞয়া কেন?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ কোন উত্তর করিলেন না; মনে মনে ভাবিলেন, —সেও তুমি জান ঠাকুর! আমি আর জানিতে চাহিব না। না জানিয়া মূর্খ আমি, যখন তোমার সম্মুখে পড়িতে পারিয়াছি, তখন আর জানা জানিতে প্রয়োজন নাই। বলিলেন, "কি করা হইবে, অনুমতি করুন।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "তুমি আমায় বিষয় দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছ, আমি বিষয় লইয়া কি করিব? আমি তোমার সন্তানকে সে বিষয় দিয়াছি। এখন বিষয় তোমার সন্তানের—সমগ্র পরিবারের। তাহাদের নিকট কিছু ভিক্ষা করিয়া তাহার বৈধী সেবায় যোগ দাও। তাহাকে আসন, কাষ্ঠপাদুকা, ছত্র, অঙ্গাবাস দিয়া গৃহ পবিত্র কর। তাহার বৈধী সেবা চালাইয়া, তাহার প্রসাদে কৃষ্ণমণ্ডিতে জীবন নির্ব্বাহ কর।"

এতক্ষণ শিবসুন্দর কোন কথা কহেন নাই—কেবল মৃদুমন্দ হাসিতেছিলেন। শশাঙ্ককে বলিলেন, "দাদা! আমাদের প্রজাবর্গ বড়ই কষ্টে আছে। একবার তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা হয়। তাহারা প্রহারের পীড়নে তখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া—যে মুখ দেখাইয়াছিল, আমার সেই মুখই হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। একবার তাহাদের হাসিমুখ দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়।"

তখন শশাঙ্ক জ্যোতিঃপ্রসাদে নানা কথা হইল। শেষে জ্যোতিঃপ্রসাদ বাড়ী গেলেন। শিবসুন্দর বলিলেন, "দাদা! একি—এ? স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ—সুবর্ণ হয় শুনা যায়, কিন্তু যে ইহা দেখিবে, তাহার আর ভ্রম থাকিবে না।"

শ। তাহার যাহা দেখাইবার ইচ্ছা,তাহা আমরা দেখিবার অধিকারী;. সমালোচনার প্রয়োজন নাই। মায়ায় সব—যাহারা মায়া—সে পারে সব। অতএব তাহার মায়া প্রতি দৃষ্টির আবশ্যক কি? সেই ভজনীয়।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ মায়াপুর কাছারিতে বড় ধূম। প্রবাদ—আজ হরসুন্দরের মাথায় সুপারি বসাইয়া কাষ্ঠপাদুকা প্রহার করা হইবে।

অতি প্রত্যুষে জমিদার-গৃহিণীর জোর তলপ। শশাঙ্ক বলিলেন, "কেন, বেণী! হাত মুখ ধুইয়া গেলে চলিবে না?"

বেণী, জ্যোতিঃপ্রসাদের কর্ম্মচারী। সে বলিল, "কেন, তাহা জানি না, মা ঠাকরুন বলিলেন, যত শীঘ্র পারেন যাইতে হইবে।"

শশাঙ্ক ইহার ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—এতদিন এই সংসারে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি, এক দিনের জন্য গৃহিণী কখন আহ্বান করেন নাই, আজ কর্ম্মে অবসর লইয়াছি বলিয়া কি তিনি ভৎ র্সনা করিবেন? বেণী তাঁহাকে অন্দর বাটীতে লইয়া গেল। গিয়া—গৃহিণীকে জানাইল। গৃহিণী কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ সংসার আপনার জন্যই বজায় আছে, যাহাদের হাতে করিয়া মানুষ করিলেন, শুনিতেছি নাকি কা'ল হইতে তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন? যাহারা বালক তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিয়াছে, আমি বিশ্বাস করিব কেন? না করিলেও একটা কথা কিরূপ শুনিতেছি? যদি তাহা সত্য হয়, ব্রাহ্মণের অপমান আমার সহ্য হইবে না, আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিব।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "মা! সংসার আমি রক্ষা করি নাই, কৃষ্ণ-কৃপায় এ সংসারে তুমিই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী। ব্রাহ্মণের অপমান ভয়েই আমি বিদায় লইয়াছিলাম। কিন্তু মা! আর ভয় নাই, কৃষ্ণের কৃপায় সে মতি দূর হইয়াছে।"

তখন অন্য অন্য কথার পর শশাঙ্ক বলিলেন, "সে বন্দবস্ত করিয়াছি, বিষয় আর নষ্ট হইবে না। আপনার মতি অনুসারেই ঈশ্বরেচ্ছায় দেবীপ্রসাদের জন্ম। দেবীপ্রসাদ এখন আপনার মাথা ধরা হইয়াছে। তাহার হস্তে বিষয় দিলে বিষয় রক্ষার জন্য আর ভাবিতে হইবে না। আপনারা এখন স্ত্রী পুরুষে খান—দান, কৃষ্ণে মতি দিন।"

তখন দেবীপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত। দেবীপ্রসাদ, শশাঙ্কের কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার বলুন দেখি? বাবার এ হঠাৎ পরিবর্ত্তনে আমার ভয় হইয়াছে। কা'ল রাত্রে সে জন্য বাবা বা আমি, উভয়েই বাড়ীর ভিতর শয়ন করিতে আসিতে পারিলাম না, রাত্রি অধিক হইয়া গেল।"

তখন শশাঙ্কের মুখে গৃহিণী ও দেবীপ্রসাদ সকল শুনিলেন। উভয়েরই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। উভয়েই শশাঙ্ককে প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ দেবীপ্রসাদ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন. "পিতা

থাকিতে আমি বিষয়ের কর্ত্তা হইতে পারিব না। বাবার যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে আর তাঁহার দ্বারা বিষয় রক্ষা হইবে না। বিশেষ তাঁহার এ ভাবে আমাদের বাধা দেওয়াই উচিত নহে। মা থাকিতে, আপনি থাকিতে, বিষয় ভাবনা আমার নাই। আমি সন্তান—সন্তানই থাকিব।"

গৃহিণী হাসিলেন, বলিলেন, "সন্তানের উপযুক্ত তুমি ; কিন্তু উনি বিষয় হইতে দূরে থাকিবেন, আর তুমি আমায় বিষয় দিয়া ভোলাইবে বাবা! কিছুতেই কাজ নাই, দেবতার নামে বিষয় হইলে, দেবতাই চালাইবেন। এতদিন উনি মানুষের চাকরি করিতেন, এখন উনি দেবতার চাকরি করিবেন, আমরা প্রসাদ পাইব। আর আমাদের বিষয়-সুখে কাজ নাই।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, "আজ আমি বাবার মন তুষ্টির জন্য, কয়েকটী কাজ করিব, আপনাদের তাহাতে মত কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "উঁহাকে বল।"

দেবী। হরসুন্দর বাবুর জমিদারী নিষ্কর হইবে। রায় পরগণা তাঁহার সংসার নির্ব্বাহের জন্য দান করা হইবে। তাঁহার যে সকল প্রজারা, বাবার দ্বারায় নিপীড়িত হইয়াছিল, তাহাদের জমি নিষ্কর হইবে। আজ রাত্রিতে হরসুন্দরের সমস্ত প্রজাকে আমি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইব। আমি তখন বাবার ভয়ে কিছু বলিতে পারি নাই, আজ বাবার মনের ভাব দেখিয়া আমার সে দিনের সাধ মিটাইব।

শশাঙ্ক বলিলেন, "দেবী! তুমি ধন্য। পুত্রের উপযুক্ত। যে মর্ম্মে তোমার এ ইচ্ছা, তোমার দ্বারাই বিষয় রক্ষা হইবে। বিষয়ের মূল্য তুমি বুঝিয়াছ। আমি আশীর্ব্বাদ করি—তোমার কৃষ্ণে মতি হউক।"

তখন শশাঙ্ক বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। দেখিলেন—জ্যোতিঃপ্রসাদ ইষ্ট পূজায় গাঢ় নিবিষ্ট। শশাঙ্ক ডাকিলেন না। ক্ষণেক পরে জ্যোতিঃ-প্রসাদ, শশাঙ্কের নিকট আসিয়া বসিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদকে দেখিয়া শশাঙ্ক বলিলেন, "একি? কণ্ঠে মালা কখন ধারণ করিলে?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন, "রাত্রিতে ধারণ করিয়াছি। আপনাকে লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।"

শ। লজ্জা কি? উত্তম করিয়াছ।

জ্যো। আমি যা ছিলাম, তাহাই আছি। আমি কি কণ্ঠী ধারণের উপযুক্ত?

শ। এ ইচ্ছা হইল কেন? উহাতে কি ধর্ম্ম হইবে?

জ্যো। ধর্ম্ম হইবে কি—না হইবে. তাহা ভাবি নাই। পূর্ব্বে আপনার মালা দেখিয়া আপনাকে বিদ্রূপ করিয়াছি। এখন আপনাকে মালা বড় শোভা পাইতেছে দেখিয়া, সেই স্মরণের জন্য তুলসীর মালা পরিতে ইচ্ছা হইল। বিশেষ, মনে হইতেছে, আপনাদের যাহা ভাল লাগে, আমার যেন তাহাতে বিচার না আসে এবং তাহাই ভাল লাগে।

শ। ভাল ভাল। দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি। মালা ইত্যাদির সেবাই ধর্ম্ম নহে, কৃষ্ণ সেবার জন্য,—ইহা যেন মনে থাকে। যদি কৃষ্ণে মতি না থাকে, তবে মালা ধারণে ধর্ম্মধ্বজী হইলে, অপরাধে পড়িতে হইবে। কৃষ্ণে মতিই প্রয়োজন, মালা ইত্যাদি উপলক্ষ্য মাত্র।

তখন শশাঙ্ক দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিয়া লইলেন। এ দিকে বেলাও হইল। উভয়েই গৃহে গিয়া বসিলেন। শশাঙ্ক, দেবীপ্রসাদের ভাব সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "উহাকে যখন আপনিই বিষয়ে বসাইয়াছেন, তখন এ ভাব আশ্চর্য্যের নহে। এখন দেখিতেছি, এ সকলই ভগবানের কৃপা—মানুষের সাধ্য কিছুই নহে।"

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ এক খানি জোড় শশাঙ্ককে দেখাইলেন। শশাঙ্ক বলিলেন "এ কি করা হইবে?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ তখন ছত্র, পাদুকা ইত্যাদি শশাঙ্কের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "আপনার অনুমতিতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে। শশাঙ্ক তাহাতে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন।"

হঠাৎ বহু দিক হইতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শশাঙ্ক বলিলেন, "গ্রহণের ত দেরী আছে?" এই বলিয়া তিনি বাহিরে দাঁড়াইলেন,

দেখিলেন—সম্মুখেই পাল্‌কি হইতে হরসুন্দর অবতরণ করিতেছেন। জীবসুন্দর, নটনারায়ণ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহা দেখিয়া শশাঙ্ক, হরসুন্দরকে—জ্যোতিঃপ্রসাদ, নটনারায়ণ, জীবসুন্দরকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আসনে বসাইলেন।

শশাঙ্ক শিবসুন্দরকে নিজ বাটী হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিবসুন্দর আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। উভয়ের দৃষ্টি, যখন উভয় চক্ষে মিলিত হইল, তখন চারিদিক হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা এরূপ নিনাদিত হইয়া উঠিল যে, কেহই আর সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিলেন না।

তখন গ্রহণ লাগিয়াছে। ক্ষুদ্র জোনাক শিবসুন্দর, হরসুন্দরের পার্শ্বে, হরসুন্দরের প্রভারূপেই দীপ্তিমান। সেই দীপ্তিতে যেন জীবসুন্দর, শশাঙ্ক মণ্ডিত ভাবেই আশ্রিত।

হরসুন্দর, শিবসুন্দর যেন দারু মূর্ত্তি। বহুদিনের পর পিতা, পুত্রে দেখা, কিন্তু কোন কথা নাই, কেবল চক্ষে ধারা।

এইরূপে বহুক্ষণ কাটিল। হরসুন্দর মধ্যে মধ্যে তামাক টানিতেছেন বটে, কিন্তু বাহ্য চেতনা তাঁহার নাই। তখন শশাঙ্ক যোড়টী হস্তে ধরিয়া বলিলেন "একবার উঠিতে হইবে, জ্যোতিঃপ্রসাদের বড় ইচ্ছা, এই জোড়টী পরিতে হইবে। আজ তোমার সংসারে একটী দাস বাড়িল, আর একটী যাহা হারাইয়াছিল, টিকির টানে সে হাজির হইল।"

এই বলিয়া আগ্রহে হরসুন্দরকে কাপড় খানি পরাইয়া দিলেন। পরে একখানি স্বতন্ত্র আসনে তাঁহাকে বসাইলেন। হরসুন্দর বলিলেন, "কর কি ?"

শ। দেখ না কি করি ?

তখন যজ্ঞোপবীতটী খুলিয়া একটী নূতন যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিলেন। ইঙ্গিতে নটনারায়ণকে ডাকিলেন, বলিলেন "করিতেছ কি ? ছাতাটী খুলিয়া মাথায় ধরিয়া আজ জীবন সার্থক কর। এমন দিন আর পাইবে না।"

হর। শশাঙ্ক! তুমি বাহ্য দিয়া অন্তর ভুলাইতেছ। বালক তাহা লইতে পারিবে কেন? সামান্ত আমি, আমা অবলম্বনে এ বাহ্যের প্রয়োজন কি? তবে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, পূর্ণ কর।”

এই বলিয়া স্থির হইলেন। কিন্তু এবার তিনি স্বেদ, কম্প, পুলকে যেন আপ্লুত হইলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল।

শশাঙ্ক বলিলেন,—“কেবল অন্তর্দ্দশায় থাকিলে চলিবে না। গুরুদেব—শ্যামসুন্দর, অপ্রকট কালে তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ করিয়া যান, আজ আমি পিতৃধন তোমার নিকট বুঝিয়া লইব।”

শশাঙ্কের বাক্য শুনিয়া হরসুন্দর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদকে ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতে জ্যোতিঃপ্রসাদ, হরসুন্দরের মস্তকে অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার চরণে কাষ্ঠ-পাদুকা পরাইয়া দিতে গেলেন। হরসুন্দর তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন,—‘বাবা! উহাতেই হইয়াছে আর কেন? পাদুকা পরিয়া কি বসিয়া থাকা যায়?” এ বাধায় হরসুন্দরের সে মুখ জ্যোতিতে—হস্ত-স্পর্শে জ্যোতিঃপ্রসাদ বুদ্ধি হারাইলেন। সে বাধায় যেমন তিনি পাদুকা লইয়া উঠিবেন—অমনি তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হস্ত কম্পিত হইয়া আর পাদুকা ভার সহিতে পারিল না। পাদুকা সশব্দে হরসুন্দরের মস্তকে, গুবাকোপরি পতিত হইল। অর্ঘ্য দিবার কালে অর্ঘ্যের সঙ্গে হরসুন্দরের মস্তকে যে একটা গুবাক পতিত হইয়াছিল, তাহা জ্যোতিঃপ্রসাদও দেখেন নাই, এবং হরসুন্দরের বৃহৎ শিখায় যে তাহা লুকাইয়াছিল, হরসুন্দরও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। তাহা দেখিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ আর স্বভাব ধারণ করিতে পারিলেন না, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অমনি শশাঙ্ক লম্ফ দিয়া আসিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদকে কোলে তুলিলেন, তাঁহার চক্ষু-জলেই জ্যোতিপ্রসাদের চেতনা আসিল।

হরি! হরি! এ আবার কি! হরসুন্দরের ঈক্ষণে জীবসুন্দর,

শশাঙ্ক, নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদের অবিদ্যাগত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেন ক্রমশঃই দূরগত। যোগনিদ্রার সে জাগরণে, বিদ্যার সে নূতন মন, বুদ্ধি, দাস অহঙ্কারের উদয়ে, অবিদ্যাগত মন, বুদ্ধি যেন অস্পষ্ট। এত অস্পষ্ট, যেন সে জগৎ আর নাই—আছে কি নাই—সে বিবেচনা করিবার তদ্গত সে মনও যেন আর নাই।

তাহাতে জীবসুন্দর, শশাঙ্ক, নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদ যেন কি এক অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় রসে নিমজ্জিত। সে নিমজ্জিতভাবে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা যেন একীভূত। বহু বহু সাধনায় যোগী যে ধর্ম্ম-মেঘ-গত আনন্দ সমাধি প্রাপ্ত, নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদ, যোগনিদ্রার জাগরণে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে নিমেষে সেই বিদ্যাগত স্বরূপে, স্ব-স্বরূপে আত্ম হারা। কিন্তু জীবসুন্দর, শশাঙ্ক সে জাগরণে প্রথমে জড়লিপ্ত—ব্রহ্ম-ভাবে, পরে লিপ্তালিপ্ত—শিব ভাবে, তৎপরে জড়ে নির্লিপ্ত—বিষ্ণুভাবে, শেষ—রাগাত্মিকা ভাবে—সেই মাধুর্য্যরূপী নিত্য ভগবানকে, তাঁহার লীলাপ্রকাশ বিগ্রহ—হরসুন্দর রূপ, অণু এবং দূরবীক্ষণে চিৎ, চিদ-চিৎ, অচিৎ শক্তির স্বরূপ মূর্ত্তিতে ত্রিভঙ্গ, শ্যামসুন্দর রূপে ক্রমিক দৃষ্টি করিলেন। সে দৃষ্টিতে, শুদ্ধাভক্তিতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতার যেন চিদ্রূপে পৃথক ভাবে উদয়। সে উদয়ে জীবসুন্দর, শশাঙ্ক যেন চিদ্রূপী জ্ঞাতা, সংযোজক সূত্রই যেন হরসুন্দররূপী প্রেমভক্তি, এবং সে সূত্রের আশ্রয়রূপ জ্ঞেয়, সেই মুরলীধর শ্যামসুন্দর—কৃষ্ণ। সে প্রেমভক্তি সূত্রে যেন জীবসুন্দর, শশাঙ্কও প্রেম-ভক্তি-ময় হইয়া, শশাঙ্ক—হরসুন্দর-গুরু, শ্যামসুন্দরে—এবং জীবসুন্দর—হরসুন্দরে অভেদ হইয়া গেলেন। আর যেন শ্যামসুন্দর, হরসুন্দর, শশাঙ্ক, জীবসুন্দরে ভেদ নাই। লীলা জ্যোতিতে,লীলা জ্যোতিঃ যেন এক হইয়া স্বরূপ প্রেম জ্যোতিঃ রাধিকায় আত্মসমর্পণে গোপী ভাবে উদিত। সে উদয়ে যেন দ্বিভুজ মুরলীধর নররূপী শ্যামসুন্দর—যুগপৎ শ্যামসুন্দর, হরসুন্দররূপী মুরলী বাদনে জীবসুন্দর, শশাঙ্করূপী গোপীকে তালে তালে নৃত্য করাইতে লাগিলেন। প্রকাশরূপ যেমন দ্বিবিধ, তেমনি বংশীও দ্বিবিধ। যেমন স্বরূপ বংশীতে বাদক স্বরূপ গীত—কৃষ্ণরূপে, তেমনি লীলাপ্রকাশ, শ্যাম-

সুন্দর, হরসুন্দররূপ বংশীতে কৃষ্ণ— গুরু রূপে। লীলা যেমন স্বরূপ বংশীরই লীলা বংশী, তেমনি শ্যামসুন্দর, হরসুন্দর, রাধিকারূপ স্বরূপ বংশীর লীলা বংশীর—এক এক বংশী। স্বরূপ যেমন এক, তেমনি স্বরূপ বংশীও এক। জীব যেমন অনন্ত, তেমনি অনন্তভাবে লীলাবংশীও অনন্ত। অনন্ত ভাবে মাধুর্য্যগত অনন্ত উপাসনা ভেদে, একা কৃষ্ণই, অনন্ত প্রেমের আশ্রয়।

এই বেণুবাদনেই চতুর্মাধুরীময় কৃষ্ণের বেণুমাধুরীর প্রকাশ। মাধুর্য্য তরঙ্গময় অমৃত-বারিধি নন্দ-নন্দন-বিগ্রহ, তাঁহার সমান বা তাঁহার অপেক্ষা স্থাবর, জঙ্গমে নিরতিশয় উল্লাস-বর্দ্ধক আর কোথায়? সেই বিগ্রহই—তাঁহার বিগ্রহ মাধুরী। নিখিল ভুবনে ভুবনে যে নাদ মাধুরী, উৎফুল্ল মনে কৃষ্ণের বেণুনাদের অপেক্ষা করে, যাহা দেবদেব সদাশিবেরও মোহ আনয়ন করে,—সেই বেণুনাদই কৃষ্ণের বেণু-মাধুরী। তাহার সর্ব্বলীলাই অত্যাশ্চর্য্য, তাহার মধ্যে যে গোপলীলা, তাহাই কৃষ্ণের ক্রীড়ামাধুরী। যে ঐশ্বর্য্যের কুত্রাপি শ্রবণ নাই, তাদৃশ অনন্ত ঐশ্বর্য্য রাশিই হরির ঐশ্বর্য্যমাধুরী।

তখন জীবসুন্দর, শশাঙ্ক ভগবৎসাম্মুখ্যে কৃতার্থ হওয়ায়, সে শ্যামসুন্দরের চতুর্মাধুরীতে কর্ষিত হৃদয়, আর ধারণ করিতে পারেন না। তাহাতে জ্যোতি হইতে—জ্যোতির অভ্যুগমের ন্যায়—হরসুন্দর হইতে—জীবসুন্দর, শশাঙ্ক,—যোগমায়ার পরাবৃত্তি গত দেশে উদিত হওয়ায়, চিদচিৎ ভাবে, চিদচিৎ মন, বুদ্ধিতে আরোহণে, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সে সাত্ত্বিকী-জ্ঞানে হস্ত যোড় হইয়া গেল। কণ্ঠ উৎফুল্ল হইয়া আপনি বাজিয়া উঠিল। সে বাদ্যে শশাঙ্ক গাহিলেন :—

হরি—গোবিন্দ—মধুসূদন—
রসিক রাস,বিহারী—ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
গোপাল জীব-জীবন,
নন্দ-আনন্দ ঘন,
বৃন্দাবন বিভাবন—সনাতন হে॥

সে ধ্বনিতে ক্রমে নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদের ও সে আত্মহারা ভাব, যোগমায়ার—যোগনিদ্রা স্বরূপে আবার আবৃত হওয়ায়—তদ্গত মন, বুদ্ধি—অহঙ্কারের সত্ত্ব-ভাবে পরিণত হইয়া গেল। সে আত্ম-হারা স্বভাবের অভাব ব্যথায়—নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদও বালকের ন্যায় ক্রন্দনে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

তখন নটনারায়ণ দেখিলেন—তাঁহার পূর্ব্বসখা জ্ঞানগুরু—জ্ঞানানন্দ• আজ বৈষ্ণব বেশে ধারাসিক্ত গণ্ডে, ভক্তি-প্রবাহে শশাঙ্ক-স্বরে অদ্বয় ভাবে গাহিতেছেন :—

হরি—গোবিন্দ—মধুসূদন—

আর একদল বৈষ্ণব খোল করতাল সঙ্গে—সেই সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে-ছেন :—

হরি—গোবিন্দ—মধুসূদন—

তখন নটনারায়ণ—জ্ঞানানন্দের পদধূলি লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাহিলেন :—

হরি—গোবিন্দ—মধুসূদন—

গুরু—গোবিন্দ—মধুসূদন—

তাহা দেখিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ—হৃদয় উত্থিত আনন্দভারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া—জ্ঞানানন্দ, নটনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন :—

হরি—গোবিন্দ—মধুসূদন—

রসিক রাসবিহারী—ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

গোপাল জীব-জীবন—নন্দ-আনন্দ ঘন,

বৃন্দাবন বিভাবন—সনাতন হে।

চতুর্থ খণ্ড।

অভিধেয়—প্রয়োজন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ওই যে দূরে দেবীগ্রামের প্রান্তভাগে, দূর্ব্বাদলমণ্ডিত বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রমধ্যে—সূর্য্যকিরণে উদ্‌ভাষিত বৃহৎ সৌধ অট্টালিকা—উহাই এখন হরসুন্দরের বাসমন্দির।

এ কীর্ত্তি জ্যোতিঃপ্রসাদের। উহার প্রাঙ্গণে নটনারায়ণের সেই পর্ণকুটীর, হরসুন্দরের বাস্তু জমিতে হাসিতেছে।

জ্যোতিঃপ্রসাদের আর সেদিন নাই। তিনি এখন হরসুন্দর-সংসারের দাস স্বরূপ। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার-ত্যাগী—বিষয় শূন্য বৈষ্ণব মাত্র। হরসুন্দর-গৃহেই তাঁহার আহার, বিহার, শয়ন—হরসুন্দরের আজ্ঞাতেই—মধ্যে মধ্যে পরিবারবর্গের তত্ত্বানুসন্ধান। জ্যোতিঃপ্রসাদ এখন অমানী, মানদ।

হরসুন্দরের অট্টালিকায় বাস—অভ্যস্ত নহে, ইচ্ছাও নহে। সেজন্য নটনারায়ণের পর্ণকুটীরই তাঁহার প্রিয়। গ্রামের দুই চারিজন গৃহ-হীন প্রতিবাসী—হরসুন্দরের আগ্রহে তাহাতে বাস করিতেছেন। হরসুন্দরের ইচ্ছাতেই জ্যোতিঃপ্রসাদের ইচ্ছা—এজন্য জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহাতে সমধিক সুখী।

এখন দেবীগ্রামে শশাঙ্ক, নটনারায়ণের নিত্য গতিবিধি। তাঁহা-দেরও আর সেভাব নাই। সংসারে—তাঁহাদের ছায়া মাত্র আছে, স্বরূপে তাঁহারা হরসুন্দরের নিকট নিয়তই অবস্থিত।

দেবীপ্রসাদের বন্দোবস্তে হরসুন্দরের আয় এখন যথেষ্ট; কিন্তু তাহাতে হরসুন্দর-পরিবারের লক্ষ্য নাই। তাঁহারা যেমন ছিলেন, আজও—তেমনি আছেন, যেমন খাইতেন, আজও—তেমনি খান, যেমন পরিতেন, আজও—তেমনি পরেন। তখনও যেমন ভিক্ষুক

ফিরিত, আজও—তেমনি ফিরে। ফিরিবেনা কেন? শিবসুন্দরের হস্তে এক পয়সা থাকিতে, বা গৃহে পায়স প্রস্তুত থাকিতে, কেহ ত ভিক্ষায় বিমুখ হয় না। অনন্ত দানেও—সে অনন্তের শেষ হয় না, তাহাতে দুঃখই বা কি? সুখই বা কি?

শিবসুন্দরের—জীবসুন্দর যাহাই করেন—তাহাই ভাল লাগে। তিনি সংসারে—বালকের ন্যায়। লোকের রোদনে—তাঁহার রোদন, হাস্যে—হাস্য, তাঁহার যেন নিজের অস্তিত্ব কিছুই নাই। ইংরাজি জ্ঞানে তিনি অবস্ত।

মধ্যাহ্নে, আহারের পর, বহির্ব্বাটীতে—শিবসুন্দরের পার্শ্বে জীবসুন্দর স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। সম্মুখে হরসুন্দর। কাহার মুখে কথা নাই। ঘরে যেন কেহ নাই।

অকস্মাৎ একজন দীর্ঘকায় পুরুষ, গৃহে প্রবেশ করতঃ—আপনিই উহাদের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জীবসুন্দরের মনে, নানা স্মৃতি আসিয়া খেলা করিতে লাগিল। তাঁহার ভাবে আগন্তুক, জীবসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমায় চিনিতে পারেন।"

জী। আপনার মুখ দেখিয়া পরিচিত মনে করিতেছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

আগ। আমি যে কন্যাটীকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছি, এখন তাহাকে আমার প্রয়োজন হইয়াছে—আনিয়া দিন।

সসম্ভ্রমে জীবসুন্দর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। উঠিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "হইয়াছে—অনেক দিনের কথা, সেজন্য ভুলিয়াছি—আমায় ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু আমি ত ক্ষমার যোগ্য নহি? যিনি জীবনদাতা—তাঁহাকে বিস্মরণ, ইহাত ক্ষমার যোগ্য নহে?"

আগন্তুক, জীবসুন্দরের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। বলিলেন, "বিস্মরণ, অবিস্মরণ মনের কার্য্য, আমার তোমায় লইয়া কথা, তোমাকে যাহা দেখিয়াছিলাম, আজ তুমি—সে তুমি নাই দেখিলাম। তাই

আমি তোমাকে আবার তাহা দান করিলাম। আজ হইতে পত্নীরূপে তাহাকে গ্রহণ করিবে। আজ হইতে তিনি আমার মা হইলেন। সংসারে যাহা দেখি নাই, তিনি তাহা দেখাইলেন, আমরা যোগ-ধর্ম্মে কি করিলাম? তোমরা পূর্ব্ব সাধনক্রমে তাহা দেখাইলে।"

তখন হরসুন্দর, শিবসুন্দর হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্যে জীবসুন্দরের চক্ষে ধারা বহিল, তিনি যোড় হস্তে আগন্তুককে বলিলেন,— "প্রভো! যখন প্রয়োজন ছিল, তখন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। লইয়াছিলেন —লইয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ক্ষুধিতের সম্মুখে অন্ন ধরিয়া, ক্ষুধিতের হৃদয় যন্ত্রণায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ সেই ক্ষুধা আর নাই। যখন ক্ষুধা নাই—প্রভো! তখন সে অন্নে আর প্রয়োজন কি? আপনার বস্তু, আপনি লইয়া যান। আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন সে ক্ষুধা—না জন্মে। তখন ক্ষুধায় কাঁদিয়াছিলাম, এখন অক্ষুধায় কাঁদিতেছি।"

এ কথায় আগন্তুক, জীবসুন্দরের মুখপানে তাকাইয়া—অনেকক্ষণ কি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পরে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"ক্ষুধা নাই! যদি নাই—কাহার কৃপায়?" আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন:—"আমরা যোগে মনকে নিরুদ্ধ করতঃ, ক্ষুধা হইতে নিবৃত্ত থাকি, অশান্ত চিত্তে তোমার অক্ষুধা উল্লেখে হাসি পাইলেও, তোমার মুখের ভাবে, তাহা মিথ্যা ভাবিতেছি না, শান্তচিত্তই অনুমিত হইতেছে। তোমার এভাব কাহার কৃপায়?"

এ কথায় জীবসুন্দরের ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, চক্ষু, জলধারায় প্লাবিত হইয়া গেল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। আবার আগন্তুক বলিতে লাগিলেন,—"তোমার এভাব সত্য, আমিই আমার হৃদয়-দর্পণে তাহা দেখিতেছি। আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমায় তখন চিনিতে পারি নাই, তাই পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলাম। তোমার বস্তু তুমিই গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন পরীক্ষায় মন অগ্রসর না হয়।"

জীব। যাহা দান করা হইয়াছে, আবার তাহা লইতে আদেশ—

এ অকৃপা কেন? আমি অন্ধ হইয়া নিজের দোষ নিজে কিরূপে দেখিব? আমার ত্রুটি শত কোটী, তাহা জানি—দেখাইয়া দিয়া আমায় কৃপা করুন। আমি আশীর্ব্বাদের যোগ্য না হইলেও—পাত্র বটে; কিন্তু আপনি আশীর্ব্বাদ কর্ত্তা, যাহাকে একবার আশীর্ব্বাদে রক্ষা করিয়াছেন, আবার তাহাকে এ অকৃপা কেন?

উভয়ের অবস্থা দেখিয়া হরসুন্দরও শিবসুন্দর হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে আগন্তুকের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। পরে বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিলেন, দাঁড়াইয়া—জীব-সুন্দর লক্ষ্যে বলিলেন,—"বৎস! আমি চলিলাম, এখন তোমার বস্তু—তুমি লইতেও পার—না লইতেও পার—সে তোমার ইচ্ছা। আমি যে ঋণে বদ্ধ ছিলাম, তাহা হইতে মুক্তি দাও, ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—আর যেন এ গুণ-কর্ম্মে লিপ্ত না হইতে হয়। ইহা যে ভক্তি বিরোধী—তাহা বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি বলিয়াই, আজ তোমার নিকট, তোমার বস্তু ফিরাইতে আসিয়াছি. কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা পাইলাম না, তাহা—আমায় লুকাইলে। সে দোষ তোমার নহে—আমার। এখনও আমার সে সময় বোধ হয় আইসে নাই। কিন্তু জানিও, আমি বড় কাঙ্গাল, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল—তাহা তুমিও একদিন দেখিয়াছ—যাহার জন্য সে ঐশ্বর্য্য ফেলিতে হইয়াছে—তাহার জন্য আমি বড় কাঙ্গাল। না ফেলিলে, সে কাঙ্গালের ঠাকুরের দর্শন মিলে না, তাই আমি—সে ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া তাহার জন্যই ফিরিতেছি।"

জীবসুন্দর একবার শিবসুন্দরের প্রতি চাহিলেন। শিবসুন্দর একবার হরসুন্দরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন।

তখন শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত। আসন গ্রহণ করিয়া শশাঙ্ক, হরসুন্দরকে বলিলেন, "আবার একটী ভাগীদার জুটিল নাকি? উহার মুখ দেখিয়া—তাহাই ত বোধ হইতেছে।"

হরসুন্দর কোন কথা কহিলেন না, কেবল একটু মৃদু মন্দ হাস্য করিলেন। তাহা দেখিয়া শশাঙ্ক বলিলেন, "ওইত তোমার দোষ, অন্তরে অন্তরে লোকের পিছন ধরিয়া টানিবে, আর বাহিরে যেন

জড়ভরত, তোমার এ শঠতা শিক্ষার যে গুরু, সে ত প্রসিদ্ধ ননীচোরা, নচেৎ আমাদের কি গরু বানাইতে পারিতে ?" আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বসুন, যাহার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, সে ত সর্ব্ব স্থানেই আছে—এখানেও আছে। তবে আর ঘুরিয়া ফিরিয়া কি লাভ ? আসন গ্রহণ করুন।"

আগন্তুক, শশাঙ্কের মুখ-ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন—আমার সে যোগবল কোথায় ? বাল্যাবধি বনে বনে ফিরিয়া যে সিদ্ধি লাভ, সে সিদ্ধিত সামান্য, এ চক্ষু-আকর্ষণ কোন্ শক্তির ? কাহাদের নিকট ছুঁচ বেচিতে আসিয়াছিলাম, ছি! ছি! করিয়াছি কি ?

"আগন্তুকের ভাব দেখিয়া শশাঙ্ক হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন যোগিন্! আপনি কাহার জন্য যোগী ?"

আ। আমি যোগী ছিলাম, এখন সে যোগও ছাড়িয়াছি। আমি এখন যোগী নহি।

শ। কেন ?

আ। যোগে ভগবান মিলিল না।

শ। কি মিলিল ?

আ। সমাধি।

শ। চাহিয়াছিলেন কি ?

আ। চাহিয়াছিলাম সমাধি—এখন চাহি ভগবান।

শ। সমাধিতে কৈবল্য, কৈবল্যেই পরমাত্ম-নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণে কি—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, থাকে ? আপনি যে জ্ঞাতার স্বরূপে ভগবৎ-প্রার্থনায় উপস্থিত ?

আ। সাযুজ্যেই থাকে না—তাহাই কৈবল্য গত নির্ব্বাণ—সালোক্য, সারূপ্যে থাকে। তবে মায়াগত জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা থাকে না বটে, এজন্য শাস্ত্রের ও বাক্য।

শ। ভগবানে কি প্রয়োজন ? যোগ-শক্তিতে আপনার ত কিছুরই অভাব নাই ?

আ। তখন অভাবের তাড়নায় পূজা করিয়াছিলাম, এখন স্বভাবে তাহার পূজার ইচ্ছা।

শ। কেন?

আ। জানি না। বোধ হয়—ইহাই আত্মার স্বভাব। ভগবদ্‌-ভক্তিই—আত্মার জীবন, সেবাই কর্ম্ম, প্রেমই জীবন-জীবন। কিন্তু ভক্তিহীন আমি, ভক্তির সাধন সাধি নাই—ইহাই দুঃখ।

শ। ভক্তির সাধন নাই, ভক্তিই সাধ্য।

আ তবে ভক্তি-যোগের সাধন কি?

শ। অবিদ্যার জ্ঞান, কর্ম্ম দূরীকরণ, বিদ্যায় স্বগত ভক্তির পরানুশীলনে উৎকর্ষ সাধনা আত্মার স্বগত ভক্তি—নিত্য। জ্ঞান কর্ম্মরূপ আবরণের দূরীকরণে—তাহার প্রকাশ। যতদিন জ্ঞান কর্ম্মরূপ মেঘ, তাহাকে কখন আবরণ করে—কখন করে না, ততদিন সে ভক্তি—সাধন রূপা। মেঘের ধ্বংসে, যখন তাহার নিত্য প্রকাশ—তখন তাহাই সাধ্য।

আ। যোগ কি ভক্তি শূন্য? তবে যোগে ভগবান আকাশ কুসুম কেন?

শ। ওই মিশ্রা যোগ-ভক্তি অহঙ্কারই তোমার চক্ষু আবৃত করিয়াছে। কর্ম্ম ঘুচিয়াছে—কিন্তু জ্ঞান আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

আ। সত্য কথা—আমি তাহা বুঝিয়াছি। আমি উহাও ফেলিব। কিন্তু কি দিয়া ফেলিব, ওই অহঙ্কারই এতদিন আমায় তাহা জিজ্ঞাসা করিতে দেয় নাই, আজ যখন সেই অহঙ্কারই আমায় কৃপা করিতেছে, তখন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি—কি দিয়া ফেলিব? আমার বলে ত কুলাইতেছে না। সে বল—কে দিবে, সে ভক্তিবল ভিন্ন, চক্ষু ফুটে কই?

বলিতে বলিতে আগন্তুকের চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া হরসুন্দর, শিবসুন্দর, শশাঙ্ক, জীবসুন্দর চক্ষু-জলে সিক্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া অগন্তুক সকলের দিকেই যোড়হস্ত হইলেন; বলিলেন, "আমার জন্য আপনাদের চক্ষে জল—ধন্য আপনারা, আজ আমিও ধন্য।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "তবে এই বেলা একবার ডাক দেখি—সত্য হৃদয়ে একবার প্রাণের সহিত বল দেখি—অমানী, মানদ হইয়া কাঙ্গাল ভাবে একবার হৃদয়ে তাহার প্রতি চাও দেখি—অদর্শন ব্যথা জানাইয়া নিজের বল, বুদ্ধি, যোগ ফেলিয়া, কাতরে একবার ডাক দেখি—হরি হে—কৃষ্ণ হে —

আর বলিতে হইল না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন অগ্নির প্রভাবে, অগ্নি স্বরূপে নীত হয়, তেমনি যোগসম্পন্ন আগন্তুকের—শশাঙ্কের মুখভাবে, বাক্য শক্তিতে—হৃদয় যেন বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হৃদয়গত স্ফূর্ত্তি—যেন আর হৃদয়ে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। ইন্দ্রিয় দ্বারে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকায়, স্বেদ, কম্প, পুলক-প্রস্রবণে প্রকটিত হইতে লাগিল। সে প্রস্রবণে স্নাত হইয়া চক্ষু যেন দিব্য ভাবে, কি এক নূতন জগৎ দেখিল, সে নূতন জগতে চিদঙ্গ-ময় দিব্যবিগ্রহ, সব এই, কিন্তু যেন এ মাটীর গঠন নহে। সম্মুখে এই চারিজন, ইঁহারা কিন্তু যেন, তাঁহারা নহেন্। হরি! হরি! আগন্তুক তখন, সে হৃদয় বেগ আর ধারণ করিতে পারিলেন না, নৃত্য করিতে লাগিলেন।

সে নৃত্য আর থামে না। হরসুন্দর বলিলেন, "শশাঙ্ক! যখন যেদিকে যাইবে—সেই দিকেই বাড়াবাড়ি! বাহিরের লোকে দেখিলে বলিবে কি?"

শ। বলিবে কি? তুমি লুকাইয়া লুকাইয়া খাইবে—আমি তাহা ধরাইয়া দিব। ধন বিতরণ কর; স্পর্শ মণির—স্পর্শ মণি প্রসবে, পূর্ণতার হানি ত হয় না—তবে সাধারণ বঞ্চিত হইবে কেন?

হর। সাধারণ-দরদের কথা আর তুলিও না, একদিন যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে দিয়াছিল।

শশাঙ্ক আর কোন উত্তর করিলেন না। আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি দেখিলে, কি শুনিলে—যে অত নৃত্য? উহা সাধুর অন্তরের ধন নহে--বিতরণের; স্থির হও—তামাক খাও।"

এই বলিয়া তাঁহার হস্তে হুঁকাটী দিলেন। একবার তামাক টানিতে না টানিতে—আগন্তুকের সে ভাব আর নাই। তিনি যেন পূর্ব্ববৎ। আগন্তুক এক দৃষ্টে শশাঙ্কের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—জ্ঞান, যোগ মার্গে—যে স্ফূর্ত্তি, তাহা কেবল অন্তর মুখে। ভক্তি মার্গে তাহা অন্তর মুখেই বদ্ধ নহে। অন্ত-র্ব্বহির্ম্মুখ এক হইয়া যায়। না হইলে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির বন্ধন ঘুচে কই? এতদিনে বুঝিলাম—নিবৃত্তিও বন্ধন। অন্তর, বাহ্য এক হইয়া যায় বলিয়াই, চিদ্‌ভাবে—বাহ্যও চিন্ময় হয়।

শশাঙ্ক দৃষ্টে বলিলেন, "সত্যই ভক্তির সাধন নাই—ভক্তিই সাধ্য। ভক্তির স্বতঃই উদয়। জড়াবরণে জীব তাহা দেখিতে পায় না। জড় ত্যাগে, কুণ্ডলিনী মহাবিদ্যারূপা—মহাকুহকিনীতেও অর্দ্ধাবৃত থাকে, তাই তাহার সম্যক দৃষ্টি হয় না; না হওয়ায়—ভক্তি অহৈতুকী হয় না; না হওয়ায়—আত্ম সমর্পণ হয় না; না হওয়ায়—সে হৃদয়,ভক্তিতে অভেদ হয় না; না হওয়ায়—ভেদ হৃদয়ে কৃষ্ণের উদয় হয় না। পরাবিদ্যায় তাহা এক হইয়া যাইলে, এ ভেদ আর থাকে না; না থাকায় ভক্তির উদয়, সে উদয়ে হৃদয়ের আপ্লুত ভাব, সে আপ্লুত ভাব-বেগে তাহার ইন্দ্রিয়ে নির্গমন, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ।

"ভাল—তাহাই হইল, কিন্তু একটা কথা—ভক্তি-যোগেও ত এ ভাব সাধিতে হয়, সাধনায় তবেত এ ভাবের উদয়? আমি যে জ্ঞানে, তাহা হইতে নিত্য দূরে, সে জ্ঞানে, আমি যে তাহার—মহিমা কীর্ত্তন—নামের স্মরণ, ভক্তি-মনে এক দিনের জন্যও করি নাই? আমার প্রতি তাহার এত দয়া কেন? আমি যে কৃপার পাত্রও নহি।"

শ। তুমিই কৃপার পাত্র। যে ব্রহ্ম, পরমাত্ম পদও তাহার জন্য তুচ্ছ করিয়াছে—সেই তাহার ভক্ত। ভক্তি সাধনে ভক্তির উদয়ে, দিনের পর দিনে জীবের জড়াবরণ, বা মহাকুহকিনীর মহামায়া কাটে, তবে সে শুদ্ধাভক্তির মুখ দর্শন করে। তুমি যোগ-ধর্ম্মে তাহা অগ্রে কাটিয়া রাখিয়াছিলে, তাই আর কাটাইবার সময় অপেক্ষা করিল না, তাহার স্বতঃই উদয় দেখিলে। তখন উপেয় বুদ্ধিতে যে সাধন সাধিয়া-

ছিলে, এখন উপায় বুদ্ধিতে তাহাকে লইয়া, উপেয় ভক্তি লাভ করিলে। যাহাদের সে সাধনের অপেক্ষা আছে, তাহাদের উপায় বুদ্ধিতে সে সাধনের আবশ্যক ; কারণ প্রত্যাহার ভিন্ন, ভক্তির অহৈতুকী ভাব উপলব্ধি হইবার নহে।

আ। এখন বুঝিলাম—বিকার, নির্ব্বিকার—বিশেষ, নির্ব্বিশেষ—বৈচিত্র, অবৈচিত্র—বিলাস, অবিলাস—একেরই দুই পৃষ্ঠ। চিৎ চক্ষে এই সবিশেষই—চিৎ সবিশেষ, অচিৎ চক্ষে ইহাই - জড় সবিশেষ। এ দুয়েরই, বৈচিত্র রূপ চক্ষুতে প্রকাশ, অবৈচিত্রে - চক্ষু কোথায় ? কে দেখিবে ? কাহার দ্বারায় দর্শন। যাহাতে সে নির্ব্বাণ—সে তাহাতেই বদ্ধ, কারণ সেই বদ্ধ দর্শনই তাহার শেষ দর্শন। সে নির্ব্বাণে সে কৃষ্ণের তনুভাব্রহ্মে। কৃষ্ণের লীলা বিশেষে তনুভাব্রহ্মের বিশেষ,—পরমাত্মার জড় লীলায়, মহাকুহকিনীর যোগ-জ্ঞান বিশেষে, যখন আবার চিৎ স্ববিশেষ জ্ঞান, সে জ্ঞানে ভগবদ্ভক্তি, তাহাই মুক্তি। কারণ পূর্ব্বে নয়, বিশেষেই বদ্ধ ছিল, নির্ব্বাণে না হয়—বিশেষ অতিক্রমে নির্ব্বিশেষেই গতি হইল, কিন্তু সবিশেষে আসিলেইত সে আবার বদ্ধ ? তবে তাহার মুক্তি কোথায়? এ জ্ঞানের মুক্তি, মুক্তিই নহে। বিশেষে—নির্ব্বিশেষে সর্ব্বগতি হইল কই ? অতএব ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই - যদি হইত, তবে জ্ঞান, যোগমার্গে বহির্ম্মুখে, নিবৃত্তি মার্গেই স্থিতি কেন ? প্রবৃত্তিকে হেয়, নিবৃত্তিকে উপাদেয় জ্ঞান, তাহাও ত মায়িক। সে জ্ঞান, সমাধিতে না থাকিলেও—সমাধি ভঙ্গে থাকিবেই। সমাধি ভঙ্গই যদি মায়া হয়, তবে ত সমাধি ভঙ্গরূপ আবরণে, সে বদ্ধ। সমাধিতে অজ্ঞাত মাত্র। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ ভক্তি যোগে—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা, অন্তর্ম্মুখ, বহির্ম্মুখ, সব এক হইয়া যায়, সকলি চিন্ময় হয় ; হয় বলিয়া—বদ্ধ, মুক্তের স্মৃতি থাকে না, এদেশের স্মৃতি থাকে না, এদেশের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ভক্তিতেই মুক্তি, মুক্তিতেই স্বাধীনত্ব, স্বাধীনত্বেই জীবের স্বরূপ জ্ঞান, স্বরূপ জ্ঞানে ভগবদ্ ভজন, তাহার নিত্য সিদ্ধ ধর্ম্ম।”

শশাঙ্ক বলিলেন, “তুমি ধন্য, তোমার সুকৃতি ধন্য।”

আ। সুকৃতি, দুষ্কৃতি কর্ম্মগত। যাহা জড়কর্ম্মগত, তাহা চিদাকর্ষণে অক্ষম। তবে সুকৃতির মহিমা কেন? কৃপাই ধন্য।

শ। সাধু কৃপাই—ভক্তি-সুকৃতি।

আ। জড় কর্ম্মে—ভক্তি-সুকৃতির কিরূপে উদয় হয়?

শ। ভোগাবসান কাল অবধি সাধুর চিদচিৎ শক্তিতে স্থিতি। সে ভোগাবসানে, তাঁহার যে অচিৎ সম্বন্ধ—জ্ঞান, কর্ম্ম সুকৃতি, তাহাতে যে জীবের আকর্ষণ, সাধুর সে চিদচিৎ আভাসে, তাহার সে জ্ঞান, কর্ম্ম সুকৃতি আবৃত হয়, সে আবৃতে সে জীব, তখনই বস্তু নির্দ্দেশে অন্ধ হইলেও, সেই আভাসে, সেই জ্ঞান, কর্ম্ম-সূত্র বা সুকৃতি, সংশোধনে ভক্তি-সুকৃতি রূপে, নিরুপক্রমে স্থিতি করে। পরে ব্যক্ত ভাবে সোপক্রমে বাহ্য সম্পর্কে, পুরুষকারে দণ্ডায়মান হইলে, সাধুর তাহাতে কৃপা-দৃষ্টি হয়। হইলে, ভক্তি-সুকৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়। যাহার কেবল মায়া শক্তিতেই স্থিতি, তদ্‌যোগে যে, কর্ম্ম-জ্ঞান-সূত্র তাহা মায়াগত, কিন্তু সাধুযোগে অসাধুর যে জ্ঞান, কর্ম্ম, অসাধু অন্ধ হইলেও, সে জ্ঞান, কর্ম্ম —চিদচিৎ। চিদচিৎ হেতু, তাহাতে যে জ্ঞান-কর্ম্ম-সূত্র—তাহাও চিদচিৎ। এই ভক্তি-সুকৃতিতেই কৃষ্ণের কৃপা। কর্ম্ম-সূত্র জীব দেহে দ্বিভাবে অবস্থিতি করে—এক সোপক্রম, এক নিরুপক্রম। যাহা ব্যক্ত— তাহাই সোপক্রম, যাহা অব্যক্ত ভাবে—তাহাই নিরুপক্রম। সোপক্রম দ্বিবিধ রূপে কার্য্যময়ী। এক প্রাক্তন, এক পুরুষকার। বীজ যেমন মৃত্তিকা, জলে ক্রমে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব কর্ম্ম-সূত্রে যে, দেহ মনের উদয়, সেই উদয়ে, কর্ম্মসূত্রের যে ক্রম প্রকাশ বা অঙ্কুরিত ভাব, তাহাই প্রাক্তন, এবং সেই প্রাক্তনের যে বাহ্য সম্পর্কে মিশ্রকার্য্য রূপ, তাহাই পুরুষকার। সেই পুরুষকারে জীব কর্ত্তা বলিয়াই, প্রাক্তনের বলানুসারে ফলের ইতর বিশেষ হয়। হীন বলে ফলের অপ্রাপ্তিরূপ দুঃখ ভোগ, বল প্রাধান্যে প্রাপ্তিরূপ সুখভোগ। যাহার দ্বারায় এই সুখভোগ—তাহাকেই সুকৃতি, এবং যাহার দ্বারায় দুঃখভোগ—তাহাকেই দুষ্কৃতি বলা হয়। এই সুকৃতি দ্বিবিধ, এক চিৎ, এক অচিৎ। যাহার দ্বারায় চিৎ ঐশ্বর্য্য

ভোগ—তাহাই চিৎ বা ভক্তি-সুকৃতি, আর যাহার দ্বারায় অচিৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ—তাহাই অচিৎ বা জ্ঞান, কর্ম্ম গত-সুকৃতি।

আ। বুঝিয়াছি—আর বলিতে হইবে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন রক্ষার অবলম্বন হওয়াই, আমার ভক্তি-সুকৃতির উদয়। কর্ম্ম সুকৃতিতে আমার সে সংযোগ। আর সেই ভক্তি-সুকৃতিতে আমার এ সংযোগ।

তখন অতি ধীর ভাবে আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন—দিব্যানন্দ! তুমি যাহা বলিয়াছিলে—তাহা সত্য, অতি সত্য, কিন্তু আর আমার হরসুন্দরের জন্য ঘুরিবার প্রয়োজন নাই, যথাস্থানেই পঁহুছিয়াছি, তবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়—দেখিব।

অস্পষ্ট ভাবে এ কথা সকলেরই কর্ণে গেল। সকলেই তখন হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিতে পারেন—এ আগন্তুক কে? ইনিই সেই পূর্ণানন্দের বাল্যবন্ধু, ষড়ঙ্গযোগী—অচ্যুতানন্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বহু নদ, নদী অতিক্রমে পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ, দিব্যানন্দ—গয়াতীর্থে পঁহুছিলেন। এই স্থান হইতেই অচ্যুতানন্দ ভিন্ন পথ অনুসরণ করিলেন। কারণ, পূর্ণানন্দের ইচ্ছা—একবার শ্রীক্ষেত্র দর্শন। দিব্যানন্দের ইচ্ছা না থাকিলেও, গুরু-আজ্ঞা অবহেলনে তাহার ইচ্ছা হইল না। বিশেষ, কোথায় যে, সে বকুল তলার দিব্য মূর্ত্তির অনুসন্ধান হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তখন যথা তথা অনুসন্ধানই আবশ্যক। এক একবার মনে হইতেছে, হরসুন্দরই—সেই আগন্তুক, আবার পরক্ষণেই সন্দেহ আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। যাহাই হউক, সম্পন্ন যোগীর তাহাতে দৃকপাতও নাই। হৃদয় যেন তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে নিষেধ করিতেছে, সে দিব্য মূর্ত্তি যেন সম্মুখেই বোধ হইতেছে।

অচ্যুতানন্দ শ্রীক্ষেত্রাভিমুখ না হইয়া দেবীগ্রামে পঁহুছিলেন। কিন্তু কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। পথি মধ্যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়া ভিক্ষার আশায় বাটীর মধ্যে ঢুকিয়া, যাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন ও সে দর্শনে তিনি যে কার্য্যে উপনীত হইতে গিয়া, যে কার্য্যে উপনীত হইয়াছিলেন—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

পূর্ণানন্দ ও দিব্যানন্দ যথাসময়ে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। দেব-দর্শনে সে দিন গেল। অন্তবার পূর্ণানন্দ তীর্থে যেরূপ আনন্দিত হইতেন, এবার সে আনন্দ তিনি পাইলেন না। অন্তবার নবাগত ব্যক্তিদের যেরূপ ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেন, এবার সেরূপ দিলেন না। যাহারাই তাঁহার নিকট আসিলেন, তাঁহাদেরই নিকট কৃষ্ণ-মতি ভিক্ষা করিলেন। শেষ পূর্ণানন্দ দারুব্রহ্ম দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। নবাগত ভক্তেরা তাহার ভাব দেখিয়া কিছু বুঝিলেন না। তিনিও কাহাকেও কিছু প্রকাশ করিলেন না। রাত্রিতে নিভৃতে দিব্যানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "গুরো! আজ দেবতা সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিলেন কেন?" পূর্ণানন্দ বলিলেন, "বৎস! এ কথা বলিবার নহে, তবে তুমিই ভক্ত হইয়া গুরুর পথ প্রদর্শক, তাই তোমায় বলিতে ক্ষতি নাই। এতদিন দুর্জ্ঞেয় পরমাত্ম-জ্ঞানে অভেদে দেব-দর্শনে, যে ভাব হইত, আজ সর্ব্বান্তর্য্যামী অন্তর্ম্মুখী জ্ঞেয় ব্রহ্মে, পৃথক ভাবে দাঁড়াইয়া দাস-স্বরূপে যে, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলাম, না জানি তাঁহার চিন্ময় স্বরূপে কি আনন্দ উথলিয়া উঠে। সে ভিক্ষায় একদিনও উপনীত হইতে পারি নাই—তাই হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল।" তখন দিব্যানন্দও কাঁদিতে লাগিলেন। উভয়ের ক্রন্দনেই সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন দিব্যানন্দ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। দেব-প্রাঙ্গণে দিব্যানন্দ যোগাশ্রম হইতে যাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেন। দেখিলেন বটে—কিন্তু দেখায় বাদ পড়িল। দেখিলেন—নটনারায়ণ-গৃহিনী—চঞ্চলা—শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পার্শ্বে, যোগমায়া যেন সাক্ষাৎ ভক্তি-মূর্ত্তি রূপে দাঁড়াইয়া, আর পশ্চাতে সেই বাল্যবন্ধু—দেবেন্দ্র।

যোগমায়ার সে ঈক্ষণে দিব্যানন্দের, সেই বকুল তলার, সেই হৃদয়-ভেদী ভক্তি-প্রস্রবণ খুলিয়া গেল। বহিশ্চক্ষুগত এ জড় আবরণ, যোগ-চক্ষে যোগ-শক্তিতে আবৃত হইয়া গেল, আবার তাহাও ভক্তি প্রস্রবণেই ডুবিয়া গেল। হরি! হরি! তিনি আর সে হৃদয়-বেগ শমিত করিতে পারেন না। তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া অন্য স্থানে লুক্কায়িত হইলেন, পাছে দেবেন্দ্র অনুসন্ধানে তাঁহাকে ধৃত করেন।

অনেকক্ষণ পরে তিনি একটু স্থির হইলেন। কিন্তু বকুল তলার ন্যায় এবার আর সে আনন্দ হৃদয় হইতে লুকাইল না—জাগিয়াই রহিল। পূর্ণানন্দের নিকট আর যাইতে ইচ্ছা হইল না, এক নির্জন স্থানে বসিলেন, ভাবিলেন—একি? আমি সন্ন্যাসী, বিরক্ত, মায়া বহুরূপিণী, যোগমায়া তাহারই ত এক রূপ? তবে কি মায়া, যোগমায়া রূপে আবার গ্রাসে উদ্যতা? না—না যদি তাহা হইত, তবে সে ঈক্ষণেও ভক্তি-প্রস্রবণের উদয় কেন? মনের ত এ বিবাদ—মিটে না, শেষ মায়ারই যে এ যোগমায়া মূর্ত্তি—তাহাই স্থিরীকৃত হইল। হায়! হায়—যোগী, তোমার যোগ-জ্ঞানের দৌড় কি এই অবধি? হইবে না কেন? পরাবিদ্যাই যে যোগনিদ্রার ছায়ায়—মহাবিদ্যারূপিণী, মহাবিদ্যায় ছায়া আবরণত থাকিবেই।

ক্রমে চিন্তার পর, চিন্তায় দিন কাটিল। সন্দিহান চিন্তায়—মানুষ দুর্ব্বল হয়, মানসে ক্ষীণ হয়, কিন্তু এ কি? দিব্যানন্দের যেন সে ভাবে—পূর্ব্বাপেক্ষা বল-বৃদ্ধি, ভক্তি-প্রস্রবণে নিমজ্জন, সে যোগ-জ্ঞান যেন বকুলতলার দিব্যজ্ঞানে মণ্ডিত—একি? বহির্মুখে থাকিলেই, খাদ্যের আবশ্যক, এ বহির্মুখে ক্ষুধা, তৃষ্ণা কই? অন্তরমুখের সে যোগানন্দ, অন্তর্ব্বহির্মুখের এ আনন্দে যেন—গোষ্পদ তুল্য। হরি! হরি! ভগবন! যোগমায়া কি? সেই যোগমায়ার এ মূর্ত্তি কোথা হইতে? আমি আজও যাহার জন্য লালাইত, সংসারে যোগমায়া তাহাতেই মণ্ডিত কিরূপে?

রাত্রি অধিক হইল। দিব্যানন্দ যোগমায়ার জন্য অধীর হইলেন। ভাবিলেন—ধর্ম্ম হউক, অধর্ম্ম হউক, পাপ হউক, পুণ্য

হউক, জ্ঞান হউক, অজ্ঞান হউক—ইহা যদি মায়া হয়, ভক্তি না হয়, তবে সে ভক্তিতেও কায নাই। আগন্তুক! তুমিই ইহাকে ভক্তি বলিয়াছিলে! তাই আজি আমি হৃদয়ে তোমাকে গুরুরূপে বসাইয়া—শিষ্যরূপে তোমার প্রসাদই গ্রহণ করিলাম। আর আমার যোগ-শক্তিতে কায নাই, কায নাই কেন? চক্ষের উপর দেখিতেছি—সেই যোগ শক্তিই দাসীরূপে—ভক্তি-শক্তিভাবে উদিত হওয়ায়—আর যে আমি যোগমায়ার অদর্শন ব্যথা সহ্য করিতে পারিতেছি না।

তিনি যোগমায়ার সন্ধানে উঠিলেন। কিন্তু এখন যোগমায়া কোথায়? কুলাঙ্গনা, এ রাত্রিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ, সমাজে অসম্ভব। অথচ তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহির হইলেন। পথ অতিক্রমে—পথ-পার্শ্ব-গৃহে কি এক মধুর ঝঙ্কার শুনিলেন। ক্রমে সেই ঝঙ্কার কর্ণপাতে জানিলেন—যোগমায়ার এ ভক্তি-বীণা-ঝঙ্কার। পর্ণকুটীর, দ্বার রুদ্ধ নহে, তাহাও দেখিলেন।

দেখিলেন—চঞ্চলা, দেবেন্দ্র নিদ্রিত। যোগমায়া একা বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে সে ভক্তি-বীণার ঝঙ্কার—কিন্তু তাহাতে চঞ্চলা বা দেবেন্দ্রের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।

সে ঝঙ্কারে দিব্যানন্দের আবার মস্তক ঘুরিল, তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করতঃ, যোগমায়াকে ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতে যোগমায়া তাঁহার পদানুসরণ করিলেন।

দিবসে যোগমায়া দিব্যানন্দকে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলেন নাই। কেন বলেন নাই? পাছে দেবেন্দ্র বা চঞ্চলা—তাঁহার ধর্ম্ম-পথের কণ্টক হন। তবে সে ঈক্ষণে হরসুন্দরকে হৃদয়ে ভাবিয়া বলিয়াছিলেন,—গুরুদেব! তোমার কৃপায় মায়া কাটাইব। কিন্তু এই নরনারায়ণ—আমার স্বামী, ভর্ত্তা, দেহ-কর্ত্তা, এ মায়া-জ্ঞান শরীর থাকিতে যাইবে না। কিন্তু যদি ইহাকে ভক্তি স্পর্শে—স্পর্শ মণি করিয়া লও—তাহা হইলে, আর সে মায়া-পতি, ভর্ত্তা, কর্ত্তা, জ্ঞান থাকে না, উভয়েই প্রকৃতি হইয়া একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণের পূজায় ব্রতী

হয়। ধন্য যোগমায়া—তুমি ধন্য! বুঝি বা সেই প্রার্থনায় দিব্যানন্দের সে আনন্দ-প্রস্রবণ।

নরনারায়ণের মুখে সেই ভক্তি-ছবি দেখিয়া, যোগমায়ার কৃষ্ণ কৃপার কথা মনে পড়িল। সে স্মরণে তিনি ভক্তি-রসে দ্রব হইয়া—বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কোথায় যাইতেছি বা চঞ্চলাকে বলিয়া যাওয়া উচিত কি না—তাহা তাঁহার হৃদয়ে জাগিল না।

নরনারায়ণ, যোগমায়াকে সঙ্গে লইয়া আবার সেই নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ কাহার কোন কথা নাই। তখন নরনারায়ণ ভগ্নকণ্ঠে বহুদিন পরে ডাকিলেন—"যোগা!" যোগমায়া শিহরিয়া উঠিলেন। আবার সেই সংসার-ছবি চক্ষে সমুদিত হইল, কিন্তু হৃদয়ের ভক্তি-প্রস্রবণে তাহা দাঁড়াইল না।

নরনারায়ণ বলিলেন,—"যোগা! এতদিনে বুঝিলাম, ধর্ম্ম—সংসারে—বনে নহে, ধর্ম্ম প্রেমে—জ্ঞানে নহে, মায়া—অন্তরে, বাহিরে নহে। তুমি আমি মায়া—অবিদ্যায়, বিদ্যায় নহে। না বুঝিয়া সত্যে চ্যুত হইয়াছি; বুঝাইয়া আবার সত্যে গ্রহণ কর। ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হও। মায়ার নিকট বিদায় লইতে, অবিদ্যায় পরার নিকটও বিদায় লইয়া, যোগ-ধর্ম্মে ভোগাবসানে বৃথা দিন গেল—এখন সেই পরারূপে তোমার মায়ারূপ সম্বরণ কর। আর যেন তোমার মায়ারূপে মুগ্ধ হইতে না হয়। এতদিনে জানিলাম—তুমি সত্য সত্যই সহধর্ম্মিণী। যিনি জীবকে বদ্ধদশার ধর্ম্মে—সহধর্ম্মে, ভক্তি উন্মুখ করতঃ—জীবের মুক্ত দশাগত পরাধর্ম্মেরও সহায়—তিনিই সত্য সহধর্ম্মিণী।"

যোগমায়া, নরনারায়ণের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"বড় দেখিতে ইচ্ছা ছিল—যে হৃদয়ে যাহা সাজে, তাহা দিয়া সেই হৃদয় সাজাইলে, কেমন সুন্দর দেখায়—আজ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া—তাহা দেখাইলেন। আর কোন দুঃখ নাই—নাথ! এ সাজে যথা ইচ্ছা যাও—আমার নিষেধ নাই। যাহার নিকট যাইবে, সে যেমন তোমার—তেমনি আমার, তেমনি জগতের। একমাত্র সে—তাহার দ্বিতীয় নাই। আশীর্ব্বাদ কর যেন—সে যেখানে, আমি

সেথানে। আর আমার বলিবার কিছু নাই—আশীর্ব্বাদ কর, যেন—সে আমার—আমি তার। যদি আমার ভিক্ষা সে গ্রহণ করে, তবে আমার ভিক্ষা—যেন সে আমার অগ্রে—তোমায় গ্রহণ করে, কোলে তুলিয়া লয়—আমি পদতলে দাঁড়াইয়া যেন—তাহার পদসেবা করিতে পারি।”

এইভাব আনিতে গিয়া—লোকে, সাহজী ধর্ম্মের সৃষ্টি। মর্কট বৈরাগীর ঘরে ঘরে সেবাদাসীর কামসেবার অভ্যুদয়। ছায়ামায়ার অনুকরণই সর্ব্বস্ব। যাহা অনুকরণ—তাহা স্বরূপ নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীক্ষেত্র দর্শনে চঞ্চলার বড় সাধ। সংসারে আসিয়া—লোক তীর্থ ধর্ম্মে পুণ্যবতী হইয়া—স্বর্গসুখ ভোগ করে, কিন্তু নটনারায়ণের সেদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। বহুদিনের সাধ্য সাধনায় নটনারায়ণের মতি ফিরিল, কারণ প্রতিবাসীর মধ্যে দুই চারিজনের পরিবারও—ওই সঙ্গে যাইবেন। দুই চারিজন প্রতিবাসী সঙ্গে থাকিলেও—নটনারায়ণ সন্তুষ্ট নহেন। চঞ্চলা বলিলেন,—“তাহাতে আর ক্ষতি কি? আমাকে সকলে মার মত দেখে, বুড়া হইলাম তবুও—তুমি ক’নে বউর মত করিয়া রাখিলে—তীর্থ ধর্ম্ম হয় না। আমায় কে মন্দ বলিবে, মন্দ কাযত করিব না—যে মন্দ বলিবে, এখন যাহা হয় কর।”

নটনারায়ণ বলিলেন, “জান না ত—বিদেশ, বিভূঁই—কত আপদ, বিপদ আছে—তা কি বলা যায়? যদি যাইতে হয় তবে, দেবেন্দ্রকে সঙ্গে লও।”

চ। দেবেন্দ্র যাইবে কি?

নট। আমি বলিলে যাইতে পারে। উঁহার মাঠাকুরুণ ত যাইতেছেন?

চ। তা যদি হয়—তবে বড় বৌমাকে আমি সঙ্গে লইব? আহা! মার আমার কোন সুখই হইল না।

এই বলিয়া চঞ্চলা কাঁদিতে বসিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন—"এও ত মন্দ নহে, যাহা ভগবান করিবেন, তাহাই হইবে—তবে চিরদিন কাঁদিলে কি হইবে ?"

চ। আমি ত আর মন্দ কাজ করিব না, যে আমায় নিন্দা করিবে। আহা! সে গরিব, তাহাকেও আমার সঙ্গে দাও।

নট। বৈবাহিক মহাশয় মত দিবেন কি—না, কি জানি।

চ। না—তুমি আজই দেবীগ্রামে গিয়া তাহার বন্দোবস্ত কর। যদি তাঁহার আপত্তি না থাকে, একবারে সঙ্গে করিয়া বৌমাকে লইয়া আসিবে। আমায় ত কেউ মন্দ বলিতে পারিবে না, আমার কাজ ত আর পরে করিবে না—আমাকেই ত তাহা দেখিতে হইবে। গিন্নি হইয়া এ সকল না দেখিলে চলিবে কেন ?

নটনারায়ণ বলিলেন,—"না, তোমায় কে মন্দ বলিবে বল—পাঁচ শত বার এই এক কথার জ্বালায় কেবল আমিই মন্দ বলি—আর কে বলিবে।"

এই বলিয়া তিনি যথাসময়ে দেবীগ্রামে গিয়া হরসুন্দরকে সমস্ত জানাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হরসুন্দর ইহাতে রাজি হইবেন না। কিন্তু দেখিলেন—হরসুন্দর যেন আগ্রহে পাঠাইতে প্রস্তুত। তাহা দেখিয়া নটনারায়ণ চিণ্ময়ীর জন্য বলিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না।

যোগমায়ার তীর্থ দর্শনে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মাতৃ, পিতৃ আদেশে, শ্বশুর, শাশুড়ির ইচ্ছাতেই তাঁহার ইচ্ছা। কোন আপত্তিই উত্থাপন করিলেন না। সেই দিনই নটনারায়ণ, যোগমায়াকে নন্দীগ্রামে লইয়া আসিলেন, এবং যথা সময়ে দেবেন্দ্রের সঙ্গে চঞ্চলা, যোগমায়া এবং অন্যান্য প্রতিবাসী সকলে একত্রে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে কোন বিভ্রাট ঘটে নাই। দেব-দর্শনেও কোন অমঙ্গল ঘটে নাই, কিন্তু অদ্য প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে চঞ্চলা বা দেবেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। যোগমায়ার অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। প্রতিবাসীরা অন্য গৃহে ছিলেন, চঞ্চলার কাতর উক্তিতে

সকলেই এক গৃহে উপস্থিত হওয়ায়, হুলুস্থূল ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। প্রতিবাসী যে দুই একজন সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবেন্দ্রকে অসাবধান ইত্যাদি নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়া, শেষে চঞ্চলাকে বলিতে লাগিলেন, "আমরা ত তাহাকে প্রথমেই আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, জান—তাহার এই কাঁচা বয়স, স্বামি-সুখ একদিনের জন্যও পায় নাই—কি সাধে তাহার সংসার ভাল লাগিবে? বেশ হইয়াছে, এ পোড়া মুখ লইয়া ঘরে চল, নরাও যেমন তোমার শত্রু, এও তোমার তেমনি শত্রুতা করিল। তা আর ভাবিলে কি হইবে—সে ত আর ছেলে মানুষটী নহে যে, হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া বাহির করিব? সে রসভরে উধাও হইয়াছে। কে তাহার সন্ধান লইতে পারে? তবে সন্ধান করিতে হয়—করা যাইবে।"

এই বলিয়া সকলেই আহারের উদ্যোগে বসিলেন। দেবেন্দ্রের তাহা ভাল লাগিল না, তিনি বাহির হইলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—বাড়ী ফিরিব না। কিন্তু যোগমায়ার সতীত্বে সন্দেহ, তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও স্থান পায় নাই।

এইরূপে তিন চারি দিন অতিবাহিত হইল। যখন কোন সন্ধানই হইল না, তখন সকলেই দেশের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু চঞ্চলা, দেবেন্দ্র কোন মুখে দেশে মুখ দেখাইবেন? দেশে মুখ দেখাইতে দেবেন্দ্রের ভয় নাই, কিন্তু যোগমায়াকে ফেলিয়া দেবেন্দ্রের দেশে যাইতে আর ইচ্ছাও নাই। মনে মনে বলিলেন—নরনারায়ণ! বাল্যবন্ধু, বন্ধু ভাবিতে বলিয়াই কি—আজ আমা অবলম্বনে এরূপ কার্য্য ঘটিল। কেন আমি যোগমায়াকে আনিয়াছিলাম। যদি না আনিতাম—তাহা হইলেত এ বিপদ ঘটিত না। আমি সঙ্গে আসিয়াছিলাম কেন? না আসিলেও ত এ বিপদ ঘটিত? তবে আমি আসিয়া কি করিলাম?

সকলের তাড়নায় দেবেন্দ্রকে অগত্যা বাটী ফিরিতে হইল। মনে মনে স্থির করিলেন, যদি যোগমায়া বাটী ফিরিয়া না থাকে, তবে পুনরায় আসিয়া সন্ধান লইবেন। যদি সন্ধান না হয়, তাহা হইলে আর বাটী ফিরিবেন না।

বাটী পঁহুছিলে, এ সংবাদে নটনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে ভাবিলেন,—মা আমার অসতী নহে, হরসুন্দরের আত্মজা—অসতী হইতে পারে না; তবে ঘটনাচক্র কে বুঝিতে পারে? যখন আগ্রহে হরসুন্দর তাঁহাকে তীর্থযাত্রায় অনুমতি দিয়াছেন, তখন অবশ্যই কোন রহস্য থাকিতে পারে,—এ কথা কিন্তু তিনি কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না, কারণ তিনিও ইহার কিছুই জানেন না।

হরসুন্দরের সৌম্য মূর্ত্তিতে তাহা স্থান না পাইলেও, দিনে দিনে পাড়াপ্রতিবাসীর কুৎসায়, নটনারায়ণ বড়ই ব্যথিত হইলেন। সেজন্য পাড়াপ্রতিবাসীর সহিত তাঁহার কিছু মনান্তরও ঘটিল। ঘটুক, সে দিকে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, কেবল ঘটনা চক্রেই তাঁহার লক্ষ্য। দেবেন্দ্রকে আর অনুসন্ধানে যাইতে দিলেন না। দেবেন্দ্র ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বলিলেন, "দেবেন্দ্র! শিবসুন্দরের জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে চেষ্টায় কিন্তু ফল ফলে নাই। যেরূপে ফল ফলিয়াছিল, যদি তিনি হরসুন্দরের কন্যা হন, তবে সেই রূপেই ফল ফলিবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে দিন ত সেইরূপেই গেল। পরদিন যোগমায়ার বুদ্ধি ফুটিল। নরনারায়ণকে বলিলেন, "নাথ! বলিয়া আসা হয় নাই, মা যে ভাবিতেছেন! আমি কুলাঙ্গনা—আমার এরূপে নিশীথে অজ্ঞাত ভাবে বাড়ীর বাহির হওয়া ত ভাল হয় নাই—এখন উপায়?"

দিব্যানন্দ বা নরনারায়ণ বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু আমি তোমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না। তুমি একা যাইতে পারিবে?"

যো। আমি ত পথ চিনি না?

নর। আমি যদি সে বাড়ীর নিকট পঁহুছিয়া দিই।

যো। জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর করিব? আর এ কথা লোকেই বা বিশ্বাস করিবে কেন?

নর। আমি জানিয়াছি—তুমি গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী, তোমার তাহাতে ভয় কি? লোকের বিশ্বাস, অবিশ্বাসে প্রয়োজন কি?

যো। আছে। আমি উদাসিনী নহি—গৃহস্থ, আমার গুরু উদাসীন নহেন।

নর। আমার জানিতে বাকী নাই। আমি জানিলাম, বকুল তলার সেই আগন্তুক, আর কেহ নহেন, তিনি তোমারই পিতা, গুরু—হরসুন্দর।

যো। কিরূপে জানিলে?

নর। সেই দিন যাহা পাইয়াছিলাম, তোমার নিকটও তাহাই দেখিলাম, এ ধনের ধনী যে, সেই হরসুন্দর।

যো। তুমি ত যোগী, তোমার এ ধনে প্রয়োজন কি?

নর। আমি যোগী ছিলাম, ভক্তি-শক্তির পূজায় এখন ভক্ত হইব।

যো। তবে আমার সহিত যাইতে ক্ষতি কি?

নর। আমার সহিত আমার গুরু আসিয়াছেন, কামিনী, কাঞ্চনে তাঁহাদের সঙ্গ নাই।

যো। গুরুর ধর্ম্ম শিষ্য রাখিল না কেন?

নরনারায়ণ সে কথার উত্তর দিলেন না। যোগমায়া বলিলেন, "তুমি এখনও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী—যোগী, ভক্তি এখনও দূরে। ভক্তি অহৈতুকী হউক, তখন এ ব্যথা বুঝিবে। তোমাতে, যে অবিদ্যারূপিণী কামিনী এবং ত্রিগুণরূপা কাঞ্চন—সূক্ষ্ম, স্থূলে অর্দ্ধাঙ্গ ভাবে দেহ সাজে সজ্জিত, তাহাকেই কামিনী, কাঞ্চন বলা হয়। তাহাকে ফেলিয়া যতদিন না বস্তু-সিদ্ধিতে দাঁড়াইবে, ততদিন বাহিরের কামিনী, কাঞ্চন ত্যাগে যে ধর্ম্ম, তাহা মনের যোগ-ধর্ম্ম কল্পনা। স্বরূপসিদ্ধিতে অন্তর্ম্মুখ, বহির্ম্মুখ-দশা থাকিবেই থাকিবে, থাকিলেও সে কামিনী-কাঞ্চন—তখন বিদ্যায় চালিত হেতু, ভক্তের তাহাতে দৃষ্টি থাকে না। ভক্তি-পূজায় তোমার অবিদ্যা দৃষ্টি কেন? তবে যে শাস্ত্রের সে আদেশ, তাহা কেবল নিম্নাধিকারীর জন্য, সেজন্য তুমি উত্তম বলিয়াছ।"

সে রাত্রিতে নরনারায়ণ আর যোগমায়াকে দেখিতে পাইলেন না।

যোগমায়া যে কখন কোথায় গেলেন, যোগী নরনারায়ণের দৃষ্টি তাহা ধরিতে পারিল না।

পরদিন দিব্যানন্দ, পূর্ণানন্দের সহিত দেখা করিলেন। পূর্ণানন্দ বলিলেন, "ভিক্ষায় এতদূর যাইতে হয়? সহরে কি ভিক্ষা মিলে নাই, কাল কোথায় ছিলে?"

দিব্যানন্দ স্থির হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। হৃদয়ের সে আনন্দ-ভাব যেন হৃদয়েই নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু যোগমায়ার শেষ কয়টি কথায়, তিনি কিছু বিচলিত। যোগমায়া, চঞ্চলার নিকট গেলেন কি—না, সে সন্ধানও লইলেন, কিন্তু যোগমায়া সেখানেও আর যান নাই। তবে কোথায় গেলেন? এই সকল চিন্তা আবরণে সে স্ফূর্ত্তি যেন লুক্কায়িত।

নরনারায়ণ দেখিলেন—যখন লুক্কায়িত, তখন কামিনী-কাঞ্চনরূপ আবরণ, আমার সঙ্গে রহিয়াছে। যখন রহিয়াছে—তখন যে অবলম্বনরূপ কামিনী-কাঞ্চনে ভক্তি জাজ্বল্যমান, কামিনী-কাঞ্চনগত বলিয়া সে অবলম্বন ফেলিলে, সে ভক্তি লাভ হয় কই? না হইলে—রৌদ্র ভেদ করিয়া না গেলে—সূর্য্য লাভ, সে ত মনের কল্পনা! বিশেষ অগ্নিযোগে লৌহ যেমন আর লৌহ থাকে না, অগ্নিস্বরূপ হয়, তদ্রূপ সে ভক্তিতে, সে অবলম্বন সূর্য্যগত, তখন তাহাতে কামিনী-কাঞ্চন কোথা? না থাকিলেও, কামলগ্রস্ত ব্যক্তি, যেমন নিজ চক্ষু দোষে, জগৎকে হরিদ্রাবর্ণ দেখে, তদ্রূপ যে, কামিনী-কাঞ্চন দৃষ্টি, তাহা সে অবলম্বনগত নহে; দর্শকের স্বগত কামিনী-কাঞ্চনরূপ স্থূল, সূক্ষ্মগত দেহেরই দোষ। তবে যদি সে অবলম্বন, শুদ্ধাভক্তিগত না হয়, কামিনী-কাঞ্চনই হয়, তাহা হইলে দোষ বটে; কারণ স্বগত কামিনী-কাঞ্চনে যে ভারগ্রস্ত, আবার বাহিরের কামিনী-কাঞ্চনে সে আরও ভারগ্রস্ত হইবে, সেজন্য তাহা ত্যাগের। ত্যাগের হউক—ভালই, কিন্তু এই কামিনী শব্দ—কি কেবল জড়গত স্ত্রী মূর্ত্তিই? পুরুষমূর্ত্তি নহে? না—তাহা নহে, উভয় মূর্ত্তিই, কারণ এই যে স্ত্রী, পুরুষ মূর্ত্তি, ইহা প্রকৃতিরই বিলাস, যাহা প্রকৃতির বিলাস, তাহা পুরুষ হইতে পারে না।

প্রকৃতির এই স্ত্রী, পুরুষ বিলাসে জীব, অস্মিতায় মায়াপুরে বাস করে বলিয়াই, পুরুষ পদবাচ্য হইলেও, মায়ার প্রকৃতি, পুরুষ বিলাসে, সেই পুরুষই আবার মায়ার পুরুষ, প্রকৃতি অহঙ্কারে, পুরুষ, প্রকৃতি ভাবাপন্না। মায়া প্রকৃতি হেতু, তাহার সে পুরুষ, প্রকৃতি ভাবও প্রকৃতিগত, এহেতু স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই কামিনীপদবাচ্য। অর্থাৎ যে অবলম্বনে অবিদ্যা প্রতিভাস—তাহাই কামিনী। তবে স্ত্রী, পুরুষ মূর্ত্তি উভয়ই ত্যাগের, কিন্তু যে স্ত্রী, পুরুষ মূর্ত্তি বা অবলম্বনে, ভক্তির উদয়—তাহা ত্যাগের নহে। কারণ সে উদয়ে জীব, চিৎ স্বরূপেই অগ্রসর হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমার কাজ ভাল হয় নাই। যোগমায়া! তুমি যোগমায়ার ন্যায় আমায় ভক্তি-যোগে উন্মুখ করিলে, কিন্তু কামিনী কাঞ্চনের ভয় আমাকে আবরণ করায়, তুমিও আবরণে লুকাইলে। সত্য, আমার মত লোকের বাহ্যগত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই যুক্তিসিদ্ধ, জীব-কল্যাণেই শাস্ত্রের এ উপদেশ। কারণ, যদি আমার যোগমায়ার—কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি না পড়িত, তাহা হইলে এ বিকার আসিত না, স্ত্রী, পুরুষ জ্ঞান থাকিত না। যোগমায়াও চলিয়া যাইত না। যখন আসিয়াছিল, তখন একত্র সহবাসে তাহাতে যে ভক্তি, তাহা কামিনী-কাঞ্চন ঢাকিত, ঢাকিলেই কামিনী-কাঞ্চনের দৃষ্টি থাকিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, দুর্ব্বল পক্ষেই শাস্ত্রের বিধি। দুর্ব্বল হইয়াও অবিদ্যার জ্ঞানে, যিনি সবল মনে করেন, কামিনী-কাঞ্চন তাহাকেই গ্রহণ করে। স্বনিষ্টের কিছুই করিতে না পারিলেও, যদি তাহাদের তাহাতে অবিদ্যা বা পুরুষ অহঙ্কার জন্মে, তাহা হইলেই তাহারা গ্রাসযোগ্য; কিন্তু দাস অহঙ্কারে সে ভয় কোথায়? শিবসুন্দর! এতদিনে তোমার এ উপদেশ আমার স্মরণে জাগিল, আমায় ক্ষমা কর—কৃপা কর।

দিব্যানন্দের ভাব দেখিয়া পূর্ণানন্দ বলিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

তখন দিব্যানন্দ, যোগমায়া সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা করিলেন। পূর্ণানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে বাড়ী পঁহুছিয়া দেওয়াই, আমাদের উচিত ছিল, তাহাত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ছিল না, না দেওয়াই বিরুদ্ধ হইল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যোগমায়া সে রাত্রে নটনারায়ণের অজ্ঞাতে রাজপথে বাহির হইয়া, দেবেন্দ্র বা চঞ্চলার অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। অচেনা পথ, সহজেই দিগ্‌ভ্রম হয়। বিশেষ যোগমায়া এরূপ অবস্থায় আর কখন পড়েন নাই। মনে মনে ভাবিলেন—সকলি যাঁহার ইচ্ছায় হইতেছে, এও তাঁহারি ইচ্ছায়, তবে আমি তাহাতে মাথা দিয়া এ চিন্তায় ঘুরিয়া মরি কেন? তাঁহারি চিন্তাত আমার ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম আমি তাকাইলে, তাহার ধর্ম্ম সে যাহা করিবে, তাহাত চক্ষেই দেখিতে পাইব। এই ভাবিয়া তিনি রাজপথের দূরবর্ত্তী, একটী বৃহৎ বৃক্ষতলে, ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার ঘুচিল,—দিনের আভা দেখা দিল। যোগমায়া আর সে স্থানে থাকা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করিলেন না; কারণ গ্রাম্য পথ, মধ্যে মধ্যে তখন দুই চারি জনের গতিবিধিতে, তিনি লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন।

কিন্তু কোথায় যাইবেন? ইতস্ততঃ করিয়া দেবমন্দিরের একপার্শ্বে বসিয়া সে দিন কাটাইলেন। আবার রাত্রি আসিল। রাত্রিতে দেবমন্দিরে কাহারও থাকিবার হুকুম নাই, অগত্যা যোগমায়াকে রাজ পথে আসিতে হইল। কিন্তু আহার নাই; শরীর বড় দুর্ব্বল, আরতী দর্শনানন্তর তাঁহার সহিতই একজন স্ত্রীলোক আসিতেছিলেন। কিছুক্ষণ যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন, "হা মা! তুমি কোথা যাইবে?"

যোগমায়া কি উত্তর করিবেন—ভাবিতেছেন। স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "তোমার দেশ কোথায়? এখানে কাহার সহিত আসিয়াছ?" যোগমায়া তাঁহার অবস্থা তখন যথাযথ বলিলেন। স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "বুঝিয়াছি—আর বলিতে হইবে না, তুমি আমার সহিত আইস। আহা! কাল হইতে জলস্পর্শ কর নাই, ইহা শুনিয়া কি স্ত্রীলোকের প্রাণে সহ্য হয়? আমাদের আকড়া অধিক দূর নহে,

যে কয়দিন হয়, থাকিবে—কোন ভয় নাই, তারপর' সুবিধা পাইলেই তোমায় দেশে পাঠাইয়া দিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় যোগমায়া আকড়ায় পঁহুছিলেন। যোগমায়ার অনিচ্ছা সত্বেও, স্ত্রীলোকটী বিশেষ যত্নে যোগমায়াকে আহার করাইলেন। সে রাত্রি সেইরূপেই গেল। যোগমায়া দেবতা সম্মুখেই বসিয়াই থাকেন, পূজা ইত্যাদি কার্য্যে সহায়তা করেন, অন্য কিছুতেই যোগ দেন না, নিজের কোন চিন্তা কাহার নিকট কিছু বলেন না, মুখখানি সর্ব্বদা হাসি হাসি—ইত্যাদিতে, আকড়ার সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। এইরূপে যে, কয়দিন গেল, যোগমায়া তাহা গণিতে পারেন নাই। যোগমায়া আছেন ভাল, দেখিতেছেন সব, কিন্তু যে বিভা—হরসুন্দর,শিবসুন্দর, জীবসুন্দরের মুখে—খেলে,তাহা কাহারও মুখে খেলিতে দেখিলেন না। তাহাদের মুখে যে বিভা, তাহা—স্ত্রী, পুরুষের অনুরাগেই সর্ব্বস্থানেই খেলে। সেই বিভায় আবার আর একটী নূতন দেখিলেন, এমন নূতন—যাহা অনেকেরই নিকট নূতন। সেই আকড়ার দুই, দশজন সেবক—রাধা-ভাবলাভের জন্য স্ত্রীবেশে, স্ত্রীজন সুলভ অলঙ্কারে, শাটী পরিধানে গোপীজন-ভাবে নৃত্য বা হাব-ভাবাদি প্রকাশে, সাধনে ব্রতী।

তাঁহাদের দেখিয়া যোগমায়ার মনে হয়—এ কি ভাব? এ ভাব মায়ার—না পরার। যদি মায়ার হয়, তবেত তাহা হেয়—তুচ্ছ। যদি পরার হয়—তবে সে ভাব—সে বিভা—দেখি না কেন? জড় অলঙ্কার, জড়বেশ কেন? যে বেশ মনে করিলেই পরা যায়, যে নৃত্য মনে করিলেই নাচা যায়,তাহাই ইঁহাদের দেখিতে পাই—আর যাহা অহৈতুকী ভক্তি ভিন্ন পাওয়া যায় না, পরা যায় না, নাচা যায় না, তাহা ইহাদের কোথায়? ক্ষুধায় ভাত দিয়া পেট ভরাইলে আর যেমন সুখাদ্যও মিষ্ট লাগে না, যদি ইহাদের সত্যই তাহাতে ক্ষুধা, তবে এ জড়ে সাধ মিটান কেন? ইহাতে ত ভক্তির সে অনুরাগ নষ্ট হইবে বই—বৃদ্ধি হইবে না। বৃদ্ধি হইবে কি? রাজার সন্তান যেমন অতি দুঃখে না খাইতে পাইলেও ভুষি আহারে অশক্ত, তেমনি যদি ইহারা সত্য সে ভাবের

ভিকারী হইতেন, তাহা হইলে কি এভাবে প্রবৃত্তি হইত? যে যেমন—তার জোটে তেমন, ভগবানের এ খেলা নিত্য। ইহা সেই মহামায়ারই খেলা, এইরূপেই মহামায়া ইহাদের ভুলাইয়াছেন।

তাহাই বা কোথা? ইহারা কথাবার্ত্তায় যেরূপ, হৃদয়-ভাবে ত সেরূপ নহে। তবে কি ইহাদের অন্তরে কৃষ্ণকৃপার ভিক্ষা নাই? হরি! হরি! আর আমি এখানে থাকিব না। ইহা দেবালয় হইলেও ভজন স্থান নহে। কারণ, এখানে যাহা ভিতরে ভিতরে দেখিতেছি, সংসারে ইহার অপেক্ষা অধিক আবরক আর কি আছে, সংসারে যাহা আছে, দেখিতেছি এখানেও তাহাই আছে। তবে সংসারে প্রকাশ্য, এখানে অপ্রকাশ্য—এই প্রভেদ।

একদিন সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত আকড়াধারীর বচসা আরম্ভ হইল। সে বচসায় যে সকল শব্দের অভিব্যক্তি, তাহাতে আকড়াধারীর সহিত সে স্ত্রীলোকটীর যে কি সম্বন্ধ, তাহা যোগমায়ার বুঝিতে বাকী রহিল না। বিশেষ সে সকল শব্দ, সংসারে ভদ্র পরিবার মধ্যে কখন স্থান পায় না।

যোগমায়ার বড় ঘৃণা জন্মিল। সে অন্ন যে উদরে গিয়াছে, ভগবৎ-সেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে—ইহাই বড় দুঃখ। কিন্তু তিনি মুখে কোন কথাই প্রকাশ করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে, যে হৃদয় এ সকলের আশ্রয়, সে হৃদয় তাঁহার কথা লইবে না! কিরূপে লইবে? মায়া যে তাঁহাদের বিরোধী, যদি ভগবৎ-কৃপা দাঁড়াইতে স্থান পাইত, তাহা হইলে মায়া কি কখন বিরোধী থাকিতে পারে? মায়া যে পরম বৈষ্ণবী।

সেই রাত্রেই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। আকড়াতেই তাঁহার সহিত আলাপ। তিনি অন্য একটী আকড়ায় থাকেন। তিনি বলিলেন,—"যোগা! এ রাত্রে কোথায় যাইতেছিস? আমাদের ওখানে? তোকে ত কোথাও যাইতে দেখি না, আজ যে আমায় বড় মনে হইল?"

তবে আয়—এই বলিয়া তিনি তাঁহার আকড়ায় সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন।

আকড়ার কোন লোকেরই নিকট যোগমায়া অপরিচিতা নহেন, সেজন্য কেহই তাঁহার নিকট কিছু গোপন করেন না। তখন সকলেই একটী নিভৃত ভজন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহে বাহিরের কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই, কেবল যাঁহারা ভজন-প্রয়াসী এবং ধর্ম্ম-মর্ম্ম বিশেষ জ্ঞাত, তাঁহাদেরই সে গৃহে গতিবিধি।

তখন ভজন আরম্ভ হইল। যাঁহারা সাধক, তাঁহারা একটী প্রৌঢ়াকে বেষ্টন করতঃ, তাঁহার মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া, তাঁহার ভাব হৃদয়ে ভাবনা করিতে লাগিলেন। তিনি রাধিকা সতী হইয়া, রাধিকার হাব-ভাব-বিলাসে, বিলাস করিতে লাগিলেন। যোগমায়া সে হাব-ভাবে, নিজেই লজ্জিত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্ম ত দূরে থাকুক, যোগমায়া মনে মনে বলিলেন—প্রভো! ঠাকুর! এ আবার কোথায় আনিলে, যাহা দেখাইয়াছিলে, সে যে ইহা অপেক্ষা ভাল, আবার এ কেন? অবশ্য আমি অপরাধী, নচেৎ এ দর্শন আবার কেন? তখন তাঁহার শিবসুন্দরের কথা মনে হইল, শিবসুন্দর বলিতেন,—

"কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্ত্তন।
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥"

যোগমায়া মনে মনে বলিলেন,—দাদা! সত্য এ কথা, তখন এ কথা বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝিয়াছি, অপরাধশূন্যে নাম না করিতে পারিলে, নামের কৃপা হয় না। সে শক্তি হৃদয়ে সঞ্চার ভিন্ন, মায়া শক্তি মানুষকে এইরূপেই নাচায়, নচেৎ—

"সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবা মাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥"

এ কথার মহিমা নাই কি? ইহা যে ভগবদ্ বাক্য; ভগবদ্ বাক্যই যে ভগবান মনে করিতেও হাসি পায়, সাত নকলে আসল খাস্তা, সাধু বলেন:—

"আপন ভজন কথা— না কহিবে যথা তথা,
আপনাকে আপনি, হইবে সাবধান।"

ইহারাও সেই কথার দোহাই দিয়া, এ কদর্য্য ভাব আবরণ রাখেন। কিন্তু সাধুর নিকট তাহা অজ্ঞাত নহে, সে চক্ষু আবরণ, মায়ার সাধ্য নহে, তাই দাদা একদিন, একজন কর্ত্তাভজাকে বলিয়াছিলেন—

"যে বস্তু দিইয়া যেবা করয়ে ভক্ষণ।
উদ্গারেতে জানা যায় তাহার লক্ষণ॥"

সে কথা সত্য. যেমন কর্ত্তাভজা, তেমনিই ত ইঁহারা, কই প্রভেদ ত দেখিলাম না। কেবল নামে ভেদ মাত্র। বাহ্যে ইহারা সমস্তই গোপন করেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই যোষিৎসঙ্গ. সেই মর্কট বৈরাগ্য. সেই গ্রাম্য কথায় মগ্ন, ভক্তি কোথায়? যে নাম একবার স্মরণে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, হস্ত যোড় হইয়া যায়, চক্ষু আত্ম-সম্বরণ করিতে পারে না; সেই নামে ইহাদের এ ভাব কেন—এ মূর্ত্তি কেন? যদি নামের সেই কৃপাই না হইল—তবে বহিরঙ্গের এ কামিনী-বেশ ভূষায় কি গোপী-ভাবের উদয় হইতে পারে? না হইলে—এ সাজা গোপী-ভাব, মায়ারই আদর্শ, কারণ মায়া এইরূপেই সে দৃষ্টি আবরণ করেন। যদি তাহা না হইত, দাদার মুখে শুনি, চৈতন্ত চরিতামৃতে ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
——তথাপি রাজা কাল সর্পাকার।
কাষ্ঠ নারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥
——বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনার মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরায়ে বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

এই জন্যই দাদা বলেন :—

"সাধন ভজন মনের ভ্রান্তি, না খুলিলে হৃদয় গ্রন্থি,
হতবুদ্ধি করে আর।"

আবার বলেন :—

"যে হল সাধন ক্ষান্ত, সে যেন অজ্ঞ নিতান্ত,
সাধনের কি আছে অন্ত—"

এ কথা তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিলাম, এ দুই কথাই সত্য। অবিদ্যা বুদ্ধিতে সাধন, ঘানিতে যোড়া—বলদের ভ্রমণ, আর হ্লাদিনী সঞ্চারে যে সাধন, তাহার অন্ত নাই, তাহা নিত্য নব নব ভাবে অনন্ত।

যোগমায়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। সকলে বলিলেন, "রাত্রি অনেক. হইয়াছে—তুমি বাড়ী যাও।" কিন্তু যোগমায়া যে, কোথায় যাইবেন—তাহা তিনিই জানেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন—ভগবন্! তোমার ইচ্ছায় দেহ—রক্ষা হয়, হউক, না হয় তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু এরূপ সঙ্গ আর যেন না ঘটে। আমার শত শত ত্রুটি, তাহা জানি, তাই তোমার এ লীলা, কিন্তু তোমার ভক্তসঙ্গ ভিন্ন, সে ত্রুটি সংশোধন করে কে প্রভু!

তখন যোগমায়া সেই নিশীথে, একাকী রাজপথে দাঁড়াইয়া, ভক্তি-জলে অঙ্গ ভাসাইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণানন্দ, দিব্যানন্দের আগ্রহে সেই দিনই, সেই বকুলতলায় আগন্তুকের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা,কিন্তু কি ভিক্ষা, তাহা বুঝা যায় না। কারণ অনেকে বহু যত্নে আতিথ্য সেবায়, তাঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করাইতে পারেন নাই। তাঁহারা যে কি চাহেন, তাহা তাঁহাদের বাক্যে বুঝা যায় না, অথচ ভিক্ষায় উপেক্ষা।

তিন দিনের পথে, এক গৃহস্থমন্দিরে, পূর্ণানন্দ ভিক্ষায় গাহিলেন,—

পরম পুরুষ-ভাবে একা কে বিহর কোথায়।
কে তুমি দিলে হে দেখা—বকুলতলায়॥
চোরে বুঝিতে না পারে,
স্বভাবেতে চুরি করে,
তাই পুন দিতে ফিরে, এনেছি হেথায়।
শুনি চোর হয় সাধু, তোমারি কৃপায়॥

দিব্যানন্দের মুখে কথা নাই। পূর্ণানন্দের এ ভাবে তিনি, পূর্ণানন্দের হৃদয় যতই অনুভব করিতেছেন, ততই দ্রব হইতেছেন। কিন্তু দিব্যানন্দের এখন আগন্তুকের প্রতি আর সে সন্দেহ নাই। যোগমায়াই সে সন্দেহ কাটাইয়া গিয়াছেন। আগন্তুক যে হরসুন্দর—নিশ্চয়ই হরসুন্দর, তাহা যোগমায়ার সঙ্গ গুণে, তাঁহার সে স্বহৃদয়গত আনন্দই সাক্ষ দিতেছে। কিন্তু পূর্ণানন্দের নিকট তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই, কারণ পূর্ণানন্দ কোন শক্তিতে সে বিশ্বাস, হৃদয়ে ধরিবেন?

গৃহকর্ত্তা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সাদরে তাঁহাদের আতিথ্য সেবায় যত্নবান হইলেন—কিন্তু হইবে কি? পূর্ণানন্দ গীত শেষ করিয়াই গমনোদ্যত। কোন দোষে অতিথির এ অকৃপা? গৃহকর্ত্তার কাতর বাক্যে, পূর্ণানন্দ আবার সেই গীত ধরিলেন। তখন বাটী মধ্য হইতে একটী অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া, গৃহকর্ত্তাকে ডাকিয়া কর্ণে কর্ণে কি বলিয়া দিলেন, তাহাতে গৃহকর্ত্তা, পূর্ণানন্দকে বলিলেন, "চোর, বুঝিতে না পারিয়া চুরি করিয়াছিল, যদি ফিরাইয়া দিবার মন হইয়াছে, তবে আবার না বুঝিয়া ফেরা কেন? ইহাতে কি সাধুকৃপা হয়? ভগবৎ-প্রসাদেই নারদ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।"

এ কথায়, গীত শেষ হইতে না হইতেই পূর্ণানন্দ, গীত বন্ধ করতঃ বৃদ্ধের প্রতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "এ কাহার কথা, তোমার মুখেত এ কথা সম্ভব নহে, সে দীপ্তি তোমার

মুখে কোথায়? যাহা হউক, যে বাড়ীতে এ কথা শুনিলাম, সে বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে আমার ইচ্ছা।” এই বলিয়া তিনি আপনিই আসন গ্রহণ করিলেন।

দিব্যানন্দের বুঝিতে বাকী ছিল না। তিনি বুঝিলেন—যোগমায়ার এ খেলা। যোগমায়া তবে কি দেবেন্দ্রের সন্ধান পায় নাই? তবে যোগমায়া এতদূরে আসিল কি রূপে? যেরূপেই আসুক, এ খেলা যোগমায়ারই, অন্যের দ্বারায় এ খেলা ত সম্ভব নহে?

গৃহকর্ত্তা সমস্ত আয়োজনে, পূর্ণানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, “পাক কি স্বহস্তেই হইবে? না—বিষ্ণুপ্রসাদ পাওয়া হইবে?”

পূ। স্বহস্তে পাক আমরা করি না, ফল, মূলই আমাদের যথেষ্ট। গৃহীর, বিষ্ণুপ্রসাদও আমরা গ্রহণ করি না। তবে যদি যাঁহার এ বাক্য, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ দিতে পারেন—আমাদের আপত্তি নাই।

গৃহকর্ত্তা অন্দরবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। যথাসময়ে পূর্ণানন্দ ও দিব্যানন্দ প্রসাদ পাইলেন। পরে বিদায় সময়ে গৃহকর্ত্তাকে, পূর্ণানন্দ বলিলেন, “যাঁহার এ বাক্য, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, প্রসাদ ত পাইলাম, বৈষ্ণব ত হইতে পারিলাম না।”

গৃহকর্ত্তা অন্দর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—“—যে স্থান হইতে যাহা চুরি করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাহা—পঁহুছিয়া দিন। যাহার ধন—সে যাহার নিকট রাখিয়াছিল, সে যখন তাহা—তাহাকে ফিরাইয়া দিবে, তখন—ভগবৎপ্রসাদের মর্ম্ম বুঝিবেন।”

পূর্ণানন্দ আর উত্তর করিলেন না। পদব্রজে—একমনে চলিলেন। দিব্যানন্দকে বলিলেন,—“কথার মর্ম্ম বুঝিলে?”

দি। বুঝিয়াছি, চিত্তশুদ্ধি না হইলে, চিত্ত—জীবকে ভগবচ্চরণে অর্পণ করে না, করিলে—সে আপন ক্ষেত্র প্রকৃতিতে অভেদ ভাবে সংস্থিত হইয়া, ঈশ্বর শক্তিরূপে কৃতার্থ হয়। চিত্তই—জীবকে মোহিনী মন্ত্রে চুরি করে, সে মন্ত্রে জীব—অস্মিতায় আপনা ভুলিয়া, তাহার সহিত অভেদ হইলে, জড় অবিদ্যারূপ চিত্ত, জীবের অধিষ্ঠানে

জাগ্রত হওয়ায়—সেই অভিমানে জীব বদ্ধভাবে—জড়স্বরূপে দৃষ্ট হয়। জীব, ভগবানের ঐশ্বর্য্যবিশেষ, সে ঐশ্বর্য্য—ভগবান যাহার নিকট রাখেন, সেই সংসারের পিতৃস্থানীয়। মায়ার—পিতা, মাতা, জায়ারূপ শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠরূপ, যখন সে ঐশ্বর্য্য—ভগবানকে প্রত্যর্পণ করে, তখন ভগবান তাহা গ্রহণ করেন। যদিও মাতা, পিতা, জায়া—হৃদয়ে বা মুখে তাহা বলেন না, কিন্তু তদ্গত চিত্ত-ব্যবহারে—ঐশ্বর্য্যরূপ জীব, সে বন্ধন—এত সামান্য দেখে যে, ছিন্ন করিতে ক্লেশ পায় না। কিন্তু যদি মায়া—সে অবলম্বনে—এ কৃপা না করিতেন—তাহা হইলে কি জীব, সে যুদ্ধে জিত হইতে পারে? চিত্তকে যেমন পর-চিত্ত আকৃষ্ট করে, তদ্রূপ আপনি, আমার সেই মাতৃ-পিতৃ-স্থানীয় গুরু গৃহ হইতে, চিত্তরূপিণী হইয়া, অপহরণ করিয়াছিলেন—এখন সেই স্থানেই—আমাদের উপস্থিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"আমিও তাহাই বুঝিয়াছি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে বেলা দ্বিপ্রহরে বহির্ব্বাটীতে—নটনারায়ণ একটু বিশ্রাম লইতেছেন। আর যোগমায়ার অদৃষ্ট ভাবিতেছেন। সে ভাবনার শেষ না দেখিয়া, আকুল হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগে—আপনা আপনি বলিতেছেন,—ভগবান যাহা করিবেন, তাহাই হইবে—তাহাই হয়—হইতেছে, নিত্য দেখিয়াও আবার ভুলি কেন?

অমনি যেন কে, পার্শ্ব হইতে বলিল,—"ভুল—কেন বলিব? না ভুলিয়া, তাহার মায়া লীলাটি কি উড়াইয়া দিতে চাও?"

নটনারায়ণ পার্শ্ব ফিরিয়া দেখেন—সম্মুখে শশাঙ্ক। তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন,—"কতক্ষণ?"

শশাঙ্ক বলিলেন,—"এই আসিতেছি। নিত্য দেবীগ্রামে তুমি এক দিক দিয়া, আমি এক দিক দিয়া যাই, আজ ভাবিলাম—তাহা হইবে

না, এক সঙ্গে যাইব, তাই—পেট টা ঠাণ্ডা করিয়া একদৌড়ে তোমার এখানে।”

নট। তোমার যে কত ভঙ্গী, বুঝা ভার।

শ। তাহার মায়ালীলাও নিত্য, নিত্য না হইলে, তাহার বৈধী সেবা নিত্য হয় কই?

নট। তা যেন হইল, তাহা হইলে আত্যন্তিক প্রলয় কিরূপে সিদ্ধ হয়।

শ। কেন? তাহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, একটা ব্রহ্মাণ্ডের আত্যন্তিক প্রলয়ে, তাহার বৈধী সেবার অনিত্যত্বতা তুমি সিদ্ধ করিতে চাও না কি? যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয়, বৈষ্ণব—দৃষ্টি করেন না,জ্ঞান মার্গেরই সে ভ্রম। মায়া যে যুগপৎ বিশেষাবিশেষ ভাবেই নিত্যা।

নট। তাহাই যেন হইল, যাহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহাদের হৃদয়ে, ভুল স্থান পায় কি?

শ। সে অবিচিন্তিত, তাঁহার শক্তিও অবিচিন্তিত, না হইলে, স্বধর্ম্ম দেখাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অর্জ্জুনকে কে বলিয়াছিল? অর্জ্জুন ত ভুলকে তুচ্ছ করতঃ দূরে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল, সেই ত অর্জ্জুনকে জোর করিয়া ধরিয়া সহস্র ভুল মাথায় চাপাইয়া, লীলা-মহিমা প্রকাশ করিল।

নট। আপনাদের কথা বা ভাব বুঝা ভার। কখন কি বলেন, তাহারও ঠিক নাই।

শ। যখন আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছ, তখন ও পণ্ডিতি বুদ্ধি আর বেশী দিন থাকিতেছে না। সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট, মূর্খের দলে, মূর্খ হইবে না ত—আর কি হইবে?

নট। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই স্বধর্ম্ম। সেজন্য বলিলেন, ‘স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।’ ভাল—জীবের স্বধর্ম্ম কি?

শ। জীব, যাহাতে স্বরূপে স্থিত, তাহাই—তাহার স্বধর্ম্ম।

নট। মায়িক যুদ্ধে কি অর্জ্জুন স্বরূপে স্থিত?

শ। তবে তুমি আমায় না বকাইয়া ছাড়িলে না। অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র। যাহাই হউক—সেই অর্জ্জুন উপলক্ষেই আমাদেরও বলিতে হয়। লীলা হেতু ভেদ বুদ্ধিতে মায়া—ভগবান হইতে পর, সেই পরধর্ম্মে জীব—অস্মিতায়—পর। অস্মিতায় পরই—তাহার—স্ব। সেই স্বএর ধর্ম্মেই, যতদিন সে অস্মিতায় থাকে—ততদিন, সেই ধর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম। মায়া, ঈশ্বরাদেশে স্বধর্ম্মেই জীব-মুক্তি এবং বন্ধের, যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উভয়ই মায়ার স্বধর্ম্ম। অতএব সেই স্বধর্ম্ম দ্বিবিধ; এক মুক্তি হেতু, এক বদ্ধতা হেতু। মুক্তি-মুখ জীবের বর্ণাশ্রম গত ধর্ম্মও—স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মে, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই স্বধর্ম্ম। এহেতু, কর্ম্ম মাত্রই বন্ধের কারণ নহে। এই আশ্রমগত ধর্ম্মপালনে জীবের সুকৃতি,—সুকৃতিতে—স্বধর্ম্মাচরণ, স্বধর্ম্মাচরণে অবিদ্যার জাগরণরূপ—চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে—কৃষ্ণে অবিদ্যাগত স্বধর্ম্মগত কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মার্পণে—জীবের মায়াগত স্বধর্ম্ম বা নিসর্গের ত্যাগ, সে ত্যাগে—বিদ্যায় স্বরূপগত স্বধর্ম্মের প্রকাশ, সে প্রকাশে বিদ্যার ভক্তিমূর্ত্তি, জ্ঞান বৃত্তির—মিশ্রাজ্ঞানবৃত্তি ত্যাগে—শুদ্ধা, শুদ্ধা—ঘনীভূতভাবে—প্রেম, প্রেমে ভগবৎ লাভ, লাভে—শান্তভাবে স্থিতি। সে স্থিতিতে—ভগবৎ-মাধূর্য্যে স্বরূপগত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবের উদয়। অর্থাৎ—বদ্ধ-জীবের স্বধর্ম্ম—মায়াগত আশ্রম ধর্ম্ম, মুক্ত জীবের স্বধর্ম্ম—স্বরূপগত। যুদ্ধ ইত্যাদি আশ্রমগত ধর্ম্ম,—আশ্রমগত ধর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধি—এহেতু বর্ণাশ্রম ত্যাজ্য নহে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় ভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত—সেহেতু ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের ধর্ম্ম—যুদ্ধ। মায়াগত স্বধর্ম্মেই সুকৃতি, সুকৃতি-তেই—স্বরূপগত স্বধর্ম্মের লাভ, স্বরূপগত স্বধর্ম্মেই—মায়াগত স্বধর্ম্মের ত্যাগ।

তখন শশাঙ্ক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এখন বুঝিলেন, যে বহির্ম্মুখে বর্ণাশ্রম-গত স্বধর্ম্ম ত্যাগের নহে, কিন্তু অন্তর্ম্মুখে—ত্যাগের। তোমার ও ভুলও বহির্ম্মুখে ত্যাগের নহে, অন্তর্ম্মুখে—ত্যাগের। এরূপ না হইলে তাহার মায়া লীলা থাকিত কি?"

এইরূপে অনেক কথার পর নটনারায়ণ বলিলেন,—"যদি মধ্যে

মধ্যে এইরূপ এক আধ বার আইস, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। তাই বা বলি কেন? আমিও ত যাইলেই যাইতে পারি, না যাই কেন? যাহা হউক, আজ যে হঠাৎ এ কৃপা, কেন বল দেখি?"

শশাঙ্ক বলিলেন,—"ও হরি! তোমার কথায় থাকিতে নাই, তোমার বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো।"

নট। কি হইয়াছে?

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ। ইন্দ্রনারায়ণের মেয়েটীর সম্বন্ধের জন্য, কিছু বলিয়াছিলে কি? তোমার মনে নাই, কিন্তু আমার মনে আছে।

নট। হা—হা—বলিয়াছিলাম বটে। কোথাও ঠিক করিতে পারিলে কি?

শ। না করিয়া কি আর—বলিতে আসিয়াছি।

নট। মেয়েটাও দেখিতে দেখিতে দশ বার বৎসরের হইয়া উঠিল, আর রাখা যায় না,—যে বাড়ন্ত গড়ন।

তখন বিবাহ সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে, এমন সময়ে নটনারায়ণ বলিলেন,—"দেখ, দেখ, দুইজন সন্ন্যাসী—এই দিকে আসিতেছেন।"

সত্যই দুইজন সন্ন্যাসী একবারে গৃহমধ্যে—সম্মুখে। উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিলেন, নটনারায়ণ চিনিলেন, কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—"কে নরনারায়ণ আসিলি? আয় আয় বাপ! একবার কাছে আয়।"

এই বলিয়া নটনারায়ণ, নরনারায়ণকে কোলে টানিয়া লইলেন। নরনারায়ণও প্রণাম করতঃ তাঁহার পদধূলি লইলেন। বলিলেন,—"বাবা! আমার সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছেন, ইনিই আমার সেই শৈশবের প্রাণদাতা, বর্ত্তমান যোগ-গুরু—আপনি কি ইঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না?"

নটনারায়ণ তখন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"সংসারি, একদিন তোমার নিকট হইতে যে ধন—অপহরণ

করিয়াছিলাম, আজ তাহা ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি। প্রফুল্ল মনে স্বীকার কর। কিন্তু বলিতে হইবে—এ দ্রব্য কাহার।"

শশাঙ্ক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"বুনো গোঁসাই! তাহা পরে বলিতেছি, জিজ্ঞাসা করি—একটা ছেলে পুষিতে যার ক্ষমতা নাই, তাহার এত লম্বা চওড়া—কিম্ভূত কিমাকার বেশ কেন? যেন সংসারী অপেক্ষা কত বড়, আরে ছি।"

সন্ন্যাসী, শশাঙ্কের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন,—"উহাঁর কথা ধরিবেন না, উহাঁর সকল স্থলেই নকল করা স্বভাব।"

স। না—না—নকল নহে—ঠিক বলিয়াছেন। তাই আমি উঁহারপানে তাকাইয়া দেখিতেছি—একথা যার তার বলিবার ক্ষমতা নাই। এতদিন কোন ব্যক্তি যাহা বলে নাই—আজ উঁনি তাহাই বলিয়াছেন, আপনি যাহাই বলুন—উনি নকল করেন নাই।

শ। ভাল, ভাল—বুনোগোঁসাই! এখন বস।

পূর্ণানন্দ কোন কথা না কহিয়াই আসন গ্রহণ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—কি সংসার দেখিয়াছিলাম যে, তুচ্ছ করতঃ ব'নে গিয়াছিলাম? সেও ত অহঙ্কার, অহঙ্কারে—সে অহঙ্কার তখন ধরা পড়ে নাই। যে কথা বলিলেন—তাহার নিকট যোগ-ধর্ম্মের প্রসংখ্যান লাগে না—ধর্ম্ম-মেঘের উপর। যদি লাগিত, যদি আহার দিয়া দিব্যানন্দকে পুষিতে পারিতাম, তাহা হইলে আবার কি ফিরাইতে আসিতে হইত?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্র বাটী ফিরিয়া—লজ্জায় কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে—কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহা নট-নারায়ণই উপলব্ধি করিয়াছেন, অন্যের সে লক্ষ্য নাই। পুনরপি সেস্থানে গিয়া—অনুসন্ধানে তাহার অতীব ইচ্ছা হইলেও—নটনারায়ণের নিষেধে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। নটনারায়ণেরই বা এ নিষেধে প্রয়োজন কি? হরসুন্দরের তাহাতে ইচ্ছা নাই। হরসুন্দর যে, নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নহে—তবে তাঁহার ভাবে—নটনারায়ণ একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

দেবেন্দ্র স্থির হইতে পারিতেছেন না। হৃদয় যেন তাঁহার কিছুতেই প্রবোধ মানে না। না আহারে, না বিহারে, না পাঠে, না কাহার সহিত বাক্যালাপে, সে অস্থির মনকে তিনি কিছুতেই স্থির করিতে পারেন না। শান্ত হইবার জন্য, দুইদণ্ড যদি কোথায় গিয়া বসেন—তবে সেই যোগমায়ার কথাই উঠে, তাহাতে সাধারণের যে, যোগমায়ার প্রতি সন্দেহ, সে সন্দেহে—দেবেন্দ্র জর্জ্জরিত হন। সাধারণের এ দৃষ্টিতে—সাধারণের প্রতি তাঁহার ঘৃণাই বৃদ্ধি হয়, মনে হয়—যখন প্রকৃত ঘটনা অজ্ঞাত, তখন যথাযথ না জানিয়া—এ কুদৃষ্টি কু হৃদয়েরই প্রতিফলন মাত্র। যদি হৃদয় পবিত্র হইত, তাহা হইলে পবিত্রভাবেই সে দৃষ্টি পড়িত, এবং তাহার জন্য অনুতাপ দেখা যাইত।

কোথাও দুইদণ্ড জুড়াইবার স্থান নাই দেখিয়া, তিনি এখন প্রায় হরসুন্দরের নিকট গতিবিধি করেন। অচ্যুতানন্দের সহিত তাঁহার বেশ পরিচয় হইয়াছে। তিনি বাড়ীতে—নন্দীগ্রামে, চারিটী আহারের জন্য আসেন মাত্র।

অচ্যুতানন্দ, দেবেন্দ্রের নিকট নরনারায়ণের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছেন, এবং যাঁহার জন্য তিনি নিবিড় কারণ ত্যাগে—সংসারভ্রমণে, তিনিই যে—দিব্যানন্দেরই সেই বকুলতলার—আগন্তুক—হরসুন্দর—

তাহা বুঝিয়াছেন। কারণ দিব্যানন্দ-মুখে যে চিন্ময় খাদ্যের কথা শুনিয়াছিলেন, হরসুন্দরের নিকটেই—সে লাভে তিনি কৃতার্থ।

হরসুন্দর বা শিবসুন্দরের মুখ দেখিয়া, দেবেন্দ্র কোন কথায় অগ্রসর হইতে পারেন না, তাঁহার ভয় হয়, লজ্জা হয়। সেজন্য তিনি অচ্যুতানন্দকে বলিলেন,—"নরনারায়ণ দিন কিনিল, কিন্তু আমি কি করিলাম?"

অচ্যুতানন্দ হাসিলেন, বলিলেন,—"তুমি আমায় এইরূপ অনেকবার প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি কি করিলে না করিলে, আমি কিরূপে তাহা বলিব? তবে যখন অনুতাপ আসিতেছে, তখন যে তুমিও দিন কিনিবে—তাহা স্থির।"

দে। ভাল—সুকৃতি অভাবে এবার ত কিছুই করিতে পারিলাম না, আবার আসিয়া যে পারিব, তাহাতেই বা স্থির কি?

অ। সুকৃতি ভিন্ন অনুতাপ উদয় হয় না। যখন অনুতাপের উদয়, তখন কার্য্য আরম্ভ হইতে দেরী কি?

দে। ধরিয়া লউন, কার্য্য আরম্ভ হইতে হইতেই আমি মরিলাম। তাহার পর আবার এই অনুতাপ যে উঠিবে—তাহার স্থির কি?

অ। তাহা স্থির। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম দুইটী ঔপাধিক শরীর। স্থূল শরীর পরিবর্ত্তনের নাম—মরণ। সূক্ষ্মশরীর ত্যাগেই—মুক্তি। যতদিন না মুক্তি হইতেছে—ততদিন সে মরিলেও—সূক্ষ্মশরীরেই থাকে। সূক্ষ্ম শরীর এত সূক্ষ্ম, যে স্থূল শরীরগত চক্ষু তাহা দৃষ্টি করিতে পারে না। সেজন্য মরণে, তাহার আত্মীয়বর্গ শোকে অভিভূত হয়। সেই সূক্ষ্মশরীরের দুইটী বৃত্তি, একটী—নিমিত্ত, একটী—উপাদান। নিমিত্তটী অহংতত্ত্বগত—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়—ইত্যাদি সমন্বিত, এবং উপাদানটী, অহংতত্ত্ব প্রকটিত—পঞ্চভূতগত তত্ত্ব পরিণাম। জীব যখন দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন ওই নিমিত্তাংশ সূক্ষ্মশরীরই সঙ্গে করিয়া গমনে—অন্য উপাদান অংশ গ্রহণ করতঃ, পরে পূর্ব্ব স্থূল ত্যাগ করে। সে উপাদান অংশ এত সূক্ষ্ম যে, চর্ম্মচক্ষে দর্শন হয় না। মধুচক্রের মূল মক্ষিকা গমন করিলে, তাহার সহচর

মক্ষিকারাও যেমন তাহার সহিত গমন করে, তদ্রূপ মনগত প্রাক্তন ছবি লইয়াই জীবের গমন। মনই সর্ব্ব অনর্থের মূল, মনেই বাসনা, সেই বাসনায়—জীবের যে অবস্থান, সেই অবস্থানে, ওই নিমিত্ত, উপাদানরূপ—সূক্ষ্মশরীরের সহিত, যেমন স্থূল দেহত্যাগে—পর্য্যায়-ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তেমনি—পর্য্যায়ক্রমে আবার মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে শুক্রশোণিত, শুক্রশোণিত হইতে ভূত, ভূত হইতে—এই স্থূল দেহ সংগ্রহ হয়, এবং তাহাতে ওই সূক্ষ্মশরীর আবার প্রকটিত হয়। এই প্রকটনই জীবের জন্ম। প্রাক্তন হিসাবে ঐ স্থূল শরীরের সংগ্রহে, কালের ইতর বিশেষ হয়। যে মার্গের উল্লেখ করিলাম, তাহাতেই—পুনরাগতি। এই মার্গকেই ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ও দক্ষিণায়ন বলা হয়, কারণ স্থূলের অভাবে বাহ্য বস্তুর সহিত—তখন কোন সম্বন্ধ না থাকায়—জীব অন্ধভাবাপন্নই থাকে। প্রবৃত্তি হেতুই জীবের পুনরাগমন। অবিদ্যা-ভাবে ঈড়াই সেই প্রবৃত্তি মার্গ—এহেতু ঈড়াকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। অতএব যদি পূর্ব্বে অনুতাপের উদয় থাকে, তাহা হইলে সেই সুকৃতিরূপে প্রাক্তন, এরূপে সাত্ত্বিক দেহের সংযোজনা করে যে, তাহাতে সে অনুতাপ না আবরিত হইয়া, বরং বৃদ্ধি হয়, কারণ বাসনাই তখন কর্ম্ম-সূত্ররূপে তদ্‌ভোগোচিত দেহ সংগ্রহ করে।

"ইহা ব্যতীত আর একটী মার্গে জীবের গতি হয়। সে গতিতে—পুনরাগমন নিষেধ হয়। সেজন্য তাহাকে অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ বলা হয়। কারণ তাহাতে সূক্ষ্মদেহের ছেদ হওয়াতে—বাহ্যদেহ অভাবে—সূক্ষ্মদেহের তমোভাবে, আর জীব অন্ধ থাকে না। নিবৃত্তিতেই পুনরাগমন নিষেধ। বিদ্যা-ভাবে পিঙ্গলা সেই নিবৃত্তি মার্গ। নিবৃত্তি মার্গই জীবকে উর্দ্ধমুখী করে—এহেতু তাহাকে উত্তরায়ণ বলা হয়।

"এই উত্তরায়ণেই ভোগাবসানে জ্ঞানী, যোগী, ভক্তের গতি। জ্ঞানী বা কৈবল্য প্রার্থী যোগীর এই উত্তরায়ণেই—ব্রহ্ম বা পরমাত্ম নির্ব্বাণেই লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তিমান যোগী বা সিদ্ধভক্ত, সে উত্তরায়ণ গতি

লক্ষ্য করেন না, বা সে গতির অপেক্ষা রাখেন না। কারণ তাঁহাদের লক্ষ্য একমাত্র সচ্চিদানন্দ ভগবদ্-বিগ্রহ। সেই বিগ্রহ-ভক্তিতে ভগবদিচ্ছাই—তাঁহাদের ইচ্ছা। উত্তরায়ণ পিঙ্গলা, বা দক্ষিণায়ন ঈড়ায় তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। অতএব ভক্তিই অভিধেয়। যদি সেই ভক্তি গুরুকৃপায় হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তবে যোগে প্রয়োজন? যদি মলয় স্বতঃই প্রবাহিত হয়, তবে তালবৃন্তের ব্যজনে প্রয়োজন? এজন্য আমি হরসুন্দরের কৃপায় ষড়ঙ্গযোগরূপ, তালবৃন্তের ব্যজন ছাড়িয়া, এখন ভক্তিতেই অবগাহনে আছি, যদি তোমার সে অনুতাপ উঠিয়া থাকে, আর যদি তাহা সত্যই ভুক্তি, মুক্তি কামনা শূন্য হইয়া থাকে; জ্ঞান, কর্ম্মের আবরণে যদি আর সুস্থ হইতে না পার, তবে হরসুন্দরের চরণে আশ্রয় লও, কৃষ্ণ নামে ডুবিতে থাক, যতই ডুবিবে, ততই মজিবে। যাহা তুমি লজ্জায় ফুটিয়া বলিতে পার না, আজ আমি তাহা ফোটাইয়া দিলাম, কেন বাজে প্রশ্ন আনিয়া দিন কাটাও, কৃষ্ণ নাম লইতে বিলম্ব কর?"

দেবেন্দ্র দেখিলেন, অচ্যুতানন্দ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া—দেবেন্দ্র যে কথা তুলিবার জন্য, যে প্রশ্ন করেন -সেরূপ প্রশ্ন নিষেধ করিলেন। দেবেন্দ্র ধরা পড়িয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন।

পরে দেবেন্দ্র বলিলেন, "ধর্ম্ম লাভের উপযুক্ত হইয়া আমি হর-সুন্দরের নিকট দাঁড়াইতে পারি না। সেই জন্যই এতদিন দাঁড়াইতে পারি নাই। নচেৎ যে দিন নরনারায়ণ গৃহ ছাড়িয়াছে, আমিও সেই দিন হইতেই সংসার ছাড়িয়াছি। কিন্তু সে মনের কল্পনার ছাড়া ছাড়ি আমি বুঝি না; বুঝি না বলিয়াই দেখি যে,আমার হৃদয় মলিনতায় পূর্ণ, সে পূর্ণতায় স্থান নাই। হরসুন্দর যে ধনী—তাহাও আমি অনেক দিন হইতে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি, ধনীর নিকট দাঁড়াইলে, ধনীর দান অবশ্য মিলিবে তাহাও জানি, কিন্তু পাত্রাভাবে সেধন ভূমিতে গড়াগড়ি যাইবে, সে ব্যথা সহ্য হইবে না, সেই জন্য হৃদয়পাত্রকে মালিন্যে খালি করিতে চাই, ভক্তিতে শুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট

দাঁড়াইতে চাই। আমায় সেই কৃপা করুন, যাহাতে আমি হরসুন্দরের নিকট দাঁড়াইতে পারি।”

অচ্যুতানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “তোমার এ বাক্য শুনিতে মিষ্ট, কিন্তু জানিয়া রাখ, ইহাও অহঙ্কার গত, এ অহঙ্কার ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে শিখ, তবে যদি তাঁহার দয়া হয়, সে তাঁহার ইচ্ছা। মানুষ কি কখন তাঁহার ভক্তির উপযুক্ত হইতে পারে? যদি সে উপযুক্ত না করিয়া লয়? এই জন্যই সাধু বলেন,—“ভগবন! তুমি আমায় যাহাতে নিযুক্ত করিয়াছ, আমি যন্ত্রের ন্যায় তাহাই করিতেছি,—একবার তুমিও তাহাই বল, তাহা হইলে আর এ অহঙ্কার দাঁড়াইতে পারিবে না।”

দে। এ কথা লইয়া অনেকবার অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন, “তিনি যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, আমাতে পাপ বা পুণ্য কোথায়?” অতএব তাহাদের মদ্যপান, বেশ্যাগমন যখন ঈশ্বর দ্বারে সংঘটিত, তখন তাঁহারা সে ভোগেও, দোষ, গুণের ভাগী নহেন—কিন্তু ইহার প্রকৃতার্থ কি?

অচ্যুতানন্দ অনেকক্ষণ স্থির হইয়া পরে বলিলেন:—

“খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে।
কাল কর্‌লে এঁড়ে গরু কিনে॥”

আমি কি ভাবে এ কথা তুলিয়াছি, তাহা বলিয়াছি, কিন্তু যে ভাবে ইহার অর্থ চাহিতেছ, সে ভাবে ত ইহার অর্থ মিলিবে না। মিলাইতে পারিব না। কারণ তাঁহারা ঠকাইতে আসিয়াছেন, ঠকিয়াত যাইবেন না—যতক্ষণ তাঁহাদের এ প্রতিজ্ঞা, ততক্ষণ ত তাঁহারা বুঝিবেন না, বুঝাইতেও পরিবে না।

দে। ইহার অর্থ আমি বুঝিলাম না। যাহা প্রকৃত অর্থ, সকলকেই তাহা লইতে হইবে।

অ। তুমি ছেলে মানুষ—তাই ওরূপ বলিতেছ, সে জোর—শব্দার্থে বা ব্যাকরণে খাটে, কিন্তু ভাবার্থে খাটে না। ভাবানুসারে ব্যাখ্যা—দেখ, শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক বুদ্ধিতে—শক্তি ভেদ ভাবে, এবং অভেদ বুদ্ধিতে—শক্তি অভেদ ভাবে, বলে, কয়, কার্য্য করে। যাহা অভেদ

বুদ্ধিতে বলে, ভেদবুদ্ধিতে তাহা সঙ্গত হয় না—আবার যাহা ভেদ বুদ্ধিতে বলে. অভেদ বুদ্ধিতে তাহা সঙ্গত হয় না। ভেদ বুদ্ধিতে কর্ত্তা অহঙ্কার, অভেদ বুদ্ধিতে—দাস অহঙ্কার। মানুষ যখন দাস বুদ্ধিতে থাকে, তখন দেখে সবই ভগবৎ-কার্য্য ; যখন অহং বুদ্ধিতে থাকে, তখন দেখে সবই—অহং বুদ্ধির কার্য্য। অহং বুদ্ধিতে সে, ভগবান হইতে অনুস্বরূপে পৃথক, সে পৃথকতায়, তাহার কর্ম্মও পৃথক। সে পৃথক কর্ম্মে, পৃথক যে অনুস্বরূপ—সেই কর্ত্তা ; সেই অনুকর্ত্তার কর্ম্মেই—মদ্য-পান, বেশ্যাগমন সংঘটিত হয়, অতএব ভগবৎ-আবরক যে কর্ম্ম—তাহাই বদ্ধজীবের, এবং ভগবৎ-প্রকাশক সে কর্ম্ম—তাহাই ভগবানের। কর্ত্তা অহঙ্কারে জীব, কর্ম্মে আসক্ত, এজন্য তাহার ফলভোগ, ঈশ্বর কর্ম্মের আশ্রয় মাত্র। তাই জীব, দাস অহঙ্কারে, ভগবৎ কর্ম্মই দেখিতে পায়, এজন্য সে তাহাই বলে, কিন্তু অহংকর্ত্তা তা কিরূপে বলিবে ? তবে যদি সে সত্য অন্তরের সহিতই তাহা বলিতে পারে, তাহা হইলে মদ্য-পান বা বেশ্যাগমন আর তাহার দ্বারায় ঘটিবে না, যদি ঘটে, তাহা হইলে—তাহার হৃদয় মিথ্যা, বাক্য মিথ্যা, সেও মিথ্যা।

"বৎস দেবেন্দ্র! যাহারা ওরূপ বলে, তুমি তাহাদের কথায় কান দিওনা, কারণ যাহাদের ওরূপ অন্তর, তাহারা নিজেও ধর্ম্ম করিবে না—পরকেও করিতে দিবে না। যাহাদের ধর্ম্মে আস্থা আছে, বা ধর্ম্মে যাহারা ব্রতী, তাঁহাদের মুখ হইতে ও কথা বহির হইবে না। যাহাদের মুখে এ কথা, দেখিবে তাহারাই বিধর্ম্মী। বিধর্ম্মীর সহিত তর্কও নিন্দনীয়। তাহারা শারীরিক ক্রিয়ায় ধর্ম্মকর্ম্মে থাকিলেও, মানসিক ক্রিয়ায় বিধর্ম্মী।"

তখন শশাঙ্ক আসিয়া বসিলেন, বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের কোন কষ্ট হইতেছে না ত ?—সে এক দিন, আর এ এক দিন, তখন যোগী—এখন ভোগী।"

অচ্যুতানন্দ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ভোগী বলিয়া তামাসা করিলেত হইবে না ? মানুষ, আত্মস্বরূপ ভোগের জন্য যোগী হয়, যোগ সম্পন্নে আত্মভোগে -সেইত সত্য ভোগী, তবে আর ঠাট্টা করিলে কি

হইবে? তাহার পর, তুমি আবার ভোগীর ভোগী, কারণ আত্মস্বরূপ ভোগ ত আছেই, তাহার উপর ভগবৎ-স্বরূপ ভোগ—আপনাকে নমস্কার, আমরা যোগী—ভোগীর সহিত আমরা কথা কহি না।”

শ। ভাল ভাল—দেখা যাবে।

শশাঙ্ক, দেবেন্দ্রকে বলিলেন, “কি দেবেন্দ্র, এত ঘন ঘন আনাগোনা কেন? বৈষ্ণবগুলা রাঘববোল তাহা জান, বেশ সুখে আছ, বিবাহ করিয়াছ, খাইতেছ—দাইতেছ—আবার এ কেন? রাঘববোলের ঠাকুরটীর কথা কি জান?—

“যে করে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ,
তাতেও যদি না ছাড়ে আশ,
করি তারে দাসের দাস।”

তখন অচ্যুতানন্দ হাসিয়া উঠিলেন; শশাঙ্ক বলিলেন, “দেবেন্দ্র পলাও, পলাও, কথার ভঙ্গিটা বুঝিলেত?”

দেবেন্দ্র, শশাঙ্কের ভাব জানিতেন, তিনি হাসিতে লাগিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, “তুমি পলাইলে না, ভাল—এইবার তুমি কেমন না পলাও—তা দেখিব। তুমি এখানে আসিয়া বসিয়া আছ, আর তোমার বুদ্ধিমান বাল্য বন্ধুটী যে, আবার বুদ্ধি, শুদ্ধি জলে ভাসাইয়া বাড়ী হাজির—তাহা শুনিয়াছ কি? স্ত্রীটীত রাস্তায় ভাসাইয়া দিয়া আসিলে, এখন শ্রীমানের আর একটী শ্রীর যোগাড় দেখ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ত করিয়া আসিলেন, সংসারটা ফাঁক যায় কেন?”

দেবেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িলেন, তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল, কষ্টে বলিলেন, “বিদ্রূপ করিবেন না, সত্য বলুন, আমি ত আহারের পর বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি, এর মধ্যে কখন আসিলেন, আর আপনিই বা কিরূপে সংবাদ পাইলেন?”

শ। তা বলিব কেন? তুমিও বাটী হইতে বাহির হইয়াছ, সেও বাটী ঢুকিয়াছে, আসিয়াই তোমার সন্ধান, এখন স্ত্রীটা কাহাকে দিয়া আসিলে, তাহার জবাব দাও গে।

দেবেন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল। হর্ষে বিষাদ দেখা দিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিলেন।

শ। যাও কোথা? আমিত বলিয়াছিলাম,—কেমন না পালাও দেখিব, কেমন?

এই বলিয়া শশাঙ্ক হাস্য আরম্ভ করিলেন। পরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ভায়া! আর যাইতে হইবে না, আমি তোমার এই খানেই দেখাইব। সে ছুটোকেই ধরিয়া আনিয়াছি—দেখিতে চাও চল।"

তখন শশাঙ্ক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "তাঁহাদের আসিবার কথা ত, এত দেরী হইতেছে কেন, বলিতে পারি না।"

শ। তাহারা ত আসিয়াছে, আমিই ধরিয়া আনিয়াছি, আবার আমিই সে জন্য আপনাদিগকে ডাকিতে আসিয়াছি।

অ। কোথায়—কোথায় তাঁহারা?

শ। হরসুন্দরের নজরবন্দিতে।

নবম পরিচ্ছেদ।

যোগমায়া যখন রাজপথে—নিশীথে একাকী সহায়শূন্য হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন—অসহায়ের সহায়—ভগবান, এক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দাঁড়াইয়া—তাঁহার সহায় হইলেন। জ্যোৎস্নালোকে ব্রাহ্মণ—চলিতে চলিতে দেখিলেন, এক শুভ্রবসনা—অঙ্গনা, স্থির অবিকম্পিতভাবে, যোড় হস্তে—উর্দ্ধমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া। দেখিয়া তাঁহার ভক্তি হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সে ভাব-ভঙ্গের চেষ্টা পাইলেন না। সম্মুখে দাঁড়াইয়াই রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে যোগমায়ার দীর্ঘনিশ্বাসে—সে ভাবের ব্যত্যয় ঘটিল, অমনি ব্রাহ্মণ ডাকিলেন,—"মা!"

যোগমায়া চক্ষুরুন্মীলনে বলিলেন,—"বাবা!" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শৈশবে আমার মা—আমায় এই সংসারে ফেলিয়া গিয়াছেন। আমার কন্যা নাই, মা বলিয়া ডাকায়, যে কত সুখ—

তাহা জানি না। আজ তোমায় মা বলিয়া ডাকিয়া—তাহা জানিলাম। আজ হইতে তুমি আমার মা। মা! তুমি এখানে দাঁড়াইয়া কেন? দেখিতেছি তুমি—বালিকা নহ, এ বয়সে বাড়ীর বাহিরে, নিশাথে—একাকী তোমার এ ভাব কেন? যদি কোন আপত্তি না থাকে—আমায় বল, যদি কোন প্রয়োজন থাকে—আমায় বল—আমি বৃদ্ধ, তাহাতে কোন দোষ হইবে না।"

যোগমায়া তখন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তাহাতে ভাবনা কি মা? তুমি আমার সহিত আইস, আমি ত তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পিত্রালয়ে যাইতে কন্যার লজ্জা কি মা!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আর অপেক্ষা না করিয়া—চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূরে—একটী দ্বিতল বাটীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ডাকিলেন,—"গৃহিণী!" তখন একটী স্ত্রীলোক বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসিলেন—"এটি কে?"

ব্রা। তুমি শাশুড়ীর আদর পাও নাই। কন্যার ভালবাসা ভোগ কর নাই। ভগবান আজ দিয়াছেন—লও। কুড়াইয়া পাইয়াছি বলিয়া যেন অযত্ন না হয়।

ব্রাহ্মণের নাম ভগবানদাস। ইনি বৈষ্ণব, তিলকধারী, হাতে নামের মালা। নামে ইঁহার বড় রুচি। প্রতিদিন তিনলক্ষ নামের জপ ভিন্ন—ইঁহার চিত্ত স্থির হয় না। নামাচার্য্য হরিদাসের সাধন-ক্রমেই ইঁহার সাধন। আজ কার্য্যান্তরে যাওয়ায় অনেকটা সময় নষ্ট হইয়াছে, সেজন্য সেদিন আর কোন কথা হইল না। ব্রাহ্মণ—নামে বসিলেন।

সেদিন মন বড় স্থির। নামে চিত্ত অবিকম্পিত ভাবে মগ্ন। নাম সংখ্যায় রাত্রি ফুরাইয়া গেল—আর নিদ্রা কি হইবে। প্রাতে তিনি যোগমায়াকে ডাকিলেন; বলিলেন,—"মা! এ আমার বাড়ী নহে। প্রভু-দর্শনে এখানে আসা। তুমি যে কৃষ্ণভক্ত, তোমায় দেখিয়াই—আমি তাহা বুঝিয়াছি। প্রভুদর্শনে—ভক্ত লাভ, আমার বড়ই সৌভাগ্য। দেবী বা নন্দিগ্রাম হইতে—আমার বাড়ী—অনেক দূর, তাহাতে

ভাবনা নাই। আমি তোমাকে—তোমার পিত্রালয়ে বা শ্বশুরালয়ে—যেখানে বলিবে, সেইখানেই পঁহুছিয়া দিব। তবে মা, তোমায়—এখনই ছাড়িব না। যখন মা বলিয়াছি—তখন মায় পোয় কিছুদিন হরিনাম করিব।”

যোগমায়া কোন উত্তর করিলেন না। নরনারায়ণের ভাব দেখিয়া যোগমায়া বুঝিয়াছিলেন যে, নরনারায়ণ আর বিলম্ব না করিয়াই—হরসুন্দরের নিকট পঁহুছিবেন। সে কথা একবার মনে পড়িল, কিন্তু সেজন্য তাঁহার ব্যস্ততা বাড়িল না। ভাবিলেন, যেখানে হরিনাম—সেই আমার বাড়ী, যদি এ বাড়ী—সে বাড়ী হয়, তবে এ বাড়ী ফেলিয়া, সে বাড়ীর জন্য—ব্যস্ততা কেবল মায়ার খেলা।

ভগবানদাস বলিলেন,—“মা! কাল আমরা দেশে রওনা হইব, মনে করিয়াছি। সমস্ত বন্দোবস্তও করিয়াছি। তোমার কি এখানে আর ২।৫ দিন দর্শনের ইচ্ছা আছে? যদি থাকে—তাহা হইলে তাহা স্থগিত করি।”

যো। না—আপনার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ দেশে পঁহুছিলেন। বৃদ্ধের হরিনামে বিরাম নাই। যোগমায়া কিন্তু মালা লয়েন না। বৃদ্ধপ্রদত্ত মালা পড়িয়াই থাকে, তিনি স্থির হইয়া নামেই থাকেন। একদিন বৃদ্ধ বলিলেন,—“মা! তুমি নামেই থাক, তাহা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু তুমি মালা লও না কেন?”

যোগমায়া কোন কথা কহেন না। বৃদ্ধও ছাড়েন না। তখন যোগমায়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, চক্ষে ধারা বহিল, অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, সে স্বেদ, কম্প, পুলকে যোগমায়ার যে মূর্ত্তি, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধের হস্ত হইতে মালা খসিয়া পড়িল; চক্ষে ধারা বহিল, নাম যেন অন্তর্ম্মুখে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু মুখ বদ্ধ হইয়াছে, যে সংখ্যা গুণিবে—সে যেন নাই। তখন বৃদ্ধ দুলিতেছেন, যেন আপনাকে আপনি ধারণ করিতে পারিতেছেন না। যোগমায়া দেখিলেন—বৃদ্ধ পড়িয়া যাইবেন। যোগমায়া তখন ডাকিলেন,—“বাবা! বাবা!” দুইতিন ডাকের পর—

বৃদ্ধের যেন চেতনা হইল, তিনি বলিলেন,—"মা! তুমি ধন্য, আর মা,—তোমার মালা লইবার জন্য—ব্যস্ত করিব না। তোমার মা—অন্তরে অন্তরে নামের মালা চলিতেছে—যে দেখে নাই, সেই তাহা বুঝিবে না, তাই আমি বুঝি নাই। আমার দোষ লইবে না, আজ হইতে তুমি আমার ধর্ম্ম মা হইলে।

যো। এতদিন কি—নামে এভাবে কখন হৃদয় গলে নাই।

ভ। কই মা,—সেই কৃপার জন্য—ভগবানকে বল, ভক্ত-মুখেই ত মা—ভগবান শুনেন।

যো। হৃদয়ে যে শক্তি অনুভব করিলেন, এই শক্তিতেই—কৃষ্ণ-নাম অধিষ্ঠিত। এ শক্তি ভিন্ন, নাম প্রকট হন না, না হইলে হৃদয় শুদ্ধ হয় না, না হইলে ভক্তি শক্তির সঞ্চার হয় না। সঞ্চার না হইলে—ভক্তির উদয় নাই। বিনা সঞ্চারে সংখ্যা গণনার প্রয়োজন হয়। ভক্তিতে দ্রব যে, তাহার সাধনে সংখ্যা করে কে?

ভ। সব কথা শুনিলাম, কিন্তু ভক্তহরিদাস, সংখ্যা গণনা করিতেন কিরূপে?

যো। নিম্নাধিকারীকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার—মালা ধারণ, নচেৎ তাঁহার মালা-অপেক্ষা ছিল না। যতদিন অপেক্ষা থাকিবে, আপনিও—ততদিন নামে—সংখ্যা গণিবেন, পরে—সঞ্চারে ভক্তি-প্রবাহে—মালা ঠিক থাকিবে না। সে নামের—অন্ত নাই, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনেও, হৃদয়ে সে নাম খেলিবে। যখন সেদিন আসিবে, তখন মালার অপেক্ষা না থাকিলেও—নিম্নাধিকারীর জন্য থাকিতে পারে।

ভ। তুমি যে শক্তির কথা বলিলে, সে শক্তি কি নামে নাই?

যো। যে নামে আছে, সেই কৃষ্ণ-নাম। কৃষ্ণ-নামে কৃষ্ণ-শক্তি নিত্য, যে নাম কৃষ্ণ-শক্তি-শূন্য, তাহা—কৃষ্ণ নাম নহে। এই নাম শক্তির উদয়কেই, শক্তি সঞ্চার বলা হয়। শক্তি-সঞ্চারেই জীব বুঝিতে পারে :—

"একবার হরিনামে—যত পাপ হরে।
পাপী হ'য়ে তত পাপ—না করিতে পারে॥"

সঞ্চারের পূর্ব্বে সে, একথা শুনে, সুকৃতিদ্বারে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু দৃষ্টি করে না। এই বিশ্বাসই—সঞ্চারের পূর্ব্বভাব, এজন্য সাধু বলেন :—

"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

সঞ্চারে দৃষ্ট বিশ্বাসই ভক্তি—এহেতু বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ভক্তিরই নামান্তর। আপনি কৃষ্ণে শ্রদ্ধাবান্, যাহার কৃষ্ণে শ্রদ্ধা, সে যদি অপরাধ শূন্যে—কৃষ্ণ-নাম লয়, কৃষ্ণ—গুরুরূপে উদয় হইয়া স্বশক্তি প্রকাশ করেন। যতদিন জীবে—কৃষ্ণের এ কৃপা না হয়, শ্রদ্ধায় জীব—অপরাধ শূন্যে নাম লইবে, এবং বৈধী ভক্তিগত একাদশী, চাতুর্ম্মাস্য ইত্যাদি ভগবদ্ভক্ত সেবায় -নিযুক্ত থাকিবে। আবার সঞ্চারে ভাবোদয়ে সে, এ সেবা লইতেও পারে, না লইতেও পারে। কারণ ভগবান বলেন :—

"পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষ—আজ্ঞা বলবান॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগকরি—সে কৃষ্ণকে ভজয়॥"

সঞ্চারে জীব অন্তর্ম্মুখ হয়, অন্তর্ম্মুখই তাহার সাধন চলিতে থাকে। আজ্ঞার পর, যে আজ্ঞা—তাঁহাই তাহার শেষ আজ্ঞা। পূর্ব্ব আজ্ঞা পালনে সঞ্চার, সঞ্চারে যে আজ্ঞা, সেই আজ্ঞায় তখন—তাহার সাধন।

"সঞ্চারে ভক্তি প্রবাহে সে শান্ত হয়। যে শান্ত হইয়াছে, বহির্ম্মুখ সাধনে আর তাহার প্রয়োজন নাই, তবে পরিনিষ্ঠিতের সে সাধনা, নিম্নাধিকারীর জন্য মাত্র। নচেৎ শাস্ত্রে সে যাহা পূজিত, তাহা হৃদয়ে দেখিয়া, আর তাহাকে শাস্ত্র অনুসন্ধান জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হয় না। বীজ যেমন জল সেচনেই ফলফুলে শোভিত হয়—তদ্রূপ নাম—শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তনে ফলফুলে শোভিত হয়, শাস্ত্র পাঠে রাগ

রসের বিচার করিতে হয় না। আর তাঁহাকে অবিদ্যাগত মন, বুদ্ধি দিয়া পরোক্ষ জ্ঞানের বৃদ্ধি করিতে হয় না। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, বা একাদশী, চাতুর্ম্মাস্যে দিন কাটাইতে হয় না। আর তাহাকে গ্রাম্য কথার সঙ্গে সঙ্গে মনের, মন সন্তুষ্ট করিতে, হরি নামে বিষয় কূপে পতিত হইতে হয় না। দেহের জাগ্রৎ, স্বপ্ন নিদ্রা যেমন স্বতঃই উদয় হয়, তেমনি নামে তখন সে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রাগত হয়। জীব যেমন নিদ্রাতেও মায়া-সঙ্গী, সঞ্চারীও তেমনি নিদ্রাতে নাম-সঙ্গী হয়। সে জন্য সে, নিন্দাকে—নিন্দাবোধ, সুখ্যাতিকে—সুখ্যাতি বোধ করে না। সে দেখে—সকলি বৈষ্ণব, মায়া ঘোরে অবৈষ্ণব মাত্র। কারণ স্বর্ণ, বিষ্ঠাগত স্বর্ণকে ভিন্ন দেখে না, তবে তাহার সঙ্গও করে না। এই জন্য সাধু বলেন ঃ—

"নাচে গায় নাম লয়, নাহি জানে আন।
প্রভুর সেবা করে, ভক্তের নাহি নাম॥
অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে॥"

আপনি শ্রদ্ধায় অধিকারী, নচেৎ ভক্ত সেবায় এত আগ্রহ কেন? কৃষ্ণে দরদ না জন্মিলে কি—কৃষ্ণের ভক্তে দরদ হইতে পারে? ভক্ত যেখানে—কৃষ্ণ সেখানে। তাই বোধ হয়, কৃষ্ণ আপনাকে অচিরে কৃপা করিবেন। আমার বহু বহু সুকৃতি, তাই আমি আপনার দর্শনে, ক্ষেত্রের সে মর্কটবৈরাগীর দল অতিক্রম করিয়া, নিত্য অপরাধ শূন্য হরিনাম শুনিতেছি, অপরাধ শূন্য নামে, হরি কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না।"

এইরূপ ভক্তি-প্রসঙ্গে বৃদ্ধ বড়ই প্রীত। যোগমায়াকে ছাড়িয়া তিনি এক দণ্ড থাকিতে চাহেন না। কিন্তু যোগমায়া, কামিনী সুলভ লজ্জাবশতঃ, গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়াই বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। এই সহবাসে দিন দিন গৃহিণীরও, কৃষ্ণে মতি গাঢ় হইতে লাগিল। তখন সংসারে আহার, বিহার—নাম মাত্র। যোগমায়ার মুখে হরসুন্দরের কথা শুনিয়া অবধি, বৃদ্ধের হরসুন্দর-দর্শন-ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে,

সেই বলবতী ইচ্ছায় বৃদ্ধ, যোগমায়াকে লইয়া সপরিবারে হরসুন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণ এখন নিত্য দেবীগ্রামে যাতায়াত করেন। ইতিমধ্যে যে, ক্ষেত্রে তাঁহার যোগমায়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। বিশেষ তাঁহার নিকট যোগমায়ার কোন কথা কেহ তুলেন নাই। দেবেন্দ্র, নরনারায়ণের সহিত দেখা করেন বটে, কিন্তু সে কথা কিরূপে তাঁহার নিকট জানাইবেন, এজন্য তিনিও সে কথা কোন দিন তুলেন নাই। বিশেষ নরনারায়ণ এখন প্রায়ই হরসুন্দরের নিকট থাকেন। বাড়ীতে এক আধবার আইসেন মাত্র, নচেৎ চঞ্চলা বড়ই কাতর হন।

প্রতিবাসী বা আত্মীয় স্বজন, নরনায়ণকে দেখিয়া যাহার যেরূপ হৃদয়, তিনি সেইরূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও, নরনারায়ণ কাহাকেও কিছু বলেন না। কেহ নরনারায়ণকে ভক্তি করেন, কেহ বা ভ্রষ্ট ভ্রমে অভক্তিও প্রকাশ করেন; কিন্তু নরনারায়ণ উভয়কেই সমান চক্ষে দেখেন।

নরনারায়ণের এখন আর সে গেরুয়া বসন নাই, জটা নাই। এ পরিবর্ত্তনে তাঁহাকে কে ভ্রষ্ট না বলিবে? ঘৃণা না করিবে? কিন্তু হরসুন্দরের আজ্ঞা, নরনারায়ণ বিনা আপত্তিতে, পালন করিয়া প্রফুল্লমনা।

পূর্ণানন্দ, বা অচ্যুতানন্দ কিন্তু সেই—সন্ন্যাসি-বেশেই আছেন; তবে নরনারায়ণের প্রতিই হরসুন্দরের এ আদেশ কেন? নটনারায়ণ ও চঞ্চলার জন্য। পূর্ণানন্দের বা অচ্যুতানন্দের ত আর নটনারায়ণ, চঞ্চলা নাই, তবে কাহার প্রীতির জন্য তাঁহাদের বেশ পরিবর্ত্তন

প্রয়োজন? কিন্তু ভক্তির এমনি স্বধর্ম্ম যে, পূর্ণানন্দ বা অচ্যুতানন্দের সে বেশ পরিবর্ত্তনে আর কোন আপত্তি নাই—ধা ভক্তিগত সে বৈষ্ণব লক্ষণ ধারণ, তাহাতে তাঁহাদের এখন বড়ই প্রীতি।

নরনারায়ণের সেই পূর্ব্ব কথা মনে হয়,—আর হাসি পায়। তাঁহার প্রতি সাধারণের ভাব ভঙ্গী দেখেন, আর মনে মনে হাসেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কথা—আর পাঁচ কথায় আবরণ করেন। মনে করেন -যে জন্য আমার এ পরিবর্ত্তন, এ সকল হৃদয়ে এমন কোন ভাব নাই, যাহার দ্বারায় আমার প্রকৃত ভাবের পরিচয় হইবে। তিনি এখন অপমান, অমান্যকে মাথায় লইয়াছেন, মান, সুখ্যাতির প্রতি দৃষ্টি ভুলিয়াছেন, হৃদয়ে কিন্তু উভয়কেই স্থান দেন নাই।

আজ দুই দিন নরনারায়ণ দেবীগ্রামেই আছেন। হরসুন্দর, কৃষ্ণ প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ, শশাঙ্ক, নরনারায়ণ সকলেই স্থির মনে শুনিতেছেন। কাহার মুখে বাক্য নাই। শশাঙ্ক, হরসুন্দরের প্রতি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ একদৃষ্টে কেবল চাহিয়া আছেন, আর মধ্যে মধ্যে স্বেদে অঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। পূর্ণানন্দ সে ভাব দেখিয়া মনে মনে বলিলেন—আমরা বনে বসিয়া নানা কষ্ট স্বীকারে একতত্ত্ব অভ্যাসে দিন কাটাইয়াছি, শশাঙ্ক সংসারে বসিয়া সেই ধ্যানে মগ্ন, ধন্য ইহাদের ভক্তি, ধন্য ইহাদের প্রতি ভগবৎ-কৃপা।

শশাঙ্কের ভাব দেখিয়া হরসুন্দর স্থির হইলেন, বলিলেন, "শশাঙ্ক! উঠ, স্থির হও, তামাক খাও দেখি?"

শশাঙ্ক তামাক সাজিতে উঠিলেন। পূর্ণানন্দ, হরসুন্দরকে বলিলেন, "এই যে সকল ভাব দেখিতেছি, সংসারে ইহার অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভব? তাই আমার মনে হয়, যে ধর্ম্ম—সংসারে হয়—কি—বনে হয়।"

হরসুন্দর বলিলেন, "সংসার যুতের হইলে—সংসারেই হয়, নচেৎ বন ভিন্ন উপায় কি? ভাগবত-সঙ্গ যদি ভাগ্যে না থাকে, তবে বনে নিঃসঙ্গ ভাবেই থাকিতে হইবে, কারণ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত, জীবের

সাধ্যে সঙ্গলাভ—ভাগ্যে ঘটে কি? ভাগবত-সঙ্গ হেতু সংসার শ্রেষ্ঠ আশ্রম।"

পূ। যুতের সংসার কিরূপ আমি বুঝিলাম না।

তখন শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সাধু-সহবাসই যুতের সংসার।"

পূ। তবুও আমি বুঝিলাম না। সংসারে সাধু-সহবাস—কি বলিতেছেন?

হরসুন্দর বলিলেন, "শুনিয়া বুঝিবেন না. বুঝিতে পারিবেনও না। দেখিলে যদি বুঝিতে পারেন, দেখিবার ইচ্ছা আছে কি?"

পূ। তাহা আপনার কৃপা, যদি কৃপা করিয়াছেন, যদি বন হইতে সংসারে আবার ঢুকাইয়াছেন, তবে যাহাতে ভ্রম কাটে, ভক্তির দাস হইতে পারি, সে ভিক্ষা দিতে হইবে।

তখন হরসুন্দর বসিয়া বসিয়াই বিষ্ণুপ্রিয়াকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি মধ্য-দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু কামিনী-সুলভ লজ্জায়, তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিতে পারিতেছেন না। সে জন্য চিন্ময়ী-হরিপ্রিয়াও বড় চিন্তিত, কারণ হরসুন্দরের ঐ রূপ আহ্বান, তাঁহারা কখন শুনেন নাই। হরসুন্দর আবার বলিলেন—"লজ্জার প্রয়োজন নাই, এখানে তোমার স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিবার কেহ নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে গৃহ মধ্যে আইস।"

আলুলায়িত কেশে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন বালিকার ন্যায় হরসুন্দরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে চমকিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীগত ভাব দেখিবার চক্ষু তখন আর কাহার নাই, কিন্তু সকলেই তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

হরসুন্দর বলিলেন, "মা! একটা আলো আর বইখানা লইয়া আইস।" বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাই করিলেন, কারণ জিজ্ঞাসায় তাঁহার ইচ্ছা নাই, যেমন সকলে দেখিতেছেন, তিনিও তেমনি আজ্ঞাপালনে দেখিতেছেন মাত্র।

হরসুন্দর ঊর্দ্ধে নির্দ্দেশ করতঃ বলিলেন, "ওই মটকাটিতে অগ্নি ধরাইয়া দাও।"

বিনা বাক্য ব্যয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাই করিলেন।

হরসুন্দর বলিলেন, "নামিয়া এইখানে দাঁড়াও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাই করিলেন। তখন তৃণগুচ্ছ, ক্রমে ক্রমে দীপমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। গৃহ মধ্যে ভস্ম পড়িতে লাগিল, অগ্নিকণা ছিটকাইতে লাগিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, নয়ন ধারে গণ্ড ভিজিতে লাগিল। শশাঙ্ক—স্বেদ, কম্পে মুখ আরক্তবর্ণ করতঃ যোড় হস্ত হইলেন।

কিয়দগ্রে পূর্ণানন্দ একখানি আর্দ্র কৌপীন বাহিরে—রৌদ্রে শুখাইতে দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার তাহা মনে হইল, পাছে তাহা পুড়িয়া যায় এজন্য, তিনি সহসা উঠিয়া সেখানি সংগ্রহ করিলেন। তখন শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিলেন।

এ দিকে প্রতিবাসীরা এবং জ্যোতিঃপ্রসাদ, শিবসুন্দর, জীবসুন্দর আসিয়া উপস্থিত। শশাঙ্কের হাস্যের ভাবে তাঁহারা কি বুঝিলেন, কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া প্রতিবাসীর সহিত সে অগ্নি নির্ব্বাণে অগ্রসর হইলেন। স্ফুলিঙ্গ পতনে সকলেই তখন সরিয়া সরিয়া বসিতেছেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সে দিকে দৃক্‌পাত নাই দেখিয়া, অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "মা! আমি যেমন তোকে অহঙ্কারে, একদিন বাঁচাইলাম—মনে করিয়াছিলাম, ভগবান সেই তোকে দিয়াই, আজ তাহার উত্তর দিলেন। তুই ধন্য মা, তোর জন্য আজ আমিও ধন্য। মা! তখন আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, আজ তুই আমায় কৃষ্ণে মতি আশীর্ব্বাদ কর।"

দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বসন ধরিয়া উঠিল। তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্ত যোড় হইয়া গেল, কিন্তু তিনি স্থির, অবিকম্পিত—দারুমূর্ত্তি। শশাঙ্ক লম্ফ দিয়া তাঁহার বসন মোচন করিতে গেলেন, অমনি হরসুন্দর নিকটে গিয়া শশাঙ্কের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে, বসন ত ধরে

নাই” এই বলিয়া হরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, “তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।” শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন,—তোমার সকল তাতেই শঠতা, এই না তোমার গুণ নাই—শিবসুন্দর, জীবসুন্দর বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, প্রতিবাসী কাহাকেও সে দিকে আসিতে দেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্দরে গেলেন। হরসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে সকলে বাহিরে আসিলেন।

হরসুন্দর, পূর্ণানন্দকে বলিলেন, “যুতের সংসার কাহাকে বলে, দেখিলেন কি ?”

পূ। ভগবানের কৃপায়, আজ দেখিলাম।

এ দিকে প্রতিবাসী দ্বারা সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না, ক্রমশঃ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল, কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

শশাঙ্ক বাহিরে আসিয়া পূর্ণানন্দকে বলিলেন, “বুনোগোঁসাই! সংসারে ত ধর্ম্ম হয়ই না, তাহা আমি পাঁচ শত বার বলিব, কিন্তু বনে যে হয়, আর হইয়াছে, কৌপীনের খেলাই তাহার প্রমাণ। সংসারের লোকগুলা যেমন সেয়ানা—ধর্ম্মও তেমনি কাণা, বুদ্ধি যেমন কুনো, গোঁসাই তেমনি বুনো আচ্ছা বল দেখি বুনোগোঁসাই! শূকর—কতক্ষণ ঘৃতান্ন খায় ?”

শশাঙ্কের দুই এক কথাতেই পূর্ণানন্দের চমক ভাঙ্গিয়াছে— পূর্ণানন্দ অধোবদনে বলিলেন, “বিষ্ঠার গন্ধ যতক্ষণ না পায়।”

তখন শশাঙ্ক অগ্নি নির্ব্বাণে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অগ্নি ভীষণ বেগে সমস্তই অধিকার করিয়াছে। গতিক দেখিয়া শিবসুন্দর, হরসুন্দরকে বলিলেন, “গতিক বড় ভাল নহে, সমস্তই ধরিয়া উঠিয়াছে, বাড়ী আর রক্ষা করিতে পারা যাইবে না বোধ হয় ”

হরসুন্দর একটু হাসিলেন, বলিলেন, “বাড়ীর প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, আর বাড়ীর প্রয়োজন নাই।”

শিবসুন্দর কোন কথা না কহিয়া, তখন দেবীপ্রসাদ প্রদত্ত নানা দ্রব্য, সেই অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন যাবৎ জীবসুন্দর, শিবসুন্দরের সহিত দেখা করেন না। যে জীবসুন্দর, শিবসুন্দরের ছায়ার ন্যায়, সে জীবসুন্দরের এভাব কেন? শিবসুন্দর মনে মনে ভাবেন—নরনারায়ণকে পাইয়া কি আমাদের ভুলিল?—না তাহা নহে। তবে কি? একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

গৃহদাহের পর হরসুন্দর এখন জ্যোতিঃপ্রসাদের সেই বৃহৎ অট্টালিকায়। জীবসুন্দর, জ্যোতিঃপ্রসাদ, নিভৃতে কৃষ্ণস্মরণে মগ্ন। শিবসুন্দর, সম্মুখে গিয়া বসিলেন। শিবসুন্দর যে সম্মুখে, জীবসুন্দর তাহা জানিতে পারেন নাই, কিন্তু অন্তরে যেন নূতন ভাবোদয়, সে ভাবে সঞ্চারী সাত্ত্বিক ভাবের প্রকট, সে প্রকটে শিবসুন্দরও যোগ দেওয়ায়, তিনি বাহ্যোন্মুখ হইলেন। তখন সম্মুখে শিবসুন্দরকে দেখিয়া বলিলেন "দাদা! ভ্রাতৃ ভালবাসা সুন্দর, কিন্তু আমার আজও সম্বন্ধ বোধ হইল না, আমি তোমার উপর দুঃখ করিয়া, দুই দিন যাবৎ তোমার মুখ দেখি নাই, সেও ত আমার অবিদ্যার অভিমান।"

শিবসুন্দর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "হইয়াছে কি? আমার উপর অভিমান কেন? জানি না—আমি তোমায় কি ব্যথা দিয়াছি, আমায় জানাইয়া অপরাধ শূন্য কর।"

জীব। অপরাধী আমি, যে সম্বন্ধ বোধহীন, তাহার অপরাধ পদে পদে।

শি। তা হউক, এখন অভিমান কেন বল, আমি সেজন্য তোমার নিকট দেখা করিতে আসিলাম।

জীবসুন্দর তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "পূর্ব্বে যাহাকে নিত্য উপদেশে আদর করিতেন, এখন সে কোন অপরাধে, সে কৃপায় বঞ্চিত হইল? এই আমার অভিমান। দাদার নিকট এ অভিমান খাটে, আর কোথাও ত এ অভিমানের স্থান নাই। দাদাই সংসারে বন্ধু।"

শিবসুন্দর আবার হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "তুমি বড় ছেলে মানসী করিয়াছ। বালককে লোকে সরোবরে যাইতে নিষেধ করে, কারণ সে বুদ্ধির অভাবে ডুবিতে পারে, কিন্তু তাহার বয়স হইলে, তাহাকে আর সে উপদেশ দেওয়া হয় না। তাহা ত জান, তবে অভিমান কিসের?

"সম্বন্ধ জ্ঞানে তুমিই অধিকারী। সংসারের কোন দ্রব্যই যেমন গৃহকর্ত্তার তুচ্ছের নহে, অথচ যাহা যেরূপ, তাহার সহিত তাঁহার তদ্রূপ ব্যবহার; তদ্রূপ তুমি ভগবানের কোন ঐশ্বর্য্যকেই হৃদয়ে তুচ্ছ করনা দেখিতে পাই, অথচ যাহার ভগবানে যেরূপ রতি, তুমি তাঁহার সহিত, সেই রূপেই ব্যবহার কর। যাহার এরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান, তাহাকে আর কি উপদেশ দিব? যাহার সম্বন্ধ বোধ হইল, তাহার বাকী কি? সম্বন্ধগত রসের উদ্দীপন ভিন্ন, কি সম্বন্ধ বোধ সুসিদ্ধ হয়? সুসিদ্ধ না হইলে কি, কর্ত্তায় লক্ষ হয়? না লক্ষ্য হইলে কি, কর্ত্তার বিশেষত্ব বোধ হয়? বিশেষত্ব বোধ না জন্মিলে কি, বিশেষ ভাবের উদয় হয়? বিশেষ ভাবের বোধ ভিন্ন কি, রাগাত্মিকা ভাবের সন্ধান হয়? রাগাত্মিকা ভাব ভিন্ন কি, রাধাকৃষ্ণের যুগল বিলাস দর্শন হয়? যদ্দ্বারা এই রাগাত্মক মন্দিরে জীবের গতি—তাহাই অভিধেয়—ভক্তি, এবং যাহাতে সেই রাগাত্মিকা বিলাস, তাহাই প্রয়োজন বা প্রেম। প্রেমেই ভগবৎপ্রাপ্তি, এ হেতু জীবের, প্রেমই প্রয়োজন। কারণ প্রেম ভিন্ন ভগবান দুর্ল্লভ। অতএব ভগবান প্রয়োজনের বিষয়, প্রেমই—প্রয়োজন। তবে ভাই! আমার উপর অভিমান করিবে কেন? বৃক্ষের অঙ্কুরেই লোকে জল সেচন করে, উপদ্রব নিবারণে চেষ্টিত হয়, যখন অঙ্কুর বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন সে স্বতঃই স্বকার্য্য সাধন করে। তবে আমার উপর অভিমান কেন? ভাবোদয়ে যখন তোমার সম্বন্ধ বোধ দৃঢ়ীভূত, তখন বৃক্ষ যেমন স্বগত রসে ফল ফুলে শোভিত হয়, তেমনি তুমি স্বগত ভাবে, সে ভক্তি, প্রেম বৈচিত্রে শোভিত হইবে বটে, কিন্তু নববিধ ভাবের সমুৎকণ্ঠাও একটী ভাব, সে ভাবে তোমার এ ভাবমূর্ত্তি

দেখিয়া, আজ আমার হৃদয়ে যে কি আনন্দ, তাহা যদি বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে এ অভিমান আর দাঁড়াইতে স্থান পাইবে না।”

জীবসুন্দরের সে ভাব কাটিয়া গেল, তিনি যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “অভিমান নহে, আমি না বুঝিয়া কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি, সে কথা ধরিয়া কাজ নাই। আমি বাবার নিকট সম্বন্ধ তত্ত্বের উপদেশ পাইয়াছি, আজ আমি আপনার নিকট, অভিধেয় রূপ—ভক্তির উল্লেখ শুনিতে চাই, এবং জানিতে চাই—ভক্তিই কিরূপে প্রয়োজন তত্ত্ব রূপে উদিত হয়েন?”

শিবসুন্দর বলিতে লাগিলেন,—“জীবের স্বরূপ নিত্য, নিত্য না হইলে, সে নিত্য প্রেমের অধিকারী হইতে পারিত না। মন, অবিদ্যা-গত। যাহা অবিদ্যাগত, তাহা চিৎকণ জীবের ঔপাধিক। যাহা ঔপাধিক—তাহা নিত্য নহে। যাহার প্রতিভাসে অবিদ্যার পলায়ন, এবং জীবের স্বরূপ প্রকাশে, স্বগত ভক্তি শক্তির প্রকাশ, তাহাই অদ্বয় চিৎস্বরূপ ভগবানের রাগাত্মিকা ভক্তি শক্তি, চিৎস্বরূপ ভগবানে নিত্য রাগময়ী, এ হেতু সে ভক্তিকে রাগাত্মিকা বলা হয়।

“স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আনুকূল্য বিশিষ্ট অনুশীলনই—ভক্তি বা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

“জীব চিৎকণ, অতএব জ্ঞানই জীবের স্বরূপ, ভক্তি—রাগরূপা, অতএব বৃত্তি বিশেষ। জ্ঞান—শুষ্ক, ভক্তি—রসার্দ্র। রস অর্থাৎ যাহার দ্বারা আনন্দ, চমৎকার, বিস্ময়াদি ভাবের সঞ্চার।

“চিদাকর্ষণই রাগস্বরূপা। কারণ সর্ব্বরাগের একমাত্র বিষয় কেন্দ্রই—সর্ব্বাকর্ষক ভগবান কৃষ্ণ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যরূপ দ্বিবিধ বিলাসে—রাগও ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যে দ্বিবিধ। মহিম-জ্ঞানযুক্ত বা ঐশ্বর্য্য রাগ, এবং মাধুর্য্য রাগ।

এই রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধ। কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগা। যাহা ইচ্ছারূপা তৃষ্ণাকে প্রেমময় রূপে পরিণত করে—তাহাই কামানুগা, এবং শ্রীকৃষ্ণে পিতৃত্বাদি অভিমানই—সম্বন্ধানুগা। এই উভয়বিধ ভক্তিতে জীবের রাগানুগা ভক্তিও কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগা ভাবে দ্বিবিধ।

যদিও গোপীগণ—কাম হেতু, কংস—ভয়হেতু, শিশুপাল—দ্বেষ-হেতু, যাদবগণ—সম্বন্ধহেতু, পাণ্ডবগণ—স্নেহহেতু, এবং ঋষিগণ—ভক্তিহেতু, পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল মাত্র কাম ও সম্বন্ধ উল্লেখের কারণ এই যে, আনুকূল্যের অভাব হেতু, ভয় ও দ্বেষকে বর্জ্জন করা হইল, এবং স্নেহ শব্দ, যে স্থলে সখ্যগত, সে স্থলে তাহা বৈধীর মধ্যে পরিগণিত, এবং রাগানুগা সাধন ভক্তিতে, তাহার উপযোগিতা নাই। কিন্তু যদি স্নেহ, প্রেমবাচক হয়, তাহা হইলেও সাধন ভক্তিতে তাহার উপযোগিতা নাই। কারণ শুদ্ধা ভক্তি—উপেয়, স্নেহকে উপায় স্বরূপে লইলে, বৈধী ভক্তিতেই পরিগণিত হয়। তবে যে শিশুপালাদির পরম গতির উল্লেখ, তাহার মর্ম্ম এই যে, সূর্য্য ও কিরণ—তত্বত এক। কেবল অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয় মাত্র। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার তনুভা ব্রহ্মে, ভেদ জানিবে। দ্বেষ ইত্যাদিতে ঐ কিরণ স্থানীয় ব্রহ্মেই গতি হয়, এজন্য ঐ কিরণগত প্রদেশকেই সিদ্ধ লোক বলা হয়—তাহাও মায়াতীত। কিন্তু ভক্ত, অভীষ্ট বিষয়ক রাগময় প্রেম বিশেষে, তাহার কৃপালাভে সূর্য্য রূপ শ্রীকৃষ্ণে গতি প্রাপ্তে, তাহার সেবায় অধিকার পায়।

"কামানুগা আবার দ্বিবিধ। সম্ভোগেচ্ছাময়ী, এবং তদ্ভাবেচ্ছাময়ী।

"সম্ভোগ ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য-ভাবগত স্বকীয় ভাব। কেলী ইত্যাদি শব্দে, ক্রীড়া মাত্রেতেই সম্ভোগ শব্দের তাৎপর্য্য, তৎ তাৎপর্য্যবতী যে ভক্তি, তাহাই সম্ভোগেচ্ছাময়ী। এবং স্ব স্ব যুথেশ্বরীদিগের ভাব মাধুর্য্য কামনাকেই—তদ্ভাবেচ্ছাময়ী বলা হয়। সম্বন্ধানুগাও দ্বিবিধ। এক ভক্ত সম্বন্ধ এবং আনুগত্য সম্বন্ধ।

"জীবের ত্রিবিধ অবস্থা। সিদ্ধ, সাধক, এবং বদ্ধ। বদ্ধ—অচিদঙ্গী, রাগসাধক—চিদচিদঙ্গী, এবং সিদ্ধ—চিদঙ্গবিগ্রহ। এ হেতু ভক্তিও ত্রিবিধ। অচিদঙ্গে—স্বরূপ ভক্তি নিদ্রিত ভাবেই থাকেন। কারণ অচিৎ—চিৎ এর নিদ্রিত ভাব। যথন ভক্তির—চিদচিৎ অঙ্গে ক্রিয়া, তথন তাহাকে উপায় ভক্তি, যথন চিদঙ্গবিগ্রহে ক্রিয়া—তথন তাহাকে উপেয় ভক্তি বলা হয়। কারণ চিদচিদঙ্গী ভক্ত, যাহার দ্বারায় অচিৎ

অঙ্গ নির্লিপ্তে, চিদঙ্গ লাভ করে, তাহাই উপেয় চিদঙ্গ ভক্তির—উপায় স্বরূপ। এ হেতু উপায় ভক্তিকে—সাধন ভক্তি, এবং উপেয় ভক্তিকে —সাধ্য ভক্তি বলা হয়। সাধ্য ভক্তি, সাধন ভক্তির ফলস্বরূপ, এ হেতু সাধ্য ভক্তিকে, ফল ভক্তিও বলা হয়।

"অতএব সাধ্য, সাধন ভক্তি স্বরূপত এক। এহেতু, ভক্তি দ্বিবিধ। এক শুদ্ধ, এক অশুদ্ধ। যাহা ভগবদ্ভক্তি-অভিভূত—তাহাই শুদ্ধ এবং যাহা ভগবদ্ভক্তি-অনভিভূত ও জ্ঞান কর্ম্মের দ্বারায় অভিভূত বা অনভিভূত—তাহাই অশুদ্ধ।

"অবিদ্যাপ্রভাবে লোক সদাই বহির্ম্মুখ। অন্তর্ম্মুখী গতির জন্য বা কৃষ্ণ-কৃপাহেতু উপাসনাই মূল। যিনি চিদঙ্গ-বিগ্রহ—কৃষ্ণে ভজন করেন, তিনি ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্ম, পরমাত্ম জ্ঞানে—সে ভক্তি সুদুর্ল্লভ। কারণ সে জ্ঞানে—মায়ায় ঘৃণা বোধ থাকে। ভক্তি হেতু যে উপাসনা—তাহা ভালবাসাময়, তাহাতে ঘৃণা স্থান পায় না। সদাই দাস্যভাব, সদাই সে দাস্যে—আনন্দ বর্ত্তমান। কৃষ্ণের মায়া বলিয়া—মায়াকেও ঘৃণা করে না, কৃষ্ণ মায়াকে যে ভাবে দেখেন—সেও সেই ভাবেই—মায়াকে দেখে, সেজন্য মায়া তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। পারে না বলিয়া—সে ভক্তি, শুদ্ধা। ঘৃণা—মায়াগত ভাব। নিষ্কামীর যে মায়ায় ঘৃণা, সে ঘৃণার লোপের সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ব্বাণ, সে হেতু সে তাহা জানিতে পারে না, অতএব তাহার নিষ্কামত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ কালের বৈচিত্র্যাভাব হেতু, তাহাতে সে অজ্ঞাত থাকে মাত্র। এজন্য সে ভক্তি—মায়া কামনায় নিষ্কাম হইলেও, ভগবদ্ভক্তি স্পর্শ বিনা—তাহা অশুদ্ধ।

"এই অশুদ্ধ ভক্তি দ্বিবিধ। আরোপসিদ্ধ এবং সঙ্গোপসিদ্ধ। জ্ঞান, কর্ম্ম যাহার প্রধান অঙ্গ—তজ্জনিত ফল বাসনায়—তাহাতে যে ভক্তির স্থিতি, তাহাকে গুণীভূতা বলা হয়। যদি ওই জ্ঞান, কর্ম্মের—ভক্তিই প্রধান অঙ্গ হয়, তবে সে ভক্তিকে প্রধানীভূতা ভক্তি বলা হয়। গুণীভূতা ভক্তির ফল—স্বর্গাদি ভোগ। ইহাই বদ্ধজীবের—সকাম ভক্তি। এই ভক্তিতেই সংসার চালিত। প্রধানীভূতা ভক্তিই—সাত্ত্বিকী ভক্তি।

"এই সকাম ভক্তি—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ অনুসারে—ত্রিবিধ। যিনি ভেদদর্শী—হিংসা, ক্রোধ, মাৎসর্য্যে ভক্তিকে মিশ্রিত করেন, তাঁহার ভক্তি—তামসী।

"যিনি ভেদ-দর্শী—যশ বা বিষয়, ঐশ্বর্য্যের বাসনায়—ভক্তিকে কলুষিত করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি—রাজসী।

"ভেদ-দর্শী যে পুরুষ—পাপক্ষয়, কিম্বা ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ হেতু বেদ-আজ্ঞায়, ভক্তিতে হরির পূজা করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি—সাত্বিকী।

"হরি—মায়াতীত। এ তিন ভক্তিতে—হরি সন্তুষ্ট নহেন। কারণ এ তিন ভক্তিই মায়ামিশ্রিত। ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমের অধিষ্ঠাত্রী—মহামায়া, কৃষ্ণের আজ্ঞায়—তাঁহাদের মায়া ফলদানে তুষ্ট করতঃ—মায়া-জালে বদ্ধ রাখেন। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস; সে অবিদ্যায় সকাম ধর্ম্মে স্বরূপ হারাইয়া—যে সুখ প্রার্থনা করে, তাহা এত তুচ্ছ যে তাহা কৃষ্ণ দেন না, যাঁহার দাস, দাসীই তাহা পূরণ করে। তাহার এই ভাবে সে এত মলিন—যে, তাঁহার দাস, দাসীরা, তাহাকে সে অমল কৃষ্ণ স্বরূপের নিকট যাইতে দেন না। বন্ধন দশায় রাখেন। যাহা দিয়া বন্ধন করেন, তাহাই—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ আবরণে, এবং তদগত কর্ম্মে—সেই ত্রিগুণ রজ্জু দিয়া বন্ধন করেন। ইহাতে জীবের যে সুখ, দুঃখ ভোগ, তাহা বর্ণনাতীত। কারণ ত্রিগুণের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ শৃঙ্খলের ন্যায়। যিনি সাত্বিক—তিনিই তাহাতে আবদ্ধ হইয়া মায়া রাগে অহঙ্কারী, তবে আর রাজসিক, তামসিকের কথা কি? সেজন্য বন্ধন পক্ষে, এ তিনই সমান। জড়ে—জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি, অস্তিত্ব, পরিণাম, ক্ষয়, এই ছয় ভাব নিত্য, এবং তদ্‌গত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাবে জীব বাসনাময় হইয়া নিত্য আহার, নিদ্রা, মৈথুনে ব্যস্ত।

"এইরূপ সকাম ভাবে—জীব নানা কর্ম্মে—ধর্ম্ম আহরণে রত, এবং ঈপ্সিত ধন ভোগে—তাহার ক্ষয়ে, আবার তাহার জন্যই ব্যস্ত। এইরূপ কর্ম্মফলে—কখন স্বর্গ, কখন নরক ভোগ হইতেছে, কিন্তু মায়া-

পাশ ছেদনের তাহাতে কোন উপায় নাই, এবং তাহাতে সে দৃষ্টিও ফুটে না।

"এই প্রধানীভূতা বা সাত্ত্বিকী ভক্তি, আবার দ্বিবিধ। কর্ম্ম-মিশ্রা এবং জ্ঞান-মিশ্রা। মুক্তিহেতু যাহার দ্বারায় সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহাকে কর্ম্ম-মিশ্রা এবং যাহার দ্বারায় আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয়—তাহাকে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি বলা হয়। কর্ম্ম-মিশ্রা-ভক্তি-সম্পন্নে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি, অর্থাৎ—কর্ম্ম প্রধান জ্ঞান, সাধন সম্পন্নে—জ্ঞান প্রধান কর্ম্মে পরিণত হয়। কর্ম্মপ্রধান জ্ঞানে—কর্ম্মযোগ, তৎপরে জ্ঞান প্রধান কর্ম্মে—সমাধি। পরমাত্মে সমাধি—কৈবল্য যোগ, এবং ব্রহ্মে সমাধি—জ্ঞানযোগ। এই কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তিকেই—মিশ্রা নিষ্কামা বা আরোপসিদ্ধা, এবং জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিকেই—নিষ্কামা বা সঙ্গোপ সিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। কারণ, তাহা জড়কামনাশূন্যে—কৈবল্য বা নির্ব্বাণ-উন্মুখী।

"যখন ভক্তি উক্ত জ্ঞান, বা কর্ম্মের দ্বারায় অনভিভূত ভাবে—ভগবদ্ ভক্তিতে অভিভূত হয়, তখন সেই ভক্তিকে—স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। কারণ সেই ভক্তিতেই—জীবের স্বরূপ, সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ জড় বিবিক্ত ভাবে চিৎ স্বরূপে সে, স্ব স্বরূপ দর্শনে সক্ষম হয়। কখন কখন স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তিকেও নিষ্কাম ভক্তি শব্দে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

"এই স্বরূপসিদ্ধ ভক্তি দ্বিবিধ। সাধ্য এবং সাধন। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাধ্য ভক্তিতে, জীব রাগাত্মিকা ভক্তিতে অভেদে—ভগবৎ পার্ষদ রূপে চিন্ময় ধামে স্থিত হয়। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগমন করে, এহেতু তাহাকে—রাগানুগা বলা হয়।

"এহেতু, রাগানুগা ভক্তি—লোভাত্মক, কারণ রাগানুরাগ আশ্রয় যে রাগাত্মিকা ভক্তি, তাহা রাগ স্বরূপ, সেই রাগে—লোভাত্মক যে ভক্তি—তাহাই রাগানুগা। লোভের যেমন স্বতই উদয়, কাহার অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ রাগানুগা ভক্তি, শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা করে না।

"স্বরূপসিদ্ধ ভক্তির যখন ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশ, তখন তাহাকে—সাধন ভক্তি, যখন অতীন্দ্রিয় ভাবে চিজ্জগতে স্থিতি, তখন তাহাকে—সাধ্য ভক্তি বলা হয়।

"এই সাধ্য ভক্তি আবার দ্বিবিধ। ভাব এবং প্রেম।

"এই স্বরূপসিদ্ধ ভক্তি রাগস্বরূপ, রাগ—বৃত্তিবিশেষ, জ্ঞানই তাহার আধার স্বরূপ, অতএব জ্ঞান—ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। সেজন্য জ্ঞান—আধার, ভক্তি—আধেয়। জড়ে যে অনুরাগ, সেই রাগ বিপরীত-মুখী হইয়া আত্মোন্মুখ হইলেই—বৈরাগ্য, অতএব যেমন আলোকের পরবর্ত্তী ছায়া, তদ্রূপ ভক্তির বৈরাগ্য সহচর হইলেও—আলোক এবং ছায়া রূপ বিরুদ্ধগুণ বশতঃ, বৈরাগ্য—ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না।

"ভক্তি—বৃত্তি বিশেষ হেতু, স্বয়ং সেবা রূপা, এহেতু সাধক, সিদ্ধের যে সেবা রূপ ক্রিয়া—তাহা ভক্তিই, ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তি নিরুপাধিক, এহেতু তাহাতে অঙ্গরূপ কোন উপাধিই লক্ষিত হয় না।

"যদি বল শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণরূপ অনুধ্যানই ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও নহে, কারণ অনুধ্যানেরও সিদ্ধাবস্থা—রাগ, অতএব অনুধ্যান—তাহার অঙ্গ হইতে পারে না। যদি বল, সৎসঙ্গ ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও নহে, কারণ সৎসঙ্গও রাগরূপা, রাগ—রাগের অঙ্গ হইতে পারে না।

"এইরূপে পরোপকারও পরানুশীলনের অঙ্গ নহে, তৎস্বরূপ। এহেতু দয়া, মৈত্রী, ক্ষমা, দান ইত্যাদি ভক্তিরই বৃত্তি বিশেষরূপে গণ্য।

"উপায় স্বরূপ সাধন ভক্তির দুইটী অঙ্গ। পরানুশীলন ও প্রত্যা-হার। পরানুশীলনে জীবস্বরূপের—স্বরূপবৃত্তির উৎকর্ষ, এবং প্রত্যাহারে—সেই বৃত্তিকে মায়া পঙ্ক হইতে উদ্ধার।

"প্রত্যাহারে—মায়ামুক্তি। পরানুশীলনে স্বরূপবৃত্তির উৎকর্ষে, মুক্তি স্বতঃ সিদ্ধ বটে, কিন্তু যদি প্রত্যাহারে দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে—সকাম ভক্তি প্রাচুর্য্যে, অহৈতুকী ভক্তির দৃষ্টি বাধিত হইতে পারে। কারণ স্বরূপসিদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তি লক্ষণ যে পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ,

ইত্যাদি—তাহা সকাম ভক্তিরও লক্ষণ বিশেষ হেতু, পথভ্রম হইতে পারে। অতএব প্রত্যাহারের সহিত পরানুশীলন কর্ত্তব্য।

"এহেতু শুদ্ধরাগের কোন অঙ্গ দৃষ্ট না হইলেও, সকাম রাগে, প্রত্যাহার অঙ্গরূপে গণ্য। এই জড়কুণ্ঠিত রাগের অন্তর্ম্মুখ চেষ্টাই—পরানুশীলন, এবং বহির্ম্মুখে চিত্তের বিক্ষেপরূপ প্রতিবন্ধক দূরীকরণই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয়ে চিৎকণ জীবের ইতরানুরাগ নিবৃত্তিই—প্রত্যাহার। নচেৎ কেবল ইন্দ্রিয় জয়ে, ইতরানুরাগের বৃদ্ধিই দেখা যায়। যে ফলে যোগী যোগভ্রষ্টে আবার ইন্দ্রিয় দাস হইয়া পড়েন। এজন্য শাস্ত্র যে নানা প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, সে সকলই—প্রত্যাহারের উপযোগী। তাহার কতকগুলিতে দেহের, কতকগুলিতে ইন্দ্রিয়ের, কতকগুলিতে মনের উপকার হয়। তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ইত্যাদিতে দেহের শুদ্ধি, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, শম, দম ইত্যাদিতে ইন্দ্রিয়ের, এবং তিতিক্ষা, আর্জ্জব, অস্তেয়, অক্রোধ, সাংখ্য ইত্যাদিতে মনের শুদ্ধি। এক প্রত্যাহারই ইহাদের ফল স্বরূপ, এই প্রত্যাহারে যোগ, এবং যোগের ফল—ভক্তি।

"প্রত্যাহার সাধন, ভক্তির অঙ্গ বিশেষ হইলেও, প্রবৃত্ত ভক্তের পক্ষে, অনেক সময়ে বিপজ্জনক হয়। কারণ তপস্যা, কর্ম্ম, মুক্তি, অদ্বৈত জ্ঞান, ইত্যাদি প্রত্যাহার-প্রত্যঙ্গকে মুখ্য ফল বোধে, তাহাতেই বিমুগ্ধ হওয়ায়, আর সে অগ্রসর হইতে পারে না।

"বৈরাগ্য—তিন প্রকার। শ্মশান বা ফল্গু বৈরাগ্যের অবস্থা অস্থায়ী। তাহা ক্ষণেকে উদয় হয়, ক্ষণেকে তিরোহিত হয়। সমুদয় ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাম্প্রদায়িক চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া, যাঁহারা সংসার হইতে দূরে থাকেন—তাঁহাদের বৈরাগ্য শুষ্ক। কারণ তাঁহারা মায়া-রাগ পরিত্যাগ করিতে চাহেন, কিন্তু অন্য রাগেও সিক্ত হইতেও পারেন না। তাহাতে সময়ে সময়ে, এরূপ অনর্থে পতিত হয়েন, যাহা তাঁহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত। কারণ কেবল জ্ঞানের দ্বারায় মায়াতীত হওয়া যায় না। সেইজন্যই তাঁহারা সংসারে তিষ্ঠিতে পারেন না, কারণ সংসারে নানা প্রলোভন। জল হইতে দূরে থাকিয়া জলজীত হওয়া, যেমন মনের কল্পনা, ইহাদেরও ইন্দ্রিয়

জয়ও সেইরূপ। ইহার ভাণের নামই মর্কট বৈরাগ্য, ভিতরে মায়াক্লেদে পূর্ণ—কিন্তু উপরে সাম্প্রদায়িক চিহ্নে পরিষ্কৃত।

"যুক্ত বৈরাগ্যই প্রত্যাহারের সাধক। নিষ্কাম ভাবে শুদ্ধ ভক্তিতে কর্ম্ম সাধনেই, যুক্ত বৈরাগ্যের উদয় হয়। পরানুশীলনের জন্য দেহযাত্রা। সেই দেহকে পরানুশীলনের যোগ্য করিয়া রাখিবার জন্য যে কর্ম্ম, তাহা বৈরাগ্যের অঙ্গ বলিতে হইবে। যেহেতু তাহারা প্রত্যাহারের সাধক ভিন্ন, বাধক নহে। কারণ কর্ম্ম মাত্রই ত্যাগের নহে।

"ভাব যুক্ত সাধনকে—পরানুশীলন বলে। স্বরূপ সিদ্ধ প্রেমের—মনে যে আবির্ভাব—তাহাই ভাব। শারীরিক কার্য্যের দ্বারায় যে ভাবানুশীলন —তাহাই সাধন। অতএব ভাবাভাবে যে সাধন, তাহা কল্পনা। সাধনে— মনে ভাবের আবির্ভাব, এবং জীবস্বরূপে প্রেমাবির্ভাব না হইলে, সে সাধন সিদ্ধ হয় না। অতএব পরানুশীলনই সাধন, এবং সাধনই ভাব ও প্রেমের বাহ্যরূপ। সাধন ভক্তি দ্বিবিধ রাগ এবং বৈধী। বৈধীও রাগ বিশেষ, তবে যে রাগ বিধি নিয়মকে অপেক্ষা করে, সেই রাগকে বৈধী, বা মহিম জ্ঞানযুক্ত রাগ, এবং যাহা বিধি নিয়মকে অতিক্রম করতঃ অগ্রসর, তাহাকেই রাগ শব্দে নির্দ্দেশ করা হয়। এই রাগ এবং বৈধী, অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। শক্তি-সঞ্চারে, শক্তির উদয়ে ভগবন্নামে যে সাধন, তাহাই অন্তরঙ্গ; শক্তির অনুদয়ে ভগবন্নামে যে সাধন, তাহাকেই বহিরঙ্গ বলা হয়। অতএব বহিরঙ্গ সাধনই, ভগবন্নামে শক্তির উদয়ে—অন্তরঙ্গ সাধন, এবং অন্তরঙ্গ সাধনই শক্তির অনুদয়ে—বহিরঙ্গ সাধন। শক্তি সঞ্চারের পূর্ব্বে ভগবন্নামে যে সাধন, তাহা যদি লোভ যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাগের বহিরঙ্গ, এবং যদি বিধি আজ্ঞার অধীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৈধীর—বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়। রাগাত্মিকার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব প্রতিভাসে, রাগ ভক্তি—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর ভাবে প্রকটিত, এবং বৈধী —শান্ত, দাস্য, সখ্যে প্রকটিত হয়। বৈধীগত দাস্য, সখ্য—ঐশ্বর্য্যগত,

কারণ ঐশ্বর্য্যে কৃষ্ণ বিভু, নারায়ণরূপে; সে বিভুরূপ মধুরগত—দাস্য, সখ্যের বিষয় হইতে পারে না।

"ভাবোদয়ে, বৈধীতে সে মহিম জ্ঞান যুক্তভাবে, ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণ দাস্যই লাভ হয়। বৈধী সাধন অঙ্গ—অনন্ত। তন্মধ্যে রূপ গোস্বামী, তাহার চতুঃষষ্টিটী নির্দ্দেশ করতঃ বলেন যে, ইহার মধ্যে পাঁচটী মুখ্য। সেই পাঁচটী যথা:—শ্রীমূর্ত্তিতে প্রীতি, ভগবৎ-ভাগবতে শ্রদ্ধা, ভক্ত-সহবাস, নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে বাস।

"পূর্ব্বে বলিয়াছি,—প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক, শারীর, মানস, কায়িক চেষ্টা এবং প্রীতি বিষয়াত্মক মানস ক্রমই—অনুশীলন। সেই অনুশীলন যদি, শ্রীকৃষ্ণে অরুচিকর না হয়, তাহা হইলেই তাহা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ অনুকূল বিষয়ে যে পরম আবেশ, তাহাই রাগ। চিদাকর্ষণের অনুকূল বিষয়ই, সেই রাগাশ্রয় স্বরূপ কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণে যে নিত্য সিদ্ধ রাগ—তাহাই রাগাত্মিকা, রাগাত্মিকায়—নিত্য সিদ্ধ ব্রজবাসীরাই সিদ্ধ।

"সেই অনুশীলন ভক্তি নামে অভিহিত হইলেও, যদি তাহা অন্য অভিলাষ বা জ্ঞান, কর্ম্মে আবৃত না হয়, তবেই তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা হয়। অন্যাভিলাস অর্থাৎ ভোগ, মোক্ষ কামনা. জ্ঞান, কর্ম্ম অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম. বৈরাগ্য, সাংখ্য, অষ্টাঙ্গ যোগ ইত্যাদি। অর্থাৎ অনুশীলন যদি ভুক্তি. মুক্তি কামনা রহিত হইয়া, শ্রবণ কীর্ত্তনাদিময় হয়—তাহা হইলেই তাহাকে শুদ্ধ ভক্তি বলা হয়। শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা, স্বরূপসিদ্ধা, অহৈতুকী ইত্যাদি উত্তমা-ভক্তির নামান্তর।

"এই উত্তমা ভক্তির ছয়টী গুণ, যথা,—ক্লেশঘ্নী, শুভদা, সুদুর্ল্লভা. মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা, এবং কৃষ্ণাকর্ষণী। উক্ত ক্লেশ ত্রিবিধ:—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাপ আবার দ্বিবিধ—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। যাহা বীজরূপে স্থিত, তাহাই—অপ্রারব্ধ, এবং যাহা বৃক্ষরূপে তাহাই প্রারব্ধ। বাসনাই—পাপবীজ, বাসনা মূলই—অবিদ্যা বা অজ্ঞান। শুভদা অর্থাৎ সাধক কর্ত্তৃক সর্ব্ব জগতের প্রীতি বিধান, এবং

সর্ব্ব জগতের সাধকের প্রতি প্রীতি, অনুরাগ, সর্ব্ব সদ্‌গুণ ও সুখ। সুখ আবার ত্রিবিধ :—বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও পারমেশ্বর সুখ। ভক্তিতে মোক্ষ সুখও গোষ্পদ তুল্য, এ হেতু ভক্তি মোক্ষলঘুতাকৃৎ। কৃপা ভিন্ন ভক্তি লাভের অন্য উপায় নাই এবং কৃপাও সাধারণতঃ দুর্লভ, এহেতু সুদুর্লভা। ব্রহ্মানন্দ হইতেও গাঢ় আনন্দ স্বরূপ, এহেতু ভক্তি সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। কৃষ্ণ আকর্ষণে কেহই সমর্থা নহে, কেবল ভক্তিই সমর্থা, এহেতু ভক্তি কৃষ্ণাকর্ষণী। অতএব ভক্তি সাধারণতঃ সুদুর্লভা, সাধনে—ক্লেশঘ্নী, মুক্তে—শুভদা, মোক্ষে—মোক্ষলঘুতাকৃৎ, ঐশ্বর্য্যে—সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা, এবং মাধুর্য্যে—কৃষ্ণাকর্ষণী।

"এই ভক্তিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধায়—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে—ভজন, ভজনে—অনর্থ নিবৃত্তি, অনর্থ নিবৃত্তিতে—নিষ্ঠা, নিষ্ঠায়—রুচি, রুচিতে—আসক্তি, আসক্তিতে—ভাব, ভাবে—প্রেমের উদয়। অতএব ভক্তিই কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র—অভিধেয়।

"ভক্তির বিষয় নাম। শাস্ত্র অনন্ত মুখে সেই নামের মহিমার অন্ত করিতে পারেন নাই। এজন্য সাধু বলেন :—

"হরি হতে হরিনাম ভারী, সাধু গুরু শাস্ত্রে বলে।
এ কথা মিথ্যা নয় কভু, আপনি প্রভু প্রকাশিলে ॥
এ নহে পণ্ডিতের কর্ম্ম,
ভাবে যদি শতজন্ম,
নাহি পাবে ইহার মর্ম্ম, সধর্ম্মে না সজাগ হলে ॥"

"অপরাধে অনর্থ বৃদ্ধি। অপরাধ শূন্যে নাম না লইলে, নামের কৃপা—উপলব্ধি হয় না। সেই অপরাধ দ্বিবিধ! সেবাপরাধ, ও নামাপরাধ। সেবাপরাধ—বত্রিশটী, এবং নামাপরাধ—দশটী। এ অপরাধে যাহার দৃষ্টি নাই, তাহার হরিনাম মনের কল্পনা।

"বৈধী ভক্তি নববিধ :—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য, আত্মনিবেদন। শ্রবণ দ্বিবিধ। প্রথম—হরি-মন্ত্রে বহিরঙ্গে বৈধীভক্তি। দ্বিতীয়—সঞ্চারে হরিনাম প্রাপ্তি। এই নামেই অন্তরঙ্গে বৈধী ভক্তিগত ঐশ্বর্য্য-রাগ-ভক্তি সিদ্ধ হয়।

তৎপরে মাধুর্য্যরাগ ভক্তিতে, তৃতীয়বার শ্রবণেরও, পাত্রবিশেষে প্রয়োজন হয়।

"কৃষ্ণ বিষয়ক রুচিকর বাক্য মাত্রই—কীর্ত্তন। কৃষ্ণ বিষয়ক রুচিকর স্মৃতি মাত্রই—স্মরণ। স্মরণ পঞ্চবিধ। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি, চৈতন্য সমাধি।

"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—এই তিন, বহিরঙ্গ ভক্তির মুখ্য অঙ্গ। অন্য গুলি ইহাদের অন্তর্ভূত। নমস্কারই—বন্দন। বন্দন দ্বিবিধ:—একাঙ্গ, এবং অষ্টাঙ্গ। ভগবদর্চ্চা মূর্ত্তির পূজা ইত্যাদিই—অর্চ্চন।

"অহং অভিমান ত্যাগে, দাস অহঙ্কারে সেবাই—দাস্য। পাদ সেবাই পরিচর্য্যা। দাস্যগত বুদ্ধিতে বন্ধু ভাবে যে ভগবৎ সেবা—তাহাই সখ্য। রাগ এবং বৈধী ভেদে—দাস্য এবং সখ্য দ্বিবিধ। রাগাঙ্গ এবং বৈধাঙ্গ। অর্চ্চা মূর্ত্তিতে যে সেবা, তাহাই বৈধ। রাগাঙ্গ দাস্যও দ্বিবিধ, ঐশ্বর্য্যগত এবং মাধুর্য্যগত। যাহা মধুরগত দাস্য, তাহাই মাধুর্য্যগত, এবং যাহা শান্তগত, তাহাই ঐশ্বর্য্যগত।

"আত্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু, তাহার সমর্পণই—আত্মনিবেদন। তাহা হইলে নিজের আর কিছুই থাকে না, যখন সকলই ভগবানের হয়, তখন তৎ সেবাই ভগবৎ সেবা হয়।

"ভাবোদয়ে—এই বৈধ, বহিরঙ্গ ভক্তি, অন্তরঙ্গরাগে, অন্তরঙ্গ হইয়া যায়। হইলে—স্বগতভাবে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যে নীত হয়।

"বহিরঙ্গ বৈধী ভক্তি সাধনের—একমাত্র বিষ্ণু স্মরণই—মুখ্য বিধি।

"যদি অন্তরে রাগ এবং সমস্ত ভক্ত্যঙ্গই—বিধি মার্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যগত স্বকীয় প্রেমের, অনুগামিত্বই লাভ হয়, মাধুর্য্যগত পরকীয় ভাবের উদয় হয় না। কারণ বিধিমার্গে পরকীয় ভাব উপাসনায়, যখন শ্রীনন্দ-নন্দন সুদুর্ল্লভ, তখন পুর-ভাবে তাহাও দুর্ল্লভ। অর্থাৎ স্বকীয়—ঐশ্বর্য্যভাবগত। অতএব পরকীয় ভক্তের, তত্ত্বদংশ বর্জ্জনীয়।

"কারণ, মধুর ভাবের মাধুর্য্য শ্রবণে, অধিকারী ভক্তের লোভ জন্মে, লোভ কাহার অপেক্ষা রাখে না, সে জন্য তদ্‌ভাবে অভিলাষী হন।

যাহার লোভ জন্মে না, তিনি শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষায় ভজনে প্রবৃত্ত হন, এতাদৃশ ভক্তই—বৈধ। রাগভক্ত লোভে তখন, তৎপ্রাপ্তির জন্য গুরু, শাস্ত্রের অপেক্ষায় পরানুশীলনে চেষ্টিত হন। এই নিমিত্তই যে অবধি ভাবের আবির্ভাব না হয়—সে অবধি বিধিমার্গেই তাঁহার অধিকার।

"ভজনগত ভাব পঞ্চবিধ:—তদ্ভাবময়, তদ্ভাবসম্বন্ধী, তদ্ভাবানুকূল, তদ্ভাবাবিরুদ্ধ, তদ্ভাবপ্রতিকূল। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব চতুষ্টয়—ঐ অনুকূল তদ্ভাবসম্বন্ধী, তদ্ভাবময় ভজনের অনতিরিক্ত ভাবময় সাধনের পরিচয় মাত্র। অঙ্গ যেমন অঙ্গীর পোষণের সাধন, তদ্রূপ দাস্য, সখ্যাদি ভাবে—প্রেম বিগ্রহের সাধন। গুরু পদাশ্রয় ইত্যাদি সেই ভাবসম্বন্ধী অর্থাৎ ভাবগত উপাদান মাত্র।

"এই প্রেম—ভাবোত্থ ও অতি প্রসাদোত্থ ভেদে—দুই প্রকার। নিরন্তর অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গ গুণে যে, ভাবের উৎকর্ষতা—তাহাই ভাবোত্থ, এবং সাক্ষাৎ হরি কৃপাই—অতিপ্রসাদোত্থ। যেমন গোপীগণের বিনা বেদাধ্যয়ন, সৎসঙ্গ, ব্রত, তপস্যায় সাক্ষাৎ হরি-কৃপা।

"অতিপ্রসাদোত্থ আবার দ্বিবিধ। মহিমজ্ঞানযুক্ত এবং মাধুর্য্যাশ্রিত। বৈধরাগই—মহিমজ্ঞানযুক্ত, কেবল রাগই—মাধুর্য্যাশ্রিত।

"ভাব কাহাকে বলি—সঞ্চারে বিদ্যা বৃত্তির স্ফুরণে, জ্ঞান, কর্ম্মে অনাবৃত পরসত্ত্বগত চিত্তের যে, ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয়ানুকূল্যাভিলাষ, ও সৌহার্দ্দাভিলাষগত স্নিগ্ধতাকারিণী মনোবৃত্তি—তাহাই ভাব।

"ভাবের নামান্তর—রতি। ঐ রতি রসাবস্থায় দ্বিবিধ রূপে উক্তা। স্থায়ী, ও সঞ্চারী। স্থায়ী আবার দ্বিবিধ:—প্রেমাঙ্কুর এবং প্রেম। যাহা বিনাশের কারণ বিদ্যমানেও, স্বমাধুর্য্যে সেই কারণকে অভিভূত করতঃ—প্রণয়াস্পদকেও অভিভূত করিয়া রাখে—তাহাকেই প্রেম বলে। প্রণয়াদি—এই প্রেমরই অবস্থা-ভেদ। নৃত্য, গীতাদি—অনুভাব, প্রেমাঙ্কুরেরই চেষ্টা রূপ। ভাব, হ্লাদিনী শক্তি সারবৃত্তির সহিত, সম্বিৎ শক্তি বৃত্তির সারাংশ বলিয়া, উহা শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ হইলেও, স্বরূপ সিদ্ধ অবস্থায় পরসত্ত্বগত, বস্তুসিদ্ধিতে—শুদ্ধসত্ত্বগত। কারণ প্রপঞ্চগত

শুদ্ধসত্ত্বকেই—পরসত্ত্ব বলা হয়। এজন্য ভাব, সাধ্য ভক্তি হইয়াও, সাধ্য ভক্তিরূপে নির্দ্দেশিত হয় না, অথচ সাধন ভক্তির সাধ্য।

"ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি, এবং তদবসতি স্থলে প্রীতিরূপ নয়টী প্রীত্যস্ফুরণই—ঐ প্রেমাঙ্কুরের চিহ্ন। ভাব-আবেগেই এ গুলির প্রকট। জাগতিক নানা বিষয়েও চিত্তের অক্ষুব্ধতাই—ক্ষান্তি, ভজনবিনা অনর্থক কালযাপন না করার নাম—অব্যর্থকালত্ব, বিষয়ে অরুচিই—বিরক্তি, মানসত্ত্বেও অমানিত্বই—মানশূন্যতা, সুদৃঢ় ভগবৎ-প্রাপ্তির আশাই—আশাবন্ধ, ভগবৎ-প্রাপ্তিহেতু চিত্তের চাঞ্চল্যতাই—সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা পরানুশীলনে অভিলাষই—রুচি, তাহাতে অনুরাগই—আসক্তি, এবং কৃষ্ণ বসতি স্থলে অভিলাষই—তদবসতি স্থলে প্রীতি। এ সকল লক্ষণে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অধিকার জানা যায়।

"কর্ম্মী বা জ্ঞানীরও মধ্যে মধ্যে এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞানে আবৃত থাকায়, এ সব লক্ষণ ভগবদ্‌-রতিগত নহে—রত্যাভাস মাত্র। ঐ রত্যাভাস আবার দ্বিবিধ ঃ—প্রতিবিম্ব এবং ছায়া। ভোগ, মোক্ষ-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই রত্যাভাসের উদয় হয়—তাহা হইলে তাহাকে প্রতিবিম্ব, এবং সাধারণে সাধু সঙ্গ গুণে যে ক্ষণেক উদয়, তাহাকেই ছায়া বলা হয়।

"এই ভাব, ঘনীভূতে প্রেমস্বরূপা। চিত্ত ভগবানে নিরতিশয় মমতাযুক্ত হইলেই—প্রেমের আবির্ভাব। প্রেম নিত্য। বিঘ্নাদি দ্বারায় অভিভূত হইবার নহে। এই প্রেম দ্বিবিধ, এক—মহিম জ্ঞান যুক্ত, এক—কেবল। বিধি মার্গানুসারে ভক্তের যে প্রেম—তাহাই ঐশ্বর্য্যাত্মিক এবং রাগমার্গানুযায়ী ভক্তের প্রেম—কেবলা, অর্থাৎ শুদ্ধ মাধুর্য্যাত্মিকা। মমতার ইতরবিশেষে প্রেমেরও ইতর বিশেষ দেখা যায়। প্রেমের পর অবস্থা—স্নেহ। স্নেহে চিত্ত দ্রব হয়, সে দ্রবভাবে, যে ঘনীভূত স্নেহ—তাহাই রাগ। সেই ঘনীভূত স্নেহ গাঢ় বিশ্বাস আবর্ত্তনে—প্রণয়।

"স্থায়ী ভাব যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব এবং ব্যভিচারী ভাব দ্বারা শ্রবণাদি কর্ত্তৃক হৃদয়গত আস্বাদন যোগ্য হয়, তবেই তাহা ভক্তি রস রূপে গণ্য। ঐ ভক্তিরস ভাবভেদে পঞ্চবিধ:—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর।

"রতির আস্বাদ্য রূপে উদয় ভাবই—বিভাব। এই বিভাব দ্বিবিধ; যাহাতে রতি বিভাবিত—তাহাই আলম্বন, এবং যাহার দ্বারা বিভাবিত—তাহাই উদ্দীপন। আলম্বন আবার দ্বিবিধ:—যাহার উদ্দেশে রতির প্রবৃত্তি—তিনি বিষয়ালম্বন, এবং যিনি ঐ রতির আধার—তিনিই আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ-রতির, শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন এবং ভক্তবর্গ আশ্রয়ালম্বন। যাহার দ্বারা রতির উদ্দীপন—তাহাই উদ্দীপন বিভাব; যাহা ভাবের জ্ঞাপক—তাহাই অনুভাব। চিত্তের যে ক্ষোভক—তাহাই সাত্ত্বিক ভাব, এই সাত্ত্বিক ভাব অষ্ট প্রকার:—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, ও প্রলয় অর্থাৎ চৈতন্য সমাধি।

"সাত্ত্বিক ভাব সকল স্নিগ্ধ, দিগ্ধ এবং রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ। স্নিগ্ধ আবার মুখ্য এবং গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণে স্নিগ্ধ—মুখ্য, এবং পরম্পরায়—গৌণ। স্নিগ্ধ ভাব—নিত্যসিদ্ধেই লক্ষিত। সাধন সিদ্ধে, জাত রতিতে—তাহাই দিগ্ধ নামে পরিচিত। আর অজাত রতিতে সঙ্গগুণে দিগ্ধের যে কচিৎ প্রকাশ—তাহাই রুক্ষ। ঐ সকল ভাব আবার অবস্থাভেদে পঞ্চবিধ;—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত, সুদ্দীপ্ত। এই উদ্দীপ্ত ভাবই—মহাভাবে—সুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

"রত্যাভাসগত সাত্ত্বিকভাব—চারিটী:—মুমুক্ষু ব্যক্তিতে জাত সাত্ত্বিক ভাবই—রত্যাভাসজ, কর্ম্মী জনে জাত সাত্ত্বিক ভাবই সত্ত্বাভাসজ, পিচ্ছিলচিত্ত জনে জাত সাত্ত্বিক ভাবই—নিঃসত্ত্ব, এবং ভগবদ্দ্বেষী জনে জাত সাত্ত্বিক ভাবই—প্রতীপ সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম ইত্যাদি ব্যভিচারী ভাব—তেত্রিশটী। স্থায়ী ভাব ত্রিবিধ:—সামান্য, স্বচ্ছ, এবং শান্তাদি রসযুক্ত। যাহার ভজন সামান্য হেতু, তৎপরিপাকে শান্তাদি বিশেষ ভাব রহিত যে সামান্য রতি—তাহাই সামান্য। যাহার ভজনপরিপাকে চিত্ত এরূপ স্বচ্ছ যে, পঞ্চবিধ

ভক্তের সঙ্গ গুণেই, পঞ্চবিধ ভাবই প্রতিফলন যোগ্য, সেই চিত্ত ভাবই—স্বচ্ছ। পৃথক পৃথক রসনিষ্ঠ ভক্তের, এক এক ভাবের নামই—শান্তাদি রসযুক্ত ভাব।

"শান্তাদি ভাব পঞ্চবিধ :—শান্তের—শান্তি, দাস্যের—দাস্য, সখ্যের—সখ্য, বাৎসল্যের—বাৎসল্য, এবং মধুরের—প্রিয়তারূপ স্থায়ী ভাব। শান্তের গুণ—শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠবুদ্ধিতা, দাস্যের গুণ—সেবা, সখ্যের গুণ—সম্ভ্রম-রাহিত্য, বাৎসল্যের গুণ—স্নেহ, এবং মধুরের বা উজ্জ্বলের গুণ—সঙ্গসুখ।

"শান্ত প্রেম। শান্তরসের বিষয়াবলম্বন—চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, ও আশ্রয়াবলম্বন—সনকাদি শান্তগণ। হরিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষ রাহিত্য, ভগবানের প্রিয়ভক্তে—ভক্তির ক্ষুণ্ণতা, সংসার ক্ষয় ও জীবন্মুক্তির আদর, নিরপেক্ষ, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারিতা এবং মৌন ইত্যাদি এ রসের—অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ ইত্যাদি সাতটী—সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, আবেগ, বিতর্ক ইত্যাদি শান্তরসের—সঞ্চারী ভাব। শান্তিরতি—স্থায়ী ভাব।

"দাস্য প্রেম বা প্রীত ভক্তি-রস। এই রসে দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ—উভয় রূপই—বিষয়াবলম্বন, ও হরিদাসগণ আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনে দ্বিভুজ, অন্যত্রে দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ ভেদে ত্রিবিধ, এবং আশ্রয়ালম্বন দাসও, অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ, ও অনুগভেদে চতুর্ব্বিধ। ব্রহ্মা, শিব—অধিকৃত দাস। আশ্রিত দাস আবার—শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। অনুগদাস আবার—পুরস্থ ও ব্রজস্থ ভেদে দ্বিবিধ। এই রসে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি, অঙ্গ সৌরভ ইত্যাদি—উদ্দীপন। সর্ব্বতোভাবে ভগবদাজ্ঞার পালন, শ্রীকৃষ্ণ দাসের সহিত মিত্রতা ইত্যাদি—অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব—সাত্ত্বিক। হর্ষ, গর্ব্ব, প্রীতি ইত্যাদি—ব্যভিচারী ভাব, সম্ভ্রম, প্রীতিই—ইহার স্থায়ী ভাব। এই সম্ভ্রম, প্রীতি অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্তে—প্রথমে প্রেম, পরে স্নেহ, তৎপরে রাগরূপে নীত হয়। শান্তপ্রেমে—স্নেহ, রাগের উদয় নাই, এহেতু শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ।

"দাস্য প্রেম দ্বিবিধ—অযোগ এবং যোগ। হরির সঙ্গাভাবকে অযোগ, মিলনকে যোগ বলা হয়। অযোগ আবার—উৎকর্ষতা ও বিয়োগতা ভাবে দ্বিবিধ। যোগ আবার—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি ভেদে তিন প্রকার।

"গৌরব প্রীতিতেও এইরূপ সকল ভাব হইয়া থাকে। তাহার বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন লালনীয় সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, ইত্যাদি কুমারগণ।

"সম্ভ্রম, প্রীতি ও গৌরব প্রীতিশালী দ্বারকাস্থ দাসগণের মধ্যে, যাঁহারা নিরন্তর আরাধ্য বুদ্ধিতে সেবন করেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের প্রধানতা, আর যাঁহারা লাল্য, তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় সম্বন্ধ স্ফূর্ত্তি হয়। ব্রজস্থ ঐ দুই প্রকার দাস ভক্তের, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান না থাকিলেও, গোপরাজ-নন্দন বলিয়া ঐশ্বর্য্য জ্ঞান আছে।

"সখ্যপ্রেম। এই রসে দ্বিভুজ কৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন, এবং তাহার বয়স্য-গণ—আশ্রয়ালম্বন। ব্রজস্থ দ্বিভুজ কৃষ্ণ, এবং অন্য স্থানস্থ দ্বিভুজ কৃষ্ণ ভেদে, আলম্বন দুই প্রকার। বয়স্যগণও—পুরসম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধী ভেদে দ্বিবিধ।

"যাঁহারা বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন, দাস্যগন্ধযুক্ত, সখ্য প্রেমশালী—তাঁহারাই—সখা নামের উপযুক্ত। তুল্য বয়স এবং কেবল সখ্যাশ্রয়ী সখাদিগকে—প্রিয়সখা বলা হয়। সখা এবং প্রিয়সখা হইতে বিশেষ যাঁহারা, ভাবশালী, ও অতিশয় রহস্যপ্রিয়, তাঁহাদিগকেই প্রিয়-নর্ম্ম-সখা বলা হয়।

"শ্রীকৃষ্ণের বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, অবতারাদির চেষ্টার অনুকরণ, বিচ্ছেদ, ক্রীড়া ইত্যাদি—এই রসের অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ ইত্যাদি—সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, বিপদ, দৈন্য ইত্যাদি ত্রিশটী—ব্যভিচারী ভাব, তন্মধ্যে মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা, ধৃতি—অমিলনাবস্থায় এবং মৃতি, ক্লোম, ব্যাধি, অপস্মৃতি, ও দৈন্য মিলনের অবস্থায় প্রকাশ পায় না। এই সখ্য রসে, রতি—প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"বাৎসল্য প্রেম। এই রসে দ্বিভুজ কৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন, এবং তাঁহার

গুরুগণ—আশ্রয়ালম্বন। প্রিয়বাক, সরল, বুদ্ধিমান, মান্যব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে মানদ এবং দাতা ইত্যাদি ইহার—বিভাব। দেবকী ও তাঁহার স্বপত্নীগণ, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যপত্নী ইত্যাদি—ইহার আশ্রয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ ইত্যাদি ইহার—উদ্দীপন বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, লালন, প্রতিপালন ইত্যাদি ইহার—অনুভাব। হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ ইত্যাদি ইহার—ব্যভিচারী ভাব।

"অনুকম্পার্হ ব্যক্তির প্রতি, অনুকম্পাকারীর যে সম্ভ্রমশূন্যা রতি—তাহাই বাৎসল্য। ইহার এই বাৎসল্যই—স্থায়ী ভাব। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তের তারতম্য নানাবিধ হয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সে উত্তম।
তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তার তম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ, তারে ভজে তৈছে॥"

"সুতরাং পৃথিবীর ন্যায় মধুর রস অধিক গুণশালী, এহেতু মধুর বা উজ্জ্বল প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"মধুর বা উজ্জ্বল প্রেম। ধ্বংসের কারণ থাকিতেও—যাহা ধ্বংস রহিত, এইরূপ যে যুবক যুবতীদিগের ভাব, তাহাকেই প্রেম বলে। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের যে প্রেম, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রেম। এই মধুর প্রেমের শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীবর্গ—আলম্বন বিভাব। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া-

লম্বন এবং প্রেয়সীগণ—আশ্রয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

"এই প্রেম নাটকে রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন বা নায়ক। নায়ক প্রথমতঃ ত্রিবিধ:—গোকুলে—পূর্ণতম, মথুরায়—পূর্ণতর, এবং দ্বারকায়—পূর্ণ। ইঁহারা প্রত্যেকে আবার চতুর্ব্বিধ। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর, বিনয়ী, সর্ব্বজনের সম্মানকারী নায়কই—ধীরোদাত্ত; নব যৌবন সম্পন্ন, নৃত্য গীতাদি কুশল, প্রেয়সীবশ নায়কই—ধীরললিত; ভীমসেনের ন্যায় উদ্ধত নায়কই—ধীরশান্ত। ইঁহারা প্রত্যেকে আবার পতি, উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ, প্রত্যেকে আবার—অনুকুল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে চতুর্ব্বিধ। একমাত্র নায়িকাতে অনুরাগী নায়কই—অনুকূল; বহু নায়িকাতে অনুরক্ত হইয়াও, সকলের প্রতি সম যে নায়ক—তিনিই দক্ষিণ; যিনি সাক্ষাতে প্রিয় ও অসাক্ষাতে অপ্রিয় বলেন—তিনি শঠ; আর যিনি অন্য কান্তাগত ভোগ চিহ্নেও মিথ্যাবাদী ও নির্ভয়—তিনিই ধৃষ্ট। এই নায়ক ছিয়ানব্বই প্রকার। ব্রজলীলায় সকল নায়কেরই গুণ—শ্রীকৃষ্ণে দৃষ্ট। এ ভিন্ন অন্য অন্য রসগত নায়কের গুণ ত, শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান আছেই—এই রূপে সৎ-চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ, ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বমূলতত্ত্ব।

"বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের ন্যায় আশ্রয়ালম্বন—নায়িকা, প্রথমতঃ দ্বিবিধ,—স্বকীয়, পরকীয়। স্বরূপ বা মাধুর্য্য সত্ত্বময় ভগবান কৃষ্ণের, লীলা সত্ত্বই—স্বঐশ্বর্য্য, তন্মধ্যে চিৎঐশ্বর্য্য জ্ঞানে যে ভগবৎ বাঞ্ছা—তাহাই স্বকীয়। ঘটের প্রকাশে যেমন ঘটাকাশের প্রকাশ, সে প্রকাশ যেমন মহান আকাশে অভেদ হইয়াও, ঘটহেতু ভেদভাবে স্থিত, তদ্রূপ স্বরূপ সত্ত্বের স্বগত মাধুর্য্যে, যে ভগবদ্‌বাঞ্ছা—তাহাই পরকীয়। স্বকীয় অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানগত বিবাহবিধানে বিবাহিত, প্রণয়াস্পদই—স্বকীয়, এবং সেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞানগত ধর্ম্ম বিধানকে তুচ্ছ করতঃ, আসক্তি বিধানে সমাহিত যে প্রণয়াস্পদ,—তাহাই পরকীয়। স্বকীয়ের চক্ষে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও, পরকীয়ের সে বোধ নাই, কারণ পরকীয়, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান অতীতস্বভাবা। কারণ, ঘট হেতু ঘটাকাশের ভেদ ভাবে স্থিতি

হইলেও, ঘটাকাশের সে ঘটগত জ্ঞান নাই। যাহা এই ঘটগত জ্ঞানের পর—উৎকৃষ্ট, তাহাই পরকীয়। এ হেতু অবিদ্যার পরকীয়—অতি হেয়, কারণ অবিদ্যার যে পরকীয়, তাহা স্বকীয়েরই ভ্রষ্টতা মাত্র, তাহা অচিৎ ঘটগত জ্ঞান শূন্য না হইয়াও, অবিদ্যা অর্থাৎ অচিৎ ঘটগত জ্ঞানে—ব্যাভিচারিণীমাত্র।

"এহেতু কাত্যায়নীব্রত পরা গোপকন্যাগণের মধ্যে, যাঁহাদের গান্ধর্ব্ববিধানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ হয়, তাঁহারাই—স্বকীয়, তদন্যা ধন্যাদি গোপকন্যা সকল—পরকীয়। শ্রীরাধাদি প্রৌঢ়া গোপী সকল—পরকীয়া। মহিষীগণ—স্বকীয়া। এই স্বকীয়া, পরকীয়া আবার—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা ভেদে ত্রিবিধা। মধ্যা আবার—মান সময়ে—ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা ও ধীরাধীরমধ্যা ভেদে ত্রিবিধ। প্রগল্‌ভাও এইরূপ ত্রিবিধ। ব্রজে পালিকা, চন্দ্রাবলী ও ভদ্রা—ধীরপ্রগল্‌ভা। শ্যামলা—অধীর-প্রগল্‌ভা। মঙ্গলা—ধীরাধীর প্রগল্‌ভা। অত্যন্ত রোষেও যিনি, কেবল মৌন মাত্র পরায়ণা থাকেন—তিনি মুগ্ধা। মুগ্ধার ভেদ নাই। ইঁহারা প্রত্যেকে স্বীয়া ও পরকীয়া ভেদে চতুর্দ্দশবিধা। কন্যা একবিধা, অতএব সাকল্যে নায়িকা পঞ্চদশবিধা। ইঁহারা আবার অবস্থা ভেদে অষ্টবিধ হয়েন। সেই অষ্ট ভেদ যথা:—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা। এইরূপে নায়িকা—এক শত বিংশতি প্রকার। পুনশ্চ—উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদে—তিন শত ষাট প্রকার। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধন সিদ্ধ। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতিই নিত্যসিদ্ধা, এবং সাধনসিদ্ধা আবার—মুনিপূর্ব্বা, শ্রুতিপূর্ব্বা, দেবী ভেদে ত্রিবিধ।

"নায়িকাদিগের স্বভাব। শ্যামলা ও মঙ্গলা প্রভৃতি প্রখরা। শ্রীরাধা ও পালী প্রভৃতি মধ্যা। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি মৃদ্বী। ইঁহাদের মধ্যে আবার—স্বপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা, তটস্থাপক্ষা ও প্রতিপক্ষা ভেদ দেখা যায়। আবার কেহ কেহ বামা, কেহ কেহ দক্ষিণা।

"স্বয়ং দূতী ও আপ্তদূতী ভেদে, দূতী দ্বিবিধ। আপ্তদূতী আবার, অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা, ও পত্রহারিণী ভেদে ত্রিবিধা। ইঁহারা আবার

কার্য্য ভেদে বিবিধ। ব্রজে ধীরা, বৃন্দা ও বংশী এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের দূতী।

"বয়ঃসন্ধি, নব্যযৌবন, ব্যক্তযৌবন ও পূর্ণযৌবন ভেদে—বয়স চতুর্ব্বিধ। বাল্য ও যৌবনের সন্ধির নাম—বয়ঃসন্ধি। শ্রীরাধাদি—ব্যক্ত-যৌবনা. এবং চন্দ্রাবলী, পদ্মা—পূর্ণযৌবনা।

"সখী আবার—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠা সখী ভেদে—পঞ্চবিধা। ইহারা আবার—সমস্নেহা ও অসমস্নেহা ভেদে—দ্বিবিধ। কৃষ্ণে যাঁহাদের অধিক স্নেহ, তাঁহাদের—সখী. রাধিকায় যাঁহাদের অধিক স্নেহ—তাঁহাদের নিত্যসখী. ইহাদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা তাঁহাদের—প্রাণসখী, যাঁহারা বৃন্দাবনেশ্বরীর তুল্য রূপা—তাঁহাদের প্রিয়সখী, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান—তাঁহাদের পরমশ্রেষ্ঠা সখী বলা হয়।

"স্বকীয়ভাবে—মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ। পরকীয় ভাবে—গোপীগণ। মাধুর্য্যলীলায় যেমন শ্বেতদ্বীপ হইতে, বৃন্দাবনে,—লীলার প্রকট, ঐশ্বর্য্য লীলায় তেমনি মথুরা হইতে, দ্বারকায়—লীলার প্রকট।

"কৃষ্ণ-অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী রাধিকার—কায়ব্যূহ সখী গোপীগণই—সমর্থা। সমর্থা সখীগণই,প্রেম—বর্দ্ধক, পোষক, প্রবর্ত্তক এবং প্রকাশক। সে হৃদয়ে—আত্ম কাম-প্রীতি-ইচ্ছার গন্ধ মাত্র নাই, কারণ বহুরূপে স্থিতি হইলেও গোপীগণ, রাধিকার মনোবৃত্তি স্বরূপা হেতু, মধুচক্রগত মক্ষিকা যেমন মূল মক্ষিকার সহায়মাত্র—তৎস্বরূপা। সেজন্য শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের তদ্‌ভাবময়ী যে মধুর রস, তাহার উদ্দীপনই, তাঁহাদের বাঞ্ছা। সে বাঞ্ছায় রাধাকৃষ্ণের সে মধুর রসপ্লাবনে যে সুখানুভব, সে সুখানুভবে, সে মধুর রসপ্লাবন সুখেও বঞ্চিত না হওয়ায়, সখীগণ সমধিক সুখী হইলেও, মূলমক্ষিকা যেমন মধুচক্রগত মধু, সহচর মক্ষিকায় দান করে, তদ্রূপ রাধা তাঁহাদের কৃষ্ণ সঙ্গমে প্রীত করান।

"এ হেতু সখীগণের করুণা ভিন্ন, ব্রজের সে মধুররস প্রাপ্তির—আর অন্য উপায় নাই। সখীগণই সে প্রেম সেবার বিদেহ—সাধ্য বস্তুরূপা—

মঞ্জরী—গুরু। ভক্ত—গুরুরূপা, কাচিৎ—মঞ্জরী, সখীর অনুগা সখী জ্ঞানে, তাঁহার সেবায়, সে রসের অধিকার পান। অতএব গুরুভক্তিই—অভিধেয়। গুরু, স্বগত শক্তিতে, ভক্তের ভক্তি শক্তি উদ্দীপনে, যে অধিকার দেন, সেই অধিকারে ভক্ত, তদ্‌ভাব অনুগমনে, রাগাত্মিকা ভক্তির সন্ধানে, রাগানুগ ভক্তিতে সাধনে উন্মুখ হওয়ায়, রাগাত্মিকার প্রতিভাসে, তাহাতে অভেদে যে স্বরূপে উদিত হন, তাহাই প্রয়োজন রূপা প্রেম। কারণ এই প্রয়োজনের বিষয়, সেই প্রেম-স্বরূপ মূর্ত্তি, সর্ব্ব-প্রেমের স্বরূপ—স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ।

"এই রসে মুরলীধ্বনি আদি—উদ্দীপন বিভাব; কটাক্ষ, হাব, ভাব, হেলা, শোভা, কান্তি ইত্যাদি বিংশতিটী অলঙ্কার—এ রসের অনুভাব। বিকারের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের বিকারাভাবের নাম সত্ত্ব, ঐ সত্ত্বের প্রথম বিকারই—ভাব। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবই—এ রসের সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন, গ্লানি ইত্যাদি একত্রিশটী—ব্যভিচারী ভাব। মধুর রতি—স্থায়ী ভাব।

"মধুর রতি আবার—সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা ভেদে ত্রিবিধ। মথুরাস্থ কুব্জাদির—সাধারণী রতি; দ্বারকাস্থ মহিষীদিগের—সমঞ্জসা-রতি; এবং গোকুলবাসিনীদিগের—সমর্থা রতি। সামান্য ভাবে—নিজ সুখ তাৎপর্য্যযুক্ত রতিই—সাধারণী। শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের সুখ তাৎপর্য্য বিশিষ্ট; পত্নী ভাবময়ী রতি—সমঞ্জসা। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ তাৎপর্য্যান্বিতা রতিই—সমর্থা। এই সমর্থা রতিই, প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাব-দশা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। যে মহাভাব—মুক্তপুরুষ ও সিদ্ধ ভক্তদিগেরও অনুসন্ধেয়।

"এইরসে—ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য, ও ভাবশান্তি—এই চারি দশা। ভাবের আবির্ভাবই—ভাবোৎপত্তি, ভাবদ্বয়ের মিলনই—ভাবসন্ধি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব, পর পর ভাব দ্বারা উপমর্দ্দিত হইলে—ভাব-শাবল্য, ভাবের অন্তর্দ্ধানই—ভাবশান্তি।

"এই রতির গাঢ়ত্বই—প্রেম, এবং পরিণত অবস্থাই—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব। যেমন—ইক্ষু, রস, গুড়,

শর্করা সিতা, সিতপলা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি, একই ইক্ষুবীজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, তাহারই অবস্থাভেদে বিশেষ বিশেষ নামে প্রকটিত।

"যাহা অতি মমতাযুক্ত, সর্ব্বতোভাবে চিত্ত নির্ম্মল কারক, এরূপ গাঢ় ভাবই—প্রেম।

"প্রেম—বৈচিত্রে চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া, স্বরূপে উদয় হয়। স্নেহোদয়ে—অঙ্গ সঙ্গে, অবলোকনে, দর্শন, শ্রবণ, স্মরণে তৃপ্তি আশা তিরোহিত হয়। নিত্যই নূতন ভাবে তখন প্রকটিত, সে প্রকটনের আর অন্ত হয় না।

"যে স্নেহ আদরে, স্নেহের পাত্রকে মদীয় না ভাবিয়া—অন্যদীয় ভাবায়, অর্থাৎ যাহার মধুরতা বস্বন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে, এমন যে চন্দ্রাবলীর স্নেহ, তাহাকেই ঘৃতস্নেহ বলা হয়। তাহার বিপরীতই—অর্থাৎ যাহা স্বতঃই মধুর, বস্বন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে না, তাদৃশ মধুর ন্যায় রাধিকা দেবীর স্নেহই—মধুস্নেহ।

"স্নেহের আধিক্য হেতু যে কৌটিল্য—তাহাই মান। মান আবার —উদাত্ত ও ললিত ভেদে দ্বিবিধ। সারল্যযুক্ত মানই—উদাত্ত, এবং কৌটিল্যময় মানই—ললিত। চন্দ্রাবলীতে উদাত্ত, রাধিকায় ললিত মানই শোভা পায়।

"কান্ত-দেহে সম্ভ্রম বর্জ্জিত অভেদভাবনাময় বিশ্বাসই—প্রণয়। ঐ প্রণয় আবার দ্বিবিধ। বিনয়ান্বিত হইলেই—মৈত্রপ্রণয়, ভয় বর্জ্জিত স্ববশতাময় হইলেই—সখ্যপ্রণয়।

"প্রণয়—উৎকর্ষে যখন দুঃখকেও সুখে পরিণত করায়, তখন তাহাই —রাগরূপে প্রকটিত। এই রাগ আবার দ্বিবিধ। নীলিমা ও রক্তিমা। যাহা বাহ্যে অতি প্রবলা, কিন্তু ব্যয়াভাবে আত্মলগ্ন ভাবেই স্বরূপ আবরণ রূপা—তাহাই নীলিমা, আর যাহা নিত্য নব অনপেক্ষেয়, অথচ স্বীয় কান্তি দ্বারাই দীপ্তা হেতু, ভাবাবরণ শূন্য—তাহাই রক্তিমা। নীল রাগ চিরসাধ্য হইলেই—শ্যামরাগ। শ্রীচন্দ্রাবলীর—নীলরাগ, ভদ্রা প্রভৃতি গোপীগণের—শ্যামরাগ। রক্তিমা রাগের অন্তর্গত মঞ্জিষ্ঠারাগ। মঞ্জিষ্ঠা—ভাবারণ শূন্যা, অনন্যাপেক্ষা। শ্রীমতী রাধিকার

মঞ্জিষ্ঠারাগ, শ্যামলাদি গোপীগণের রক্তিম রাগগত—কুসুম্ভ নামক রক্তিম রাগ। ঐ রাগ সুখসাধ্য, অন্যাপেক্ষ।

"যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সদাই অনুভূত, এবং প্রতি অনুভবেই নিতুই নূতন —তাহাই অনুরাগ। ইহা মহিষীদিগেরও দুর্ল্ভ, কেবল গোকুলস্থা গোপীদিগেরই সংবেদ্য।

"অবিচিন্তিত ব্রজদেবীর, ভাবই—মহাভাব। এই মহাভাব আবার রূঢ়, অধিরূঢ় ভাবে দ্বিবিধ।

"শ্রীকৃষ্ণ সুখ-পীড়াশঙ্কায়, নিমেষমাত্র কাল ও যে, তাঁহার অদর্শন অসহ্যতা—তাহাই রূঢ়মহাভাব।

"যাহাতে কোটীব্রহ্মাণ্ডগত সুখও, একবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন সুখের নিকট গোষ্পদ তুল্য, এবং শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শন ব্যথা, সর্পাদি দংশন ব্যথা অপেক্ষাও গুরুতর—তাহাই অধিরূঢ়মহাভাব। এই অধিরূঢ়মহাভাব আবার—মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ।

"যাহাতে সুদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাবের উদয়, এবং যে উদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বা তৎ-প্রেয়সী বর্গেরও, ক্ষোভাভিভব জন্মে—তাহাই মোদন।

"বিচ্ছেদে এই মোদনই—মাদন নামে অভিহিত। এই মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধিকাতেই শোভা পায়। দিব্যোন্মাদ এই মাদনেরই বৃত্তি-ভেদ। দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপাদি প্রেমময়ী অনন্ত ভাবের উদ্গম। তখন বনমালাদিতে ঈর্ষা, পুলিন্দ জাতিতেও শ্লাঘা, এবং তমালস্পর্শিনী মালতীর সৌভাগ্য বর্ণনাদি বিবিধ ব্যাপারই দৃষ্ট হয়। এই মাদনই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ইহার অধিক আর নাই। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে :—

"প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে (আর) বুদ্ধিগতি নাহিক আমার।"

"কুব্জাতে সাধারণী রতি—প্রেম পর্য্যন্ত। মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি—অনুরাগ পর্য্যন্ত। সত্যভামা ও লক্ষণা দেবীর রতি—রাধিকানুসারিণী। রুক্মিণী দেবী, চন্দ্রাবলী—ভাবানুসারিণী। প্রিয়-নর্ম্ম-সখাদিগের রতি—অনুরাগ পর্য্যন্ত। ব্রজসুন্দরীগণের রতি—মহাভাব পর্য্যন্ত। সুবলাদি

সখাগণেরও ঐরূপ। মাদন কেবল শ্রীরাধারি শোভাপায়। ললিতা, ও বিশাখা দেবীরও ঐরূপ।

"স্থায়ী ভাব আবার—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভ আবার—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, ও প্রবাস ভেদে চতুর্ব্বিধ। অঙ্গ-সঙ্গ পূর্ব্বে যে উৎকর্ষাগত রতি—তাহাই পূর্ব্বরাগ। লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ ইত্যাদি পূর্ব্বরাগের—দশদশা। মান দ্বিবিধ—সহেতুক ও নির্হেতুক। নির্হেতুক মান আপনিই শান্ত হয়, কিন্তু সহেতুক মান—সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা, রসান্তর দ্বারা শান্ত হয়। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পূর্ণ, ও সমৃদ্ধিমান ভেদে—সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ।

"শান্ত ও দাস্য পরস্পর—মিত্রভাবাপন্ন। সখ্য ও বাৎসল্য—তটস্থ। বাৎসল্যের সহিত কাহার মৈত্রী নাই। উজ্জ্বল ও দাস্য—বিপরীত ভাবাপন্ন।

"গৌণ রস সাতটী। পঞ্চবিধ ভক্তেই ঐ সকলের উদয় দেখা যায়। অতএব পঞ্চ মুখ্য, এবং সপ্ত গৌণ মিলিয়া—রস বারটী।

"পরস্পর বৈরভাবাপন্ন রসদ্বয়ের যোগ হইলেই—রসাভাস হয়। পরস্পর মিত্র ভাবাপন্ন রসের যোগে সুরসতা হয়।"

এই মুখ্য পঞ্চরসের যে কান্তি, তাহা কান্তিতেই শোভা পায়। যদি আমাদের ভবিষ্যতে সে কান্তির জন্য চিত্ত আকুলিত হয়, তবে ভগবানই তাহার সুযোগ করিয়া দিবেন। এ সময়ে বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহার অবতারণা করিলাম না।

তখন শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত। শশাঙ্ক বলিলেন,—"শিবসুন্দর! তুমি এখানে? আমি যে তোমার জন্য সব মাটী মাড়াইতে মাড়াইতে এখানে উপস্থিত, কোথাও দেখা পাই না। এখানে বসিয়া চুপি চুপি কি কথা হইতেছে—বল দেখি? নিজেদের মাথা ত অনেক দিন খাইয়াছ, তোমরা ত সংসারের অখডিম্ব, আবার ঐ দুধের ছেলেটাকে কেন লোভ বল দেখি?"

শশাঙ্কের ভঙ্গী দেখিয়া জীবসুন্দর, জ্যোতিঃপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। শিবসুন্দর, শশাঙ্কের ভাবে হাসিতে

তখন ব্রাহ্মণ—ভগবান দাস—যথাযথ বর্ণনায়—যোগমায়ার চরিত্রের কথা এবং ধর্ম্ম-ভাবের উল্লেখে বলিলেন,—"তবে যদি এ মেয়েকেও সাধারণের অসতী ধারণা হয়, তাহা হইলে সংসারে আর সতীর স্থান নাই।"

এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরসুন্দর বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, আপনি যেমন সমাজ লইয়া সংসারী, আমিও তেমনি সমাজ লইয়াই সংসারী। যে সমাজের মুখ রক্ষার্থে—আপনি আপনার পুত্রবধূকেও—ঘরে লইতে পারেন নাই, সেই সমাজের অমান্য করিয়া, যাহা একদিন আমি দান করিয়াছি—তাহা আবার প্রতিগ্রহণ করিব কি প্রকারে? অতএব যোগমায়ার এ সংসারে স্থান নাই। তবে যদি যোগমায়ার—ভগবানে সত্য ভক্তি থাকে—তাহা হইলে ভগবানও উহার কলঙ্ক মোচন করিবেন, এবং মায়া স্থান না দিলেও—স্বরাজ্যে স্থান দিবেন—সেজন্য আর আমরা চিন্তিত হইব না। আর আমার নিকট ও কথা তুলিবেন না।"

তখন যোগমায়া—সকলকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে, আর কাহার অপেক্ষা না করিয়া—ধীরে ধীরে সেগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ভগবান দাস কাঁদিয়া যোগমায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, বলিলেন,—"কোথা যাও মা! কেহই স্থান না দেয়, আমি তোমায় স্থান দিব, তুমি আত্মহত্যা করিও না, আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি যে তোমার সন্তান, আমার কথা রক্ষা কর।"

যোগমায়া তখন অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধের কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ অনেক পরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে—একটু হাসিয়া যোগমায়া বলিলেন,—"আমি আপনার কথা রক্ষা করিব, আত্মহত্যা করিব না, সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত হউন।"

ভ। তুমি যে আত্মহত্যা করিবে না, তাহা কি আমি জানি না? যে তোমায় চিনিয়াছে, তাহার মা সে ভ্রম নাই, তবে সংসারে ও কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। এখন বলি কি, আমার সহিত আবার যাইলে ভাল হয় না মা?

যো। আমার আশা আপনি ত্যাগ করুন। আপনার যদি আর কোন প্রয়োজন থাকে, তবে সেইদিকে দৃষ্টি করুন। আমার জন্য ভাবিবেন না, এই উত্তরদিকে শ্যামীবামুনির একখানা ঘর আছে, আমাদের ক্ষেত্রে যাইবার অগ্রে তাহার মৃত্যু হয়. তাহার আর কেহ নাই. সে ঘর খালি পড়িয়া আছে জানি, আমি সেইখানেই থাকিব, সেইখানেই যাইতেছি।

ভ। সে কি কথা মা! এই বয়সে একা কিরূপে থাকিবে, লোকে কি বলিবে?

যো। যাহার ভয়—লোক ত তাহা অগ্রেই বলিয়াছে। আর তাহার জন্য ভাবিবেন কেন?

ভ। এরূপ একলা থাকিলে, বিপদও ত ঘটিতে পারে, কার কিরূপ মন, তাহা ত বলা যায় না, বিশেষ দেশের সব লোকই ত আর ধর্ম্মভীরু নহে?

যো। সেজন্য আমি ভাবিব না—ভগবান ভাবিবেন।

ভ। একা থাকিবে কি প্রকারে?

যো। একা আমি থাকিব না, ভগবানই সঙ্গে থাকিবেন।

ভ। খাইবে কি?

যো। ভগবানের সে চিন্তা, আমি চিন্তা করিলে, আর ভগবান চিন্তা করিবেন না। এমন কায কখন করিবেন না।

ব্রাহ্মণ এইরূপে কোন প্রকারে যোগমায়াকে ফিরাইতে পারিলেন না। যোগমায়াও ব্রাহ্মণকে লইয়া আর অগ্রসর হয়েন না। ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, পৃথিবী যেন অন্ধকারময় দেখিলেন, অমনি তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন,—যোগমায়া আর সেখানে নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণ নন্দীগ্রামে আসিয়া চঞ্চলাকে সমস্ত জানাইলেন। চঞ্চলার চক্ষের জল আর ধরে না। নরনারায়ণ বসিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া—নরনারায়ণ পূর্ব্ব ঘটনা সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, "সে দোষ আমার, আমিই ইহার মূল।"

এ কথা নটনারায়ণ একদিন সমস্ত আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রণে সকলকেই জ্ঞাত করাইলেন, কিন্তু সেকথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, এবং তাহাতে কোন ফলই হইল না, ও নরনারায়ণকে অপদস্থই হইতে হইল।

নরনারায়ণের হৃদয়—এখন সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তাহাতে তিনি কোন তর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না, বা মনে মনে বিচলিতও হইলেন না।

এইরূপে দিন যায়, নরনারায়ণ কিন্তু দেবীগ্রামে যাইলেই—যোগমায়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন, কোন কোন দিন ভিন্নগ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যোগমায়াকে আনিয়া দেন। এইরূপে যোগমায়ারও দিন কাটিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনীর উদর পূরণে আর কতই বা আয়োজনের প্রয়োজন।

এখন দেবেন্দ্রের আর তত ভয় নাই। যখন নরনারায়ণ ইহার মূল কারণ, তখন দেবেন্দ্রের আর লজ্জাই বা কি? তিনি এখন আর দূরে দূরে থাকেন না, নরনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরেন। একদিন দেবেন্দ্র, নরনারায়ণকে সেই বকুলতলায় লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! সংসারী ছিলে—বনবাসী হইলে, আবার সংসারে আসিলে—সংসারী হইলে—এ ধর্ম্ম কিরূপ? আমি বিচার করিতে আসি নাই, বুঝিব বলিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

নরনারায়ণ একটু হাসিলেন, বলিলেন, "আমি যেমন করিয়া হইলাম, তেমনি তুমি না করিলে, কি দিয়া বুঝিবে? আমি কিরূপে বুঝাইব, আর বুঝাইলেই বা তুমি লইবে কেন?"

দে। এ কথা সত্য। তবে জাগতিক উপমা দিয়া—যদি বুঝাইতে পার, তবেই বুঝিতে পারি।

নরনারায়ণ অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "উপমা দিয়া বলিতে বলিতেছ, কিন্তু মায়া যে ভগবৎ-শক্তির এক চতুর্থাংশ, আর এক চতুর্থাংশ পরা, যেমন এই দুই চতুর্থাংশ মায়া এবং পরা, তেমনি আর দুই চতুর্থাংশ ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য চিৎ। একুনে ষোল আনা পূর্ণ। অতএব মায়া তাহার ছায়া বটে, কিন্তু সমস্তের নহে, এক চতুর্থাংশ পরার। পরা বুঝাইতে, উপমা মিলে বটে, কিন্তু চিৎ বৈচিত্রে, মায়া উপমা অনেক স্থলে যথাযথ হয় না। তবে যদি স্থিরচিত্তে আমার কথা শুন, তাহা হইলে একরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু যদি আমার কথায় বিশ্বাস না থাকে, তবে আমায় বৃথা বকাইবে কেন?"

দে। বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কথা আবার তুলিলে কেন? তোমার কথা আমি কোন কালেই অবিশ্বাস করি না। যদি করিতাম—তবে বুঝিতে আসিতাম কি?

নর। মায়ার বুঝাবুঝি ছাড়িয়া দাও, তাহাতে কায হয় না। সময় না হইলে যত্নে বৃক্ষ, ফল ফুল ধরে না। যদি ধরিত—তবে শিব-সুন্দরের উপদেশের পর, আবার আমায় বনে যোগ-ধর্ম্মে ভোগাবসান করিতে হইত না। যাহাই হউক, তোমার জিজ্ঞাসার—আমি সামান্য উপমায়—উত্তর দিতেছি, মন দিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর।

"সাধারণতঃ লোকের সহজ স্বভাব গত একটী প্রফুল্ল ভাব আছে। সঙ্গ দোষে লোক যখন মদ্য পানে মত্ত হয়, তখন সেই প্রফুল্লতা হারায় বটে, কিন্তু তৎ স্থানে মদ্যের একটী স্বতন্ত্র প্রফুল্লতা উপস্থিত হইয়া ক্রিয়া করে। সেই ক্রিয়াজনিত চক্ষে, সে নানা দর্শন কল্পনা করে, তখনকার অবস্থায় তাহার সে দর্শন, যে মদ্যজনিত মিথ্যা, তাহা সে জানিতে পারে না। তেমনি মায়া মদ্যে বিকারে আমি প্রথমে বাড়ী ছিলাম। নেশা ছুটিবার অগ্রে, মদ্যপায়ীর যেমন একে একে তাহার স্বগত সহজ প্রফুল্লতার আভাস উদয় হয়, তদ্রূপ মায়া নেশা কাটারূপ বৈরাগ্যে, আমায় পরাগত সহজ ভাবের আভাস, একে

একে উদয় হওয়ায়, মদ্যপায়ী কষ্ট স্মরণে যেমন আর মদ্য খায় না, তেমনি আমি মায়ামদ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইলাম। অর্থাৎ অধিক দিনের মদ্যপায়ী যেমন একবারে মদ্য ছাড়িলে রোগগ্রস্ত হইবার ভয়ে, মদ্য ছাড়িয়াও, ঔষধের ন্যায় শরীর রক্ষার্থে কিছু কিছু করিয়া তাহা পান করে,সেরূপ কিছু করিয়া ত্যাগরূপ বনবাস; কারণ যদিও বন,মায়া ছাড়া নহে, তবে পূর্ণমাত্রা নহে। যখন মদ্যপায়ীর মদ—প্রায়ই ত্যাগ করিয়াছেন,—এরূপ সময় হয়, তখন তাঁহার মদের যে কর্ম্ম, তাহা থাকে না বটে, কিন্তু সেই সহজ প্রফুল্লতাও থাকে না, কারণ মন কোন না কোন বিষয়ে বিনিময় না হইলে, সে প্রফুল্লতা আসে না। যখন সে মদ্য মোহে বিলীন হইয়াছিল, তখন সে একরূপ ছিল. তদ্গত কষ্টে তাহা ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু সে সহজ প্রফুল্লতা পাইল না। না পাওয়ায়, এবং পুনরপি মদ্য ব্যবহার না করায়, সে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিল। কারণ বল মাত্রই নেশাগত, যে মদ্য বলে সে বলীয়ান ছিল. সে বল যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, ততই সে ক্ষীণ হইতে লাগিল; এই ক্ষীণ হইবার কালে, তাহার মদ্যপান জনিত কোন কর্ম্ম থাকে না, এবং স্বগত সহজ প্রফুল্লতার আভাস মাত্র থাকায় সে স্থির হয় বটে, কিন্তু বলাভাবে আছি কি নাই, তাহা তাহার জ্ঞান থাকে না। ইহাই যোগ ধর্ম্মের—সমাধি। যদি বল জীবের ত নিজের একটা বল আছে, তবে এরূপ আছে কি নাই, এরূপ জ্ঞান হইবে কেন? তাহার উত্তর এই যে, জীব—কিরণ-কণ—এত ক্ষুদ্র যে, তাহা কাহার দ্বারায় আবৃত হইলে, তাহাকে ভেদ করিয়া, তাহার স্বপ্রকাশে ক্ষমতা নাই। মায়ায় দুইটী স্থিতি—এক সবিকার, এক নির্ব্বিকার। সে সবিকার মায়ায় মন,—বুদ্ধিতে সবিকার হইয়া, বিকার ত্যাগ করিতে করিতে যখন তাহার, নির্ব্বিকার প্রকৃতিরূপে স্থিত হয়, তখন তাহার নির্ব্বিকার অঙ্গে, সবিকার মন বুদ্ধি না থাকায়, আর কাহার দ্বারায় জীব অগ্রসর হইবে? সে জন্য তাহাকে নির্ব্বিকার ভাবেই সেই স্থানেই থাকিতে হয়, কাজেই সে নির্ব্বিকারে মায়ার সবিকার গত সুখ, দুঃখ নাই, থাকে কেবল তাহার অনুজ্ঞান মাত্র—ইহাই পরমাত্ম

গত—কৈবল্য সমাধি। যদি তাহার পূর্ব্বসাধন কালে ব্রহ্ম ধারণা থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে সে ওই প্রকৃতি গত ব্রহ্ম তন্মভায় —ওই ভাবেই স্থিতি করে। কারণ ব্রহ্মও নির্ব্বিকার—ইহাই ব্রহ্ম সমাধি। যদি পূর্ব্বগত সাধনে ওই জ্ঞান কিছু ভক্তি মিশ্রা থাকে, তাহা হইলে সে আর একবারে নির্ব্বাণ প্রায় না হওয়ায়, সালোক্য, সারূপ্য ইত্যাদি ভাবে তথায়ই অবস্থিতি করে, কারণ ভক্তি বৃত্তি বিশেষ, বৃত্তি থাকিলেই সে, বৃত্তির ইতর বিশেষ ভাবে জাগরূক থাকে। যদি ওই মিশ্রা ভক্তি এত প্রবল হয়, যে পরসত্ত্বের আভাস গ্রহণ যোগ্য, তাহা হইলে সে, সেই আভাসে শঙ্খ, চক্র, গদা. পদ্মধারী বিষ্ণুর যে নির্ব্বিশেষ মায়া গত মূর্ত্তি, তাহারই পার্ষদ ভাবে অবস্থিতি করে। —ইহাই ষড়ঙ্গ যোগীর শেষ ফল। যদি এই পার্ষদ ভাবে কালে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তথা হইতে চিদ্ধামে গতি হয়। জ্ঞান বা সমাধি যোগীরও এ অবস্থা, ওই রূপেই হয়।

"যেমন মদ্য রাগে লোক, মদ্যপানজনিত চক্ষে নূতন জগৎ দেখে, তদ্রূপ মায়া-রাগে যেরূপ এই বিশ্ব, তেমনি পরারাগে যে বিশ্ব, তাহাই চিজ্জগৎ। এই পৃথিবীতে নানা দ্রব্য থাকিলেও, যেমন মদ্য, নূতন জগৎ না থাকিলেও, এই জগৎকে নূতন রূপেই দেখায়, তদ্রূপ চিজ্জগতে যে শক্তিতে সেই জগৎকে, এই জড় জগৎ করিয়া দেখায়, তাহাই স্বরূপ শক্তির—মায়া শক্তি। সেই মায়া মদ্যে আমরা বদ্ধ হইয়া বনে গিয়া, যখন বনের সমাধি জানিলাম, তখন মায়া ত্যাগে—পরারাগে দৃষ্টি পড়িল। কারণ এই বকুলতলায়, সে দিব্য দৃষ্টি আমার একবার হইয়াছিল, যদি না হইত, তাহা হইলে পরা-রাগের আর সন্ধান না হওয়ায়, নির্ব্বাণেই গতি হইত। সে জন্য মদ্যপানহেতু যেমন মদ্য দাতার নিকট যাইতে হয়, সেরূপ পরাধনী গুরুর নিকট এখন মাথা পাতিতে হইল। সেই ধনীর যে পথ—আমাদেরও সেই পথ।

"তুমি যে ভাবে আবার সংসারী হইলে বলিতেছ, তাহা তোমার ভ্রম। যে স্ত্রী, পুত্র লইয়া লোক সংসারী হয়, সেই স্ত্রী পুত্র, অবিদ্যাগত খেলার অবলম্বন বিশেষ। কিন্তু যাহাতে সেই অবিদ্যা, বিদ্যাদ্বারে

চালিত, আর তাহা অবিদ্যা গত খেলার অবলম্বন হইতে পারে না।" কিন্তু অবিদ্যাগত চক্ষে বিদ্যা দৃষ্ট নহে, সেজন্য সে বিদ্যাগত খেলাকে, স্বগত অবিদ্যাগত খেলার ন্যায় ভাবিয়া, তাহাই মনে করে, সে দোষ তোমার নহে, সেই হেতু যোগমায়া সাধারণের নিকট অসতী—তোমার এ প্রশ্ন। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখ যে, বিদ্যার ভক্তি বৃত্তিতে—একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ, দ্বিতীয় নাই। যদি তাহা হয়, তবে বুঝিতে পার—যোগমায়ার সহিত আমার এখন সম্বন্ধ কি? কিন্তু বলিব কি—জীবের এমনি দুরাদৃষ্ট যে, মায়ার মোহিনী মূর্ত্তির মোহনে, অবিদ্যার কাম গন্ধে, এ বিশুদ্ধ ভাবেও মলা লাগাইয়াছে—সাধারণের দোষ কি?"

দে। কে লাগাইয়াছে? আমি ত সে জন্য কিছু বলি নাই।

নর। তোমাকে বলি নাই। সংসারে এমন অনেক সম্প্রদায় পাইবে, যাহারা এই মায়া দেহকেই পরা দেহ নির্দ্দেশে, তৎসাধনে মায়া ফলই উপার্জ্জন করতঃ, নিজের মাথা নিজে ত খায়ই, আবার পরের মাথা খাইয়া বেড়ায়। সেই সব দেখে বলিয়াই, সেইরূপ ভাবিয়া সাধারণের যোগমায়ার প্রতি এ ভাব। ভগবৎ-সাধনে কি মায়া ব্যবহার আছে? সে সাধনে একের—অন্য দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদি থাকে—তবে তাহাই মায়ার কুহক মন্ত্র। সে জন্য বৈষ্ণব—তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করেন না।

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আমি সব বুঝিয়াছি, আমার জিজ্ঞাসার আর কিছু নাই। এখন আমার উপায় কি? আমি এতদিন তোমার আশায় ছিলাম যে, তুমি পাইলে আমি বঞ্চিত হইব না, আমার সে বিশ্বাস সত্য না হইবে কেন? যদি আমার সে বিশ্বাস সত্য হয়, তবে তাহা সত্য হইতেই হইবে?"

তখন নানা কথা উঠিল। শেষে নরনারায়ণ দেবেন্দ্রকে, হরসুন্দরের নিকট লইয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে ইন্দ্রনারায়ণের কন্যার বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, দিনস্থিরও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিপদ সহজে ছাড়িতে চাহে না। প্রতিবাসী স্বজনেরা আবার সেই গোলই তুলিয়াছেন। নটনারায়ণ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, নরনারায়ণ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "আপনাকে কয়দিন ভাবিত ভাবিত বোধ হইতেছে কেন?"

নট। মেয়েটা আর রাখা যায় না, এ দিকে দলাদলিও ঘুচিল না। পাত্রের পিতা এখন বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

নর। কেন? সেত চুকিয়া গিয়াছে?

নট। সেত চুকিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আমায় তাহারা যাহা বলে, তাহাতেও বিপদ, আবার তাহা প্রকাশ করিলেও বিপদ, তাই ভাবিতেছি।

নর। আমি একরূপ বুঝিয়াছি, প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি তাহা না হয়, শুনিয়া তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে, যদি তাহাই হয়, তাহাতে আর বিপদ কি?

নট। বিপদ আর কি? তুমিই জ্যেষ্ঠ, বিপদ আপদ সকলই তোমার, তবে কথা হইতেছে, সকলের আপত্তি এই যে, তুমি বৌমার ওখানে অনেক দিন আহার কর, থাক, তুমি যদি তাহা আর না কর, এবং রীতিমত প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হও, তাহা হইলে তাঁহাদের আর কোন আপত্তি থাকে না। কিন্তু এ কথা আমি তোমাকে কিরূপে বলিব, তিনি সতী, হরসুন্দরের আত্মজ।

এই বলিয়া নটনারায়ণ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, আর বলিতে পারিলেন না।

নরনারায়ণ ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তাহার জন্য কাঁদিতেছেন কেন? আমি তাহাই করিব, আপনি প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করুন। আমার জন্য ইন্দ্রের কন্যার বিবাহ হইবে না—তবে আমি কি ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছি!"

নট। তুমি পার সব—তাহা জানি, কিন্তু তাঁহার উপায়? কে দেখিবে, আমরা থাকিতে তিনি পেটের জন্য কি ভিক্ষা করিতে বাহির হইবেন?

নর। সে কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনি কি মায়া-ঘোরে সব ভুলিতেছেন? তাহার সঙ্গে কি কেহ নাই? তবে কাহার জন্য তাহার নিকট আমি যাই? যদি থাকে, সে কি কাহাকেও ফেলিয়াছে, যে আজ তাহাকে ফেলিবে ভাবিয়া কাঁদিতে বসিব? সেই দৃষ্টিতে সংসারে চলিলে, সুখ দুঃখের কিছুই থাকিবে না।

এইরূপ নানা কথার পর, নটনারায়ণ দেবীগ্রামে যাত্রা করিলেন। হরসুন্দর সমস্ত শুনিলেন, বলিলেন, "ভাল পরামর্শই হইয়াছে, সেই ব্যবস্থা করা হউক।

সে কথায় নটনারায়ণ আবার—যেরূপ নরনারায়ণের নিকট কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন—সেইরূপ কাঁদিয়া ফেলিলেন, হরসুন্দর বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়! সংসারে ধর্ম্ম লাভ হইবার নহে, বনে যাইতে হইবে, যদি মনকে বনের মত করিতে পারেন—তবে সংসারই বন হইলে, এ ত্যাগ স্বীকারে বেদনা উঠিবে না, না উঠিলে, বেদনারূপ মেঘে আর চক্ষু আবরিত হইবে না। না হইলে ভগবৎ দর্শনে ভক্তিতে যে বলী, মায়ার সাধ্য কি যে তাহাকে অশান্ত করে।"

নটনারায়ণ আর বসিলেন না, উঠিলেন। হরসুন্দর বলিলেন, 'বাড়ী যাইবে কি?'

নট। হাঁ, বাড়ীতে একবার বলি, সে তোমার কথার অপেক্ষায় রহিয়াছে।

হর। তবে শুন—যাহা করিতে হইবে। আমরা বাড়ী শুদ্ধ সে প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে যাইব। কিন্তু তোমার বাড়ীতে এ মুখ আর দেখাইব না। সে জন্য একটু দূরে এই প্রায়শ্চিত্তের স্থান করিবে, এবং এক স্থানে একটু এরূপ করিবে যেন, মেয়েরা থাকিতে পারে, কিন্তু সে জন্য অধিক খরচের আবশ্যক নাই। দুই একদিনের মধ্যেই প্রায়শ্চিত্তের দিন স্থির, এবং আয়োজন করিবে। যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

নটনারায়ণ এ· কথার কিছুই মর্ম্ম বুঝিলেন না। কারণ তাঁহার মন বড় ভাল নহে—রাগে, দুঃখে বিভ্রান্ত। তিনি, তাহাই হইবে বলিয়া নন্দীগ্রামে আসিলেন। চঞ্চলাকে সমস্ত জানাইয়া বলিলেন, "চঞ্চলা! আমার কিন্তু এ কিছুই ভাল বোধ হইতেছে না। কারণ বৈবাহিক মহাশয় এখানে না আসিয়া, স্বতন্ত্র স্থান করিতে কেন বলি· লেন? অবশ্য ইহার কোন গূঢ় মর্ম্ম আছে। মর্ম্ম থাকে থাকুক, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কেন আমার মনে মন্দই গাহিতেছে?"

বলিতে বলিতে আবার তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। নরনারায়ণ এদৃশ্য আর দেখিতে পারেন না। তিনি দেবীগ্রামাভিমুখী হইয়া যোগমায়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। যোগমায়াকে দেখিবামাত্র তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। অমনি হৃদয় ভেদ করিয়া কি এক শক্তি, তাঁহাকে স্তোদূল্যমান করত, আনন্দ রূপে—মুখ দিয়া, জলরূপে—চক্ষু দিয়া, স্বেদ রূপে—সমস্ত অঙ্গ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। নরনারায়ণ সমস্ত ভুলিলেন।

অনেকক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া নরনারায়ণ বলিলেন, "তোমার নিকট কান্নাও—হাসি হইয়া যায়, তবে আর বলিব কি? যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলা হইল না—যাহার জন্য আসি নাই, তাহাই হইল।"

যোগমায়া বলিলেন,—"তবে আজ কিসের জন্য আসা হইয়াছে?"

তখন নরনারায়ণ হাসিতে হাসিতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

যোগমায়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"উত্তম পরামর্শ হইয়াছে। তাহার জন্যই বা আমাদের ভাবনা কি? এই পর্ণ কুটীরে বসিয়াই আমি, পিতার নিত্য প্রসঙ্গ শুনিতেছি, তাঁহার পার্শ্বেই বসিতে স্থান পাইয়াছি। মায়াশক্তিতে তাহা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, তোমার নিকট অলীক নহে, যখন অলীক নহে, তখন বিচ্ছেদই বা কোথায়?—বহির্ম্মুখে? তবে আমরা কি ত্যাগ শিখিয়াছি? বহির্ম্মুখে ঠিক না থাকিলে—তাহার বৈধী সেবার গোল হয়, সেই বৈধী

সেবার জন্য আমাদের ইহাতে ব্যথা লাগিবে না।' কেন লাগিবে না তাহাও বলি, কারণ ইহাও তাহারি ইচ্ছা। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, তোমার হৃদয় অতি সুন্দর, তাই বৈরাগ্যে তোমার, এ ত্যাগ দৃষ্টি, কারণ বৈরাগ্য মায়া মধ্যগত বলিয়া, তাহার মায়ার ভাব অনবগত নহে, কিন্তু মায়া হইতে অতীত ভাবে, চিৎ স্বরূপে—বৈরাগ্য স্থান পায় না, তখন সে কাহার অপেক্ষা করে না। যেখানে ভগবৎছবি, সেই খানেই তাহার দৃষ্টি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল। সমস্ত দিন সূর্য্যদেব যেন মেঘ-বসনে অবগুণ্ঠিত! ভাবে বোধ হয়, যেন আর পৃথিবীর মুখ দেখিবেন না। আকাশের কান্না নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই; পৃথিবী যেন নিস্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর, যেন প্রলয়ের দিন সমুদিত।

নন্দীগ্রামবাসী লোকের হৃদয়ও যেন ঐ আকাশের ন্যায়—পৃথিবীর ন্যায়। মুখও যেন কি এক অবিচিন্তিত লজ্জা, ভয় রূপ বসনে, অবগুণ্ঠিত। তাঁহারা এ প্রায়শ্চিত্তে যোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই যেন কাহার সহিত হৃদয় খুলিয়া—এক হইতে পারিতেছেন না। কি যেন কিসের দ্বারায় মুখ আবৃত, হৃদয় যেন নিস্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর। কাহার মুখে কোন আলাপ নাই, শব্দ নাই, হাস্য নাই, কি যেন এক অজানিত দিন সমুদিত।

এ দিকে হরসুন্দরের আদেশ রক্ষার্থে—বিষ্ণু-মন্দিরের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গণে, প্রায়শ্চিত্তের স্থান, এবং সেই মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে হরসুন্দর-পরিবারবর্গের স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তাহাতে সপরিবার হরসুন্দর সহাস্যবদনে উপবিষ্ট, পশ্চাতে—চিন্ময়ী, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনে কপাটের অন্তরালে, সম্মুখে—শিবসুন্দর, জীবসুন্দর পদচারণে সংসার ব্যাপার দর্শনে চমকিত।

যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। স্বজন—আত্মীয়—কুটুম্ব, প্রতিবাসীতে সম্মুখে সভাপূর্ণ, কিন্তু কাহারও মুখে বাক্য নাই, সকলেই যেন কি এক ভাবে গম্ভীর, অথচ হৃদয় যেন কাহারও প্রেরণায় শূন্যবৎ।

ভোজনকাল উপস্থিত। সকলই প্রস্তুত, নরনারায়ণ জোড় হস্তে সভাস্থ সকলকেই ভোজনে আহ্বান করিলেন। নিঃশব্দে সকলেই ভোজনে বসিলেন।

নটনারায়ণ, শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদ, পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ, দেবেন্দ্র, নরনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ সকলেই পরিবেশনে ব্যস্ত হইলেন। কাহারও বিরাম নাই।

অকস্মাৎ ভোজন ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে—এ কাহার মূর্ত্তি! যোগমায়া —তুমি? তোমার এ মূর্ত্তি কেন? যেন চিরদরিদ্রা, রুক্ষকেশা, মলিন-বসনা, ভিখারিণী—পাত্রাবশিষ্টের জন্য অপেক্ষায়।

পরিবেশন করিতে করিতে নরনারায়ণের অকস্মাৎ সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। সে দৃষ্টিতে নরনারায়ণের হস্ত, পদ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর হস্ত পরিবেশন করিতে পারে না, সে হস্ত আর যেন তাঁহার নহে, কে যেন তাঁহার সর্ব্ববল হরণ করিল, বিষম শব্দে হস্ত হইতে থালা, সামগ্রী সহিত ভূতলে পতিত হইল।

তখন সকলের তাঁহার প্রতি চক্ষু পড়িল। নরনারায়ণ দুলিতেছেন, মুখ হইতে কি এক জ্যোতিঃ যেন নির্গত হইতেছে, সে জ্যোতিঃ যেন যোগমায়ায় গিয়া মিলিত হইতেছে—আর সেই জ্যোতিঃতে যোগমায়া যেন ভিন্ন স্বরূপে উদিত। সে কেশ—যেন স্বর্ণ চামরের ন্যায়, বসন —যেন হীরক খচিত, হাস্য—যেন শশিকলা, রূপ—যেন চির ভাগ্যবতী, হৈমবতী। সে দর্শনে নরনারায়ণ, নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন :—

"কে আমি বুঝিতে নারি একি হ'ল বাই।
সত্য মিথ্যা গুরু জানে চক্ষে দেখতে পাই॥

যখন আমি হই বহির্ম্মুখ,
হৃদকমল হয় পাষাণ স্বরূপ,
অনা'সে দি অন্যেরে দুঃখ,
কেবল স্বসুখ চাই॥
শ্রীনাথেরি আকর্ষণে,
যখন অন্তর্ম্মুখে টানে,
আমাতে আমি থাকিনে,
হই আহ্লাদিনী রাই॥"

সে দর্শনে যাঁহার যেথানে হস্ত, সে হস্ত সেই খানেই রহিল। যে বাক্য নির্গত হইতে ওষ্ঠে বাহির হইতেছিল, সে বাক্য সেই ওষ্ঠেই রহিল। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত—যেন আর আসিল না।

তখন নরনারায়ণ জোড় হস্তে বলিলেন, "ভাই, বন্ধু, পিতৃস্থানীয় ভদ্রগণ! আর আমার জাতি রক্ষা করা হইল না, প্রায়শ্চিত্তে হৃদয়ে যে মলা পড়িয়াছিল, তাহা খসিয়া গেল। আপনাদের জাতি আপনারা রক্ষা করুন, আর এ জাতি রক্ষায় আমার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের জন্য প্রয়োজন, যদি সাধু অপরাধেই তাঁহারা ডুবিলেন—তবে কাহার জন্য আমার জাতি রক্ষা—সমাজ রক্ষা? তাই বলি—আপনাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, বুদ্ধি খুলিয়াছে, অহঙ্কার শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝিয়াছে, ধর্ম্ম রক্ষার উপযুক্ত হইয়াছে—এখন আপনাদের ধর্ম্ম, আপনারা রক্ষা করুন, আমার দ্বারায় ধর্ম্মরক্ষা হইবার নহে—হইল না।"

এ বাক্যে সকলেই ভোজন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া অচ্যুতানন্দ, পূর্ণানন্দের জটাজূটমণ্ডিত শিরোদেশ হইতে—কি এক জ্যোতিঃ সকলের নয়নকে বিভ্রান্ত করিল। তখন পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ—সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সে দৃষ্টিতে সকলের মস্তক যেন শূন্য ভাবে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

তখন পূর্ণানন্দ জোড় হস্ত হইয়া হরসুন্দর লক্ষ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "প্রভো! গুরো! ভক্তির কাঙ্গাল, ভক্তির জন্য গুণ ফেলিয়াছে, কিন্তু যদি অনুমতি হয়—এ কৃষ্ণদ্বেষী, ভক্তদ্বেষী নন্দীগ্রাম——"

মুহূর্ত্তের জন্ত একবার পৃথিবী—কাঁপিয়া উঠিল, আকাশ—বিকট—চীৎকারে ডাকিয়া উঠিল,মেঘ—মুষলধারে ধারা বর্ষণ করিল। তাহাতে—এ ইহার ঘাড়ে, ও উহার ঘাড়ে, কেহ বা ভূমির পিচ্ছলে—উচ্ছিষ্টে, কেহ বা তীব্র বর্ষণ আবেগে—পঙ্কে, স্বকৃত সাধু-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিলেন। তখন সকলের সহিত সকলের বিবাদ বাধিয়া গেল। এ ইহাকে ও উহাকে ভৎর্সনা আরম্ভ করিল। কেহ কাহাকে বলিল, "আমার কি দোষ, আমি ত যোগমায়াকে অসতী ভাবি নাই,বলিও নাই, তোদের সঙ্গে যোগ দিয়াই ত আমার এ দুর্দ্দশা," আবার একজন বলিল, "বলিস্ নাই, তুই ত যত নষ্টের গোড়া।" একজন বলিল, "আরে সে কথা এখন থাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন সব বুঝিতে পারিতেছিস ত? ইহারা মানুষ নহে, নচেৎ ঐ দুইটী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী—সাধু কি, ইহাদের মধ্যে এরূপ ভাবে যোগ দিত? নরনারায়ণ কি বলিল—বুঝিলে কি? এখন সকলে আয় ক্ষমা ভিক্ষা করি, ব্রাহ্মণের নিকট ব্রাহ্মণের ভিক্ষায় আর অপমান কি?"

সকলের এইরূপ অবস্থা, আর মনের ভাব দেখিয়া—শ্রীক্ষেত্রের সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যোড়হস্ত হইয়া যোগমায়ার—নরনারায়ণের দর্শন, নরনারায়ণের সহিত গমন হইতে, পূর্ণানন্দের ভিক্ষা অবধি—সমুস্তই বিবৃত করিয়া বলিলেন, "ইহা ত আমি পূর্ব্বেই আপনাদের জানাইয়াছি, তখন লন নাই কেন? জানিলাম সকলই ভগবানের খেলা।"

তখন সকলেই—স্বকৃত অপরাধ দৃষ্টে—ভয়ে, ঘৃণায়, লজ্জায়, যোগমায়ার প্রতি দৃষ্টি করতঃ বলিতে লাগিলেন,—"কে জানে তোমায় যোগমায়া! তুমি সতী, যোগমায়া-রূপিণী। মা! না বুঝিয়া সন্তান অপরাধ করিয়াছে, এখন সে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষায় সকলে তোর মুখ প্রতীক্ষায়, অভয় দে—মা! আমরা বড়ই লজ্জিত, ভীত হইয়াছি, এ দুই সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে রক্ষা কর।"

এখন আর যেন সে যোগমায়া নাই, যেন বালিকা—রোরুদ্যমানা, অভিমানিনী, বলিলেন,—"আজন্ম আমি আপনাদের নিকট কন্যা-ভাবে প্রতিপালিতা, আমি সতী কি—না, সে পরীক্ষা আপনাদের

নিকট—আপনারা যাহা বলিবেন—তাহাই আমি, আপনাদের কৃপায় এখন—আমি সতী। আপনাদের ভালবাসায়—আমি আজ অনুগৃহীত, ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন যেন—আর কিছু থাকুক, আর নাই থাকুক, নন্দীগ্রামের কৃষ্ণে মতি থাকে।”

এই বলিয়া যোগমায়া ঊর্দ্ধশ্বাসে—হরসুন্দরের লক্ষ্যে ছুটিলেন, সকলেই তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন বটে, কিন্তু বিষ্ণুমন্দিরের সে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশে কাহারও সাহস হইল না, সকলেই দেখিলেন, কে যেন কালরূপী এক দীর্ঘকায় পুরুষ—সে প্রাঙ্গণে পদচারণে দ্বার রক্ষা করিতেছে। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

যোগমায়া ঢুকিয়া হরসুন্দরের পদতল চুম্বন করিলেন, বলিলেন,—“পিতঃ! গুরো! স্বজনের কৃপায়, প্রতিবাসীর কৃপায়, এখন আমি সতী হইয়াছি, আবার অকৃপায় অসতী হইতে পারি। যে দেশের এ রীতি, আর আমি সে দেশে থাকিব না। যে দেশে অসতী নাই, সতী—সতীই থাকে, যে দেশে একা কৃষ্ণ বই পুরুষ নাই, আমায় সেই দেশে স্থান দাও।”

এই বলিয়া যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন। চিন্ময়ী, যোগমায়াকে অমনি কোলে লইয়া—তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন, বলিলেন,—“মা! তোকে লইতেই আমরা আসিয়াছি, যাহার কৃষ্ণ সহায়, তাহার ভাবনা কি মা!”

তখন নটনারায়ণ, শশাঙ্ক, শিবসুন্দর, জীবসুন্দর, যোগমায়ার অনুসন্ধানে—হরসুন্দরের সম্মুখে উপস্থিত। হরসুন্দর বলিলেন,—“শশাঙ্ক! আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শরীর আর বয় না। অনেকবার তোমাদের নিকট বিদায় ভিক্ষা চাহিয়াছি, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া কেহ বিদায় দিতে পার নাই—আজ আবার বিদায় ভিক্ষার জন্যই দণ্ডায়মান—তোমরা সকলে প্রাণ ভরিয়া একবার—হরি, হরি বল—হরি, হরি বলিয়া এ বৃদ্ধকে হরিনামে—হরিতে সমর্পণ কর।”

শশাঙ্ক, হরসুন্দরের সেরূপ মূর্ত্তি—আর কখন দেখেন নাই। সে মূর্ত্তিতে তিনি, পূর্ব্বদিন ভুলিলেন, পূর্ব্ববল ভুলিলেন, চতুর্দ্দিকে হর-

সুন্দরের জ্যোতিঃ দেখিলেন। সে দর্শনে তিনি—আপনা ভুলিলেন, জগৎ জ্ঞান ভুলিলেন, বলিলেন,—"প্রভো! তোমার যাহা ইচ্ছা, কৃষ্ণের ইচ্ছায়—তোমার যাহা ইচ্ছা, কৃষ্ণের ইচ্ছাই সর্ব্ব ইচ্ছা—আমার ইচ্ছা যেন স্বতন্ত্র না হয়, তবে আমায় জিজ্ঞাসা কেন? তোমার ইচ্ছা—তুমিই বুঝিতে পার, তোমার যাহা ইচ্ছা—তাহাই হউক।"

এই বলিয়া শশাঙ্ক কাঁদিতে লাগিলেন। শিবসুন্দরের কথা তখন তাঁহার হৃদয়ে জাগিল। এদিকে নরনারায়ণ উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"প্রভো! অপরাধ মার্জ্জনা কর, এ সাধু-অপরাধী দেশে, আর আমার প্রয়োজন নাই। যোগমায়া! বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি, তুমি আবরণ কর নাই, আমিও আবরিত হই নাই, কি জানি—ভগবৎ-লীলার কি মহিমা। তোমার সে কথা তখন বুঝিয়াও বুঝি নাই,—এখন বুঝিয়াছি—জাগ্রত বহির্ম্মুখেও বৈরাগ্য স্থান পায়—পায়বলিয়াই, তাহাকে ভগবৎ মায়া-লীলা হেতু, সমাজের মুখ দেখিতে হয়, কিন্তু অন্তর্ম্মুখে, চিৎ শক্তিতে সে প্রতিভাস না পড়ায়, তাহাতে সংসার থাকে না। তখন সে অচিৎ নির্লিপ্ত চিৎ এ, দৃষ্টি পড়ে নাই, দরদ উঠে নাই, তাই এ প্রায়শ্চিত্ত, তাই এ সমাজ রক্ষার চেষ্টা, তাহাতেও দুঃখ নাই; যোগমায়া! কৃষ্ণের ইচ্ছা যাহা—তাহাই হউক—হইয়াছে—হইবে, কিন্তু গুরো! হরসুন্দর, বকুলতলার আগন্তুক—একবার বল, কৃষ্ণে একবার বল, যেন কৃষ্ণের ইচ্ছায়, নিত্য কৃষ্ণে মতি থাকে, ভক্তিতে অচলাভক্তি থাকে।"

নরনারায়ণের এবম্বিধ অবস্থায় সকল লোকই তাঁহার নিকট আসিলেন, তখন একটা গোল পড়িয়া গেল। হরসুন্দর বলিলেন,—"শশাঙ্ক! নরনারায়ণ বড় চঞ্চল হইয়াছে, তাহাকে শান্ত কর, আজ জগৎ বড় নিরানন্দময়, সকলকে আনন্দ বিলাও, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার—কৃষ্ণে নিত্য মতি রহুক।"

শশাঙ্ক, নটনারায়ণ—নরনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন,—"নরনারায়ণ!" নরনারায়ণ যোড়হস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন আবার আকাশ বিকট চীৎকারে, বজ্রনাদে, কাঁদিয়া উঠিল। ভূমিকম্পে পৃথিবী—থর থর কাঁপিয়া উঠিল। মেঘ—অশ্রুধারায় বিষম বর্ষণ করিতে

লাগিল। কাহার ঠিক নাই—কে কোন দিকে পড়িল, কে কোন দিকে রহিল, কেহই তাহা জানিল না। সহসা যেন সকলের কর্ণে কি এক বিষম শব্দ, মুহূর্ত্তে বাজিল. অমনি সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত পরে যেন সকলেই হৃদয়শূন্য হইলেন। আর সে ভূমিকম্প নাই, বজ্র নিনাদ নাই, ধারা বর্ষণ নাই, সকলেই যেন স্থির—শান্ত, সে শান্তচিত্তে, শান্ত চক্ষে সকলে দেখিলেন—সে বিষ্ণুমন্দির আর নাই। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সে জ্যোৎস্নায়, সে বিষ্ণুমন্দির-প্রাঙ্গণে, দোদুল্যমান জল রাশিতে, সে জ্যোৎস্না ভাসিতেছে।

তখন সকলেই তাহার নিকট গিয়া মাথায় হাত দিলেন। কিন্তু কাহার আর ক্রন্দন আসিল না। কি যেন এক অবিচিন্তিত ভাবে, সকলেই যেন প্রশান্ত চিত্ত, ভগবল্লীলা দর্শনে চমৎকৃত—বিস্মিত। তখন ভক্তিজলে আপ্লুত হইয়া নরনারায়ণ দেখিলেন—ভূমিকম্পে বিষ্ণুমন্দির ডুবিয়াছে, তৎস্থানে বৃহৎ সরোবর হাসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সপরিবার—হরসুন্দরও বিষ্ণু-সঙ্গ লইয়াছেন। অচ্যুতানন্দ, পূর্ণানন্দ, জ্যোতিঃপ্রসাদ ভক্তিরাগে জগৎ ভুলিলেন। অন্য অন্য সকলে যেন, কি এক অবিচিন্ত্যরসে বিভোর হইয়া আপন পর ভুলিলেন, তবে কে আর অনুতাপ তুলিবে?

শশাঙ্ক বলিলেন, "ভাই পূর্ণানন্দ! অচ্যুতানন্দ! এই দেখ, চক্ষের উপরে দেখ—সংসার বস্তু চিনে না—গুণ চিনে। চিদ্‌বস্তু চিনে না, চিদ্‌গুণও চিনে না—জড়গুণ চিনে। আত্মধর্ম্ম চিনে না, ভগবৎ ধর্ম্ম চিনে না—অহঙ্কার চিনে—পুঁথি চিনে। যদি তাহা না হইত, হরসুন্দরকে না চিনিয়া, তোমাদের কোনগুণে চিনিল? উহাও ত মায়া। সংসার কাহার পূজা করিল—কাহার গুণ মহিমা গাহিল? এমন যাহার গতি, স্থিতি, পরিণাম—ভগবদাজ্ঞায় হরিনামে সংসারের কল্যাণ কর। কিন্তু তাহার ছায়া ও যেন হৃদয়ে স্পর্শিতে না পায়, একবার সেজন্য হরি হরি বল—গাও:—

"কে জানে তোমারে হে—বংশীধারি,
তোমার মর্ম্ম তুমি জান আর জানেন মুরারী।

(রাই কিশোরী)

অঘাসুর বকাসুর আদি—হত হল যত—
তুমি নাথ গুণাতীত, নহত কংসারী ॥”

সেই দিন হইতে লোকে এই গ্রামকে নন্দীগ্রাম বলে, নচেৎ নন্দীগ্রামের পূর্ব্বনাম—বিষ্ণুগ্রাম। এই জন্যই আমরা এ গ্রামকে, নন্দীগ্রাম নামে প্রথম হইতেই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

সেদিন সেই ভাবেই গেল। দিনের পর কত দিনই গিয়াছে, কিন্তু সেদিনে যাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের মাথার উপর যতদিন গিয়াছিল, ততদিন—হরসুন্দর, শিবসুন্দর, জীবসুন্দর, চিন্ময়ী, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, যোগমায়াকে কেহ ভুলিতে পারেন নাই। শশাঙ্ক, অচ্যুতানন্দ, পূর্ণানন্দ, জ্যোতিঃপ্রসাদ, নটনারায়ণ, নরনারায়ণের ত কথাই নাই। তাঁহারা স্বগত চিত্তপটে ভক্তি তুলিতে, তাঁহাদের মূর্ত্তি আঁকিয়া কৃষ্ণ চরণে নিত্য উপহার দিতে ভুলেন নাই।

সমুদিত ছায়াপথ গগনে মিশিল।
বারেক সকলে তবে হরি, হরি বল।

সমাপ্ত।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের

প্রকাশকের—নিবেদন।

পুস্তক লেখা গ্রন্থকারের উপজিবীকা নহে। চিকিৎসা—ইঁহার উপজিবীকা। সেজন্য—এ তাবৎকাল তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। সহৃদয় পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধিকন্তু পুস্তক খানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ায়, আমরা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত আট আনা মূল্যে দিতে অক্ষম হইলাম, কিন্তু স্বাক্ষরিত গ্রাহকগণ, এক টাকা মূল্যেই পাইবেন, পূজার পর ২৲ দুই টাকা মূল্যে এই খণ্ড বিক্রয় হইবে।

নামে ভেদ না থাকায়, নবযুগ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই,—ছায়া, ছায়াপথের প্রণেতা কি—না, অনেকে জিজ্ঞাসা করায়, সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, ছায়া, ছায়াপথ প্রণেতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, নবযুগ সম্পাদক নহেন, এবং ইঁহার জন্ম স্থানও—ঢাকা—নহে, হুগলির আড়পার হালিসহর বা কুমারহট্ট। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী—নিরীহ।

কলিকাতা।
১০ই ভাদ্র, ১৩০৮।

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

অঘাসুর বকাসুর আদি—হত হল যত—
তুমি নাথ গুণাতীত, নহত কংসারী॥"

সেই দিন হইতে লোকে এই গ্রামকে নন্দীগ্রাম বলে, নচেৎ নন্দী-গ্রামের পূর্ব্বনাম—বিষ্ণুগ্রাম। এই জন্যই আমরা এ গ্রামকে, নন্দীগ্রাম নামে প্রথম হইতেই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

সেদিন সেই ভাবেই গেল। দিনের পর কত দিনই গিয়াছে, কিন্তু সেদিনে যাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের মাথার উপর যতদিন গিয়া-ছিল, ততদিন—হরসুন্দর, শিবসুন্দর, জীবসুন্দর, চিন্ময়ী, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, যোগমায়াকে কেহ ভুলিতে পারেন নাই। শশাঙ্ক, অচ্যুতানন্দ, পূর্ণানন্দ, জ্যোতিঃপ্রসাদ, নটনারায়ণ, নরনারায়ণের ত কথাই নাই। তাঁহারা স্বগত চিত্তপটে ভক্তি তুলিতে, তাঁহাদের মূর্ত্তি আঁকিয়া কৃষ্ণ চরণে নিত্য উপহার দিতে ভুলেন নাই।

সমুদিত ছায়াপথ গগনে মিশিল।
বারেক সকলে তবে হরি, হরি বল॥

সমাপ্ত।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের

প্রকাশকের—নিবেদন।

পুস্তক লেখা গ্রন্থকারের উপজিবীকা নহে। চিকিৎসা—ইহার উপজিবীকা। সেজন্য—এ তাবৎকাল তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। সহৃদয় পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধিকন্তু পুস্তক খানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ায়, আমরা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত আট আনা মূল্যে দিতে অক্ষম হইলাম, কিন্তু স্বাক্ষরিত গ্রাহকগণ, এক টাকা মূল্যেই পাইবেন, পূজার পর ২৲ দুই টাকা মূল্যে এই খণ্ড বিক্রয় হইবে।

নামে ভেদ না থাকায়, নবযুগ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই,—ছায়া, ছায়াপথের প্রণেতা কি—না, অনেকে জিজ্ঞাসা করায়, সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, ছায়া, ছায়াপথ প্রণেতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, নবযুগ সম্পাদক নহেন, এবং ইহার জন্ম স্থানও—ঢাকা—নহে, হুগলির আড়পার হালিসহর বা কুমারহট্ট। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী—নিরীহ।

কলিকাতা।
১০ই ভাদ্র, ১৩০৮।

শ্রীরাধানাথ মিত্র।